[illegible] জাতীয় মর্যাদা ঃ
[illegible] তার [illegible]

[illegible]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

Ph.D

[illegible]
[illegible]
[illegible]
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[illegible]

ইসলামে নারীর মর্যাদা :
বাংলাদেশে তার অবস্থান
[১৮০০ — ১৯৯০]

GIFT

401375

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারীর মর্যাদা ঃ বাংলাদেশে তার অবস্থান [১৮০০ – ১৯৯০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি- এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

অক্টোবর-২০০৩।

কলা অনুষদ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পি- এইচ. ডি. (লন্ডন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

401375

উপস্থাপক

ফেরদৌস আরা খানম
পি- এইচ. ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
401375
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পিএইচ.ডি. (লন্ডন), এম.এ. (ডবল), বি.এ. অনার্স (ঢাকা)
এম.এম. (ঢাকা), এফ.আর.এ.এস

সিনিয়র অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ ও ধর্ম-দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

دكتور محمد حبيب الرحمن شودرى

الاستاذ الكبير والرئيس السابق
قسم الدراسات الاسلامية ومقارنة الاديان
جامعة داكا، بنغلاديش

Dr. A.B.M. Habibur Rahman Chowdhury
Ph.D. (London), M.A. (Double), B.A. Hons (Dhaka)
M.M. (Dhaka), F.R.A.S.

Senior Prof. & Ex. Chairman
Dept. Of Islamic Studies & Comparative Religion
University Of Dhaka, Bangladesh
Phone : Off. 9661920-59/4310, 4313. Res. 8612992
E-mail : harchow@du.bangla.net

Ref :

Date :

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পি- এইচ. ডি. গবেষক ফেরদৌস আরা খানম (রেজিঃ নং ১১৩/২০০০-২০০১) -এর দাখিলকৃত **"ইসলামে নারীর মর্যাদা ঃ বাংলাদেশে তার অবস্থান" (১৮০০-১৯৯০)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি কোন যুগ্ম গবেষণা কর্ম নয়। বরং এটি প্রার্থীর স্বকীয় কৃতিত্বে রচিত একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষায়ই এই শিরোনামে পি- এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আগাগোড়া গভীরভাবে পাঠ করেছি এবং মৌলিকত্ব ও মান বিচার করে এটি পি- এইচ. ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি।

১০/৯/০৩

401375

(ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী)
পি- এইচ. ডি. (লন্ডন)
সিনিয়র অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"ইসলামে নারীর মর্যাদা ঃ বাংলাদেশে তার অবস্থান" (১৮০০-১৯৯০)** শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমি গবেষণার পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ করিনি।

ফেরদৌস আরা খানম।
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রেজি ঃ নং- ১১৩/২০০০ - ০১
যোগদান তারিখ- ১৬ ঃ ০৮ ঃ ০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

১. 'আরবী, ও ইংরেজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়নে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অবলম্বন। যেমন ঃ

ا = আ. a	ج = জ dj, j	ر = ড় r	ظ = জ z	م = ম m
إ = ই i	ج = চ c	ز = য z	ع = '	ن = ন n
ا = উ u	ح = হ h	ژ = ঝ zh	غ = গ gh	و = ও w
ب = ব b	خ = খ kh	س = স s	ف = ফ f	ء = '
ب = প p	د = দ d	ش = শ sh	ق = ক k, q	ى = য় y
ت = ত t	د = ড d́	ص = স s	ك = ক k	= এ ﮮ ay
ث = ছ th	ذ = য dh	ض = দ/য d	ك = গ g	
	ر = র r	ط = ত t	ل = ল L	
যের + ى = ঈ, ী,	পেশ + و = ঊ, ূ			

২. অভিসন্দর্ভে কোন উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে অনুসৃত প্রতিবর্ণায়নের পদ্ধতিকেই অনুসরণ।

৩. ফুট নোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমবার গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম, খন্ড, অনুবাদকের নাম, প্রকাশক, প্রকাশনার সময়কাল, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে শুধু গ্রন্থকারের নাম, অথবা গ্রন্থের নাম কিংবা শুধু প্রাগুক্ত ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. ফুট নোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা ক্রমিক নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে লেখকের পরিবর্তে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য বিষয়

- ভূমিকা
- ইসলাম পূর্ব সভ্যতা ও ধর্মে নারীর স্থান ও মর্যাদা
- ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার
- পাকভারত উপমহাদেশে নারীদের অবস্থা
- বাংলাদেশে নারীর অবস্থান
- উপসংহার
- পরিশিষ্ট
- গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম পূর্ব সভ্যতা ও ধর্মে নারীর স্থান ও মর্যাদা

প্রথম পরিচ্ছেদ–	সূচনা	১৫
	চীন সভ্যতা	১৫
	ভারতীয় সভ্যতা	১৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ–	মিশরীয় সভ্যতা	৩৩
	গ্রীক সভ্যতা	৩৫
	রোম সভ্যতা	৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ–	ব্যবিলনীয় সভ্যতা	৩৯
	সুমেরীয় সভ্যতা	৪৫
	আক্কাদীয় সভ্যতা	৪৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ–	অ্যাসিরীয় সভ্যতা	৫০
	পারসীক সভ্যতা	৫২
	বৌদ্ধ ধর্ম	৫৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ–	ইয়াহুদী ধর্ম	৫৭
	খ্রীষ্ট ধর্ম	৬১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ–	আরব সভ্যতা	৬৮

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

	ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার	৮৫-৩১৭
প্রথম পরিচ্ছেদ–	জন্মগতভাবে নারী পুরুষের অধিকার	৮৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ–	পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার	১০৫
	দুহিতা রূপে নারী	১০৫
	সহধর্মিনীরূপে নারীর অধিকার ও মর্যাদা	১১১
	জননীরূপে নারীর অধিকার ও মর্যাদা	১২৫
	শিক্ষার অধিকার	১৩৩
	কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার	১৪৫
	ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার	১৫৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ–	অর্থনৈতিক অধিকার	১৬৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ–	রাজনৈতিক অধিকার	১৯৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ–	রাসূলের যুগে উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহাবী ও তাঁদের অবদান	২২০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ–	ধর্মীয় কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও অবদানের সুযোগ	২৬৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ–	ইসলামের আলোচিত বিষয়সমূহ	২৭৮
	তালাকের অধিকার ও পদ্ধতি	২৭৮
	বহুবিবাহ	২৯০
	নারীর সাক্ষ্যদান	৩০০
অষ্টম পরিচ্ছেদ–	নারী ও পর্দা	৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ– পাক ভারত উপমহাদেশে নারীদের অবস্থা (১৮০০ খ্রী: —১৯৪৬ খ্রী:) ৩১৮-৩৭০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ– পাকিস্তান আমলে নারীদের অবস্থা (১৯৪৭ খ্রী: — ১৯৭০ খ্রী:) ৩৭১-৩৮৩

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে নারীর অবস্থান (১৯৭১ খ্রী: — ১৯৯০ খ্রী:)। ৩৮৪-৪৪১

প্রথম পরিচ্ছেদ– সংবিধানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা ৩৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ– সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনে নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার ৩৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ– কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অবস্থান ৪০৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ– বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলন ও নারীর ক্ষমতায়ন ৪১২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ– উপমহাদেশে মুসলিম নারী নেতৃত্ব ৪২১
- বেনজীর ভুট্টো ৪২১
- শেখ হাসিনা ৪২২
- বেগম খালেদা জিয়া ৪২৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ– বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে নারীর অবদান ৪৩১

উপসংহার ৪৪২

পরিশিষ্ট ৪৪৬-৪৫৪

এক. শিল্পীর তুলিতে নবাব ফয়জুন্নেছার কল্পিত ছবি ৪৪৬
দুই. নবাব ফয়জুন্নেছা স্কুল, কলেজ, কবর ইত্যাদির ছবি ৪৪৭-৪৫০
তিন. বেগম রোকেয়ার ছবি ৪৫১
চার. পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর ছবি ৪৫২
পাঁচ. বি. এন. পি. চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়ার ছবি ৪৫৩
ছয়. আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ছবি ৪৫৪

গ্রন্থপঞ্জি ৪৫৫

Dakha University Institutional Repository

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একজন নারীকে যে অধিকার, সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তা উপস্থাপন করা এবং জাহেলিয়াতের যুগের নারীদের দুরাবস্থা ও বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুক্ষাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা ও সমাধানের দিক নির্দেশনা দান করা। এ কারণে অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে **"ইসলামে নারীর মর্যাদা ঃ বাংলাদেশে তার অবস্থান।" (১৮০০-১৯৯০)।**

নারী ও পুরুষ দুইই আল্লাহর সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহর কাছে নারী পুরুষ উভয়ই সমান। পৃথিবীর সকল ধর্ম ও মতাদর্শে দেয়া নারীর অধিকার ও মর্যাদার চাইতে ইসলামের দেয়া অধিকার ও মর্যাদা অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ। অথচ অজ্ঞতার কারণে আমরা আজ স্রষ্টার দেয়া শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত। একমাত্র ইসলামই দিতে পারে নারীকে ব্যক্তিগত অধিকার, সামাজিক মর্যাদা। অথচ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থে, ইসলামের শাশ্বত বিধানকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর নবুয়াতের পূর্বে সমগ্র আরব ছিল, নারী নির্যাতনের আবাসভূমি। জন্মের পর একটি মেয়ের বাঁচার অধিকারও আরবরা কেঁড়ে নিয়েছিল। নারীকে শুধুই ভোগের জন্য প্রয়োজন, এটাই জাহেলিয়াতের যুগের ধারণা ছিল। মদ, নারী, আর যুদ্ধ এই তিনটিই ছিল একজন পুরুষের বেঁচে থাকার উপকরণ। ঘরে, ঘরে নারী স্বামীর অধিকার, মায়ের মর্যাদা, বাবার স্নেহ থেকে নিদারুণভাবে বঞ্চিত ছিল। জাহেলিয়াতের যুগে নারীকে পারিবারিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অধিকার, সম্পদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। নারীর সমগ্র জীবনকাল ছিল লাঞ্ছনা গঞ্জনাপূর্ণ। মানুষ হিসাবে একজন নারীর কোন মর্যাদা পৃথিবীতে ছিল না।

পৃথিবীতে যত ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে কেউই নারীকে তাঁর যথাযথ সম্মান বা মর্যাদা দেয়নি। হিন্দু ধর্মে কোন নারীর তাঁর পিতার সম্পত্তিতে কোন অধিকার নেই। বিধবা বিবাহের অনুমতি নেই। জীবদ্দশায় স্বামী দেবতার, সন্তুষ্টিই ছিল নারীর একমাত্র ধর্ম। সেখানে নারী ধর্মে, পরিবারে, উত্তরাধিকারে কোথাও ন্যায্য অধিকার পায়নি।

ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়, মনে করত নারীর কোন আত্মাই নেই। মনে করা হত নারীই সকল পাপের উৎস। এক সময় প্রার্থনায়ও নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারত না। নারীর মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা একজন মানুষ হিসেবে অধিকার ও সম্মান নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকার কোন অধিকারই তার ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম বৈরাগ্যবাদকে ধর্মের মূল উপাদান মনে করে। অহিংসবাদে বিশ্বাসী গৌতম বুদ্ধ নারী সম্পর্কে তেমন কিছুই বলে নি। তাই বৌদ্ধ ধর্মেও নারীর অধিকার সংক্রান্ত কোন বিধান দেয়া হয়নি। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদী কোন ধর্মেই নারীকে ধর্মীয় বিধানে কোন অধিকার বা মর্যাদা দেয়া হয়নি। বর্তমানে যেটুকু অধিকার তারা ভোগ করছে তার সবটুকুই

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন আর আইনের মাধ্যমে অর্জিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অন্য কোন ধর্মে নারীর অধিকার নিয়ে কোন সমালোচনা বা প্রতিবাদ করা হয় না। ইসলামের কিছু বিধি-বিধানের খণ্ডিত অংশ নিয়ে বিরূপ আলোচনা বা সমালোচনা করা হয়। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর প্রত্যেকটি বিধানের পিছনে ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে, সামাজিক ভিত্তি রয়েছে, প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে, সর্বোপরি রয়েছে একটি সার্বজনীন কল্যাণকর দিক। বিশেষ করে ইসলামে পুরুষের চার বিয়ের অনুমতি, তালাকের অধিকার, পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞতা ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করা হয়ে থাকে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশেও নারীরা নির্যাতনের শিকার এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারীর সমঅধিকার, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি দাবিতে বাংলাদেশে নারী বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠন তৈরি হয়েছে। এন. জি. ও. গুলো এবং এই সকল নারীবাদী সংগঠন নিজস্ব মতবাদের ভিত্তিতে নারীর অধিকার আদায়ের নামে যে সব কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে এর দ্বারা বাংলাদেশে নারীরা আরও বেশি লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছে।

বাংলাদেশে নারীর অধিকার, নারী নির্যাতন এবং ধর্মে নারীর স্থান সম্পর্কে অনেক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশ বিদেশের অনেক গবেষক, আলিম, শিক্ষাবিদ তাতে যোগদান করেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে বহু বইও লেখা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলনও এন. জি. ও. গুলো নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির নামে নারীদের এমন সব কাজ এবং কাজের পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছে যা শহরে ও গ্রামে নারীদের আরও বেশী নির্যাতিত ও অসম্মানিত করছে। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সমাজে, সংসারে, নারীর সঠিক মূল্যায়ন এ পদ্ধতিতে কোনদিনই সম্ভব নয়।

যেহেতু বাংলাদেশে নারীদের অধঃপতিত অবস্থার কারণে সমাজে, শিক্ষাঙ্গনে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। অশ্লীলতা, শালীনতাবর্জিত লেবাস পোশাক, উগ্র চাল-চলনে সুস্থ্য পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। অসংখ্য প্রতিভাবান যুবকরা বিপথগামী হচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় দেশ ও জাতিকে সঠিক পথ দেখানো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। সেহেতু আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরীর পরামর্শে নারী সমাজের যথাযথ মূল্যায়ন, ইসলামে নারীর অধিকার এবং বাংলাদেশে নারীর সম্মান ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **"ইসলামে নারীর মর্যাদা ঃ বাংলাদেশে তার অবস্থান।"** (১৮০০-১৯৯০) এই শিরোনামটি আমার গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছি।

অভিসন্দর্ভের পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তুকে আমি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। **প্রথম অধ্যায়ের** শিরোনাম **"ইসলাম পূর্ব সভ্যতা ও ধর্মে নারীর স্থান ও মর্যাদা।"** এ অধ্যায়ে চীন সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, মিসরীয় সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, রোম সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, আক্কাদীয় সভ্যতা, অ্যাসিরীয় সভ্যতা, পারসিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইয়াহুদী ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম ও আরব সভ্যতাসহ বিভিন্নধর্ম ও সম্প্রদায়ে নারীর কি অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া এই অধ্যায়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্যান্য ধর্মে নারীরা কতটুকু অধিকার পেয়েছে তার মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে– **"ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার"** সম্পর্কে। এতে জন্মগতভাবে নারী পুরুষের অধিকার, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার, দুহিতা, সহধর্মীনি এবং মা হিসেবে নারীর অধিকার, নারীর শিক্ষার অধিকার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর দেয়া অধিকার রাসূলের যুগে কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে তার নমুনা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে **"পাক ভারত উপমহাদেশে নারীদের অবস্থা"** এবং পাকিস্তান আমলে নারীদের অবস্থা" সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা। এখানে শিক্ষা, সাহিত্য ও রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলিম মহিলাদের অবদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য নারীদের অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম– **"বাংলাদেশে নারীর অবস্থান।"** এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা, সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনে নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্রে, নারীর অবস্থান, বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলন ও নারীর ক্ষমতায়ন, উপমহাদেশে মুসলিম নারী নেতৃত্ব, বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে নারীর অবদান বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বাংলাদেশে ধর্ম ও নৈতিকতাবিহীন শিক্ষার ভয়াবহ পরিণতির কথা ও স্থান পেয়েছে। সেই সাথে সাথে উল্লেখ করা হয়েছে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও তার উৎস এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়।

উপসংহারে বলা রয়েছে নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন এবং নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার পর এই গবেষকের অনুভূতির বর্ণনা। এখানে আমি আমার প্রাপ্ত, সংগ্রহকৃত ও আবিষ্কৃত তথ্যবলির আলোকে নারীর অধিকার এবং বাংলাদেশের নারীর অবস্থান সম্পর্কে আমার অভিমত ব্যক্ত করে থিসিসের সমাপ্তি টেনেছি।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও **"ইসলামে নারীর মর্যাদা ঃ বাংলাদেশে তার অবস্থান" (১৮০০-১৯৯০)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে আমি রাহমানির রাহীম মহান আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে অকুণ্ঠচিত্তে শুকরিয়া আদায় করছি। গবেষণার প্রতি মুহূর্তে মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত আমাকে এই কাজ এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। তাই অবনতমস্তকে আবারও তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। দুরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত মহান নেতা শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম-এর উপর।

গবেষণাকর্মে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, সিনিয়র অধ্যাপক উস্তাযুল আসাতিয়া ডক্টর এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী। আমার প্রতি পরম পিতৃস্নেহ ও অসামান্য মমতা নিয়ে আমার পারিবারিক নানা বিপর্যয়ে, যখন আমি গবেষণা কর্ম বন্ধ করে দিতে চেয়েছি, থমকে দাঁড়িয়েছি, তখন তিনি সাহস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়ে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছতে সহযোগিতা করেছেন। নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার অভিসন্দর্ভটি দেখে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি রেফারেন্স পদ্ধতি সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ পাই। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান স্যারের এই সহযোগিতা, সময়দান ও মূল্যবান পরামর্শদানের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে যথাযোগ্য জাযা ও পুরস্কার দিয়ে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে কল্যাণময় করুন-এই প্রার্থনাই করি। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. মুজতবা হোসাইন স্যার এবং বিভাগীয় অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতিও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা করার জন্য।

গবেষণার কাজে বহু প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা আমি পেয়েছি। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, জাতীয় গণ-গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, লালমাটিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় লাইব্রেরী, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা একাডেমী, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, উইমেন ফর উইমেন, ব্র্যাক, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরী মহিলা বিভাগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, মূল্যবান তথ্য, দুর্লভ সাময়িকী, পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করার কারণে আমি তাদের সকলের কাছে ঋণী।

এছাড়াও আমার স্নেহভাজন সহকর্মী জনাব কুতুবউদ্দীন, ছোট ভাই আনসার উদ্দীন এবং হাফেজ হাফিজুর রহমান যাঁরা আমাকে গবেষণার কাজে অকুণ্ঠচিত্তে সহযোগিতা, সময়দান, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ।

অভিসন্দর্ভটি রচনায় যেসব গুণীজন আমাকে প্রয়োজনীয় বই-পত্র ও তথ্যাবলি সরবরাহ করেছেন, পরামর্শ এবং সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, আমি তাঁদের সবার কাছেই ঋণী। এঁদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জননেতা, অধ্যাপক গোলাম আযম, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরীর সাবেক আমীর ও কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এ. টি. এম আজহারুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ মহিলা বিভাগের নেত্রী সাবেক এম.পি জনাব রাশিদা খাতুন, রোকেয়া ইউনুস, খোন্দকার আয়েশা খাতুন, মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর পরিচালক ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আব্দুস শহীদ নাসিম, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন এ. বি. এম. আব্দুল খালেক মজুমদার, ইবনে সিনা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট মজিবুর রহমান, ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির এম.ডি ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. –এর ই.সি. চেয়ারম্যান জনাব আবু নাসের মুহাম্মদ আব্দুজ জাহের, ড. জামাল উদ্দীন, তেজগাঁও কলেজ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. শফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন, মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী -এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ গবেষণা কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার আত্মীয়-স্বজন যাঁরা আমায় সাহস যুগিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমার ছোট খালা নারী আন্দোলন নেত্রী খোন্দকার আয়েশা খাতুন, বড় ভাই সাইফুল আলম খাঁন মিলন, প্রবাসী ভাই খায়রুল আলম খাঁন দোলন, প্রবাসী বড় বোন রওশন আরা মুকুল, আমার স্নেহময়ী মা বেগম লুৎফুন নাহার, আমার শ্রদ্ধেয় বয়োবৃদ্ধ বাবা হাবিবুর রহমান খাঁন অন্যতম। তাঁদের উৎসাহ যে আমাকে কতটা অনুপ্রাণিত করেছে হয়তোবা তাঁরা নিজেরাও তা অনুভব করতে পারেননি।

আমার দুই ছেলে সরকার নাজমুস সাকীব ও সরকার মেহেদী আফিফ গবেষণার এই দীর্ঘ সময়কালে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে, অনেক ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছে। বিশেষ করে কম্পিউটারে কাজ করার সময় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাকীব ও আফিফ আমাকে যে সহযোগিতা করেছে আমার কাছে তা আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমার সংসার জীবনের প্রতিদিনের ব্যস্ততায় যাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা আমায় সাহস যুগিয়েছে, আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই কাজে; যাঁর সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমার গবেষণা কাজের প্রতিটি পদক্ষেপে ছিল, সে আমার জীবনসাথী এডভোকেট জসীমউদ্দীন সরকার। আমার যে কোন অর্জন তাঁর কাছেও পরম প্রাপ্তির, তাঁর জন্যও গর্বের, তাঁর দরদমাখা সহযোগিতা, নিরন্তর উৎসাহ, নিরলস প্রচেষ্টা, আগ্রহ ও ত্যাগ না থাকলে আমি এ গবেষণা কখনোই শেষ করতে পারতাম না। তাই ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক ঊর্ধ্বেই তাঁর স্থান। এ কারণে অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করার এই আবেগাপ্লুত মুহূর্তে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি তাঁকে।

দীর্ঘদিন ধরে থিসিসের কম্পিউটার কম্পোজে সহযোগিতা করেছে আমার ছাত্রতুল্য হাফেজ জহির উদ্দীন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কম্পিউটারের কাজে আরও যাঁদের সহযোগিতা নিয়েছি তাঁরা হলেন, জনাব মাওঃ হাবিবুর রহমান ও আশফাক উদ্দীন (ঝোটন)। কুমিল্লা থেকে নবাব ফয়জুন্নেছার বিভিন্ন স্থাপনার ছবি সংগ্রহ করতে আন্তরিক সহযোগিতা করেছে স্নেহের ভাগ্নে আজিজুল হক (বাদশা)। থিসিস প্রিন্টিং-এর শেষে মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত নানা সমস্যার সম্মুখিন হই। দিশেহারা এই অবস্থায় আল্লাহর রহমত হিসেবে যে কয়জন দ্বীনি ভাই রাতদিন পরিশ্রম করে, সমস্যাগুলি সমাধানে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন- মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী, মোঃ কামাল হোসেন, মোঃ সানোয়ার হোসেন এবং কে. এম. মশিউর রহমান। সেজন্য তাদের প্রত্যেককে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই শুকরিয়া। পরিশেষে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সকলের এ মহৎ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার সর্বোত্তম জাযা দান করুন।

আমীন ॥

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম পূর্ব সভ্যতা ও ধর্মে নারীর স্থান ও মর্যাদা

সূচনা ঃ

সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে মানব-সভ্যতার মঙ্গল ও উন্নতি। এই সম্পর্কে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সভ্যতার ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে এবং সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সর্বত্র এই সম্পর্কের ব্যাপারে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতিই পরিলক্ষিত হয়। নারী এবং পুরুষ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সমাজ, সভ্যতা বিনির্মাণে এবং সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোথাও নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনীরূপে জীবনে চলার পথে তাকে সাহায্য করেছে। আবার অপরদিকে কোথাও এই নারীই সমাজ সংসারে অধম দাসীতে পরিণত হয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগে নারীকে সকল অধিকার হতে বঞ্চিত করে জীব-জন্তুর ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে। তাঁকে পাপ-পঙ্কিলতার উৎস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর অন্তর্নিহিত গুণরাজি বিকাশের কোন সুযোগ-সুবিধা তাঁকে প্রদান করা হয়নি। আবার কোন সময় এই সুবিধা প্রদান করা হলেও সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত করে তাঁকে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়েছে। এমনকি কখনো কখনো তাকে ঐসব অধিকার থেকেও বঞ্চিত রাখা হতো যা ঐ দেশের জীবজন্তুও ভোগ করত। এভাবে বংশীয় শৃঙ্খলা ও সভ্যতার ভিত্তি ধ্বসে পড়েছে। পুরুষের সাথে বৈরীতার লালন করে নারী মুক্তির চিন্তা হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে শয়তানের আধুনিক ফেতনা। অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীকে এগুতে হবে আল্লাহর দেওয়া বিধি বিধানকে মেনে নিয়ে। নচেৎ সমাজ সভ্যতার মৌল কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। ইতিহাসের দুটি পর্যায়ে নারীরা নির্যাতিত হয়েছে। একবার অন্ধকারাচ্ছন্ন মূর্খতার যুগে আর একবার আমাদের এই আধুনিক যুগে। মূর্খতার যুগে নারীদেরকে সীমাহীন অত্যাচার করা হতো। ইসলাম এসেই নারীদেরকে তা থেকে উদ্ধার করেছিল। কালের পরিক্রমায় আবার এই আধুনিক যুগে এসে নারীরা নির্যাতনের শিকার। অতীত যুগের ইতিহাস এবং বর্তমানে নারীদের অবস্থান আলোচনা করলে একথাই প্রমাণিত হয়।

চীন সভ্যতা

দুনিয়াতে চীনদেশেই নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনে নারীকে Waters of woe (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চীনে নারী কখনও কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। এমনকি তার সন্তানদের উপরও কোন অধিকার থাকত না। স্বামী যখন ইচ্ছা, তখনই তাকে তালাক দিতে পারত এবং অপরের উপপত্নীরূপে তাকে বিক্রয়ও করতে পারত। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে

Dhaka University Institutional Repository

জীবন যাপন করতে হত এবং পুনর্বিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল। চীনদেশের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈকা চীনদেশীয় নারী বলেন ঃ 'মানব সমাজে নারীদের অবস্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারী হতে নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।[১]

সে দেশে বালকেরা দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়াত যেন তারা স্বর্গ হতে আগত দেবতা। স্ত্রী, কন্যা সন্তান প্রসব করেছে সংবাদে কোন পিতাই আনন্দিত হত না। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার দৃষ্টি যেন কারও উপর পতিত না হয় সেজন্য সে নিজের ঘরে লুকিয়ে থাকত। সে মৃত্যুবরণ করলে কেউই তার জন্য রোদন করত না। ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। তার পিতা-মাতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বের করে দেয়া হত।[২]

অবিবাহিতা নারী পিতার পরিবারের সদস্য থাকত। বিয়ের পর সে স্বামীর পরিবারে চলে যেত এবং স্বামীর মাতা-পিতা ও মুরুব্বীদের কর্তৃত্বাধীনে থাকত। অলঙ্কারাদি ও নিজস্ব ব্যবহারের জিনিসপত্র ব্যতীত বধূ যে সম্পত্তিই সঙ্গে নিয়ে আসত, এর সবকিছুই স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিগণিত হত। বধূর অবস্থা নিতান্ত অসহায় ছিল এবং কেবল পিতার বংশের বলেই সে স্বামীর পরিবারে টিকে থাকতে পারত। পুত্র সন্তান প্রসব ও স্বামীর মুরুব্বীদের মৃত্যুতে শোক পালনের পর স্ত্রীর অবস্থা কিছুটা ছিল সবল হয়ে উঠতো।

বর ও কনের পরিবার-প্রধানদের আনুষ্ঠানিক সম্মতিতেই বিবাহ-কার্য সম্পাদিত হত। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিবাহের উকিলের মাধ্যমে এই কার্য সম্পন্ন করা হত।[৩]

ভারতীয় সভ্যতা

সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু অধুষিত ভারত[৪]বর্ষকে একটি হিন্দু ধর্মভিত্তিক দেশ মনে করা হয়। কারণ এর অন্যান্য যে কোন দিকের চেয়ে ধর্মীয় দিকটি সব সময় বেশি প্রভাব বিস্তার করে

---

১. আব্দুল খালেক, **নারী** (ঢাকা ঃ দীনী পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি- ১৯৯৯ খ্রিঃ), পৃ ৫ ।

২. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, **Women in Islam** (Lahore : Islamic Publication Ltd., October- 1979), P- 7.

৩. **Encyclopaedia Britannica,** Vol. IV, p- 409.

৪. **ভারত** ঃ প্রাচীন ভারতের আয়তন ছিল ১৮ লক্ষ বর্গমাইল। এশিয়া মহাদেশের মধ্য দক্ষিণে ভারতের অবস্থান। পার্সীয় ও গ্রীক লেখকদের প্রভাবে ভারত আন্তর্জাতিকভাবে India নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পারস্য সম্রাট প্রথম দারিয়াস ৫১৭-৫১৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে পাঞ্জাব অধিকারের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ গড়ে তোলেন। শুধুমাত্র পারস্যই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদেশীরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। এই বিদেশীদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত যে সকল বিদেশী পশ্চিম এশিয়া থেকে এসেছিল। এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল পারসিকগণ, পারদগণ, গন্ধারগণ, সাসানীয়গণ, জার্মান, গ্রীক, রোমকগণ এবং সবশেষে মুসলমানগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদেশীরা মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিল যাদের মধ্যে শকগণ, খাসগণ, আভীরগণ, কুষাণগণ, হুনগণ, গুর্জরগণ এবং গুলিকগণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তৃতীয়

Dhaka University Institutional Repository

আসছে। এখানেও নারী দাসত্ব ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায়নি।[৫] ইসলামের শেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সময়কালে ও তাঁর পূর্বের প্রাচীন ভারতের বিবাহ পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, মহাভারত ও বাৎসায়নের মাধ্যমে জানতে পারি। প্রাচীন ভারতে একজন পুরুষের যে বহু স্ত্রী গ্রহণের অধিকার আছে সে কথা আমরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে জানতে পারি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় উল্লেখ আছে, 'যেহেতু (যজ্ঞে) একটি দণ্ডকে দুটি বস্ত্রখণ্ড বেষ্টন করে কিন্তু তার বিপরীত হয় না, সেহেতু একটি পুরুষ দুই স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এক নারী বহুপতি গ্রহণ করতে পারে না। [৬] ঋগ্বেদের ধর্মীয় গ্রন্থেও পুরুষের বহুবিবাহের উল্লেখ আছে।[৭] ভারতবর্ষের বিখ্যাত আইন রচয়িতা ও শাস্ত্রকার মনুরাজ মনস্মৃতিতে নারী সম্পর্কে বলেছেন, ভারতীয় নারী চিরকালই অন্যের অধীন। শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে স্বামীর অধীনে থাকবে এবং বিধবা হওয়ার পর থাকবে পুত্রের অধীনে, কোন সময় সে স্বাধীন থাকবে না। নারী অপ্রাপ্ত বয়স্কা, প্রাপ্ত বয়স্কা বা বৃদ্ধা যাই হোক না কেন স্বাধীন যেন না হয়।[৮] কোরবানী এবং ব্রত পালন করা নারীর জন্য পাপ। তার উচিত স্বামীর সেবা করা। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় স্বামী গ্রহণের বিষয় মুখে আনাও নারীর উচিত নয় বরং স্বল্পাহারী হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া উচিত।[৯] মিথ্যা বলা নারীর আপন বৈশিষ্ট্য।[১০] হিন্দু ধর্মে নারী জাতিকে অসম্মান করে আরও বিভিন্ন উক্তি করা হয়েছে-নদী, সশস্ত্র সৈনিক, শিং ও নখরবিশিষ্ট ভণ্ড শাসক এবং নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।[১১] পরবর্তীকালে শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা দেখতে পাই 'এক পুরুষের বহু স্ত্রী থাকে।[১২] মৈত্রায়নী সংহিতায় মনুর দশ স্ত্রীর প্রতি সমদৃষ্টি রাখতে পারেননি, রোহিনীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে তাঁর যক্ষ্মা রোগ হয়।[১৩]

শ্রেণীর বিদেশীরা পূর্ব এশিয়া থেকে এসেছিল যাদের মধ্যে চৈনিকগণ, কিরাতগণ এবং পূর্ব দ্বীপবাসীগণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তার **An Advance History of India** নামক গ্রন্থে ভারতীয় জাতিসমূহকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। এই বিভক্তিসমূহ হল ১. আদিম উপজাতিসমূহ ২. মোঙ্গলীয় ৩. দ্রাবিড় এবং ৪. আর্য।

৫. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী** (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী), পৃ ৩৪।

৬. **তৈত্তিরীয় সংহিতা**-৬/৬/৪৩ম **তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ** ১৩/১০/৫৮।

৭. **ঋগ্বেদ সংহিতা**-৭/২৬/৩।

Griness Book of Records 1983 এ হিন্দু ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদকে (The Rig Veda) পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেই ঋগ্বেদেই পুরুষের বহুবিবাহের উল্লেখ আছে।

৮. **মনুরাজ-মনুস্মৃতি,** অধ্যায়-৫, পৃ ১৪৫।

৯. **মনুরাজ-মনুস্মৃতি,** অধ্যায়-৫, পৃ ১৫৫-১৫৭।

১০. **মনুরাজ-মনুস্মৃতি,** অধ্যায়-৯, পৃ ১৭।

১১. **চানক্য নীতি,** অধ্যায়-১, পৃ ১৫।

১২. **শতপথ ব্রাহ্মণ,** ৯/৪/১/৬।

১৩. **মনু-মৈত্রায়নী-সংহিতা,** ২/৩/৫/১৩।

Dhaka University Institutional Repository

শতপথ ব্রাহ্মণে লিখা আছে 'তদ্বৈ সমৃদ্ধং যস্য কনীয়াংস্যা ভার্যা আসন ভূয়াংসঃ পশব' অর্থাৎ সেই হলো সমৃদ্ধি যখন একজন পুরুষের পশুপালের তুলনায় স্ত্রী সংখ্যায় কম থাকে।[১৪]

প্রাচীন আরবদের মত ভারতেও নারী ও শিশু হত্যা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ প্রথা কখন কোথায় প্রথম প্রচলিত হয়েছিল তার ঐতিহাসিক নথি পত্র নেই। তবে প্রাচীন কাল হতে এই প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল। মৃত্যু যতই ভয়ানক হোকনা কেন তা বিধবার নিকট অভিনন্দনযোগ্য মুক্তি হিসেবে সমাদৃত হত ভারতবর্ষে। কেননা কোন বিধবা যদি সন্তানের জননী না হত তবে তার দুর্দশার সীমা থাকত না।[১৫] অতুল সুরের[১৬] লেখা থেকে জানা যায়-বৈদিক যুগে মেয়েদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। যুবক যুবতীরা অবাধে মেলামেশা করতে পারত। সে সময়কার নারীদের পতি নির্বাচন করার অধিকার ছিল।[১৭] তা সত্ত্বেও সে যুগেও মেয়েরা লাঞ্ছিত ছিল। অতুল সুর বলেন ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে এমন কয়েকটি সূত্র আছে যা থেকে বোঝা যায় যে বধূকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই বিয়ে করত তা হলেও তার কনিষ্ঠ সহোদরগণের বধূর উপর যৌনমিলন বা রমনের অধিকার থাকত। এ দু গ্রন্থেই স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেব্র বা দেবর বলা হয়েছে। এই শব্দদ্বয় থেকেও তা স্পষ্ট হয়। কেননা দেবর মানে দিবর বা দ্বিতীয় বর। আদি হিন্দু আইন ব্যবস্থায় নারী জাতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। মনু বলেন-নারী জাতির রয়েছে অপবিত্র ক্ষুধা, তারা দুর্বল নমনীয়তা ও মন্দ আচরণের অধিকারী, দিবারাত্র তাদেরকে অধীন করে রাখতে হবে।[১৮] নারী জাতির অবমূল্যায়ন এতই মারাত্মক ছিল যে, নারী জাতিকে বেদ অধ্যায়ন কিংবা পূর্বপুরুষের আত্মাসমূহের উদ্দেশ্যে বা দেব দেবিদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত নৈবেদ্য অনুষ্ঠানে যোগদান থেকে বিরত বা বঞ্চিত করা হত। স্বামীর সেবাই ছিল স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম। আর এই কর্তব্য পালনের নিষ্ঠার উপরই তার চিরন্তন শান্তি নির্ভর করত। যে সতী সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতী দিতেন, তিনি হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ সতীর আসনে অধিষ্ঠিত হতেন।[১৯] ভারতে

---

১৪. **শতপথ ব্রাহ্মণ** ২/৩/২/৮/; ৫/৩/২৮

১৫. আমীর আলী সৈয়দ, **দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম** (কলকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স) পৃ. ১৯-২০

১৬. ড: অতুল সূর, ভারতের প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ড: অতুলসুর তার **"ভারতের বিবাহের ইতিহাস"** নামক গ্রন্থে প্রাচীন ভারত থেকে পর্যয়ক্রমে বিবাহ ও বহুবিবাহের উপর ব্যাপক গবেষণা করে এক অমূল্য ইতিহাস রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে ড. অতুল সূর বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের উদ্ধৃতি দ্বারা নৃতাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, প্রাচীন ভারতে ও তার পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বহু বিবাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

১৭. **ঋগ্বেদ সপ্ত মন্ডল**- ৭/২/৫ (সমন উৎসব অনুষ্ঠান)

সমন উৎসবটি বর্তমান দিনের অলিম্পিক উৎসবের মত। এ উৎসবে মেয়েরা আমোদ প্রমোদ করত ও যুবতী মেয়েরা মনের মত পতি লাভের আশায় সুসজ্জিতা হয়ে যোগদান করত। সারারাত্র ব্যাপি এই উৎসব চলতে থাকত। আহম্মদ মনসুর, বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ সে চাকায় তাসনিম পাবলিকেশন্স পৃ.৩৪-৩৫

১৮. আমীর আলী সৈয়দ, **দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৯।

১৯. আমীর আলী সৈয়দ, **দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বীকার করা হত না। সতীদাহ[২০] প্রথাই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এভাবে স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিনিয়ে নেয়া হত।

নারী জাতির বিভিন্ন দোষ বর্ণনা করে হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে-মিথ্যা কথা বলা, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে কাজ করা, ধোঁকাবাজি, আহম্মকী, লোভ, অপবিত্রতা, নিষ্ঠুরতা, নারীর স্বভাব জাত দোষ। রাজপুত্রদের নিকট থেকে নৈতিক শুচিতা, বিদ্বানদের নিকট থেকে মিষ্ট ভাষণ, জুয়াড়ীদের নিকট থেকে মিথ্যা বলা এবং নারীদের নিকট থেকে প্রতারণা শেখা উচিত।[২১] আগুন, পানি, নিরেট মূর্খ, সাপ, রাজপরিবার, এবং নারী এরা সবাই ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এদের ব্যাপারে সবসময় সাবধান হয়ে থাকতে হবে।[২২] বন্ধু, চাকর এবং নারী, দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে কিন্তু যখনই আবার সে সম্পদের অধিকারী হয় তখনই তার কাছে ফিরে আসে।[২৩]

প্রাচীন ভারতে বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত তিনটি-১. ধর্মপালন ২. বংশরক্ষা ৩. যৌন সম্ভোগ বা রতি। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক প্রাচীনতম স্মৃতিশাস্ত্র অনুসরণ করে আট প্রকার বিবাহের কথার উল্লেখ করেছেন।[২৪] এই বিবাহগুলো হলো ঃ

১. ব্রাহ্ম বিবাহ ঃ ব্রাহ্ম বিবাহ ছিল ব্রাহ্মণ্য আচার সম্পৃক্ত বিবাহ। এই বিবাহে মন্ত্র উচ্চারণ ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে স্ববস্ত্রা ও সুসজ্জিতা কন্যাকে বরের হাতে সম্প্রদান করা হত। বিবাহ যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে বর-কনে উভয়েই তিনবার যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করতে করতে বলত 'তুমি আমি, আমি তুমি, তুমি স্বর্গ, আমি পৃথিবী, আমি সাম, তুমি ঋক, এসো আমরা বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করি।'

২. আর্য বিবাহ ঃ প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে যে বিবাহ প্রচলিত ছিল তার নাম ছিল আর্য বিবাহ। এই বিবাহে যৌতুকের পরিবর্তে নাম মাত্র কন্যামূল্য হিসেবে একটি গরু এবং একটি ষাড় দেওয়া হত।

৩. দৈব বিবাহ ঃ গৃহস্থ বা কন্যার পিতা এই বিবাহে যজ্ঞ পুরোহিতকে তাঁর প্রাপ্য অর্থের অংশ হিসেবে কন্যা দান করত।

৪. প্রজাপত্য বিবাহ ঃ এ বিবাহে কন্যার পিতা যৌতুকও দিতেন না, কন্যামূল্যও নিতেন না। বলা হত 'তোমরা দুজনে যুক্ত হয়ে ধর্মাচরণ কর'-এই উপদেশ দিয়ে যেভাবে বরের হাতে মেয়েকে দেওয়া হত তাকে বলা হত প্রজাপত্য বিবাহ।

---

২০. সতীদাহ প্রথা- ভারত বর্ষে কোন হিন্দু নারীর স্বামী মারা গেলে মৃত স্বামীর চিতার আগুনে বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় একসাথে পুড়িয়ে মারাকেই সতীদাহ প্রথা বলা হয়।

২১. **চানক্যনীতি**-অধ্যায়-১২, পৃ. ১৮।

২২. **চানক্যনীতি**-অধ্যায়-১৪, পৃ. ১২

২৩. **চানক্যনীতি**-অধ্যায়-৫, পৃ. ১৫।

২৪. আহম্মদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহম্মাদ (স)** (ঢাকা ঃ তাসনিম পাবলিকেশন্স), পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫. গান্ধর্ব বিবাহ ঃ পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছায় এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হত অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী স্বেচ্ছায় একে অপরকে মাল্য দানের মাধ্যমে যে বিবাহ করত তাকে বলা হত গান্ধর্ব বিবাহ। মহাভারতের নায়কদের মধ্যে অনেকেই গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছিলেন, যথা-অর্জুনের সাথে উলুপি ও চিত্রাঙ্গদার বিবাহ, দুস্মন্তের সাথে শকুন্তলার বিবাহ প্রভৃতি।

৬. অসুর বিবাহ ঃ এইরূপ বিবাহে পয়সা দিয়ে কন্যা ক্রয় করা হত। অর্থাৎ বিবাহে মেয়ের বাবাকে কিংবা তার অভিভাবককে পণ বা মূল্য দিতে হত। এই বিবাহের দৃষ্টান্ত মাদ্রীর সাথে পাণ্ডুর বিবাহ এবং দশরথের সাথে কৈকেয়ীর বিবাহ।

৭. রাক্ষস বিবাহ ঃ মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যে বিবাহ করা হত তার নাম ছিল রাক্ষস বিবাহ। মহাভারতে রাক্ষস বিবাহের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা-কৃষ্ণ রুক্ষিনীকে বলপূর্বক হরণ করে এনে বিয়ে করেছিলেন। দেবকের রাজসভা থেকে দেবকীকে শিনি বলপূর্বক অধিকার করে এনেছিলেন বসুদেবের সাথে বিবাহ দেয়ার জন্য। একইভাবে দুর্যোধনের সাথে বিবাহ দেবার জন্য কলিঙ্গরাজারা সভা থেকে চিত্রাঙ্গদাকে কর্ণ বলপূর্বক হরণ করে এনেছিলেন।

৮. পৈশাচ বিবাহ ঃ যেখানে মেয়েকে অজ্ঞান বা অচৈতন্য অবস্থায় হরণ করে এনে প্রবঞ্চনা অথবা ছলনার দ্বারা বিবাহ করা হত তাকে বলা হত পৈশাচ বিবাহ।

উপরোল্লেখিত এই আট রকমের বিবাহের মধ্যে প্রথম চার রকমের বিবাহকে ধর্মীয় বিবাহ বলে মনে করা হত। প্রথম চারটি বিবাহের প্রশংসায় এবং শেষের চারটির নিন্দায় মনু এবং যাজ্ঞবল্ক উভয়েই একমত। কিন্তু একই প্রসংগে মনু আবার অন্য কথা বলেছেন। তিনি প্রজাপত্য, গান্ধর্ব এবং রাক্ষস বিবাহকে আইনসঙ্গত এবং একমাত্র পৈশাচ ও অসুর বিবাহকে বেআইনী আখ্যা দিয়েছেন।[২৫]

'বহুপত্নী গ্রহণ মহাভারতীয় যুগে বেশ প্রচলিত ছিল। মহাভারতের অনেক নায়কেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। যেমন যযাতি বিবাহ করেছিলেন শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে, দুস্মন্ত বিবাহ করেছিলেন শকুন্তলা ও লক্ষ্মণাকে, শান্তনু বিবাহ করেছিলেন সত্যবতী ও গঙ্গাকে, বিচিত্রবীর্য বিবাহ করেছিলেন অম্বিকা ও অম্বালিকাকে, ধৃতরাষ্ট্র বিবাহ করেছিলেন গান্ধারী ও বৈশ্যাকে, পাণ্ডু বিবাহ করেছিলেন কুন্তী ও মাদ্রীকে এবং যুক্ত স্ত্রী হিসেবে দ্রৌপদী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ভীম বিবাহ করেছিলেন হিরিম্বাকে এবং অর্জুন বিবাহ করেছিলেন উলুপী, চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রাকে। মগধের রাজা বৃহদ্রথও বিবাহ করেছিলেন কাশী রাজের দুই যময কন্যাকে। মহাভারতে একস্থলে উল্লিখিত হয়েছে যে কৃষ্ণের ১০১৬ স্ত্রী ছিল আবার অপর স্থলে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের ১৬০০০ স্ত্রী ছিল। মহাভারতে আরো উল্লেখ আছে যে রাজা সোমকের একশত স্ত্রী ছিল।[২৬]

অতুল সুর আরো বলেন, 'বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত মহাভারতে মাত্র একটিই আছে। পাণ্ডব ভ্রাতাদের সংগে দ্রৌপদীর বিবাহই একমাত্র বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত নয়। কালান্তরে গৌতম বংশীয়া

---

২৫. আহম্মদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহম্মাদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫-৩৬।

২৬. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস** (কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ভাদ্র-১৩৮০), পৃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

জটিলা সাততি ঋষিকে এক সংগে বিবাহ করেছিলেন। আবার বাক্ষী নামে অপর এক ঋষি কন্যা এক সংগে দশ ভাইকে বিবাহ করেছিলেন। বৈদিক যুগে আমরা দেখেছি যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্তৃক বিবাহিতা বধূর উপর সকল ভ্রাতার এক সংগেই যৌনাধিকার থাকত। দ্রৌপদীর বিবাহকালে ব্যাস বলেছিলেন-স্ত্রী লোকের পক্ষে বহুপতি গ্রহণই সনাতন ধর্ম। ধর্মসূত্রে এর উল্লেখ আছে। আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- 'কন্যাকে কোন বিশেষ ভ্রাতার হাতে দেওয়া হয় না, ভ্রাতৃবর্গের হাতে দেওয়া হয়।' বৃহস্পতি এর প্রতিধ্বনি করেছেন। তবে তার সময়ে এরূপ বিবাহ বিরূপ দৃষ্টিতে দেখা হত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমৎভগবৎগীতা অনুযায়ী দক্ষ রাজার ১৬টি মেয়ের বিবাহ হয়েছিল বিভিন্ন প্রথাতে। ১৩টির বিবাহ হয়েছিল ধর্মের সংগে, একটি অগ্নির সংগে, একটি 'মিলিত পিতৃগণের' সংগে, আর সতী নামের মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল শিবের সংগে। সুতরাং এ স্থলে আমরা বহুপত্নীক, বহুপতি ও এক পত্নীক বিবাহ-এই তিনরকম বিবাহ প্রথারই দৃষ্টান্ত পাচ্ছি।[২৭]

প্রাচীন ভারতে বিবাহপূর্ব বিভিন্ন পুরুষের সাথে মেয়েদের যৌনসংসর্গ অনুমোদিত হত। এ সম্পর্কে ড. অতুল সুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন বলেন যে, 'বিবাহের পূর্বে মেয়েদের যৌনসংসর্গ মহাভারতীয় যুগে অনুমোদিত হত। বোধহয় আগেকার যুগেও হত। কেননা ছান্দগ্য উপনিষদে আমরা দেখতে পাই যে মহার্ষ সত্যকামের মাতা জবালা যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন।[২৮] বিবাহের পূর্বে মেয়েদের যৌনসংসর্গও সমাজে বরদাস্ত হত তা বিবাহের পূর্বে প্রসূত সন্তানের 'আখ্যা' থেকেই বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণ কর্ণকে বলছেন- 'কুমারী মেয়ের দুরকম সন্তান হতে পারে।' ১. কানীন ও ২. সহোঢ়। যে সন্তানকে কুমারী বিবাহের পূর্বেই প্রসব করে তাকে বলা হয় কানীন। আর 'যে কুমারী বিবাহের পূর্বে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে বিবাহের পরে প্রসব করে তাকে বলা হয় সহোঢ়।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মহাভারতীয় যুগে কুমারী কন্যার পক্ষে গর্ভধারণ করা বিশেষ নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না।

অতুল সুর আরো বলেন, 'মহাভারতীয় যুগে বিবাহিতা নারীর পক্ষে স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের সংগে যৌন সংসর্গও নিন্দিত ছিল না। সুদর্শন উপাখ্যানে দেখতে পাওয়া যায় যে, অতিথির সন্তোষ বিনোদনের জন্য গৃহের গৃহিনীর পক্ষে অতিথির নিকট আত্মদেহ নিবেদন করা প্রচলিত রীতি ছিল। সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সাথে যৌনমিলনের

---

২৭. অতুলসুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

২৮. অতুলসুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

* মহাভারতের এরূপ সংসর্গের দৃষ্টান্ত স্বরূপ সত্যবতী-পরাশরের কাহিনী বিবৃত করা যেতে পারে। উপরিচর বসুর কুমারী কন্যা সত্যবতী যৌবনে যমুনায় খেয়া পারাপারের কাজ করতেন। একদিন পরাশমুনি তার নৌকায় উঠে তার অপরূপ সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তার সংগে যৌনমিলন প্রার্থনা করলেন। সত্যবতী তখন পরাশমুনিকে বললেন- 'নৌকার মধ্যে আমি কিভাবে যৌনকর্মে রত হব। কেননা তীর থেকে লোকেরা আমাদেরকে দেখতে পাবে।' পরাশমুনি তখন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেন এবং তারই অন্তরালে তার সংগে যৌনমিলনে রত হন। এর ফলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম হয়েছিল। পরাশর সত্যবতীকে বর দেন যে এই সংসর্গ সত্ত্বেও সে কুমারী থাকবে। কুন্তীও কুমারী অবস্থায় সে সূর্যের সংগে মিলনের ফলে পুত্র কর্ণকে প্রসব করেছিলেন। এক্ষেত্রেও দুর্বাসামুনির বরে কুন্তীও তার কুমারীত্ব হারাননি। মাধবী-গালব উপাখ্যানেও আমরা দেখতে পাই যে, প্রতি সন্তান প্রসবের পর মাধবীর কুমারীত্ব অটুট ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

রীতিও ছিল। স্বামী মৃত্যুর পর এই ধরনের যৌনমিলন তো ঘটতই, স্বামী জীবিত থাকাকালীনও এরূপ মিলন ঘটত তারও দৃষ্টান্ত আছে।[২৯] কুন্তীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য ধর্মকে আহবান করা হয়েছিল। ধর্মের সহিত কুন্তীর সংগমের ফলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়েছিল। পরে পাণ্ডুর ইচ্ছানুক্রমে কুন্তী বায়ু ও ইন্দ্রকে আহবান করে ভীম ও অর্জুনের জন্ম দেন। পাণ্ডুর অপর স্ত্রী মাদ্রীও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সাথে মিলিত হয়ে দুটি সন্তান নকুল ও সহদেবের জন্ম দিয়েছেন...নমস্য ঋষিপত্নীরাও এরূপ যৌনসংসর্গ বা আকাঙ্ক্ষা হতে মুক্ত ছিলেন না।[৩০] প্রাচীন ভারতে বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণরা অজস্র মেয়ে বিয়ে করতেন। অতুল সুরের কথায়, 'এরূপ শোনা যায় যে একজন ২০০/৩০০ পর্যন্ত বিবাহ করতেন।[৩১]

আল বেরুনী [৩২] বলেন, 'বিবাহিতা স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের অনুমতিক্রমে পর পুরুষদের সাথে যৌনমিলনে রত হয়ে যে সন্তান উৎপাদন করত সে পুত্র তার স্বামীর হবে, যেহেতু স্ত্রীরূপ ভূমিতে তার অনুমতিক্রমে উৎপাদিত শস্যে স্বামীরই অধিকার থাকে। এ নিয়মেই পাণ্ডু শান্তনুর পুত্র বলে বিবেচিত, নিঃসন্তান অবস্থায় কোন মহা তপস্বীর অভিশাপে এই রাজা স্ত্রী সংগমের সামর্থ্য হারিয়েছিলেন। তিনি তখন পুরাশুর পুত্র ব্যাসকে তার স্ত্রীর গর্ভে তার জন্য পুত্র উৎপাদন করতে অনুরোধ করেন। ব্যাসের সংগে সংগমকালে তার এক স্ত্রী ভয়ে কম্পিত হয়েছিল, তার ফলে সেই অবস্থায় পাণ্ডুর বর্ণের এক রুগ্ন পুত্রকে সে গর্ভে ধারণ করে। রাজা তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তার কাছে

---

২৯. অতুলসুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

* স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র উৎপাদনের জন্য অপরের সাথে যৌনমিলনের দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর মাতা সত্যবতী ভীমকে ভাত্রজায়াদ্বয় অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে আদেশ দিয়েছিলেন। ভীম যখন এর অনুমোদন করলেন না তখন তাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্যে ব্যাসকে আহবান করা হয়। ব্যাস অম্বিকা ও অম্বালিকার দুটি সন্তান ও তাদের দাসীর গর্ভে আর একটি সন্তান উৎপাদন করেন। শতশৃঙ্গ পর্বতের নির্জনে পাণ্ডু কুন্তীকে আদেশ করেছিলেন- 'তুমি অপরের সাথে সঙ্গম করে সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা কর, কেননা শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে প্রয়োজন হলে নারী তার দেবরের সাথে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন করতে পারে।

৩০. অতুলসুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

৩১. অতুলসুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫- ৩৬।

৩২. প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী আল বেরুনী ব্যক্তিগতভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহুদিন অবস্থান করে তৎকালীন ভারতের সামাজিক অবস্থাসহ হিন্দুদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম, বিবাহ, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর *ভারততত্ত্ব* নামে সুবৃহৎ একটি গ্রন্থ ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। বইটির আরবি নামের ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে Book on an accurate description of all categories of Hindu thought, those which are admissible to reason as well as those are not (বুদ্ধি বিচারে যা গ্রহণযোগ্য আর গ্রহণযোগ্য নয়, হিন্দুদের সব রকম চিন্তা পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা)। EDWARD ZACHAU আল বেরুনীর মূল আরবি গ্রন্থটি ১৮৮৭ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। পরের বছর Zacha টীকাসহ ALBERUNI'S INDIA নামে তার একটি সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। ভারত সরকারের উদ্যোগে আরবির একটি সংস্করণ ১৯৫৭ সালে হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই আরবী সংস্করণের উপর ভিত্তি করে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেন যা বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রথম ১৯৭৪ এবং পরে ১৯৮২ সনে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠালে এই স্ত্রীও ব্যাসের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে নিজেকে বসানাবৃত রাখে। তার গর্ভে অন্ধ ও অসুস্থ ধৃতরাষ্টের জন্ম হয়। তৃতীয় স্ত্রীকে ব্যাসের কাছে পাঠাবার সময় রাজা তাকে ভয় ও শ্রদ্ধা পরিহার করতে বলে। হাস্যমুখে ও উৎফুল্লচিত্তে ব্যাসের বীর্য ধারণ করাতে সে স্ত্রীর গর্ভে সুভাষ ও তীক্ষ্ণধী বিদুরের জন্ম হয়। পাণ্ডুর চারি পুত্রের একটি স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্বামীর সংগে সে একমাস কাল বাস করত।[৩৩] আল বেরুনী হিন্দুদের বিবাহ সম্পর্কে বলেন। 'একটি (বিবাহ) যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের কাছে সংগম প্রার্থনা করতে পাঠাত, সুপুত্র লাভের আশায়। গর্ভকালে স্বামী আর সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করত না। আরেক প্রকারের বিবাহ হল যে এক পুরুষ অন্য পুরুষকে বলল 'তোমার স্ত্রী আমাকে দাও, আমার স্ত্রী তোমাকে দেব। একইভাবে তারা স্ত্রী বিনিময় করত, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার জনক চিহ্নিত করে দিত নারী। সে নির্দেশ করতে অপারগ হলে গণকরা বলে দিত। চতুর্থ প্রকারের বিবাহ হল বিমাতার সাথে। মৃত পিতা বা মৃত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করলে সে স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে Zaizan বলা হত।[৩৪]

প্রাচীন ভারতে শুধুমাত্র বিবাহ প্রথাই প্রচলিত ছিল না, এর বাইরে ব্যাপকভাবে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সংসর্গ বহাল ছিল যাকে ইসলাম ব্যভিচার[৩৫] বলে আখ্যা দিয়েছে এবং এর জন্য ইসলামে কঠোরতম শাস্তির বিধান রয়েছে।[৩৬] যৌন আতিথেয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ড. অতুল সুর বলেন, 'যৌন আতিথেয়তা প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল। মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে। বিশেষ করে অনুশাসন পর্বে সুদর্শন ও ওঘাবতীর কাহিনী এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে।[৩৭]

---

৩৩. আবু আহামেদ হাবিবুল্লাহ, **আল বেরুনীর 'ভারত তত্ত্ব'** (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রিঃ), পৃ ৭৭।

৩৪. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, **আল বেরুনীর 'ভারত তত্ত্ব',** প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮।

৩৫. ব্যভিচার-কোর'আন সুন্নার আলোকে নির্ধারিত বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকার যৌন সম্পর্ককে ইসলামে ব্যাভিচার বলা হয়।

৩৬. ইসলামে ব্যভিচার নৈতিকতার দিক দিয়ে অত্যন্ত খারাপ, ধর্মীয় দৃষ্টিতে মহাপাপ এবং সামাজিক দিক দিয়ে জঘন্য ও কদর্যপূর্ণ এবং আপত্তিকর। আল-কোরআনের সূরা আন নিসার তৃতীয় রুকুতে ব্যভিচারকে একটি সামাজিক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সূরা আন নূরে ব্যভিচারকে একটি ফৌজদারি অপরাধরূপে ঘোষণা করে শাস্তি হিসেবে ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারি পুরুষদের একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি ব্যভিচারি নারী ও পুরুষ অবিবাহিত হয় সে অবস্থায় এ শাস্তির বিধান প্রযোজ্য। আর বিবাহিত হলে সে ক্ষেত্রে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার বিধান রয়েছে।

৩৭. অতুলসুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ৮০।

* সুদর্শন অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম পালন করেই মৃত্যুকে জয় করবেন সংকল্প করেছিলেন। স্ত্রী ওঘাবতীকে অতিথি সৎকারের কাজে নিয়োজিত করে তিনি তাকে আদেশ দেন যে প্রয়োজন হলে ওঘাবতী যেন নির্বিচারে নিজেকেও অতিথির কাছে সমর্পণ করে। কেননা অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেউ নেই। একদিন তাঁর আদেশের সততা পরীক্ষা করার জন্য তাঁর অনুপস্থিতিকালে যমরাজ স্বয়ং ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে ওঘাবতীর সংগে সংগম প্রার্থনা করলেন। ওঘাবতী প্রথমে কৌশল করে এটা এড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম নাছোড়বান্দা দেখে অগত্যা তার সংগে যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হন। এই সময় সুদর্শন ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে সামনে না দেখতে পেয়ে তাকে বার বার ডাকতে থাকেন। কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। কেননা ওঘাবতী তখন ব্রাহ্মণের সংগে যৌন মিলনে নিযুক্ত থাকায় নিজেকে অশুচি জ্ঞান করে

Dhaka University Institutional Repository

'মহাভারতের আদিপর্বে উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুর কাহিনী থেকেও আমরা এর আভাস পাই। একদিন শ্বেতকেতু যখন পিতামাতার কাছে বসেছিলেন সেই সময় এক ব্রাহ্মণ এসে তার মায়ের সাথে যৌনমিলন কামনা করে তাকে কক্ষান্তরে নিয়ে যায়। শ্বেতকেতু এতে ক্রুদ্ধ হয় কিন্তু পিতা উদ্দালক বলেন, 'স্ত্রীলোক গাভীদের মত স্বাধীন। সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তাদের অধর্ম হয় না-ইহাই সনাতম ধর্ম। মহাভারতে আরও উল্লেখিত আছে সন্তসুজাত অর্জুনকে বলেছিলেন যে বন্ধুত্বের ষড়গুণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বন্ধুর নিকট নিজ পুত্র ও স্ত্রীকে সমর্পণ করা। কৃষ্ণও বন্ধুর কাছে পুত্র এবং স্ত্রীকে সমর্পণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কর্ণও বলেছিলেন যে যদি কেউ তাকে দেখিয়ে দেয় যে অর্জুন কোথায় আছে তাহলে তিনি তাঁকে তার স্ত্রী ও পুত্রকে সমর্পণ করবেন।[৩৮]

স্বামীরা শুধুমাত্র তাদের স্ত্রীদেরকেই অতিথিদের যৌন কামনা পূরণ করার জন্য প্রদান করত না। তারা তাদের স্ত্রীদের জুয়া, পাশা প্রভৃতি খেলায় বাজি পর্যন্ত রাখত। ঋগ্বেদে এভাবে পাশা খেলায় সুন্দরী স্ত্রীকে হারিয়ে এক যুবককে আফসোস করতে দেখা যায়।[৩৯] কোন নারীর বিবাহের পর পুত্র সন্তান না হলে অথবা স্বামী নপুংসক হলে সেক্ষেত্রে বিবাহিতা স্ত্রীকে দিয়ে এমন সকল অশ্লীল কাজ করানো হত যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ধর্মে আছে, 'পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্যা অর্থাৎ পুত্রের জন্যই বিবাহ। পুত্র না হলে পুৎ নামক নরক হতে উদ্ধার পাওয়া যায় না।' এই কারণে অপুত্রক রাজারা পুত্রার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। এর অনুষ্ঠান প্রণালী সম্পর্কে যর্জুবেদে অত্যন্ত অশ্লীলভাবে বিভিন্ন ক্রিয়া কলাপের বর্ণনা আছে। সংক্ষেপে, রাণী অশ্বলিংগ স্বীয় যোনিতে প্রবেশ করিয়ে তন্মধ্যে অশ্বের রেতঃ সেক (সেচন) করতেন। পতিত ও নপুংসক স্বামীরা অপরের দ্বারা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করাতেন।[৪০] বিধবারাও দেবরের সাথে এভাবে যৌনমিলনের মাধ্যমে পুত্র উৎপাদন করতে পারত।[৪১] শুধুমাত্র তাই নয় তৎকালীন ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলে কন্যা সন্তান জন্ম হলে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। কন্যা সন্তান জন্মকে অশুভ বলে মনে করা হত।

প্রাচীন ভারতের মন্দিরগুলোতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা অবাধ যৌন সংগমে ও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত যার ফলে মন্দিরগুলোতে যৌন ব্যভিচারের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল।[৪২]

স্বামীর আহবানে সাড়া দেন না। এমন সময় অতিথি ব্রাহ্মণ ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে সুদর্শনকে বলেন যে ওঘাবতী তার কামনা পূর্ণ করেছে। ওঘাবতীর অতিথিপরায়ণতা দেখে সুদর্শন অত্যন্ত প্রীত হন। ধর্ম তখন আত্মপ্রকাশ করে বলেন- 'সুদর্শন তুমি তোমার সততার জন্য এখন থেকে মৃত্যুকে জয় করলে।'

৩৮. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪-১০৫।

৩৯. **ধর্মীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদ,** অধ্যায়- ২, পৃ ১০-৩৪।

৪০. **অথর্ববেদ** -৯-৫-২৭,২৮)।

৪১. **ধর্মীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদ**, অধ্যায়-২, পৃ ১০-৪০।

৪২. এই অবাধ যৌন মিলন ও ব্যভিচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানী ড. অতুল সুর বলেন, ধর্মের রূপ দিয়ে কামাচারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বিবাহিতা নারীকে প্রলুব্ধ করত তার সতিত্ব বিসর্জন দিত। এভাবে প্রলুব্ধ হয়ে সতিত্ব বিসর্জন দেবার এক কাহিনী অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্যটক আবে দুবোয়া তাঁর গ্রন্থে বিবৃত করে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতে এমন কতকগুলো মন্দির আছে

Dhaka University Institutional Repository

'দক্ষিণ ভারতের অপর এক স্থানেও আবে দুবোয়া যে প্রথা দেখেছিলেন তার বিবরণও তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন কোন কোন জনবিরল অঞ্চলে এমন অনেক মন্দির আছে যেখানে দেবতাদের প্রীতির জন্য অতি জঘন্য ধরনের লাম্পট্য লীলা চলে। এ সকল স্থানের বন্ধ্যা নারীরা সবরকম লজ্জা বিসর্জন দিয়ে নির্বিচারে ও নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকদের সংগে যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হয়। প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসে এ সকল স্থানে উচ্ছৃঙ্খলতার এক উৎসব হয় এবং ঐ উৎসবের সময় সকল শ্রেণীর নরনারী (বিশেষ করে গ্রামের জঘন্য চরিত্রের লোকেরা) ঐ সব স্থানে সম্মিলিত হয়। বন্ধ্যা নারীরা এখানে দেবতার প্রীতির জন্য কোন বিশেষ সংখ্যক পুরুষের সংগে সহবাস করে তবে বাড়ি ফিরে যাবে। এমন কি যে সব নারী বন্ধ্যা নয় তারাও দেবতার প্রতি তাদের ভক্তি প্রদর্শনের জন্য অতি নির্লজ্জভাবে অপরের সাথে যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হত।[৪৩]

সে সময় ধর্মের নামে ভারতের বিভিন্ন মন্দিরগুলোতে দেবদাসী রাখার প্রচলন ছিল এবং এই দেবদাসীদের সাথে মন্দিরের পুরোহিতরা অবাধ যৌনমিলনে প্রবৃত্ত থাকত এবং জঘন্য অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ করত। ড. অতুল সুর এ সম্পর্কে বলেন, 'ধর্মের নামে আর এক রকমের গণিকাবৃত্তিও মন্দির সমূহে প্রচলিত ছিল। এ হচ্ছে দেবদাসী প্রথা। সেকালে দেবতাদের প্রীতির জন্য অনেকে নিজের মেয়েকে উৎসর্গ করত দেবতার কাছে। এরা মন্দিরে থাকত এবং এদের দেবদাসী বলা হত। এদেরকে উত্তমরূপে নাচ গান শেখানো হত এবং তারা দেবতার সামনে নৃত্যগীত করত। দেবদাসী যে হিন্দু মন্দিরেই থাকত তা নয়, বৌদ্ধমন্দিরেও থাকত। কালক্রমে দেবদাসী কদর্য গণিকাবৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল। এখনও অনেক মন্দিরে দেবদাসী প্রথা বর্তমান আছে।[৪৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্যটক আবে দুবোয়া বর্ণিত বিভিন্ন মন্দিরগুলোতে যৌনলীলা ও ব্যভিচারের যে চিত্র পাওয়া যায় তা শুধুমাত্র অষ্টাদশ শতকে ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আরব পর্যটকগণ সিন্ধু দাক্ষিণাত্য এবং উপকুল বিভাগে মন্দিরের পুজারী নারীদের এবং দেব দাসীদের যে চরিত্রহীনতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। এর চাইতে আরও অধিক লজ্জার বিষয় এই যে, ধর্ম অনুষ্ঠান হিসাবে দেবতার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তারা এই সমস্ত

যেখানকার পুরোহিতগণ প্রচার করে যে আরাধ্য দেবতার অত্যাশ্চর্য শক্তি আছে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দূর করার। এরূপ মন্দিরের মধ্যে কর্ণাটক রাজ্যের তিরুপতির মন্দির বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এখানকার দেবতা ভেনকাটেশ্বর কাছে অসংখ্য স্ত্রীলোক আসে সন্তান কামনায়। পুরোহিতগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তারা মন্দিরে রাত্রি যাপন করে। পুরোহিতরা তাদের বলে যে তাদের ভক্তি দ্বারা প্রীত হয়ে ভেনকাটেশ্বর রাত্রিকালে তাদের কাছে আসবে এবং তাদের গর্ভবতী করে দিয়ে যাবে। পরদিন প্রভাতে এসকল জঘন্য চরিত্রের ভণ্ড তপস্বীরা কিছুই জানে না এরূপ ভান করে ঐ সকল স্ত্রীলোকদের কাছে এসে দেবতার করুণা লাভ সম্বন্ধে বিশদভাবে অনুসন্ধান করতো এবং তারা দেবতার অনুগ্রহ লাভ করেছে বলে তাদের পুণ্যবতী আখ্যা দিয়ে তাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতো। দেবতাদের সংগে তাদের যৌনমিলন ঘটেছে এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এসকল হতভাগিনী নারীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেত।'

৪৩. অতুলসুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৬-১০৭।

৪৪. অতুল সুর, **ভারতের বিবাহের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

অপকর্ম করত।[৪৫] এর সূত্রপাত প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল এবং সময়ের সাথে কতক ক্ষেত্রে তার প্রসার ঘটেছে এবং কতকক্ষেত্রে এই যৌন ব্যভিচার পরবর্তীতে বন্ধ করা হয়েছে। হিন্দুদের স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিনাদণ্ডে প্রাচীন ভারতে কোন কোন বিশেষ নারীর সাথে যৌন সংগম করা যেত। এদের মধ্যে ছিল গণিকা ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের স্বৈরিনী। এসব ক্ষেত্রে ব্যভিচার বলা হত না। নারদ বলেছেন যে স্বামী পরিত্যক্তা নিষ্কলঙ্কা স্ত্রীলোকদের সংগে যৌন মিলন ব্যভিচার বলে গণ্য হবে না। স্বামী যদি নপুংসক হয়, কী ক্ষয় রোগাক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রেও অপর পুরুষের সাথে যৌনমিলন ব্যভিচার বলে গণ্য হবে না।

প্রাচীন ভারতে গণিকাদেরও বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ ছিল। ড. অতুল সুর এ প্রসংগে বলেন, এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী আমরা পাঁচ শ্রেণীর গণিকার নাম পাই যারা হল রাজবেশ্যা, নাগরী, গুপ্তবেশ্যা, দেববেশ্যা এবং ব্রহ্মবেশ্যা বা তীর্থগ।[৪৬] এই সকল গণিকাদের নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল দত্তক রচিত গ্রন্থ।[৪৭] প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বিবাহ প্রথার সাথে সাথে আরো কয়েকটি দিক উন্মোচিত হয়। সে সময় যারা সম্পদশালী ছিল তাদেরই মধ্যে একাধিক বিবাহের সর্বাধিক প্রচলন ছিল। এই বঙ্গদেশেই তখন সম্পদশালী ব্যক্তিগণের ১০০ থেকে ২০০ জন পর্যন্ত পত্নী ও উপপত্নি ছিল। ভাইয়ের মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী দেবরের সাথেই স্ত্রীরূপেই বাস করত[৪৮] এছাড়াও ভাই জীবিত থাকাকালীনও কনিষ্ঠ সহোদরগণের ভাইয়ের স্ত্রীর উপর যৌনমিলনের অধিকার থাকত। বিবাহের পূর্বে কুমারী মেয়েদের অবাধ যৌনমিলন মহাভারতীয় যুগে ও তার আগেকার যুগে অনুমোদিত ছিল। এরূপ অবাধ যৌনমিলন নিঃসন্দেহে তৎকালীন সমাজের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়ের প্রতি দিক নির্দেশ করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে গণিকা বৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতা করা হত। তৎকালীন সমাজে নারীর সামান্যতমও মূল্য ছিল না। পুরুষরা যাচ্ছেতাইভাবে নারীদেরকে পণ্যের চাইতেও খারাপভাবে ব্যবহার করত। মহাভারতে যৌনমিলনের ব্যাপারে নারীকে গাভীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।[৪৯] সে সময় নারীর সামান্যতমও

৪৫. সুলায়মান নদভী সায়্যিদ আল্লামা (র), **সীরাতুন্নবী**, আজমগর ঃ মাতমআ মাআরিফ, পৃ ২৩২; আবু যায়েদ সায়েরাফী, **সফরনামা,** পৃ ১১৫ ও ১১৮।

৪৬. রাজবেশ্যা বলতে বোঝাতো রাজার দ্বারা অনুগৃহীত গণিকা, নাগরী বলতে বোঝাতো নগরবাসিনী গণিকা, গুপ্তবেশ্যা বলতে বোঝাতো সদ্বংশীয়া নারী যে গোপনে অভিসার করে, দেববেশ্যা বলতে মন্দিরের দেবদাসীদের বোঝাতো এবং ব্রহ্মবেশ্যা বা তীর্থগ বলতে বোঝাতো তীর্থস্থানে যারা গণিকাবৃত্তি করত।

৪৭. দত্তক পাটলিপুত্র নগরের বীরাঙ্গনাদের সম্পর্কে তার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দত্তক রচিত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সেই গ্রন্থের সারাংশ বাৎসায়ন তার 'কামসূত্র' গ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ করেছিলেন। এই গণিকাবৃত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। অর্থশাস্ত্রে গণিকাধ্যক্ষ নিয়োগের কথা আছে। এই অধ্যক্ষ বছরে ১০০০ টাকা বেতন পেতেন। এছাড়া বিন্দ্য পর্বতের অন্তর্গত রামগড়ের গুহায় প্রাপ্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রত্নতাত্ত্বিক একটি লেখাতে 'সুতনুকা' নামে এক দেবদাসীর কথা উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে দেবদাসীর অস্তিত্ব সম্পর্কে এই লেখাটিই প্রথম নিদর্শন। কালিদাসের সময়ে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে অসংখ্য দেবদাসী ছিল। তবে এই সকল দেবদাসী সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলোতে।

৪৮. **ধর্মীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদ,** দশম খণ্ডের একটি সূত্র।

৪৯. **আদি পর্ব,** অধ্যায়-১২।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্রে ভারতীয় নারীকে প্রবৃত্তিতাড়িত পশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে।[৫০] এছাড়া তান্ত্রিক সাধনার মূল কথা হচ্ছে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন। এই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনকে তন্ত্রশাস্ত্রে গুহ্যরূপ দেয়া হয়েছে। কোন স্ত্রীলোককে প্রতীক ধরে নিয়ে তার সাথে যৌন মিলনে রত থাকাই তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব।

ভারতীয় উপমহাদেশেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। সুতরাং তাকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল রীতি। মনু'র মতে তাকে দিন-রাত্রি অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব, তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।[৫১] এমনিভাবে প্রাচীন ভারতের বিবাহ পদ্ধতি এবং অবাধ যৌনমিলনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায় যা ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থায় সম্প্রসারিত হয়েছে।

নারী সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণাই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণী ও রাজবংশের মহিলাদেরকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষের কাছ থেকে দূরে রাখা হত। রাজবংশের মহিলাদের আবাসস্থল কড়া পাহারায় রাখা হত। কোন কারণেই তাদের ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। আকস্মিক বিপর্যয় বা অপরিহার্য কারণে উচ্চবংশের কোন মহিলা জীবিকা অর্জনে বাধ্য হলে এ কাজে যাতে তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, সে জন্য অতি কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা হত। বস্ত্রশিল্প কারখানায় তাকে যেতে হলে অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতে যেতে হত, যেন সহজে কোন লোকের চোখে না পড়ে। তাহার বয়নকৃত বস্ত্র যে কর্মচারী গ্রহণ করত, তাকে অন্ধকারেই বাতির সাহায্যে তা পরীক্ষা করে নিতে হত। সে যদি মহিলার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাত বা তার সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোন কথা তার সাথে বলত, তবে তার জরিমানা করা হত।[৫২]

উপরোক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে কিছুটা পর্দা-প্রথা প্রচলিত ছিল; যদিও পূর্ণ পর্দা-প্রথা ইসলামের আবির্ভাবের পরই প্রবর্তিত হয়।

সতীদাহ-প্রথা প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথানুযায়ী স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে হত। এখনও এ বর্বর প্রথা ভারতের কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। মাত্র কিছুদিন আগে ভারতকে এই প্রথা রহিত করে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে।

হিন্দু সমাজে নারী অত্যন্ত অশুভ প্রাণীবিশেষ। এজন্যই সতীদাহ প্রথা অনুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করাকেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করত।

---

৫০. **মনুস্মৃতি শাস্ত্র,** অধ্যায়-৫, পৃ ১৪৫।

৫১. Amer Ali, **The Spirit of Islam,** p. 30; Ramesh Chandra Mazumdar : **Ideal and position of Indian Women in Domestic life;** Great Women of India (ed.) Swamei and Mazumdar, p 19.

৫২. A.L. Bashan, **The Wonder That was India,** Fontana 1971, p 181.

Dhaka University Institutional Repository

There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor. She is verily all these in a body.

নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এ সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।[৫৩]

Men should not love them.

নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিত নয়।[৫৪]

পুত্র সন্তান জন্মিলে পরিবারে আনন্দ ধরত না। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্ম নিলে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসত।

The birth of a girl grant if else-where, here grant a body.

হে দেবতা! নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদের পুত্র সন্তান দাও।[৫৫]

এসব উদ্ধৃতিতে হিন্দুসমাজের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে

প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত অসুর বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যাকে বিক্রয়স্বরূপই ছিল। হিন্দু নারী কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। সে যুগে বালিকাদেরকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেয়া হত। দেবতাগণ তাদেরকে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করতে পারত। এই বালিকাগণ অবশেষে মন্দিরের পুরোহিত ও ধর্মকর্তাদের অধীনে চলে যেত এবং পুরোহিত ও মন্দিরের কর্মচারীদের উপরি পাওনারূপে পরিগণিত হত।

বৈদিক যুগে নারী যুদ্ধে লব্ধ লুটের মালের ন্যায় ছিল। যুদ্ধ বিজয়ের পর বিজয়ী পক্ষ জোরপূর্বক নারীদেরকে অপহরণ করত এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর ন্যায় তাদেরকে নিজেদের মধ্যে বিতরণ করে নিত। স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করত। কন্যা সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হত। ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি ও কোন অপরাধের কারণে, এমনকি স্বামীর মৃত্যুতেও বিয়ে ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার কোন দেশেই নারী স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কোথাও নারী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হতে পারত না।[৫৬]

সনাতন ধর্ম, হিন্দু ধর্ম[৫৭] বহু পুরনো ধর্ম। বহুকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ধর্মের অনুসরণ করে আসছে। এও হতে পারে যে, এ ধর্ম কোন এক সময় আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিতই ছিল,

---

৫৩. Professor Indra, **Statues of Women in Mahabharat,** p. 16.

৫৪. Ibid, p. 17.

৫৫. Ibid, p. 21.

৫৬. Fida Hussain Malik, **Wives of the Prophet,** p. 12-15, Pakistan, Ashraf Publication 4th Ed. 1983. P. 12-15.

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু কালের অবক্ষয়ে ধর্মের ঐশী ব্যাপারগুলো পরিবর্তিত হয়ে আজকের এই শিরকে আবর্তিত হয়েছে। এই মানবরচিত পরিবর্তনশীল হিন্দু ধর্মেও প্রাচীনত্বে ও খ্যাতিতে প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে কখনো মনোযোগ দেয়া হয়নি। সতীদাহের মত নির্মম অমানুষিক বিধান হিন্দু ধর্মেরই দান। পুরুষ একই সময়ে একাধিক বিয়ে অথবা স্ত্রী বিয়োগের পর আবার বিয়ের অনুমতি লাভ করতে পারে, কিন্তু নারী স্বামী বিয়োগের পর আরেক বিয়ে তো দূরের কথা, তার বেঁচে থাকাই পাপ ছিল। স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ না হলে মৃত স্বামীর সঙ্গে ছটফট করে পুড়ে মরতে না পারলে তার স্বর্গ লাভই হবে না। যদি কোন নারী কোন প্রকারে এই সতীদাহ থেকে বেঁচে যেত, তবে ঘরে, সমাজে কিংবা আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুর কাছে তার কোন সম্মানই থাকত না। তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার শরে এমনভাবে বিদ্ধ করা হত যে, তখন বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াটাই তার কাছে শ্রেয় বলে বিবেচিত হত।[৫৮]

সনাতন ধর্মে পুরুষদের জন্য একই সময়ে দশ দশটি স্ত্রী রাখারও অনুমতি ছিল। হিন্দুদের খ্যাতনামা মনীষী ও প্রধানদের মধ্যে এর বহু নযীর পাওয়া যায়।[৫৯] হিন্দুরা তালাক শব্দের সাথে পরিচিত নয়।[৬০] হিন্দু ধর্মে সমস্ত ক্ষমতা স্বামীর অধিকারে থাকতে হবে। নারী স্বাধীন হবার উপযুক্ত নয়। নারী জীবনে কখনো নিজ ইচ্ছা মত কাজ করতে পারবে না। বাবা মেয়েকে যার সাথে বিয়ে দেবেন সেখানেই আজীবন থাকতে হবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন পুরুষের শয্যাশায়িনী হতে পারবে না অর্থাৎ সব সময় বিধবা হয়েই থাকবে। আরো বলা হয়েছে, শয্যাপ্রিয়তা, অলঙ্কারাসক্তি, পাপলীপ্সা, আত্মগর্ব, রাগ, একগুঁয়েমি ও বিরক্তিকরণ নারী চরিত্রের

---

৫৭. হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক কে বা কারা এবং হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি কখন হয়েছিল এ ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য ইতিহাস বা হিন্দুশাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত সঠিক কোন তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম হননি। হিন্দু শব্দটি হিন্দু শাস্ত্রেও উল্লেখ নেই। ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়া মহাদেশ হতে একদল লোক ভারতবর্ষে এসে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সিন্ধু নদের উপকূলে বসতি স্থাপন করে। তারা নিজেদেরকে আর্যজাতি বলে পরিচয় দেয়। সিন্ধু নদকে আর্যরা পবিত্র নদ বলে মনে করত। সিন্ধু শব্দ থেকেই সিন্ধু নদের উপকূল বাসীরা হিন্দু নামে পরিচিত।

৫৮. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী** (ঢাকা ঃ শান্তিধারা প্রকাশনী), পৃ ১৯।

৫৯. রাজা দশরথের তিন স্ত্রী ছিল। মহারাজা ধ্রুবের পাঁচজন, পাণ্ডুর দুই ও অর্জুনের তিন স্ত্রী ছিল। (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৯)।

৬০. নারীর তো কথাই নেই, পুরুষও তালাক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। অথচ এতে নারীর ক্ষতি ছাড়া উপকার খুব কমই হয়েছে। কারণ কোন মেয়ে পুরুষের ভাল নাও লাগতে পারে, কিন্তু এই ভাল না লাগার পরও ঐ পুরুষটিকে ঐ মেয়েলোক নিয়েই ঘর করতে হবে। সম্পর্ক ভালো হোক বা না হোক, স্ত্রী হিসেবে সেখানে থাকতেই হবে, ছাড়াছাড়ির কোন ব্যবস্থাই সেখানে নেই। এতে করে পুরুষটি স্ত্রীলোকটিকে বহুভাবে কষ্ট দেবার সুযোগ পায় এবং নারীকে যুগ যুগ ধরে এই নির্যাতন সয়েই আসতে হচ্ছে হিন্দু সমাজে। স্বামী সৎ হলে তো স্ত্রীর জীবন ভালই কেটে যাবে, কিন্তু স্বামী যদি অসৎ হয়, তাহলে তার জুলুম ও নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তি দেয়ার কোন পথ হিন্দু ধর্মে নেই, এমনকি পুরুষকেও বলে দেয়া হয় নি যে, স্ত্রীর সাথে অসদ্ব্যবহার করা পাপ, বরং বলা হয়েছে, নারী দিনরাত্রির কোন সময় স্বাধীন থাকতে পারে না। (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৯)।

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য, গর্হিত কাজ করা তাদের অভ্যাস। মিথ্যা বলা তাদের স্বভাবজাত কাজ। নারীর সঙ্গে পরামর্শ করতে নেই, এমনকি পরামর্শের সময় নারীকে কাছেও রাখতে নেই। পুরুষরা বদকারীর ফলস্বরূপ পর জন্মে নারীত্ব লাভ করে।[৬১]

বর্তমান হিন্দু নারী সমাজে যুগের প্রভাবে জাগরণ ও আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হওয়ায় সংবিধানের মাধ্যমে ধর্মীয় আইনকেও এ ব্যাপারে কিছু রদবদল করা হচ্ছে। হিন্দু নারীরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে নারী জাতির প্রতি লেখা ঘৃণা ও জুলুমের অধ্যায়গুলো পাঠ করে দুঃখ প্রকাশ করছে।[৬২] আর একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে, 'যদি কোন শতবর্ষী হাজার রসনাবিশিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কেবল নারীর দোষক্রুটি বর্ণনা করতে থাকে তবুও সে তা বলে শেষ করতে পারবে না।' মনু বলেন, 'ধনের ওপর নারী ও চাকরের কোন অধিকার নেই।' ঋণে ডুবন্ত ব্যক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্য হিসেবে পরজন্মে নারী বা পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে।'[৬৩] তুলসী রামায়ণেও নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাষায় বলা হয়েছে যে, নারী জাতির অন্তরে সবসময় ৮টি দোষ বিদ্যমান থাকে, যেমন- ঔদ্ধত্য, মিথ্যা, চালাকি, শঠতা, ভয়, বুদ্ধিহীনতা, কর্কশতা ও দয়াহীনতা। 'স্ত্রী ও শূদ্রকে লেখা পড়া শিক্ষা দিও না। বিয়ে ছাড়া অন্য সময় নারী সাজ সজ্জাও করতে পারবে না।'[৬৪]

'আজও হিন্দুয়ানী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু নারীদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে। পুরুষ যত বড়ো দুষ্কৃতিকারী, আহমক বা খারাপ লোকই হোক না কেন, সে স্ত্রীর মোক্ষদাতা। সে বিরাট পাপ করেও অপবিত্র হয় না, অথচ নারীর সাধারণ ভুল বা স্বামীর সঙ্গে তার সাধারণ অপরাধও ক্ষমার উপযুক্ত নয়। দিবারাত্রি সেবা করাই তার কর্তব্য। পরামর্শস্থলে নারীর কোন স্থান নেই। নারী স্বামীর আমোদফুর্তির উপকরণ মাত্র। স্বামীর সাথে সমতার দাবি করা, স্বামীর সমস্থানে বসা বা স্বামীর কাজে হাত দেয়ার অধিকার হিন্দু নারীর নেই। পুরুষ কোন দিনই স্ত্রীকে সম্পত্তির অংশীদার করেনি, ধন-দৌলতে মালিকানা পুরুষদেরই একচেটিয়া।'[৬৫]

---

৬১. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৬২. **"সমাজে নারীর স্থান",** শীর্ষক প্রবন্ধ, আর্য গেজেট-১৯৩০ সাল ২২ নভেম্বর, ভারত।

৬৩. মনুস্মৃতি লেখক, মহারাজ মনু তদীয় গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ে নারীকে দাস সম্প্রদায়ভুক্ত করে নারীর সংগত অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

৬৪. **"সমাজে নারীর স্থান",** শীর্ষক প্রবন্ধ, আর্য গেজেট-১৯৩০ সাল ২২ নভেম্বর, ভারত।

৬৫. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকার আইন

হিন্দু উত্তরাধীকার আইনে নারীর অধিকারের এক করুণ অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধীকার আইনে প্রধানত দুইটি পদ্ধতি চালু রয়েছে। যথা ঃ (i) দায়ভাগ পদ্ধতি[৬৬] (ii) মিতাক্ষরা পদ্ধতি।

(i) দায়ভাগ পদ্ধতি ঃ দায়ভাগ আইন অনুযায়ী তিন শ্রেণীর লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যথাঃ সপিন্ড, সাকুল্য ও সমানোদক। সপিন্ডগণের তালিকাঃ (i) পুত্র এবং তার অধঃস্তন তিন পুরুষ। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র। কন্যার তরফ থেকে অধঃস্তন তিন পুরুষ। কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র। (ii) পিতার তরফ থেকে উর্ধতন তিন পুরুষ। যথা-পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতার তরফের তিন পুরুষ। যথা-মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা, মাতার পিতার পিতার পিতা (iii) ভ্রাতা এবং ভ্রাতার অধঃস্তন পুরুষ এবং খুড়া ও তার অধঃস্তন পুরুষ। (iv) মহিলা। যথা- বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা এবং পিতার পিতার মাতা।[৬৭]

(ii) মিতাক্ষরা পদ্ধতি ঃ মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে[৬৮] মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রক্তের নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণিত হয়। এ আইনে তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী রয়েছে যথা (i) গোত্রজ সপিন্ড (ii) সমানোদক ও (iii) বন্ধু ।

গোত্রজ সপিন্ডের উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা মোট ৫৭। গোত্রজ সপিন্ডের কেউ জীবিত থাকলে সমানোদক ও বন্ধুগন উত্তরাধিকারী হবে না। গোত্রজ সপিন্ডের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

(i)	পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি অধস্তন পুরুষ	-	০৬ জন।
(ii)	পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি উর্ধ্বতন পুরুষ	-	০৬ জন।
(iii)	উপরোক্ত ৬টি উর্ধ্বতন পুরুষের পত্নীগণ	-	০৬ জন।
(iv)	উপরোক্ত ৬টি উর্ধ্বতন পুরুষের প্রত্যেকের পুরুষ বংশ ধারায় ৬টি অধঃস্তন পুরুষ	-	৩৬জন।
(v)	বিধবা, কন্যা ও কন্যার পুত্র	-	০৩ জন।
		মোট =	৫৭ জন[৬৯]

৬৬. এ আইন জীমুতবাহন কর্তৃক রচিত। এটি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের একটি আইন। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সমাজের মধ্যে দায়ভাগ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকার হবার জন্য পিন্ডদান শর্ত। হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান মতে মৃত ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এই শর্তে উত্তরাধিকার লাভ করবে যে, সে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে তার আত্মিক কল্যাণ কামনা করবে এবং মৃত ব্যক্তির শাস্ত্রে যারা শাস্ত্র মতে পিন্ড দানের অধিকারী তারাই কেবল ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে।

৬৭. মাও. ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয** (ঢাকা ঃ আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, নভেম্বর- ১৯৯৫ খ্রিঃ), পৃ ১১৫-১১৬।

৬৮. মিতাক্ষরা পদ্ধতি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের প্রধান দুইটি আইনের একটি। মিতাক্ষরা পদ্ধতি স্মৃতিকার ঋষি, যাজ্ঞবল্কের স্মৃতি শাস্ত্রের প্রচলিত নিবন্ধ। এ পদ্ধতি একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত। এ আইন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তান সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী হতে পারেনা, মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয় আইনেই মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী এবং পৌত্রের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। উপরোক্ত ৬ জনের কেউ জীবিত না থাকলে কন্যা উত্তরাধিকারী হবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা যে অংশ পায় তা কেবল মাত্র জীবন স্বত্বে লাভ করে। অর্থাৎ কন্যা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন কেবল মাত্র ভোগ দখল করবে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অংশ কন্যা নিজের ইচ্ছামত ভোগ, ব্যবহার, দান, বিক্রয়, উইল কিংবা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং নিকটাত্মীয়দের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। কন্যা বা স্ত্রী যদি অসতী হয় পিতার ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। কন্যা অন্ধ, বোবা, বধির, কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হলে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। হিন্দু আইনে সকল কন্যার সমান অধীকার নেই। বন্ধা কিংবা যে কন্যা কেবল মাত্র কন্যা সন্তানের মা হয়েছে সে মৃত পিতার সম্পত্তিতে কোন অংশ পাবে না। হিন্দু আইনে কুমারী কন্যার দাবী অগ্রগণ্য। অতঃপর পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভবা কন্যার দাবি। হিন্দু আইনে কন্যা জীবিত থাকলে মাতা উত্তরাধিকারী হয় না।[৭০] এবং বিধবা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হতে যে অংশ পায় তা কেবল মাত্র জীবনস্বত্বে লাভ করে থাকে।[৭১]

যে কোন ধর্মেই হোক, যতদিন পর্যন্ত নারী জাতিকে সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নিমজ্জিত করা হবে এবং তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার স্বীকৃত না হবে, অন্ধ অনুকরণ কুসংস্কারে নিমজ্জিত করা হবে, নারীর কোন স্বাধীনতা ও স্বাধীকার এবং তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত না হবে। ততদিন পর্যন্ত নারীকে পাপের প্রতিমূর্তি ও ক্ষতিকর জীব বলেই বিবেচনা করা হবে এবং নারীর মুক্তি ও শান্তিপথ অজ্ঞাতই থাকবে। যতদিন এই কুসংস্কারমূলক শিক্ষা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন হিন্দু নারীর মর্যাদা উঁচু হওয়ার কোন আশাই করা যায় না।' এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে হিন্দু নারীদের যে স্বাধীন চলাফেরা ও স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা তাদের ধর্মমতে বৈধ নয়।[৭২]

---

৬৯. মাও. ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮।

৭০. ১৯৩৭ সালে বিধবা স্ত্রীর অধীকার সংক্রান্ত আইন পাস হবার পর (১৮ নং আইন) বর্তমানে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র, পৌত্র প্র পৌত্রের সাথে বিধবা স্ত্রীও উত্তরাধিকারী হতে পারে। এর আগে বিধবা স্ত্রীর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। এ আইনটি ১৪/০৪/১৯৩৭ ইং থেকে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু কৃষিজমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রজোয্য নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সে পূর্বের মৃত স্বামীর সম্পত্তি হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে। এবং ধরে নেয়া হবে যে, সেই হিন্দু মহিলা তার মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসেবে আর বেঁচে নেই বরং মৃত্যু হয়েছে।

৭১. ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮।

৭২. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিশরীয় সভ্যতা

পৃথিবীর মধ্যে খ্রিস্ট অন্যতম প্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ সভ্যতার উন্মেষ হয় মিশরের নীল নদের অববাহিকায়। সম্ভবত অপর কোন একক সভ্যতা মানব জাতির ক্রমবিবর্তন, উন্নতি ও উৎকর্ষতায় অধিক অবদান রাখতে পারে নাই।[১] প্রাচীন মিশরীয়[২] সমাজে বেশ কয়েকটি শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল

---

১. ডঃ মাহমুদুল হাসান, **ইসলামের ইতিহাস** (ঢাকা ঃ গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ, ১৯৮৫) পৃ ৮।

২. **THE BOOK OF DEAD** গ্রন্থ থেকে প্রাচীন মিশরের ধর্মীয় ও সামাজিক দিক সম্পর্কে জানতে পারা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম ৩৪৭৩ মাইল বিশিষ্ট নীল নদের অববাহিকায় খ্রিস্টপূর্ব প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ মিশরে দুটি সভ্যতার উদ্ভব হয়। GEORGE SARTON-এর মতে, 'এর স্থিতিকাল ৩৪০০ থেকে ২৪৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সেটা পিরামিড যুগ। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ রাজ বংশের কাল ২৯৮০ থেকে ২৪৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, অর্ধ সহস্র বছর। (A History of Science Vol-1 George sarton-এর বাংলা অনুবাদ, প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ঃ ১৯৭০, পৃ ২৯।) LEONARD COTTREL তাঁর **LAND OF THE PHAROAHS** নামক গ্রন্থে এই প্রাচীন সাম্রাজ্যের রাজত্বকাল ২৭৮০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রাচীন উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের দুটি রাজ্য ৩৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে MENES নামক একজন শাসক একটি রাজ্যে পরিণত করেন। মেমফিস (Memphis) নামক শহরে (বর্তমান কায়রো নগরীর অনতিদূরে) এই সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে থিবেস (THEBES) শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

প্রাচীন মিশরীয়রা জাতিতে ছিল শঙ্কর। তারা ছিল কালো রঙের বেঁটে আকৃতির, কালো চুল এবং নাক ছিল সামান্য বক্র। বিজ্ঞানীরা ধারণা করে তাদের মধ্যে নিগ্রো ও সেমেটিক রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। তাদের মাঝে এছাড়া পশ্চিম এশীয় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটেছে। পরবর্তীতে এরা সেমেটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। মিশরের প্রখ্যাত সম্রাটদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রথম থাটমোস। (১৫৪৫-১৫১৪ খ্রীঃপূর্ব) ও তৃতীয় রামেসিসের (১১৯৮-১১৬৭ খ্রিঃ পূর্ব) নাম। এখানে এ কথা উল্লেখ্য যে পবিত্র কুরআনে মিশরের রাজাকে ফেরাউন বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মুসা (আ) এর সময়ে বনী ইসরাঈলদের মিশর ত্যাগের সময় যে ফেরাউনকে সমুদ্রের ডুবে মৃত্যুবরণ করার কথা বলা হয়েছে FATHER DE VOX তার **The Ancient History of Israil** (প্যারিস ১৯৭১) নামক পুস্তকে এই ফেরাউনকে দ্বিতীয় রামেসিস বলে উল্লেখ করেছেন। এই যুক্তি খণ্ডন করে ড. মরিস বুকাইলী তাঁর **THE Bible, The Quran and Science** নামক গ্রন্থে এ কথা প্রমাণ করে বলেন যে সেই ফেরাউন ছিল দ্বিতীয় রামেসিসের পুত্র মারনেপতাহ্। মুসা (আ) যখন মাদিয়ানে ছিলেন তখন দ্বিতীয় রামেসিসের মৃত্যু হয় এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন দ্বিতীয় রামেসিসের পুত্র মারনেপতাহ্। প্রাচীন কালের মিশরের রাজারা নিজেদের মনে করতেন সূর্য দেবতা 'রে (Ray)-এর পুত্র। সে কারণেই সার্বভৌম প্রাচীন রাজারা পরিচিত হতেন 'ফারাও (PHARAOH) নামে যা তাদের উপাধিমাত্র। এই ফারাওদেরকেই কুরআনে ফেরাউন নামে উল্লেখ করা

Dhaka University Institutional Repository

যারা হলেন রাজপরিবার, পুরোহিত, অভিজাত, লিপিকার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কৃষক ও ভূমিদাস। এছাড়া সে সময় প্রচুর যুদ্ধবন্দীদেরকে মিশরে দাস হিসেবে নিয়ে আসা হয়। তৎকালীন মিশরীয়দের পরিবার প্রথায় যদিও এক বিবাহের কথা উল্লেখ ছিল তা সত্ত্বেও রাজা ও পুরোহিতগণ এবং ধনী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ এক অবাধ বিলাসী ভোগপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। যুদ্ধবন্দী হিসেবে যে সমস্ত রমণীদেরকে মিশরে নিয়ে আসা হত তাদের মধ্য থেকে উৎকৃষ্ট নারী রাজা, সমাজের পুরোহিত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের ভাগে পড়ত। এ সকল যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে শাসকবৃন্দ ও সমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ অবাধ যৌনমিলনে লিপ্ত থাকতেন। এছাড়া তাদের সেবায় নিযুক্ত ছিল অসংখ্য সেবাদাসী। এই সকল সেবাদাসীদের সাথে সমাজের উচ্চবিত্ত তথা ধনিক সম্প্রদায় নির্বিচারে যে কোন সময় যৌনমিলনে লিপ্ত হত। রাজা, পুরোহিত ও সমাজের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল।[৩] নারীদের সে সময় বিশেষ কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। পণ্য হিসেবে নারীদেরকে নিলামে বিক্রি করা হত। ধনী সম্প্রদায় অধিক দামে নিলামে কিনে নিয়ে আজীবন তাদের সেবাদাসী করে রাখত এবং তাদের সাথে অবাধ যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত হত।

মুসা আলায়হিস্ সালাম -এর সমকালীন মিশরের সমাজ ব্যবস্থা ও মুসা আলায়হিস্ সালাম -এর উপর TEN COMMANDMENTS নামে একটি ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে। এই ছবিতে তৎকালীন মিশরের সমাজ ব্যবস্থার দিকটি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।[৪] সর্বমোট তেত্রিশ জন ক্লিওপেট্রা বিখ্যাত ছিলেন যাদের নিয়ে PAULY WISSOWA গ্রন্থে [৫] বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন মিশরীয় সমাজ ব্যবস্থায় একাধিক উল্লেখযোগ্য যে সকল দিক প্রত্যক্ষ করা যায় তা হল রাজা, পুরোহিত ও উচ্চবিত্ত ধনীক সম্প্রদায়ের মধ্যে একধিক বিবাহের প্রথা, অসংখ্য উপপত্নী, অগণিত সেবাদাসী ও অবাধ যৌনমিলনের এক অশ্লীল চিত্র। অর্থের বিনিময়ে যেহেতু নারীদেরকে নিলামে বিক্রি করা হতো সে ক্ষেত্রেই সকল নারীদের পরিণতি কি হতো তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন ধনী পুরুষের যেমন অসংখ্য পত্নী ও উপপত্নী ছিল ঠিক তেমনিভাবে ধনী রমনীদেরও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এক বা একাধিক পতি ছিল।[৬]

হয়েছে। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, ঢাকা : তাসনিম পাবলিকেশন্স, রবিউল আউয়াল- ১৪১৬হিঃ, আগষ্ট- ১৯৯৫ খ্রিঃ, পৃ ৪৬)।

৩. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬।

৪. মিশরের জুলিয়াস সীজারের পরবর্তী শাসক অক্টোভিয়ান সীজারের সময়কালীন দ্বাদশ টলেমী অলিটিস-এর কন্যা সপ্তম ক্লিওপেট্রার জীবন নিয়ে তৎকালীন সময়ে CLEOPATRA নামে একটি ছায়াছবি নির্মিত হয়। সেই ছায়াছবির মধ্যেও তৎকালীন মিশরের সমাজ ব্যবস্থার চিত্রটি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৫. PAULY WISSOWA- ২১ খণ্ড-১৯২১, পৃ ৭৩২-৭৮৯।

৬. রাশিয়ার মস্কোতে রক্ষিত GOLENISHCHEV প্যাপাইরাস ও লন্ডনে রক্ষিত RHIND প্যাপাইরাস থেকে তৎকালীন মিশরের রাজাদের তালিকা এবং তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ছবির খণ্ড চিত্র লিখা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলীও তৎকালীন মিশরীয় সমাজে বহুবিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীক সভ্যতা

প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে গ্রীক সভ্যতাই সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। এই জাতির প্রাথমিক যুগে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি,আইন সম্পর্কিত অধিকার, সামাজিক আচার প্রভৃতি দিক হতে নারীর মর্যাদা নিতান্ত অধপতিত ছিল। গ্রীকদের দৃষ্টিতে নারী একটি নিকৃষ্ট জীব ছিল।[৭] সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর কোনই মর্যাদা ছিল না। এবং সম্মানীত মর্যাদা একমাত্র পুরুষের জন্যই সংরক্ষিত ছিল।[৮] আয়োনিয়ার গ্রীকদের মধ্যে নারীদেরকে নির্জন প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হত। প্রায়ই তালাচাবি দিয়ে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হত এবং কখনও সাধারণ্যে বের হতে দেওয়া হত না। গ্রীকরা প্রেমের দেবতার পুজা করত। এধরনের নৈতিক মহামারী এবং নিকৃষ্টতম দুস্কৃতি বা পাপ সমগ্র গ্রীসে সার্বজনীন রূপ লাভ করেছিল।[৯] গ্রীক সভ্যতায় নারী কি মর্যাদার অধিকারী ছিল তা সক্রেটিসের ভাষায় বেশ সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন ঃ

Women is the greatest Source of Choose and disruption in the world. She is like the Daftly Tree which outwardly looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without fail.

নারী জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি এটি ভক্ষণ করলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য। গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে এন্ডারস্কি (Anderosky) বলেন ঃ

Cure is possible for fireburns and Snake-bite; but it is impossible to arrest woman's Charms.

অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।[১০]

প্রথার ও একাধিক উপপত্নী রাখার স্বপক্ষেও রায় প্রদান করে। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭)।

৭. গ্রীক পুরানে কল্পিত নারী পান্ডোরাকে মানবের দুঃখ দুর্দশার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনঃ- হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম ইহুদী পুরাণে ঐ একই বিষয়ের জন্য দায়ী করা হয়েছে। হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কিত কল্পিত মিথ্যা কাহিনী ইহুদী ও খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, আইন কানুন, সামাজিক ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র প্রভৃতিকেও যে, প্রবল ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তা কারও অজানা নয়। পান্ডোরা সম্পর্কে গ্রীকরা যে ধারণা পোষণ করত তাও তাদের মানসিকতাকে সমভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। (আবুল আলা মওদূদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২ খ্রিঃ, পৃ ১২)।

৮. আবুল আলা মওদূদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম** (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২ খ্রিঃ), পৃ ১২ ।

৯. ডলিঞ্জার, **দি জেন স্টাইল এন্ড দি জু,** দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৩৯।

১০. Nazhat Afza and Khurshid Ahmed, **The Position of Women in Islam** (Kuwait : Islamic Book Pablishers. 1982), p. 9-10.

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন গ্রীসে বিয়েতে নারীর সম্মতি আবশ্যক বলে মনে করা হত না। মাতা-পিতার ইচ্ছানুসারে তাকে বিয়েতে বাধ্য করা হত। বর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকলেও মাতা-পিতার নির্দেশে নারী তাকে স্বামী ও প্রভুরূপে বরণ না করে পারত না। নারীদিগকে তুচ্ছ বলে গণ্য করা হত এবং সর্বদা তাদেরকে তাদের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন-পিতা, ভাই এবং চাচা, মামা ও খালুকে মেনে চলতে হত।

গ্রীক সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল যুগে সতী-সাধ্বী নারী মহামূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত ছিল। তাদের সতীত্ব অতিব মূল্যবান সম্পদ ছিল এবং এর প্রতি সমাজে সম্মান প্রদর্শন করা হত। সম্ভ্রান্ত গ্রীক পরিবারে সেকালে তারা পর্দা-প্রথা মেনে চলত। এই সকল পরিবারে বাড়ির ভিতরে নারী পুরুষের কক্ষ আলাদা ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা নারী পুরুষের মিলিত বৈঠকে যোগদান করত না। জনসাধারণের প্রেক্ষাগৃহে তারা দৃষ্টিগোচর হত না। বিয়ের মাধ্যমে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাকেই তারা সম্মানজনক মনে করত।

পরবর্তী যুগে বারবণিতালয় গ্রীসের সর্বস্তরের লোকদেরকে আকর্ষণ করে এবং তখন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণেও পতিতাদের প্রভাব প্রতিফলিত হত। পতিতালয় যেন তখন এক প্রকার উপাসনালয়ে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল। কারণ, তাদের মতে পতিতা ছিল প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী এফ্রোডাইটের প্রতিনিধি। সে তার স্বামীদেরকে পরিত্যাগ করে অপর তিন দেবতার সাথে অবৈধ প্রেমে নিমজ্জিত হয়েছিল।[১১] এই যুগে বেশ্যা সম্প্রদায় এতখানি উন্নত মর্যাদা লাভ করল যে, ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল। বেশ্যালয় গ্রীক সমাজের আপামর সাধারণের কেন্দ্র ও আড্ডাখানায় পরিনত হল। দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখত। বেশ্যাগণ কেবল জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্মেলনে সভানেত্রীর আসনই গ্রহণ করত না বরং গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক আলোচনায় তাদের মতামতকে চূড়ান্ত বলে মনে করা হত। সৌন্দর্য পুজা গ্রীকদের মধ্যে কামাগ্নি প্রবলভাবে প্রজ্জলিত করে দিল।

গ্রীকদের নৈতিক মাপকাঠি এতখানি পরিবর্তীত হয়েছিল যে, বড় বড় দার্শনিক ও নীতিবিদ ব্যভিচার ও অশ্লীলতাকে কদর্য ও দূষণীয় মনে করত না। অবশেষে ধর্মও তাদের পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করল। [১২] গ্রীসে যখন কাম দেবীর পুজা আরম্ভ হলো তখন গণিকালয় গুলি উপাসনা মন্দিরে পরিণত হল। নির্লজ্জ বেশ্যা নারী দেবযানী বা দেবীতে পরিনত হল। ব্যভিচার কার্য ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মর্যাদায় উন্নীত হল।[১৩] এ রকম কামপূজার দ্বিতীয় সুস্পষ্ট পরিণাম এই

১১. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, **Ibid,** p. 2-3.

১২. আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২-১৩।

১৩. কামদেবী Aphrodite এর পূজা সমগ্র গ্রীসে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। গ্রীক পুরাণে কামদেবী সম্পর্কে এরকম বর্ণিত আছে যে, সে জনৈক দেবতার পত্নী হয়ে অপরাপর তিনজন দেবতা ও একজন মানুষের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং তদের যৌনমিলনের ফলে যে সন্তান লাভ করল, পরবর্তীকালে সেই কামদেব কিউপিড নামে অভিহিত হয়। এই কামদেব গ্রীকদের উপাস্য বা মাবুদ ছিল। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, যে জাতি এরকম জঘন্য চরিত্রকে শুধু তাদের আদর্শ নয় উপার্স

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল যে, গ্রীক জাতির মধ্যে 'লুত' সম্প্রদায়ের[১৪] দুষ্কার্যাবলি মহামারীর ন্যায় সংক্রমিত হয়ে পড়ল এবং তা সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিকভাবে সমর্থন লাভ করল, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই যুগের পর গ্রীকদের জাতীয় জীবনে আর কোন নবযুগের সূত্রপাত হয় নাই।[১৫]

রোম সভ্যতা

গ্রীক জাতির পরে জগতে রোমকদের উন্নতির সুযোগ এসেছিল, যে নিকৃষ্টতম দুস্কৃতি বা পাপ সমগ্র গ্রীসে সার্বজনীন রূপ লাভ করেছিল পরবর্তীকালে তা রোমে বিস্তার লাভ করেছিল।[১৬] রোমানরা যখন বর্বরতার অন্ধকার হতে বাহির হয়ে ইতিহাসে দৃশ্যমান হয় তখন তাদের সামাজিক শৃংখলা এরকম দেখা যায় যে, যে কোন পুরুষ তার পরিবারের প্রধান কর্মকর্তা ছিল, স্ত্রী ও সন্তানের উপর তার পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বর্বরতা সামান্য পরিমানে হ্রাস পেলেও নারীদের উপর কঠোরতার পরিমাণ লাঘব হয়নি। তাহযীব তমদ্দুনের উন্নতির সংগে সংগে নারীদের সম্পর্কে রোমকদের দৃষ্টিভংগিরও পরিবর্তন হতে লাগল। ক্রমশ বিয়ে তালাক[১৭] বিধি ব্যবস্থার এবং পারিবারিক রীতিনীতির এমন পরিবর্তন হয় যে, বিয়ে শুধু একটা আইনগত চুক্তি নামায় (Civil Contract) পরিণত হল। যার স্থায়িত্ব ও বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রীর উপরই নির্ভর করত। দাম্পত্য সম্পর্কের দায়দায়িত্ব গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। রোমান নারীগণ সামাজিক ক্ষেত্রে এতই স্বাধীনতা লাভ করল যে, তারা স্বামীদের উচ্চহারে সুদে টাকা কর্জ দিতে লাগল ফলে, স্বামী ধনাঢ্য স্ত্রীর দাসে পরিণত হল। তালাক এত সহজ বস্তু হয়ে পড়ল যে, কথায় কথায় দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হতে লাগল।[১৮] বিখ্যাত রোমান দার্শনিক ও পন্ডিত স্নীকা তালাকের আধিক্যের জন্য অনুতাপ করে বলেন, "আজকাল রোমে তালাক কোন লজ্জার ব্যাপার নয়, নারী তার স্বামীর সংখ্যা দ্বারাই নিজের বয়স গণনা করে।" মার্শাল (খ্রিঃ ৪৩-১০৪) উল্লেখ করেন যে, একটি নারী দশজন স্বামী গ্রহণ করেছিল।[১৯] জুদনিয়েল (খ্রিঃ ৬০-১৪০) একটি নারী সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, সে পাঁচ বছরে আটজন স্বামী গ্রহন করেছে। সেন্ট জুরুম (খ্রিঃ ৩৪০-৪২০) এমন এক নারীর বর্ণনা

হিসেবে গ্রহণ করেছিল তাদের নৈতিক মানদন্ড কোন স্তরে নেমেছিল। (আবুল আলা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪ ।

১৪. আল-কুর'আনে আল্লাহ্ উল্লেখ করেন যে, লুত আলায়হিস্ সালাম –এর জাতি নৈতিক বিপর্যয়ে নিমজ্জিত হলে আল্লাহ পাক সমগ্র জাতির প্রতি আসমানি গযব নাযিল করেন এর একমাত্র কারণ ছিল এই জাতির বিপদগামী ব্যক্তিদের নৈতিক দুষ্কার্য।

১৫. আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৩।

১৬. ডলিঞ্জার, **দি জেন স্টাইল এণ্ড দি জু,** দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৩৯।

১৭. ইসলামী শরীয়তে স্বামী স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রক্রিয়াকে তালাক বলা হয়।

১৮. আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ - ১৫-১৬।

১৯. বেশ্যাবৃত্তি এত প্রসার লাভ করল যে, রোম সম্রাট টাইবেরিসের (খ্রিঃ ১৪-৩৭) শাসনকালে সভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের বেশ্যা নর্তকীয় কাজ হতে নিরস্ত করবার জন্য আইন প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়ে। (আবুল আলা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭)।

Dhaka University Institutional Repository

করেন যে, সে তার জীবনে বত্রিশ জন স্বামী গ্রহণ করেছেন এবং সে তার শেষ স্বামীর একবিংশ পত্নী ছিল।[২০]

বিয়ে ছাড়া যৌনমিলন যে, দুষনীয়, এমন ধারনাও এ যুগে রোমানদের মন হতে দুর হতে লাগল। নৈতিক চরিত্র সামাজিকতার বন্ধন এত শিথিল হয়ে পড়ল যে, কামপ্রবনতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্লাবনে রোম সমাজ ডুবে গেল। নগ্ন অশ্লীল চিত্র দিয়ে ঘরের শোভা বাড়ানোকে প্রয়োজন মনে করা হতো।[২১] রোমীয় সাহিত্যে অশ্লীল নগ্ন চিত্র সম্বলিত প্রবন্ধাদি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করা হতো।[২২] এ সকল বর্ণনা ও সামাজিক চিত্র দেখে তৎকালে রোমান নারীদের অধ:পতিত অবস্থান সম্পর্কে খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

রোমানগণ স্ত্রীকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলে গণ্য করতো। সুতরাং নারীকে সর্বদা পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকতে হতো। বিবাহিতা স্ত্রী ও তার সকল সম্পত্তি স্বামীর ব্যবহারে চলে যেতো। স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্বপ্রকার অধিকার ছিল। স্ত্রী কোন অপরাধ করলে এর বিচারের সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীর ছিল। এমনকি, স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারতো।[২৩] সমাজের ধনী সম্প্রদায় ছাড়া রোমান স্ত্রী স্বামীর খরিদকৃত সম্পত্তির ন্যায় ছিল। স্বামীর কল্যাণের জন্য তাকে দাসীর মতোই থাকতে হতো। সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে সে যোগদান করতে পারতো না। সে কোন আমানত রাখতে পারতো না এবং কোন কিছুর জামিন, সাক্ষী ও শিক্ষক হতে পারতো না। পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার জন্য সে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের তার উপর আইনানুগ অধিকার জন্মাতো।[২৪] রোমান সাম্রাজ্যে আইনগতভাবে নারীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিলনা, ৫২০ বছর পর্যন্ত কেউ তালাকের নাম পর্যন্ত শোনেনি। অবশ্য দৈহিক দূর্বলতার কারনে নারীকে কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল।[২৫] পরবর্তী সময়ে রোমানরা নরীদের কিছু অধিকার দিয়েছিল কিন্তু তা সত্বেও এটা বাস্তব সত্য যে, পুরুষের সম মর্যাদা কখনো তারা পায়নি।[২৬] পাশবিক প্রবৃত্তির দ্বারা বশীভূত হবার পর রোম সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জল অট্রালিকা এমনভাবে ধূলিসাৎ হয়ে পড়ল যে, তার শেষ ইষ্টকটিরও অস্তিত্ব রইল না।[২৭]

---

২০. আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬।

২১. রোমীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সহ সর্বক্ষেত্রে নগ্নতা, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছিল। ফ্লোরা (Flora) নামে একটি খেলা সেই সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কারন এখানে উলংগ নারীদের দৌড় প্রতিযোগীতা হতো। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের একত্রে স্নানাবগাহন প্রথা প্রচলিত ছিল। ((আবুল আলা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭)।

২২. আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

২৩. আবদুল খালেক, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫।

২৪. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, **Women in Islam,** Ibid, p. 3 – 4.

২৫. জালালউদ্দিন আনসার উমরী সাইয়্যেদ, **ইসলামী সমাজে নারী** (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর-১৯৯১), পৃ ২৪-২৫।

২৬. **লেকী-ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাস** নামক প্রবন্ধ।

২৭. আবুল আ'লা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

খ্রিস্ট পূর্ব ২০০০ অব্দে সুমেরীয়গণ উরনগরীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং সুমার ও আক্কাদ অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতির নাম ছিল দুঙ্গী (Dungi) । দুঙ্গীর মৃত্যুর পর সুমেরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং আমোরাইট জাতি উত্তরাঞ্চল এবং ইলামাইট জাতি দক্ষিণ অঞ্চল অধিকার করে। খ্রিস্ট পূর্ব ২২০০ সালে সেমিটিক জাতি উদ্ভুত আমোরাইটরা আরো উত্তরাঞ্চল হতে এসে ব্যবিলন নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাস শুরু করে। ব্যবিলনে আমোরাইটগন বসবাস করতে থাকায় তারা প্রাচীন ব্যবিলনীয় বলে পরিচিত ছিল। আমোরাইট নামে পরিচিত এই জাতির দলপতি ছিলেন হাম্বুরাবি (খ্রিস্ট পূর্ব ২১২৩-২০৮১)।[১] আমোরাইটদের বিখ্যাত রাজা হাম্বুরাবির নেতৃত্বে ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে। রাজা হাম্বুরাবির আইনগ্রন্থ থেকে ব্যাবিলনীয় সমাজ[২] ব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র দেখতে পাই। এই আইনবিধি পর্যালোচনা করলে আমরা রাজা

---

১. মাহমুদুল হাসান সৈয়দ ড., **ইসলামের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

২. বর্তমান ইরাকের রাজধানী বাগদাদের ৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে যে বিশাল ধ্বংসস্তূপ বিরাজমান রয়েছে তা প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বলে সমধিক পরিচিত। ব্যাবিলন শব্দটি 'BAB-ILI' থেকে এসেছে যার অর্থ 'The gate of the gods' বা দেবতাদের প্রবেশদ্বার। খ্রিস্টপূর্ব ২৩৫০ অব্দের দিকে সুমের ও আক্কাদের মাঝামাঝি একটি অখ্যাত শহর ব্যাবিলন বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সিরিয়ার মরুভূমি থেকে আগত রক্ষ সেমেটিক গোষ্ঠী অ্যামরু (Amorite) সম্রাটদের দ্বারা ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পতন ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৯৪-১৮৮১ অব্দে অ্যামরু (Amorite) রাজা সুমুআবুম (Sumu-abum) ব্যাবিলনে অ্যামরু রাজত্বের সূচনা করেন। Dr. FARAJ BASMACHI এ সম্পর্কে বলেন ঃ

Sumu-abum (1894-1881 B.C) founded the first Dynasty of Babylon at the time when the long struggle of power between Isin and Larsa was going on, and large numbers of Amorite tribes were continuing to pour into Iraq invading towns and countryside. Sumu-abum chose for his capital the city of Babylon whose ruins now are situated about 90 kilometers to the southwest of Baghdad... (**Treasures of the Iraq Museum,** p- 34).

অ্যামরুদের (Amorite) বিখ্যাত ৬ষ্ঠ রাজা হাম্মুরাবির (Hammaurabi) নেতৃত্বে দজলা ফোরাতের বিস্তীর্ণ উপত্যাকায় ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে। হাম্মুরাবির রাজত্বকাল ব্যাবিলনের স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত। ১৭৯২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি ব্যাবিলনের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৭৫০ উওিখ্রহসমৃঃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শোষণ করেন। ১৯০১-১৯০২ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ জ্যাকস্ দ্য মর্গ্যানের (Jaques de Morgan) নেতৃত্বে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল পারস্যের সুসার দুর্গ আবিস্কার করেন প্রাচীনকালের অন্যতম চিত্তাকর্ষক স্মৃতিস্তম্ভ। এটি এক খণ্ড কালো সবুজ প্রস্তর নিয়মিতভাবে গঠিত এবং মসৃণ ২.৪৫ মিটার উঁচু যার মধ্যে সংকলিত হয়েছে আক্কাদীয় ভাষায় রাজা হাম্মুরাবির আইনগ্রন্থ। আইন লিখিত হয়েছে ২৪৫ সেন্টিমিটার উঁচু একটি পাথরের দুইদিকে যা বর্তমানে ফ্রান্সের লুভ্যার (Louvre) যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই প্রস্তরের সামনের অংশের উপরে একটি অল্প খোদিত ছবিতে দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

হাম্মুরাবি কর্তৃক তৎকালীন ব্যাবিলনীয় সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা জানতে পারি। আইনগ্রন্থের শুরুতেই হাম্মুরাবি বলেন :

The great gods have called me, and I am indeed a shephered who brings peace, whose, sceptri is just, my pleasant shade is spread over my city, in my bosom I have carried the people of the land of Sumer and Akked, they have become abundantly rich under my guardian spirit, I bear their charge in peace and my profound wisdom I protect them. That the strong may not oppress the weak and so to give justice to the orphan and the widow, I have inscribed my precious words on my monument and established them before my statue called king of justice in Babylon.[৩]

হাম্মুরাবীর আইনে সমগ্র ব্যাবিলনীয় সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় রাজা, রাজার পরিষদবৃন্দ, পুরোহিতবৃন্দ, পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ সৈন্যদেরকে। রাষ্ট্রের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা এই শ্রেণী ভোগ করত এবং শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার তাদের ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যারা অন্তর্ভুক্ত ছিলো তাদের কে বলা হত MUSKINU-যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ভিক্ষুক। হাম্মুরাবির আইনে এ শব্দটি জনসাধারণ বোঝানো হয়েছে। এই জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষক, সাধারণ শ্রমিক ও দাসগণ। প্রতিটি ক্রীতদাসের প্রভুগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের অধীনস্থ ক্রীতদাসদের ক্রীতদাস রমণীর সাথে বিবাহ দিতেন। তাদের সন্তান-সন্ততিরা জন্মগতভাবে ক্রীতদাস হিসেবে বিবেচিত হত। অনেক ক্রীতদাস প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীন রমণী বিয়ে করতে পারত। এক্ষেত্রে তাদের সন্তান-সন্ততিরা মুক্ত বলে বিবেচিত হত।[৪]

হাম্মুরাবির আইন অনুযায়ী সমাজের প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত পুরুষগণ একাধিক বিয়ে করতে পারতেন। এই বহুবিবাহ সীমিত পর্যায়ে প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুবিবাহের বদলে সমাজের প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত পুরুষরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অসংখ্য দাস দাসী ও উপপত্নী রাখত তাদের যৌন চাহিদা পূরণের জন্য। নিঃসন্তান স্ত্রীর স্বামীরা রক্ষিতা রাখতে পারত

ন্যায়বিচারের দেবতা সূর্যদেব শামাস হাম্মুরাবিকে তার আইন লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিচ্ছেন অথবা হাম্মুরাবি তার আইনগ্রন্থ দেবতাকে প্রদান করছেন এমন একটি ভাব প্রকাশিত হয়েছে ভাস্কর্যটিতে। আইন সংকলনটি মূলত ব্যাবিলনের সিপারে খোদিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এলেমাইনট বিজয়ী সম্ভবত শুটরুক-ন্যাখুনটে (Shutrk Nakhunte, ১২০০-১১০০ খ্রিস্ট পূর্ব) যুদ্ধের লুণ্ঠিত সামগ্রী হিসেবে ওটি নিয়ে গিয়েছিলেন পারস্যে এবং পুনঃস্থাপন করেন নিজ রাজধানীতে। হাম্মুরাবির এই আইনগ্রন্থটি পৃথিবীর প্রাচীনতম সুসংবদ্ধ আইনবিধি যা ২১০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে রাজা উর নাম্মু (UR NAMMU) কর্তৃক প্রবর্তিত আইন বিধির উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে।

৩. The CODE OF HAMMURABI, Rosamond E.Mack.-Ministry of Culture and Information, **State Organisation of Antiquetics and Huritage Bagdad**, 1979, P- 9-10.

৪. Ibid, P- 7

Dhaka University Institutional Repository

এবং এ সকল রক্ষিতাদের স্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হত। শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীর পুরুষরাই নয় অন্যান্য শ্রেণীর পুরুষরাও ক্রীতদাস রমণীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত। এ ক্ষেত্রে তাদের সন্তান-সন্ততিরা মুক্ত নাগরিক বলে বিবেচিত হত। রাজারা তাদের হারেমে অসংখ্য উপপত্নী ও রক্ষিতা রাখতেন। এই সকল রক্ষিতাদের ভরণ-পোষণ রাজকোষ থেকে দেয়া হত।[৫]

সাধারণভাবে যে কোন বিয়েই বর ও কনের পিতাই স্থির করতেন। বর ও কনে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করতে পারত। বরের পিতা বরপণ ও কনের পিতা যৌতুক প্রদান করতেন। বিবাহে প্রাপ্ত যৌতুক স্ত্রী আজীবন ভোগ করতে পারত। প্রতিটি বিবাহ আইনসংগতভাবে চুক্তি দ্বারা সম্পাদিত হত। আইনসম্মত চুক্তি ছাড়া কেউ কোন নারীকে স্ত্রী করতে চাইলেও সেই নারীকে স্ত্রী বলে রাষ্ট্র গণ্য করত না। এ সম্পর্কে হাম্মুরাবি তার আইন বিধির ১২ নং অনুচ্ছেদে বলেন ঃ

If a man has taken a woman to wife and has not drawn up a contract for her, that woman is not a wife.[৬]

যদি কোন বিবাহিতা রমণীকে তার স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সাথে একই শয্যায় সহবাসরত দেখা যেত এবং ঐরূপ অবস্থায় ধরা পড়লে তাদের দুজনকেই বেঁধে পানিতে ফেলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হত। স্ত্রীর স্বামী যদি তার স্ত্রীর জন্য প্রাণভিক্ষা করতেন সে ক্ষেত্রে রাজা স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রীকে মুক্তি দিতেন, হাম্মুরাবির কথায় ঃ

If a marrid lady is caught lying with another man, they shall bind them and cast them into the water, if her husband wishes to let his wife live, then the king shall let her servent live.[৭]

যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনে কোন স্ত্রীর স্বামী দীর্ঘদিন ঘরের বাইরে থাকতে হয় সে ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য যাবতীয় সকল কিছুর ব্যবস্থা করে যাবে এবং স্বামীর প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত স্ত্রী নিজের দায়িত্ব রক্ষা করে চলবে। কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে সেই স্ত্রী যদি পর পুরুষের সাথে যৌন মিলনে রত হয় বা পর পুরুষের গৃহে প্রবেশ করে সে ক্ষেত্রে সেই রমণীকে পানিতে ফেলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। হাম্মুরাবির কথায় :

If that woman has not kept herself chaste but enters another man's house, they shall convict that women and cast her into the water.[৮]

কিন্তু কোন পুরুষ যদি ঘরের বাইরে দীর্ঘদিন ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে তার স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করে যায় সেক্ষেত্রে সেই স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের গৃহে প্রবেশ করলে বা পর পুরুষের সাথে যৌন মিলনে রত হলেও তাকে কোন শাস্তি প্রদান করা হবে

---

৫. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

৬. **The Code of Hammurabi**-by Rosamond E. Mack, Baghdad, Iraq, p- 26.

৭. **The Code of Hammurabi**, p- 26.

৮. **Ibid,** p- 27.

Dhaka University Institutional Repository

না। একইভাবে কোন পুরুষ বা স্বামী দীর্ঘদিন বিদেশে বা ঘরের বাইরে কোন স্থানে ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করে গেলে সেই স্ত্রী অন্য পুরুষের গৃহে প্রবেশ করে তার সাথে সহবাস করার ফলশ্রুতিতে তাদের সন্তান হলে এবং সেই স্ত্রীর স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে স্ত্রী তার পূর্বের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে। সেইরূপ ক্ষেত্রে তার সন্তানরা নিজ নিজ পিতার কাছে সন্তানের মর্যাদা লাভ করবে।[৯]

হাম্মুরাবি তার আইন বিধির ১৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলেন যে যদি কোন পুরুষ তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়, যে বন্ধ্যা অর্থাৎ তার স্ত্রীর গর্ভে যখন কোন সন্তান হয় না সে ক্ষেত্রে স্বামী কনে পক্ষের যৌতুকসমূহ সমপরিমাণ অর্থ প্রথম স্ত্রীকে প্রদান করবে এবং স্ত্রীর পিতা কর্তৃক প্রদেয় যৌতুকসমূহ স্ত্রীকে প্রদান করে তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। হাম্মুরাবির কথায় ঃ

If a man wishes to divorce his first wife who has not borne him sons, he shall give her money to the value of her bridal gift and shall make good to her the dowry which she has brought from her fathers house and so divorce her.[১০]

যদি স্ত্রীর পিতার পক্ষ থেকে কোন যৌতুক বা বিয়ের উপহার প্রদান করা না হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে স্বামী এক মানেহ (1 Maneh) সমপরিমাণ রৌপ্য বিবাহ বিচ্ছেদের অর্থস্বরূপ প্রদান করবে। স্বামী যদি ভূমিদাস হয় সে ক্ষেত্রে সে তার স্ত্রীকে তিন ভাগের এক ভাগ মানে (Maneh) রৌপ্য বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রদান করবে।[১১] যদি কোন বিবাহিতা নারী স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মানুষের গৃহে বসবাস করে, সকল সময় নিজ বাড়ির বাইরে থাকার জন্য উন্মুখ থাকে এবং তার এইরূপ আচরণের জন্য সেই নারী তার নিজ গৃহের ক্ষতি করে ও স্বামীর মর্যাদাহানি ঘটায় সে ক্ষেত্রে সেই নারীর স্বামী তাকে কোন প্রকার অর্থ প্রদান করা ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। যদি সেই নারীর স্বামী তাকে তালাক প্রদান না করে সে ক্ষেত্রে তালাক প্রদান করা ছাড়াই গৃহস্বামী অন্য মেয়েলোককে বিবাহ করতে পারবে এবং বিবাহিত নারী স্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবে। প্রথম স্ত্রী দাসীরূপে পূর্ব স্বামীর সাথে একই গৃহে অবস্থান করবে।[১২] হাম্মুরাবির কথায় ঃ

If a married lady who is dwelling in a man's house sets her face to go out of doors and persists in behaving herself foolishly wasting her house and belittlind her husband, they shall convict her and, if her husband then states that he will divorce her, he may divorce her, nothing shall be given to her as her divorce-money on her journney. if her husband states that he will not

---

৯. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭।

১০. **The Code of Hammurabi**-by Rosamond E. Mack, Baghdad, Iraq, p- 27.

১১. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮।

১২. রাজা হাম্মুরাবির আইনগ্রন্থের আইন বিধির ১৪১ নং অনুচ্ছেদে।

Dhaka University Institutional Repository

divorce her, her husband may marry another woman; that women shall dwell a slave-girl in the house of her husband.[১৩]

হাম্মুরাবি তার আইন বিধির ১৪৪ ও ১৪৫ নং অনুচ্ছেদে বলেন যে যদি কোন পুরুষ কোন নারী পুরোহিতকে বিবাহ করে এবং সেই পুরোহিত নারী তার স্বামীকে কোন দাসী রমনী প্রদান করলে সেই দাসীর ঘরে সন্তান হলে তাকে গ্রহণ করতে হত। এইরূপ ক্ষেত্রে সেই পুরোহিত নারীর স্বামী যদি অন্য কোন সন্ন্যাসিনীকে (Lay-sister) বিবাহ করতে চাইলেও তা সে করতে পারবে না। কিন্তু যদি কোন পুরুষ কোন পুরোহিত রমনীকে বিয়ে করে এবং সেই পুরোহিত নারীর ঘরে যদি কোন সন্তান-সন্ততি না হয় সে ক্ষেত্রে সেই পুরুষ অন্য কোন সন্নাসিনীকে বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু সেই সন্ন্যাসিনী নারী গৃহস্বামীর প্রথম বিবাহিত পুরোহিত নারীর সমান মর্যাদা লাভ করবে না।[১৪]

হাম্মুরাবি তার আইন বিধির ১৪৮ নং ও ১৪৯ নং অনুচ্ছেদে বলেন যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে বিয়ে করে এবং বিয়ের পর সেই রমনী ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলে সেক্ষেত্রে সেই পুরুষ অন্য রমনীকে বিবাহ করতে পারবে। তবে সেই পুরুষ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করবে না। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত নারী যতদিন খুশি তার স্বামীর গৃহে অবস্থান করতে চায় ততদিন সে তার স্বামীর গৃহে অবস্থান করতে পারবে এবং স্বামী তার ভরণ-পোষণ দেবে। যদি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত নারী তার স্বামীর গৃহে অবস্থান করতে না চায় সেক্ষেত্রে সে নারী বিবাহের সময় তার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত যৌতুক ও উপহার সামগ্রী নিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে যেতে পারবে। হাম্মুরাবির কথায় ঃ

If a man has married a wife and ague attacks her, and he sets his face to marry another woman, he may marry her. He shall not divorce the wife whom ague has attacked; she shall dwell in the house which he has built, and he shall continue to maintain her so long as she lives. If that woman does not consent to dwell in the house of her husband, he shall make good to her dowry which she brought from the house of her father and so she shall go away.[১৫]

রাজা হাম্মুরাবি তার আইন বিধির ১৭০ নং অনুচ্ছেদে বলেন যদি কোন পুরুষের প্রথম স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি হয় এবং সেই পুরুষের অধীনস্থ দাসী রমনীরও সন্তান-সন্ততি হয় সেক্ষেত্রে স্বামী যদি তার জীবিত অবস্থায় দাসী নারীর ঘরের সন্তান-সন্ততিদেরকে সন্তানরূপে স্বীকৃতি প্রদান করে তবে স্বামীর মৃত্যুর পর দাসী রমনীর সন্তানগণ তাদের পিতার সম্পত্তির একটি বিশেষ অংশ সমানুপাতিক হারে লাভ করবে। হাম্মুরাবির কথায় ঃ

---

১৩. **The Code of Hammurabi**-by Rosamond E. Mack, Baghdad, Iraq, p. 28.

১৪. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭।

১৫. **Ibid,** p- 29.

Dhaka University Institutional Repository

If the first wife of a man has born him sons and his slave-girl has born his sons, and the father in his life-time states to the sons whom the slave-girl has born him : "You are my sons, he shall count them with the sons of the first wife. After the father goes to his fate, the sons of the first wife and the sons of the slave-girl shall take proportionate shares in the property of the paternal estate; an heir, being a son of the first wife, shall choose and take the first share at the division.[১৬]

হাম্মুরাবির সময়ে ব্যাবিলনে মন্দিরের পুরোহিতরা এক বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার লাভ করতো। হাম্মুরাবির পূর্বের ও পরের রাজাগণ রাষ্ট্রীয় খরচে মন্দির নির্মাণ করে দিতেন। রাজা যখনই কোন যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। তখনই প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চভাগ মন্দিরের কোষাগারে জমা করতেন। যুদ্ধে জয়লাভের ফলে প্রাপ্ত এক বিশেষ সংখ্যক রমনীদেরকে মন্দিরের দেবদাসীরূপে প্রদান করা হত। এ সকল দেবদাসীরা যে মন্দিরের পুরোহিতদের সাথে যৌনলীলায় লিপ্ত হত সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও হাম্মুরাবি তার আইন গ্রন্থের কোথাও এমনি যৌন সংগমের কথা উল্লেখ করেননি। হাম্মুরাবির আইন গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে তৎকালীন ব্যাবিলনীয় সমাজে পুরুষরা একই সময়ে প্রথম স্ত্রী থাকাকালিন অবস্থায় অসংখ্য দাসী রমণী রাখতে পারত এবং তাদের সাথে যৌন মিলনও করতে পারত। তেমনিভাবে পুরোহিত নারী বন্ধ্যা হলে তার স্বামী সণ্যাসিনীকে বিয়ে করতে পারত। তেমনিভাবে পুরোহিতরা অসংখ্য সেবাদাসীদের নিয়ে নির্বিচার যৌনসম্ভোগে লিপ্ত থাকত। পুরোহিতদের সকলে ভয় পেত এবং সবাই সমীহ করে চলত। এরই ফলশ্রুতিতে পুরোহিতদের যৌন কেলেঙ্কারীর কথা কেউ সহজে প্রকাশ করত না। এই পুরোহিতদের আবার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল রাজা ও তার পারিষদবর্গ। পুরোহিতরাই ছিল সত্যিকার অর্থে দেশের প্রধান ব্যবসায়ী। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সিংহ ভাগই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। বস্তুত তারা সকল কিছুর ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল।[১৭]

হাম্মুরাবির মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত টিকে ছিল। যে পাঁচজন রাজার পর ব্যাবিলনে রাজত্ব করেন তারা হলেন সামসু-ইলুনা (৩৮ বৎসর), আবিয়েশুখ (৩৮ বছর), আম্মি দিতানা (৩৭ বছর), আম্মি মাদুকা (২১ বছর), এবং সামসু-দিতানা (৩১ বছর)। ব্যাবিলনে অজস্র দেব-দেবী ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দে দেবতাদের সংখ্যা ছিল ৬৫ হাজার। প্রতিটি নগর, অঞ্চল ও গ্রামের নিজ নিজ দেবতা ছিল। ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা ছিল মার্দুক। এছাড়া লারসা নগরীর দেবতা ছিল শামাশ, উরুকের দেবী ছিল ইশতার। ব্যাবিলনের প্রধান গেটের নাম ইশতার গেট। উর নগরীর দেবতা ছিল নান্নার। এমনিভাবে শত সহস্র দেবদেবীর সমন্বয়ে তৎকালীন ব্যাবিলনে গড়ে উঠেছিল অগণিত মন্দির যার ভিতর মন্দিরের পুরোহিতরা অবলীলায় অসংখ্য সেবাদাসীরূপ

---

১৬. **Ibid,** p- 31-32.

১৭. আহমদ মনসুর, **বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের সাথে যৌনলিলায় লিপ্ত থাকত। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে পৃথিবী বিখ্যাত নৃপতি আলেকজান্ডার দি গ্রেট সমগ্র ব্যাবিলন জয় করেন এবং কিছুকালের জন্য ব্যাবিলনকে তার রাজধানী করেন। ব্যাবিলনের বর্তমান ধ্বংসস্তুপের প্রবেশ পথ ইশতার-গেটে প্রবেশ করার কিছু আগে ডান পার্শ্বে আলেকজান্ডার দি গ্রেট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লাল ইটের তৈরি গ্রীক নাট্যশালাটি (এ্যাম্পিথিয়েটারটি) এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আলেকজান্ডার দি গ্রেটের অসংখ্য স্ত্রী ও উপপত্নী তথা রক্ষিতা ছিল। ব্যাবিলন জয় করার সময় তার দশ হাজার মেসিডোনীয় সৈন্য সেই দেশের রমনীদেরকে বিবাহ করেন। DR. FARAJ BASMACHI তাই বলেন :

...He (Alexander the Great) Married a Persian wife himself and following his example. 10,000 Mecedonians are said to have taken Asiatc wives too.[১৮]

খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দে বিখ্যাত গ্রীক বীর আলেকজান্ডার দি গ্রেট ব্যাবিলনে মৃত্যুবরণ করেন। এমনিভাবে দেখা যায় প্রতিটি নৃপতিই একাধিক বিবাহ করতেন এবং একই সাথে অজস্র উপপত্নী রাখতেন বা রক্ষিতা রাখতেন। তাদের সাথে যৌনসংসর্গ করা ছিল একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের সমাজে বিশেষ কোনো মর্যাদা ছিল না। নারীরা পণ্যের মত ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হত। রাজা হাম্মুরাবি নারীদের বিশেষ কতক ক্ষেত্রে কিছু মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতদের যৌনলিলায় লিপ্ত থাকাকে রাজা হাম্মুরাবীও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতাও করেছিলেন।

সুমেরীয় সভ্যতা

প্রাচীন সুমেরীয়[১৯] সমাজ শ্রেণীবিভক্ত ছিল। পুরোহিত, অভিজাত, বণিক, শিল্পপতি এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণের অবস্থান ছিল উচ্চতর শ্রেণীতে। মধ্যম শ্রেণীভুক্ত হলেন

---

১৮. **Treasures of the Iraq Museum,** p. 52.

১৯. মেসোপটিয়া সভ্যতার অগ্রদূত ছিল অসেমিটিক সুমেরীয় জাতি। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ হতে ৪০০০ অব্দে সুমেরীয়র টাইগ্রীস ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যভাগে বসবাস করতে থাকে। তাদের আদিভূমি কোথায় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে সম্ভবত মধ্য এশিয়ার কোন অঞ্চল হতে সুমেরীয়রা মেসোপটেমিয়ায় আগমন করে। গ্রীক 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ দুই নদীর মাঝখানে অবস্থিত ভূমি। এই দুটি নদীর নাম টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস যা বর্তমান ইরাকের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে সকল সভ্যতা গড়ে উঠে সেটিই ইতিহাসে মেসোপটেমীয় সভ্যতা নামে অভিহিত। এশিয়া মহাদেশে এটিই প্রাচীনতম সভ্যতা প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে চারটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে যে চারটি সভ্যতার জন্ম হয় তার নাম সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বৎসর পূর্বে প্রথম জনবসতির নিদর্শন পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত 'এলাম' নামক স্থানে। এ সকল অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমে তৎকালীন সুমেরীয় সভ্যতার অজস্র নিদর্শন আবিস্কৃত হয়। এ সকল অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমে তৎকালীন সুমেরীয় সভ্যতার অজস্র নিদর্শন আবিস্কৃত হয়। এছাড়াও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমে বহু প্রাচীন শহরের সন্ধান পাওয়া যায় যার মধ্যে 'উর' অন্যতম। স্যার চার্লস ওলি কর্তৃক উরের

Dhaka University Institutional Repository

যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকত।[২০] সব তন্ত্রেই বলা হয়েছে মৈথুন ছাড়া কূলপূজা (তন্ত্র অনুযায়ী দেবীর পূজা) হয় না। যেমন গুপ্ত সংহিতায় বলা হয়েছে, 'কুলশক্তিম বিনা দেবী যো যপেত মতু পামর'। আবার নিরুত্তরতন্ত্র-এ বলা হয়েছে 'বিবাহিতা পতিত্যাগে দুষমন্ কুলার্চনে' তার মানে কূলপূজার জন্য সধবা স্ত্রীলোক যদি তার পতি (স্বামী) ত্যাগ করে, তবে তার কোন দোষ হয় না।[২১]

সুমেরীয় সমাজে স্বামী স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত এবং পরে পছন্দমত পাত্র পাত্রী নির্বাচন করে তারা আবার বিয়ে করতে পারত। বিয়েতে যৌতুক প্রথার প্রচলন ছিল। তবে উচ্চতর শ্রেণীর পুরুষরা অধিক বিবাহের বদলে অধিক সংখ্যক নারীর সাথে নির্বিচারে যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হতেই বেশি পছন্দ করত। পুরোহিতরা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের পুরোহিতদের মত অগণিত নারীকে ধর্মের নামে উপভোগ করত। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের মত সুমেরীয় সমাজে স্ত্রী বা অন্যান্য নারী দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করা হত। অতিথিরা গৃহস্বামীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন ধরনের উপহার (লালরুবি, সোনার অলংকার প্রভৃতি) প্রদান করত। পুরুষরা যেভাবে অধিকসংখ্যক নারীর সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হত নারীরাও তেমনিভাবে অশ্লীলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিত ও পছন্দমত পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হত।[২২]

---

২০. সুমেরীয় সমাজের নারীর সাথে ভারতীয় নারীর তুলনা করে ড. অতুল সুর বলেন, 'সুমের ও ভারতের মাতৃদেবীর মধ্যে এক অসাধারণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়... মেসোপটেমিয়ার মাতৃদেবীর পর্বতের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সেজন্য তাকে 'পর্বতের দেবী' বলা হত। ভারতে মাতৃদেবীর নাম ছিল 'এ-নান্না'। সে নাম হিংলাজে 'নানাদেবীর নামে এখনও বর্তমান... দু'দেশেই ধর্মীয় গণিকাবৃত্তি (বা সাময়িকভাবে সতীত্বের বিসর্জন দেয়া) প্রথা প্রচলিত ছিল। পশ্চিম এশিয়ায় এর উদ্ভব হয়েছিল ঐন্দ্রজালিক (mimetic or homoepathic) পদ্ধতি থেকে। সধবা ও অনূঢ়া উভয় শ্রেণীর মেয়েরাই দেবীর প্রসন্নতা লাভের জন্য সাময়িকভাবে তাদের সতীত্বের বিসর্জন দিত। বলা বাহুল্য, ভারতে এটা বামাচারী তন্ত্রধর্মের বৈশিষ্ট্য। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০)।

২১. অতুল সুর, **ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়** (কোলকাতা ঃ সাহিত্যালোক প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্রি), পৃ ৪২-৪৩।

২২. সুমেরীয়দের একটি অন্যতম মহা খ্যাতিসম্পন্ন ধর্মকেন্দ্রের নাম নিপ্পুর-(Nippur)। আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নিপ্পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমে একটি বিরাট লাইব্রেরী খুঁজে বের করেছেন এবং সেখানে পাওয়া গেছে বহু সহস্র মাটির ফলক যা ১৮ ইঞ্চি চওড়া। সে সব বর্তমানে কনস্টান্টিনোপোল এবং ফিলাডেলফিয়ার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলক থেকে তৎকালীন সমাজের বহু অজানা অনাবিষ্কৃত দিক উন্মোচিত হয় আমাদের কাছে। এই সকল গ্রন্থ থেকে মন্দিরে সেবাদাসী রাখার কথা জানা যায়। এই সকল সেবাদাসীরা মন্দিরের পুরোহিতদের সাথে নির্বিচারে যৌনলিলায় লিপ্ত থাকত। নারী পুরুষের এই নির্লজ্জ ব্যভিচারের ফলে বহু নারীই সন্তান গর্ভে ধারণ করত। এই সকল সন্তানদের অধিকাংশকে জন্মের পর মেরে ফেলা হত। (আহমদ মনসুর, **প্রাগুক্ত**, পৃ ৫১)।

Dhaka University Institutional Repository

আক্কাদীয় সভ্যতা

সুমেরীয়দের পর খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ২৩০০ অব্দের দিকে সুমেরের উত্তরে আক্কাদ নামক অঞ্চলে সেমেটিক ভাষী এক যাযাবর গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে যারা আক্কাদ নামে পরিচিত।[২৩] এই আক্কাদীয় সভ্যতা ১৪২ বছর পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে যার মধ্যে ৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন প্রথম সার্গন (SARGON-1)। এই সার্গনের জন্ম সম্পর্কে আমরা যে সকল তথ্য পাই তা থেকে তৎকালীন সমাজে বহুবিবাহ ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র আমরা দেখতে পাই। Dr. FARAJ BASMACHI বলেন :

His (Sargons) mother was a temple woman who conceived him and bore him in secret, she put him in a basket and cast him into the Euphrates river which carried him until he was rescued by a gardener. The gardener reared him and when he became grown-up the Goddess Ishtar granted him her love. He gained a position in the serice of UR-Zababa, Kingh of kish, and then managed to overthrow his master.[২৪]

রাজা প্রথম সার্গনের অবৈধ জন্মের মাধ্যমে তৎকালীন আক্কাদীয় সমাজের বিভিন্ন ধর্ম মন্দিরগুলোতে সেবাদাসীদের থাকার কথা জানা যায়। এই সকল সেবাদাসীরা মন্দিরের পুরোহিতদের সাথে নির্লজ্জ যৌন সংগমে লিপ্ত থাকত। ধর্মমন্দিরগুলোতে সে সময় ব্যভিচার ও যৌনলীলার আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। প্রতিটি মন্দিরে অসংখ্য মেয়েরা থাকত কখনো সেবিকারূপে এবং কখনো দেবদাসীরূপে। নারীদের এইভাবে মন্দিরের কাজে নিযুক্তি কখনো নিন্দার চোখে দেখা হত না। তৎকালীন আক্কাদীয় সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের পিতামাতারা তাদের মেয়েদের এমনিভাবে মন্দিরের কাজে অংশগ্রহণ করাকে বেশ গর্ববোধ করতেন এবং জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েকে মন্দিরে দেবদাসীদের কাজে নিযুক্ত করতেন। দেবদাসীর কাজে নিযুক্ত হয়ে মন্দির-এর ভিতর পুরোহিতদের সাথে যৌনলিলায় লিপ্ত থাকাই মেয়েদের প্রধান ও মূল কাজ ছিল। এরূপ নির্বিচার যৌন সংগমের ফলে অনেক মেয়ে গর্ভবতী

---

২৩. প্রথম সারগন খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দে সুমেরীয়দের পরাজিত করে আক্কাদ অঞ্চলে একটি নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইলামইটদের এবং ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর সিরিয়া দখল করে সারগণ পশ্চিম এশিয়ায় প্রথম সেমিটিক রাজ্য স্থাপন করেন। আক্কাদীয়রা সুমেরীয় লিখন পদ্ধতি, শিল্পকলা, ভাস্কর্য বর্ষপঞ্জী ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুমেরীয় সভ্যতার উপর ভাস্কর্য বর্ষপঞ্জী ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুমেরীয় সভ্যতার উপর ভিত্তি করেই আক্কাদীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। আক্কাদীয় ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ অব্দের একটি প্রস্তর খন্ড (Stele) । এই প্রস্তর খণ্ডে অসাধারণ দক্ষতা ও শিল্প চাতুর্যে রাজা নারমসিন এর দুর্গ অবরোধের দৃশ্যকে খোদাই করা হয়েছে। প্রথম সারগনের মৃত্যুর পর সুমেরীয়গণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিন্তু দুর্ধর্ষগুতি তাদের এই বিদ্রোহ দমন করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে সুমেরীয়গণ উর নগরীর নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহ করেন এবং সুমার আক্কাদ অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতির নাম দুনী (Duni)।

২৪. **Treasures of the Iraq Museum** by Faraj Basmachi, p. 26.

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়ত যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাজা প্রথম সার্গনের মন্দিরের ভিতর অবৈধ জন্মের ইতিহাস। মন্দিরের ভেতর অবৈধভাবে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলা হত।[২৫]

সুমেরীয়দের মত আক্কাদীয় পুরুষদের মধ্যেও বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চশ্রেণীর পুরুষরা একের অধিক স্ত্রী রাখত। তবে অধিকসংখ্যক স্ত্রী রাখার চাইতে পুরুষরা অসংখ্য সেবাদাসী ও উপপত্নী রাখত তাদের যৌন চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে। এছাড়াও যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে তারা পরনারীদের কাছে গমন করত এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে নিজ ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ রমণীকে ভোগ করত। যুদ্ধবন্দী নারীদেরকে সমাজের প্রতিপত্তিশালী লোকদের মধ্যে ও বিভিন্ন মন্দিরে বণ্টন করা হত। এই সকল যুদ্ধবন্দী নারীরা আজীবন পুরুষদের ও মন্দিরের পুরোহিতদের যৌনচাহিদা পূরণের কাজে নিবৃত্ত থাকত। নরনারীর বিবাহ সম্পর্ক আক্কাদীয় আইনের দ্বারা নির্ধারণ করা হত। পুরুষ ও নারীরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত। তবে নারীর চেয়ে পুরুষদেরই ছিল সর্বময় ক্ষমতা। পুরুষদের ক্ষমতা এত অধিক ছিল যে তারা কখনো কখনো তাদের স্ত্রীদের বিক্রি করে দিতে পারতো। স্বামীর কোথাও ঋণ থাকলে সেই ঋণ পরিশোধের জন্য স্বামীরা স্ত্রীদেরকে ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখত। প্রতিটি স্ত্রীরই কর্তব্য ছিল স্বামী ও রাষ্ট্রের জন্য অধিক পরিমাণ শিশুর জন্ম দেয়া। স্ত্রী বন্ধ্যা হলে স্বামী কোন যুক্তি না দেখিয়েই তাকে তালাক দিতে পারত। ব্যভিচারের জন্য স্বামীকে কোন শাস্তি দেয়া হত না। কিন্তু স্ত্রীর জন্য এর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এমনিভাবে আক্কাদীয় সমাজের অধিকাংশ নারীরই সামাজিক কোন মর্যাদা ছিল না। পণ্যের মত তাদেরকে যখন তখন নিলামে বিক্রি করা হত।[২৬] সমাজের মুষ্টিমেয় নারীরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করত। এমনিভাবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্না নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শুব-আদ (SHUB-AD), এনখুদিয়ানা (Enkheduana) প্রমুখ। এনখুদিয়ানা সম্পর্কে Encyclopaedia Britanica-তে বলা হয়েছে :

> Enkheduana must have been a very gifted woman, two Sumerian hymns by her have been preserved...।[২৭]

সে সময়কার উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন নারীরা যে বর্তমান আধুনিক নারীদের চাইতে সাজ সজ্জায় পিছিয়ে ছিল না তার প্রমাণ আমরা পাই প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ প্রফেসর নিউনার্দ উলী কর্তৃক আবিষ্কৃত রাণী শুব-আদ এর সমাধীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন অলঙ্কারাদী থেকে।

---

২৫. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২।

২৬. আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩।

২৭. **Encyclopaedia Britannica**, Vol-11, p. 937.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অ্যাসিরীয় সভ্যতা

অ্যাসিরীয়দের সাম্রাজ্য ও সমাজ ব্যবস্থার[১] কথা পর্যালোচনা করলে আমরা অ্যাসিরীয় সমাজে তিনটি শ্রেণীর উপস্থিতি দেখতে পাই যারা হলেন প্রথমত অভিজাত শ্রেণী। এই শ্রেণীর মধ্যে

---

১. ব্যাবিলনের প্রায় দুশো মাইল উত্তরে টাইগ্রীস নদীর তীরে প্রাচীন শহর আশুর ছিল সেমেটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অ্যাসিরীয়দের আদি বাসস্থান। অ্যাসিরীয়দের এই প্রাচীন শহরটি মূলত মসুল (MOSUL) শহরের ১১০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বারো বছর বিভিন্ন পর্যায়ে খনন কার্যের পর এই প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। Dr. FARAJ BASMACHI এ সম্পর্কে বলেন ঃ

Assur, capital city of the old Assyrian period is situated on a bluff on the west bank of the Tigris, about 110 kilometers south of Mosul. This, the oldest and most sacred of Assyrian cities, was thoroughly excavated lay a German expedition (Deutech Orient-Gesellschaft) for twelve consecutive years from the beginnings of the present century. The excavators exposed its town plan with its temples, palaces and gates, and graves of the Assyrian kings, and found an incomparable wealth of objects from the Sumerian, Akkadian and Assyrian periods. (**Treasures of the Iraq Museum,** p. 52).

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত জিনিসপত্র ও ফলক থেকে জানা যায় যে অ্যাসিরীয়দের প্রাচীন রাজা KIKIA দেবতা অ্যাসুরের নামে মন্দির, নগর, প্রাচীর নির্মাণ করেন। এই অ্যাসিরীয়রা সেমেটিক বা সুমেরীয় গোষ্ঠীভুক্ত ছিল না। ধারণা করা হয় জন্মগতভাবে তারা সুবারীয়ান (SBARIAN) ছিল। পুরাতন অ্যাসিরীয়দের রাজত্বকালে রাজা শামাসআদাদ (Shamashadad) ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্রাট। তিনি অতিমাত্রায় যৌনসম্ভোগে বিভিন্ন পত্নী ও উপপত্নীর সাথে লিপ্ত থাকতেন। এ সম্পর্কে DR. FARAJ BASMACHI বলেন ঃ

In the time of Shamashadad (Samsi-addu! 1815-1742 B.C) the old Assyrian Kingdom reached an unprecedented supremacy. He led its armies to domination over most of the cities in central Iraq and the Euphrates area, in particular Mari (modern Tell Hariri). (Treasures of the Iraq Museum. p. 40).

পুরাতন অ্যাসিরীয়দের রাজত্বকালের পর শুরু হয় মধ্য অ্যাসিরীয়দের রাজত্ব যার সময়কাল ছিল ১৩৬৫-৯১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালে অ্যাসিরীয়রা মেসোপটেমিয়ার উত্তরাঞ্চলে তাদের এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে সম্রাট আশুর উবালিটের (Assur-Uballit) মাধ্যমে যা বর্তমান ইরাকের

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চপদস্থ সামরিক ব্যক্তিত্ব ও পুরোহিত শ্রেণীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ব্যবসায়ী, কারিগর, নিম্নশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল দাস বা সামরিক নেতা কর্তৃক পদানত স্থানীয় অধিবাসী। দাসদের মধ্যে দুটো ভাগ ছিল-ক. রাষ্ট্রীয় কার্যে নিয়োজিত দাস যারা নগর ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করত, খ. কৃষি কাজে বা গৃহকর্মে নিয়োজিত দাস।

অ্যাসিরীয় রাজারা বহুবিবাহের সাথে সাথে অজস্র উপপত্নী বা রক্ষিতা রাখত। এই সকল রক্ষিতাদের বিভিন্ন হারেমে রাখা হত। রাজারা তাদের যৌন চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে এই সকল উপপত্নীদের সাথে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হত। যুদ্ধে বিজয়ের ফলে যে সকল নারীদেরকে পাওয়া যেত অ্যাসিরীয় রাজারা তাদের মধ্য থেকে পছন্দমত নারীদেরকে নিজেদের জন্য রাখত। অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দী নারীদেরকে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে ও মন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত কারণ সামরিক বাহিনী ছাড়া অ্যাসিরীয় রাজাদের মূল ভরসা ছিল ধর্মমন্দিরগুল। রাজা পুরোহিতদের শুধু মাত্র যুদ্ধবন্দী নারী ছাড়াও ব্যাপকভাবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করত। পুরোহিতরা নির্লজ্জভাবে ধর্মের নামে নারীদেরকে মন্দিরের সেবাদাসী করে রাখত ও তাদের সাথে যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত। যুদ্ধবন্দী নারী ছাড়াও সমাজের অনেক ব্যক্তিই দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য তাদের কন্যাদেরকে মন্দিরের সেবাদাসী হিসেবে দান করত। এরই ফলশ্রুতিতে অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের প্রতিটি ধর্ম মন্দির এক নির্লজ্জ যৌনলীলা ও ব্যভিচারে আখড়ায় পরিণত হয়। পুরোহিতদের যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক দিক দিয়ে প্রচুর সাহায্য করা হত সে কারণে পুরোহিতরা নির্ভয়ে, নির্বিচারে যৌনলীলায় ও সম্ভোগে মত্ত থাকত। অ্যাসিরীয়দের বিবাহ সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে বাগদান সম্পন্ন হতে হত। পাত্র কন্যাকে বাগদান করে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করত। পাত্রীকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের মাধ্যমে পাত্রীমূল্য পরিশোধ করা হত। কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে বা স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করলে এই অর্থ সেই স্ত্রী পেত। অ্যাসিরীয় নিয়ম অনুযায়ী বিবাহের পর স্ত্রীরা স্বামীর ঘরেও থাকতে পারত অথবা পিতৃঘরেও স্বামীকে নিয়ে থাকতে পারত। স্বামীর ঘরে থাকলে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীকেই বহন করতে হত। একজন

কারকুক অঞ্চলে (KIRKUK) অবস্থিত। মধ্য অ্যাসিরীয়দের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য সম্রাটগণ হলেন আশুর উবালিট (Assur-Uballit-1365-1330 B.C) সম্রাট পথম শালমানিসার-১ (Shalmaneser 1-1274-1245 B.C) সম্রাট টুকুলটিনিনুরতা-১ (Tukulti-Ninurta 1-1115-1208 B.C) ও সম্রাট টিগলাথপিলিসার-১ (Tiglathpileser-1-1157-1077 B.C)। এই সকল রাজারা সকলেই বহুবিবাহ ও অসংখ্য উপপত্নী রাখতেন। অবৈধ যৌন মিলন ছিল নিত্য ঘটনা। সম্রাট টিগলাথপিলিসার-১ ছিলেন মধ্য অ্যাসিরীয়দের রাজত্বকালের এক প্রচণ্ড প্রভাবশালী সম্রাট যিনি তার রাজত্বকে পূর্ব ও উত্তরদিকে Lands of Nairi পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে আর্মেনিয়ার লেকভেনে (Lake Van) উপস্থিত হন এবং চূড়ান্তভাবে ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন দখল করেন। এর ফলে অ্যাসিরীয়দের সাম্রাজ্য পূর্ব, উত্তরদিক এবং অ্যারাবিয়ান গালফ থেকে মেডিটারেনিয়ান কোস্ট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। সম্রাট টিগলাথপিলিসার অসংখ্য নারীকে বিবাহ করেন। বিভিন্ন হারেমে রাজা যৌন মিলনের জন্য অজস্র রক্ষিতা রাখতেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিধবা মহিলা পুনঃর্বিবাহ করার পরেও তার পূর্বের স্বামীর দেয়া সম্পত্তির অধিকারী হত যদি সে তার নিজ বাড়িতেই থাকত। যুদ্ধ বা অন্য কোন কারণে স্বামীকে বিদেশ যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর জন্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে যেতে হত। স্ত্রীকে পাঁচ বছর পর্যন্ত স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে হত। এই সময়ের মধ্যে স্বামী না ফিরে এলে সে পুনরায় বিবাহ করতে পারত। মেয়েদেরকে সাধারণত পর্দার অন্তরালেই থাকতে হত। মেয়েদের জন্য পর্দা প্রথা অ্যাসিরীয়রাই প্রথম প্রবর্তন করেন।

যদিও মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীদের ব্যভিচারের জন্য শাস্তি প্রদান করা হত কিন্তু অভিজাত বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ব্যভিচারের জন্য বিশেষ কোন শাস্তি প্রদান করা হত না। কারণ রাষ্ট্রও সমাজের রাজা, তার পারিষদবর্গ, অভিজাত শ্রেণী ও পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যেই বহুবিবাহ ও যৌনব্যভিচার অধিকমাত্রায় প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা এই শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে তাদের যৌনলীলা ও ব্যভিচার নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করার সাহস পেত না। এছাড়া অ্যাসিরীয়দের শাসকরা ছিল অতি মাত্রায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির। অ্যাসিরীয়দের ধনরত্ন মন্দিরে জমা রাখত। অ্যাসিরীয় আইনে মেয়েদের সমঅধিকার ছিল না। পুরুষরা ইচ্ছা করলেই স্ত্রী তথা নারীদের ত্যাগ করতে পারত। সাধারণ পুরুষদের মধ্যেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। জনসমক্ষে মেয়েরা বোরখা পরে বের হত। প্রতিটি অ্যাসিরীয় রাজাই ছিলেন অধিক মাত্রায় সুরা পানে অভ্যস্ত ও নারীসংগমে নেশাগ্রস্ত। বহুবিবাহের সাথে সাথে প্রতিটি অ্যাসিরীয় নৃপতিই অসংখ্য উপপত্নী বা রক্ষিতা প্রতিপালন করত নিজেদের যৌন চাহিদা পূরণের জন্য। নারীদের বিশেষ কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না; তারা ছিল ভোগপণ্যস্বরূপ।[২]

পারসিক ধর্ম সমাজ :—

পারস্য রাজ্য ইরাক হতে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এককালে পারস্যের সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল কিন্তু মহানবী (স) এর আবির্ভাবের দেড়শত বছর পূর্ব হতেই দ্রুতগতিতে অবনতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং পারস্যবাসীরা অগ্নি উপাসনা শুরু করে। ইরানের অগ্নি পূজকদের ধর্মীয় নেতা ছিল যরাথুষ্ট্র।[৩] তার ধর্মেও নারী জাতি সম্পর্কে লজ্জাকর

---

২. আহমদ মানসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মাদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪-৬৫।

৩. ইরানের ধর্মীয় নেতা ও ধর্ম সংস্কারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন যরাথুষ্ট্র। তিনি এক সময়ের ইরানের জাতীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাগুরু ছিলেন। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি ছিলেন আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। যরাথুষ্ট্রের জন্মের সময়কাল ও জন্মস্থান সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে যতদূর জানা যায় তিনি প্রাচীন পারস্য তথা বর্তমান ইরানের আজারবাইজান প্রদেশের অন্তর্গত Media নামক স্থানে ৬২৮ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে অথবা ৬ষ্ঠ থেকে দশম খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে তিনি মধ্যপূর্ব ইরানের খোরাসান অথবা পশ্চিম আফগানিস্তান কিংবা রাশিয়ার তুর্কিস্থান প্রজাতন্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে মতান্তরে ৫৩৮,৫৫৩, ৫৮৯, ৫৯৯ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম Pourusharspa (প্রশসাফা) এবং মাতার নাম Dughdhova (ডেগডভ) তিনি ছিলেন বাবা মায়ের তৃতীয় সন্তান।

Dhaka University Institutional Repository

বিধান দেখতে পাওয়া যায়। যরাথুষ্টি বলতেন, 'সন্তানবিহীন নারী পুলসিরাত পার হতে বা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। কাজেই বেহেশতের অভিলাসিনী নারী যেনো অন্ততপক্ষে অপর কারো সন্তান পালন করে হলেও মাতৃপদ লাভ করে।' এই ধর্মে ঋতুবতী নারীর প্রতি জুলুমের শেষ ছিল না। যরাথুষ্টের হুকুম ছিল, 'কোন পুষ্পবতী নারী যেনো সূর্য না দেখে, কোন পুরুষের সঙ্গে কথা না বলে। আগুনের দিকে দৃষ্টি না দেয়, পানিতে অবতরণ না করে, অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সঙ্গে একত্রে শয়ন না করে, খাদ্য স্পর্শ না করে, কোন পাত্র ধরতে হলে হাতে যেন কাপড় জড়িয়ে নেয়। কোন ঋতুবতী নারী এর বিপরীত করলে তার জন্য বেহেশত হারাম।

প্রসূতি ঘরের নিয়মও অনুরূপ কঠোর ছিল। প্রসবের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন প্রসূতি নারী মাটি বা কাঠের পাত্র স্পর্শ করার অনুমতিও পেত না। ঐ সময়ের মধ্যে কোন প্রসূতি ঘরের বারান্দায় পা দিতে পারত না। ঋতুকাল একটি পাপকাল বলে বিবেচিত হত, এমনকি ঐ সময়ের পাপ থেকে তওবা করার জন্য বছরে একটি মাস নির্ধারিত ছিল। নারী ছিল স্বামীর দাসীস্বরূপ, আল্লাহর ইবাদত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে স্বামীর দাসত্বে নিয়োজিত করা হত।[৪]

মানুষের নৈতিক চরিত্র তখন এত নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, তা কল্পনা করা যায় না। পিতা কন্যাকে বিয়ে করা এবং সহোদরা বোন ভাইয়ের স্ত্রী হওয়া তখনকার দিনে কোন অন্যায় কাজ ছিল না। সম্রাট দ্বিতীয় য়্যায্দেগরদ স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করে পরে তাকে হত্যা করেছিল।[৫]

পারসিক ধর্ম প্রাচীন ধর্ম। তবে এ ধর্মে বিভিন্ন রকমের যৌন উন্মাদনা থাকায় খসরু, গস্টাসপ ও কায়কোবাদের মত প্রতাপশালী রাজারাও এই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল যার ফলে তাঁদের প্রভাব ও প্রচারণায় এই ধর্ম দূরদুরান্ত পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। এই ধর্মের অন্য নাম ছিল মজুসিয়াত। সম্রাট পারভেজও মজুসী ছিল। একই সময় সে বার হাজার স্ত্রীর স্বামী ছিল। এই বার হাজার স্ত্রীদের মধ্যে একশ'রও অধিক ছিল তার মা, খালা, ফুফু, বোন ইত্যাদি নিকট আত্মীয়স্বজন। পারভেজ এই বার হাজার স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিল না। যখন তার ইচ্ছা হত বিশ পঞ্চাশ জনকে তালাক দিত অথবা হত্যা করত, আবার পছন্দমত স্ত্রী সংগ্রহ করে নিত, এমনকি সে তার বিবিদেরকে বিক্রি করতে দ্বিধাবোধ করত না। সে সময় নারী জাতি পন্যদ্রব্য হিসেবে সাধারণভাবেই বেচাকেনা হত। ধর্মের নামে দোহাই চলত, নিজেকে পবিত্রসত্তা বলে আখ্যা দেয়া হত। অথচ সতীন পুত্রের সাথে সৎ মায়ের সংগম করাও চলত। এত কোন লাজ-লজ্জার বালাই

যরাথুষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্যে সুদীর্ঘ সাত বছর নির্বাণ গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। রোমানদের মতে তিনি সুদীর্ঘ বিশ বছর তাত্ত্বিক জ্ঞানের অনুসন্ধানে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। যরাথুষ্ট ছিলেন একাধারে ধর্ম সংস্কারক এবং একজন মহান ব্যক্তিত্ব।

৪. শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের** (ঢাকা ঃ বাংলাদেশে কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ৮ই মার্চ ২০০১), পৃ ৩২-৩৩।

৫ ফারাস সা'আলিবী আল, **তারীখে গুরার প্যারিস**, ১৯২২, পৃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। এভাবে মা-বোন বা মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেয়ার ফলে মজুসী ধর্ম বহু দূর দেশেও পরিচিতি লাভ করেছিল। এই ধর্মেই সংস্কারক হিসেবে তথাকথিত দার্শনিক মযুক এসে আরো বহু বিধি-বিধানের পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি করে যার অনুসারী হয়েছিল শাহ কাবাদ-এর মত প্রতাপশালী রাজাও।[৬] মযুকের মতে ধন ও নারী সকল অন্যায়ের মূল। তাই সে ধন ও নারীকে স্বাধীন করে দিল অর্থাৎ ধন ও নারী কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয়ে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হল। মযুকের এই নীতি শাহ কাবাদের প্রচারণায় রাজ্যের সর্বত্র প্রতিপালিত হতে শুরু করল। এক ব্যক্তির ধন সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং এক ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত দেশবাসীর স্ত্রীতে পরিণত হল।[৭]

বৌদ্ধ ধর্ম

বুদ্ধদেবের অনুসারীদেরকে বৌদ্ধ বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হল নারীর সাহচর্যে নির্বাণ লাভ করা চলে না। একথা থেকেই বৌদ্ধধর্মে নারীর মর্যাদা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়।

বিয়ে ও এর আনুসঙ্গিক যাবতীয় কার্য-কলাপ বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থী। এর লক্ষ্য হল সকল বাসনা-কামনার বিলোপ সাধন। সুতরাং এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সাধনার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য নিতান্ত আবশ্যক।[৮] বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে নারী হল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েস্টারমার্ক (Westermark) বলেন ঃ

---

৬. এই বিশৃঙ্খলতার যুগে নিজের ধন বা নিজের স্ত্রীকে অপরের উপভোগ থেকে নিষেধ করার মতো সাহস ছিল না। প্রত্যেক মানুষের যে কোন নারী বা যে কারো স্ত্রীর সাথেই মেলামেশা করার অধিকার ছিল, এমনকি শাহ কাবাদ এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তার শাহী মহলের পাহারা ও বিধি-নিষেধ উঠিয়ে নিয়েছিল। শহরের জনসাধারণ নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে বেগম মহলে প্রবেশ করে শাহযাদী ও বেগমদেরকে ভোগ করে মযুকী মতবাদকে কার্যত রূপ প্রদান করতো। সকল মানুষই একে অপরের ঘরে প্রবেশ করে 'সমবায় কার্যক্রম'-এর রূপদান করতো।

নওশেরোয়াঁর পিতা শাহ কাবাদের স্ত্রী পাটরাণী বা মহারাণী বলে আখ্যায়িত হতো বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাজার হাজার পুরুষ তাকে ভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। ছেলে নওশেরোয়াঁ বড় হয়ে বাবার এই লজ্জাকর ঘৃণিত কাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলেন, তিনি তাঁর মাকে নিয়ে বলখের দিকে পলায়ন করলেন এবং সেখান থেকে এক সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে পিতা শাহ কাবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন এবং এই যুদ্ধে নওশেরোয়াঁর জয় হল।

৭. আবুল হাসান আলী নববী, **আস্‌সীরাতুন নববিয়্যা** (বৈরুত ঃ ১৯৮৩ খ্রিঃ) পৃ ২৬-২৭; ইসহাক ওবায়দী, যুগে যুগে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪-২৫।

৮. U. May OUNG : **Buddhist Law,** part- 1, p. 2.

Dhaka University Institutional Repository

Women are, of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of in fatuation which blind the mind of the world.

'মানুষের জন্য প্রলোভন ফাঁদগুল বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে- যা সমগ্র বিশ্বকে অন্ধ করে দেয়।[৯]

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বেটনী (Bettany) তাঁর World's Religions গ্রন্থে বলেন ঃ

Unfathomably deep, like a fish's course in the water, is the character of women, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and truth is like a lie.

পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নয়, নারীর চরিত্র হল তেমনি নিবিড়-যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্যসদৃশ এবং মিথ্যাসম।[১০]

গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে একজন বড় সংস্কারকের খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। তিনি শুধু সংস্কার ও মুক্তির আবেগেই রাজসিংহাসন পর্যন্ত তুচ্ছ বলে জেনে ছিলেন। তিনি যখন ধর্মীয় নেতারূপে প্রকাশিত হলেন, তখন তাঁর মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্যের এক আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর ধর্ম মতে হিন্দু ধর্মের মত ব্রাহ্মণ–শূদ্র, ধনী-দরিদ্র বা বড়-ছোটর কোন প্রভেদ ছিল না। বংশ ও জাতির কোন বালাই তিনি মানতেন না। এই ছিল তাঁর বৌদ্ধ সাম্যের শিক্ষা। অপরদিকে দয়া ও সহৃদয়তার উদাহরণ এই ছিল যে, পশু-পক্ষীর প্রতিও কোন নির্দয় ব্যবহার করা তাঁর নীতি বিরুদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ ধর্মে পশু-পাখি মারা ও খাওয়া নিষিদ্ধ।

দয়া ও সাম্যের মূর্ত প্রতীক এই বুদ্ধও নারী জাতির জন্য কিছু করে যাননি অথবা কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?' বুদ্ধ উত্তর করলেন, 'নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়াও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী।' এভাবে অন্য এক সময় তিনি বলেছেন, 'নারীদের সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা অনুরাগ রেখ না। তাদের সাথে কথাবার্তাও বলবে না, পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ঙ্কর বিপদস্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গী দ্বারা পুরুষের বিশ্বাসধন লুট করে নেয়; নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র। নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।' গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি হতে বঞ্চিত থাকবে। যে ধর্ম বলে, 'নারীর সঙ্গে বাস

---

৯. Nazhat Afza and Khurshid Ahmad : Ibid, p. 12-13.

১০. আব্দুল খালেক, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা জল্লাদের ছুরির নিচে মাথা পেতে দেয়া উত্তম,' সেই ধর্ম কখনো নারীকে শান্তি ও মর্যাদা দান করতে পারে না। গৌতমের দৃষ্টিতে নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়, তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নয়। এজন্যেই গৌতম বুদ্ধ বিয়ে প্রথার বিরোধী থেকে লোকদের সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রতের দিকে আহবান করেছিলেন।[১১]

বৌদ্ধদের জন্যে পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ছাড়া অন্যান্য বৌদ্ধরা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে শাসিত।[১২] ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার আইন ভারতীয় হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত। বাংলাদেশেও ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারীদের কি করুণ অবস্থা তা পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই। যেহেতু হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে হিন্দু নারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে কাজেই বৌদ্ধ নারীদের ক্ষেত্রেও হিন্দু নারীদের মতই করুণ অবস্থা বহাল।[১৩] হিন্দু সমাজে এলাকা এবং গোষ্ঠীভেদে যেমন বিভিন্ন প্রথা রয়েছে তেমনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এক শ্রেণীর আচার, বিচার, ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সাথে অন্য শ্রেণীর কিছু গড়মিল, রয়েছে।

---

১১. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

১২. ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৩৯ নং ধারা।

১৩. ফজলুর রহমান আশরাফী মাওলানা, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইহুদী ধর্ম

জাতিগতভাবে ইহুদীরা সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে একটি নিষ্ঠুর জাতি। নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাস ঘাতকতাই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইহুদীদের অন্তর পাথরের মত বরং তার চেয়ে কঠিন।[১] ইহুদীরা মনে করত যে, যত পাপই হোক চল্লিশ দিনের বেশি তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। সুতরাং নির্ভিকচিত্তে তারা পাপ কাজ করত।[২] ইহুদী ধর্মমতে নারীর উপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। এই ধর্মমতে নারী হতেই পাপের সূত্রপাত এবং তার কারণেই সকল ধ্বংস অনিবার্য। কারণ, নারীই সকল দুর্নীতির উৎস। ইয়াহুদী সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ছিল বলে গণ্য করা হত না এবং সে পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপেই পরিগণিত হত।

ইহুদী সমাজে নারী পুরুষ হতে অতি নিকৃষ্ট, এমনকি মর্যাদায় নারী চাকরদের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের বলে গণ্য করা হত। ভাই থাকলে বোন পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থায় কন্যাকে বিক্রয় করবার পূর্ণ অধিকার পিতার ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হত স্বামী।[৩]

স্বামীকে অপর মহিলার সাথে শায়িত দেখলে ইয়াহুদী স্ত্রী অভিযোগ না করে চুপ করে থাকত। কারণ, স্বামীর যা ইচ্ছা, তাই করার অধিকার ছিল।

সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরি ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ, নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না।[৪]

ইয়াহুদী সমাজে বিয়ে ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে এটি ছিল এক প্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব এতে খুব বেশি ছিল।[৫]

---

১. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ১৬১।

২. নাসির উদ্দীন আবু সাঈদ কাযী, আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর আল বয়যাবী, **আন্ওয়ারুত তানযীল ওয়া আস্রারুত তা'বীল** (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, ১৯৯৮), ১ম খণ্ড, পৃ ৭১।

৩. **Encyclopaedia Britannica,** vol. V, p- 732.

৪. Shaner, Donald W : **A Christian view of Divorce** (London : 1996,) p- 31.

৫. Report of the Commission, Marriage, **Divorce and the Church** (London : 1971), p- 9-80.

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান উৎপাদনই ছিল বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই সন্তান জন্মদান ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও স্বামী-বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত বা সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারত। বিবিধ প্রকারের বিয়ে তাদের সমাজে প্রচলিত ছিল এবং কয়েক প্রকার ব্যতীত সবগুলিরই বিচ্ছেদ হতে পারত।[৬]

বিয়ের পূর্বে কৌমার্য ও বিয়ের পর দাম্পত্য জীবনে সততা-সাধুতা ছিল বিয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীদের উপর সতীত্ব রক্ষার জোর তাকিদ ছিল এবং বিয়ের সময় সতীত্ব প্রমাণ করতে না পারলে মেয়েদেরকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলা হত।[৭]

বাগদত্তা বা বিবাহিতা নারী পরপুরুষ কর্তৃক বলপূর্বক ধর্ষিতা হলে ধর্ষণের সময় সাহায্য চেয়ে চিৎকার না দিলে সে জীবনের অধিকার হারিয়ে ফেলত এবং প্রস্তারাঘাতে হত্যাই ছিল তার শাস্তি। ধর্ষিতা কুমারী হলে ধর্ষণকারীর সাথে বিয়েই ছিল এর বিধান।[৮]

মাতা-পিতা কন্যাদেরকে বিয়েতে বাধ্য করত না। কিন্তু তাদেরকে বিয়ে দেওয়া বা কারও নিকট বিক্রি করে দেয়ার আইনসঙ্গত অধিকার পিতার ছিল।[৯]

ইহুদী সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এটি ছাড়াও স্বামী যত ইচ্ছা, উপপত্নী রাখতে পারত। তদুপরি অবিবাহিতা দাসী, এমনকি চুক্তিতে আবদ্ধা বিবাহিতা নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারও তার ছিল। এসব কাজ করেও সে ব্যভিচারী বলে গণ্য হত না।[১০]

স্বামীর তালাক দেয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করলে সে চিরকালের জন্য সেই স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হত। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলে নারী অপর স্বামী গ্রহণ করতে পারত।[১১]

স্বামী বহুক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করত। পিতা তার ছেলে-মেয়েদেরকে বিক্রি করতে পারত।[১২]

বনি ইসরাঈলকে সৎ পথ প্রদর্শন ও ফিরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দানের নিমিত্ত হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন এবং তাঁর উপরই তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ

---

৬. **8. Bible Deuteronomy** 22 : 21.

৭. Ibid, 22 : 23-25, 28, 29.

৮. **The Jewish Encyclopaedia,** Vol. XII. p. 556.

৯. Polpishil, Victor : **Divorce and Marriage,** London p. 38.

১০. Shanar, Donald W : Ibid p. 31.

১১. Bible-Deuternomy 24 : 1, 22 : 19 Shaner, Donald W : Ibid p. 31; Moscati, Sabatino : **Ancient Semitic Civilisation,** London 1957, p. 159.s

১২. Lods, **Adolphe : Israel,** London 1948, p. 191.

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[১৩] তাওরাতে নারীদেরকে পণ্যদ্রব্যের মত উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহুদী সমাজে পূর্ব হতেই শিশু মেয়েদের কেনা-বেচার প্রচলন বিদ্যমান ছিল। বরের কাছ থেকে কনেকে দাসীত্বের মূল্যস্বরূপ এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেয়া হত। ইয়াহুদী ধর্মে ভাইদের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃজায়াকে বিয়ে করা এক অপরিহার্য নীতি, তাতে মেয়ের মতামত নেয়ার কোন প্রশ্নই নেই। ইয়াহুদী সমাজে একাধিক বিয়ে করার এত প্রচলন ছিল যে, যার যা ইচ্ছা তাই বিয়ে করতে পারত, এতে তাদের মনগড়া কিতাবে কোন রকম বিধি-নিষেধ ছিল না।

দায় ভাগ আইনে ও নারীর প্রতি জুলুমের সীমা ছিল না, ছেলের বর্তমানে স্ত্রী কিছুই পেত না। নারীদের দান প্রতিদান বা সাক্ষ্য দেয়ার কোন অধিকারই ছিল না। নারীর শপথও নিরর্থক বলে বিবেচিত হত। ইয়াহুদীদের কিতাব 'আহাদ নামায়ে আতীক' গ্রন্থে নারী জাতি সম্পর্কে লিখিত আছে, 'নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে আরাম পরিবেশন করা। নারী পাপের প্রস্রবন। পূণ্যের কাজ করার কোন যোগ্যতা নারীর মধ্যে নেই বলে সে মান-সম্মানের যোগ্যা হতে পারে না।'[১৪]

দুনিয়ার যে সব ধর্ম শুধুমাত্র কিছু আকীদা এবং তত্ত্ব পেশ করেনি বরং পেশকৃত আকীদা ও তত্ত্বের ভিত্তিতে জীবনের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কেও আলোচনা করেছে ইহুদী ধর্ম তার একটি। ইহুদী ধর্ম অনুযায়ী পুরুষ সৎ স্বভাব বিশিষ্ট ও সৎ কর্মশীল এবং নারী বদ স্বভাব বিশিষ্ট ও ভন্ড। মানব জাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে মহাসুখের জীবন কাটাচ্ছিলেন কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা কিন্তু তার স্ত্রী হাওয়া তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করল এবং তাকে এমন একটি ফল খাওয়াল যা খেতে আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। এ কারণে তিনি আল্লাহর সব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তাঁর ভাগ্যলিপিতে দুঃখ-কষ্টের জীবন লিপিবদ্ধ হল। [১৫]

বাইবেল পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "যে বৃক্ষের ফল ভোজন করতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? তাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল তাই খাইয়াছি"।[১৬]

---

১৩. বর্তমানে যে তাওরাতের অস্তিত্ব দেখা যায় সঠিক মতে তা প্রকৃত তাওরাত নয়। তৎকালীন ভণ্ড ইয়াহুদী রাজাদের কল্যাণে প্রকৃত তাওরাত ভস্মীভূত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। তখন তাওরাত রাখা বা পাঠ করা অন্যায় বলে গণ্য হত। এর তিন শত বছর পর মানুষের মুখে শুনে শুনে (যার কোন মজবুত ভিত্তি ছিল না) বর্তমান তাওরাত সংকলন করা হয়েছে, তাই এ তাওরাত সত্য-মিথ্যার এক সমাবেশে পরিণত হয়।

১৪. আবুল কালাম আজাদ মাওলানা, **মুসলমান আওরাত, ভারত**, ইংলেন্ডের আর্য বিশপদের রিপোর্ট, লন্ডন ঃ ১৯৪৬ ইং থেকে উদ্ধৃত; ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

১৫. জালাল উদ্দীন আনসার 'উমরী মাওলানা, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১-৩৩।

১৬. **বাইবেল আদি পুস্তক**, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক– ১১।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর আল্লাহ তায়ালা হাওয়াকে বললেন, "আমি তোমার গর্ভ বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে, স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে এবং সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে।[১৭] অর্থাৎ ইহুদীদের মতে হাওয়া আদম (আঃ) কে পথভ্রষ্ঠ করে যে অপরাধ করেছিল, আল্লাহর তরফ থেকে তার সে অপরাধের শাস্তি হল সন্তান প্রবসকালীন কষ্ট এবং তার উপর পুরুষের স্থায়ী কর্তৃত্ব। পুরুষ কেয়ামত পর্যন্ত নারীর উপর কর্তৃত্ব চালাতে থাকবে। এ দর্শনের ফলশ্রুতিতে ইহুদী শরীয়তে পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব অত্যন্ত বেশী।

ইহুদীরা নানা ধরনের মনগড়া কথায় বিশ্বাস করত। যার কোন তত্বগত বিশ্বাস যোগ্যতা ছিল না।[১৮] মনগড়া তাওরাতের হুকুম ছিল, 'দুইজন পুরুষের মধ্যে ঝগড়া বা লড়াই আরম্ভ হলে কোন নারী যদি তার স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসে তবে তা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এ অপরাধে ঐ নারীর উভয় হাত কেটে দেয়া হবে। এতে তার প্রতি কোন রকম দয়া প্রদর্শন করা যাবে না।' স্বামীর প্রতি নারীর মমত্ববোধ, হৃদ্যতা ও ভক্তির পুরস্কার হিসেবে এর চেয়ে বেশী আর কি দেয়া যেতে পারে? একটি কুকুরের প্রভুভক্তির প্রশংসা পাওয়া অন্যায় নয়, কিন্তু একটি নারী যদি তার স্বামীকে বিপদ হতে উদ্ধার করার জন্য হাত বাড়ায় তবে তার এই মহব্বতের পুরস্কার হল হাতকাটা।[১৯]

ইহুদীদের তালাকের ব্যাপারেও এ ধরনের হৃদয়হীনতার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীর ছোট ছোট দোষ-ত্রুটিতো দূরের কথা দোষ-ত্রুটি না পেয়েও পাপহীন নারীকে তালাক দেয়ার অধিকার পুরুষদের ছিল। আরো বিপদ এই যে, ইয়াহুদী সমাজে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর কেউ বিয়ে করতে পারবে না।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর দিকে আর কেউ ফিরেও তাকাবে না। তাই প্রত্যেক ইয়াহুদী পুরুষ তার ইবাদতের সময় এই বলে দোয়া করে, হে আল্লাহ তুমি যে আমাকে নারী করে সৃষ্টি কর নি এ জন্য তোমার শুকরিয়া ও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইয়াহুদী জাতি অবশ্য খ্রিস্টান সমাজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার কারণে এবং যুগের পরিবর্তনের কারণে ও নারী সমাজকে সেই অবহেলা করতে আর পারে না। তাই, তাদের ধর্মীয় কিতাব তাওরাতকেও তাদের মন মত করে গড়ে নিয়েছে।[২০]

---

১৭. **বাইবেল আদি পুস্তক,** তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক- ১৬।

১৮. ইয়াহুদীদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, একমাত্র হাওয়া (আ) -এর ফুসলানিতেই হযরত আদম (আ) গন্দম আস্বাদন করেছিলেন এবং সেই হাওয়ারই কারণে হযরত আদম (আ) বেহেশত হতে দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়ে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে জীবনকে বিপদাপন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ ইয়াহুদীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, নারী জাতি প্রথম থেকেই অন্যায় ও পাপের উস্কানীদাত্রী হয়ে আছে। অতএব সে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য। শুধু এই একটি মাত্র কারণ থেকেই ইয়াহুদীরা নারী জাতির অধিকারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে।

১৯. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

২০. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টধর্ম

খ্রীস্টধর্মে ধর্মের নামে নারী জাতির উপর অতীব নিষ্ঠুর ও নিদারুণ নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। পোপ শাসিত! 'পবিত্র' রোম-সাম্রাজ্যে তাদের দেহে গরম তেল ঢেলে দেয়া হয়েছে; দ্রুতগামী ঘোড়ার লেজের সাথে তাদেরকে বেঁধে হেঁচড়ানো হয়েছে এবং মজবুত স্তম্ভে বেঁধে তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছে। এতেও নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটে নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ-এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : Women has no soul-নারীর কোন আত্মা নেই। এর ব্যতিক্রম হল কেবল হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর মাতা হযরত মরিয়ম আলাইহিস্ সালাম।

ড. এসপ্রিঙ্গ[২১] (Dr. Aspring) তাঁর গ্রন্থে মধ্যযুগে নারীজাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। এটা নারীদের উপর নিষ্ঠুরতার ও নির্যাতন চালাবার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। এই আইনের বলে খ্রিস্টানগণ নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করে হত্যা করে। খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত।

নারীজাতিকে অতীব হীন ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্মের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। উভয় ধর্মই নারীকে পাপের আদি কারণরূপে আখ্যায়িত করেছে। বাইবেলে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে, নারীর পাপের কারণেই পুরুষকে তাঁর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার প্রদত্ত হয়েছে।[২২]

নারী ও যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে খ্রিস্টিয় ধর্ম যাজকদের[২৩] প্রাথমিক ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, নারীই পাপের মূল উৎস। পুরুষের জন্য নারী পাপ আগমনের উৎস এবং নরকের দ্বার স্বরূপ। মানবের যাবতীয় দুঃখ দূর্দশা নারী থেকেই শুরু। নারীরূপে জন্মলাভ করা এক লজ্জাকর ব্যাপার। নারীর রূপ সৌন্দর্যের জন্য তার লজ্জাবোধ করা উচিত। কারণ এই রূপই শয়তানের মারণ যন্ত্র। যেহেতু সে জগত ও জগত বাসীর জন্য অভিশাপ এনেছে সেজন্য তাকে চিরদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে হলেও তা মূলত একটি

---

২১. ড. এসপ্রিঙ্গ জার্মানের অধিবাসী। তিনি আরবী ভাষায় একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালও ছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য থাকাকালে 'ইসাবা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

২২. **Bible : Genesis** 3; 16, New York 1973.

২৩. Tertullian নামক খ্রিস্টিয় সম্প্রদায়ের প্রাথমিক যুগের ধর্মগুরু নারী সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে– নারী শয়তানের আগমনের দ্বার স্বরূপ, সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে আকর্ষণকারিণী। খোদার আইন ভঙ্গকারিণী এবং পুরুষের ধ্বংসকারিণী। খ্রিস্টিয় তাপসশ্রেষ্ঠ (Chrysostum) নারী সম্বন্ধে বলেন যে, নারী একটি অনিবার্য পাপ, একটি জন্মগত দুষ্ট প্ররোচনা। একটি আনন্দদায়ক বিপদ, পারিবারিক আশঙ্কা ধ্বংসাত্মক প্রেমদায়িনী, একটি সজ্জিত বিঘ্ন। (আবুল আ'লা মওদুদী, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৯)।

Dhaka University Institutional Repository

অপবিত্র কাজ। এ থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এ রকম বৈরাগ্য সুলভ মনোভাব শুধুমাত্র নৈতিক ও সামাজিক দিক হতে নারীর মর্যাদাকে অতিমাত্রায় হেয় করে নাই বরং কৃষ্টিগত আইন কানুনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। খ্রিস্টিধর্মীয় বিধি বিধান অনুযায়ী যত প্রকার আইন পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত হয়েছে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপঃ

জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে নারীকে সম্পূর্ণ অসহায় করে পুরুষের অধীন করে রাখা হয়েছে। এমনকি স্বোপার্জিত অর্থের উপরও তার কর্তৃত্ব ছিল না। সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল স্বামীর। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর পুনরায় বিয়ে করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও পাপজনক কাজ ছিল। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারেও নারীর অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং বিষয় সম্পত্তির উপর অধিকার অধিকতর সীমাবদ্ধ ছিল। সকল কিছুর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল স্বামীর।[২৪]

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মমতে নারী গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী প্রকাশ্যে নারীজাতির উপর দোষারোপ করেছেন এবং নারীকে দরকারী আপদ (Necessary evil) বলে অভিহিত করেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেন ঃ নারী বলেই তার লজ্জায় অভিভূত হয়ে থাকা উচিত।[২৫]

এরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রিস্টান জগত নারী জাতির হীনতা ও অমর্যাদা প্রচার করে এসেছে।

খ্রিস্টান ধর্মে বিয়ে ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধন-যা আমৃত্যু বলবৎ থাকবে।[২৬] কিন্তু খ্রিস্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও সেন্ট পল বিয়েকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করেন না। আর একে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের অসম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেন না।[২৭] বরং তিনি Necessary evil (জরুরি পাপ) হিসেবেই বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন ঃ

It is well for a man not to touch a women. It is well for a person to remain as he is. Do not seek marriage. But if you marry, you do not sin and if a girl marries she does not sin. Yet those who marry will have wordly troubles. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the affairs of the Lord, how to please the Lord; but the married man is anxious about wordly affairs, how to please his

২৪. আবুল 'আলা মওদুদী সাইয়্যেদ, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৮-১৯।

২৫. Libra : **Womanhood and the Bible,** New York p. 18; Cleugh, James : **Love locked out,** London 1963, p 264-265.

২৬. Nazhat Afza and Khurshid Ahmad : Ibid p. 4.

২৭. Pospishil, Victor : Ibid, p. 49.

Dhaka University Institutional Repository

wife. I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord.[২৮]

কোন নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভাল। সে যেমন আছে, তদ্রূপ থাকাই তার জন্য উত্তম। বিয়ে করতে চেয়ো না। কিন্তু তুমি বিয়ে করলে তোমার পাপ হয় না এবং কোন বালিকা বিয়ে করলে সেও পাপ করে না। তবে যারা করে তারা পার্থিব দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। সাংসারিক উদ্বেগ থেকে মুক্ত থাক, এটাই আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাছে উদ্বিগ্ন, কি করে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কিভাবে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে। আমি তোমার নিজ কল্যাণের জন্যই এ উপদেশ দিতেছি, তোমার উপর কোন বাধা আরোপের জন্য নয়; বরং শৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রভুর প্রতি তোমার অবিভক্ত অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই আমি এটি বলছি।

যে ব্যক্তি তার কন্যাকে বিয়ে দেয় না; সে উত্তম কাজ করে।[২৯]

তালাক ও পুনর্বিবাহ

খ্রিস্টান ধর্মের বিধান অনুসারে তালাকের ও খোলার অনুমতিই নেই।

...that the wife should not separate from her husband and that the husband should not divorce his wife.[৩০]

...স্ত্রী তার স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হবে না; আর স্বামীও তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না।

মার্ক (Mark) বলেন, যিশু তালাকের প্রতি ঘৃণা এভাবে প্রকাশ করেন :

Who ever divorces his wife and marries another, commits adultery against her; and if she divorces her husband and marries another, she coummits adultery.[৩১]

যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রী গ্রহণ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। আর যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে বর্জন করে অপর স্বামী গ্রহণ করে, সেও ব্যভিচার করে। কিন্তু মতান্তরে খ্রিস্টান ধর্মে তালাক ও পুনর্বিবাহ অবৈধ নয়।[৩২]

---

২৮. Klansner, Joseph : From **Jesus to Paul,** London 1964, p. 571-572.
Bible-1, Corinthians, 7 : 1, 26, 28, 29, 32, 35.

২৯. **Bible,** Crinthians, VII-38.

৩০. **Bible,** Ibid, 7 : 10-11.

৩১. **Bible**, Mark 10 : 12.

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টান ধর্মমতে নারী পাপের উৎস, এই ধারণাই তার মর্যাদার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। নারীর জীবনের পরম অবদান হল পরিবারের প্রতি দরদ ও সতর্ক দৃষ্টি এবং সহজে স্বামীর প্রতি বশ্যতা স্বীকার। স্বামীর একান্ত অধীন হয়ে থাকা ও নিজকে স্বামী হতে হীন বলে মেনে নেয়াই ছিল তার পরম সাফল্য।

> The head of every man is Christ, the head of a women is her husband.[৩৩]

প্রত্যেক পুরুষের অধিকর্তা হলেন যিশু; নারীর অধিকর্তা স্বামী।নারী সমাজের বহির্ভূত ছিল এবং তাকে একান্তভাবেই স্বামীর অনুগত হয়ে থাকতে হত।

Let a women learn in silence with all submissiveness. I permit no woman to teach or to have authority over men;' she is to keep silent. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a trangrssor.[৩৪]

পূর্ণ আনুগত্যের সাথে নীরবে নারী শিক্ষা লাভ করবে। পুরুষকে শিক্ষা দান অথবা তার উপর কর্তৃত্ব করার অনুমতি আমি কোন নারীকেই দেইনি; সে নির্বাক থাকবে। কারণ, সর্বপ্রথমে আদম সৃষ্ট হয়েছিলেন, তারপর আদম প্রতারিত হননি। বরং হাওয়াই প্রতারিত হয়েছিলেন ও নির্দেশ ভঙ্গ করেছিলেন। নির্জনে থেকে নারী সুতা কাটবে, বস্ত্র বয়ন করবে। কিন্তু অপরিহার্য কারণে তাদেরকে বের হতে হলে তারা অবশ্যই পর্দা পরিধান করবে।

Let her wear a veil. For a man ought not cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. That is why a woman ought to have a veil.[৩৫]

নারী পর্দা পরিধান করবে। যেহেতু পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও গৌরব। এজন্য তার মস্তক আবৃত করা উচিত নয়। কিন্তু পুরুষ নারীর গৌরব। কারণ, পুরুষ নারী হতে সৃষ্ট হয় নি; বরং নারী পুরুষ হতে সৃষ্ট হয়েছে। আর পুরুষ নারীর জন্য সৃষ্ট হয় নি; কিন্তু নারী পুরুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এজন্যই নারীকে পর্দা পরিধান করতে হবে।

---

৩২. Pospishil, Victor : Ibid, p. 38; **Bible-1** Corinthiaus 7 : 39-40.

৩৩. **Bible-1** : Corinthiaus, 11 : 3.

৩৪. **Bible** : Timothy, 2 : 11-14.

৩৫. **Bible-1** : Corinthiaus, 11 : 6-9.

Dhaka University Institutional Repository

'সেন্ট পলের শিক্ষা নারীদেরকে ধর্মানুষ্ঠান হতে বহির্গত করেছে এবং এজন্যই গীর্জায় গমন তাদের উচিত নয়। সেন্ট পল নারীদেরকে কলরবকারী ও মূর্খ বলে ধারণা করতেন। এজন্যই তিনি তাদেরকে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম বিষয়ে অভিমত প্রদানের অনুমতি প্রদান করেননি।

The woman should keep silence in the Churches. For they are not permitted to speak; should be subordinates as even the law says, If there is anything they desire to know, let them ask their husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in Church.[৩৬]

নারীরা গির্জায় নীরব থাকবে। কারণ, তাদেরকে কথা বলার অনুমতি প্রদান করা হয়নি; তারা অধীন হয়ে থাকবে। এটাই আইনের নির্দেশ। তারা কোন কিছু জানতে চাইলে বাড়িতে তাদের স্বামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে। কারণ, গির্জায় কথা বলা নারীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রিস্টানদের এক ধর্মীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাব্যস্ত হয়, নারীর আত্মা নেই (Woman has no soul) এবং দোযখ হল তার বাসস্থান। এর ব্যাতিক্রম হল কেবল হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মরিয়ম (আ)।

'নারী মানুষ কি না' এ বিষয়ে আলোচনার জন্য পরবর্তী শতাব্দীতে তাদের অপর একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয়, নারী মানুষ বটে, তবে পুরুষের কল্যাণ ও দাসত্বের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে পুরুষ নারীকে দাসীর ন্যায় রাখত এবং স্বামীকে প্রভু বা ঈশ্বর বলে সম্বোধন করতে হত।

অতএব, মনু নারী সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন, খ্রিস্টধর্মেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না; বরং উভয় জাতি একই ধারণা পোষণ করে।[৩৭]

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সভ্যতার দাবিদার খ্রিস্ট ধর্মেও নারীকে পাপের প্রতীক বলে বিশ্বাস করে।[৩৮]

---

৩৬. **Bible-1** : Corinthiaus, 14: 34-35.

৩৭. আব্দুল খালেক, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪-১৫।

৩৮. খ্রিস্টসম্প্রদায় মনে করে মা হযরত হাওয়া (আ) –এর ভুলের কারণে নারী রক্তে পাপ স্থায়ীভাবে স্থান নিয়েছে। মানব শরীরে মাতৃরক্তের অংশ থাকে বলে সন্তানও পাপী হয়েই জন্মগ্রহণ করে। এই পাপ সৃষ্টি বহুদিন থেকে চলে আসছিল, তাই পৃথিবীতে এমন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তির আগমনের প্রয়োজন ছিল যিনি নিজ রক্ত দানে মানব আঁচলের পাপ ধুয়ে মুছে দিতে পারেন। হযরত ঈসা (আ)-ই ঐ মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তিনি শূল বরণ করে আত্মকুরবানী দ্বারা মানুষের এই পাপ কলংক মিটিয়েছিলেন। মা হাওয়া (আঃ)-কৃত পাপের কলংক ঘুচাবার এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। (নাউযুবিল্লাহ) (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫)।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টানরা দুটি কারণে নারী জাতির প্রতি ক্রোধান্বিত। তারা নারীদের কোন রকম শ্রদ্ধা, দয়া ও ভালবাসার অধিকারিণী বলে স্বীকার করে না। প্রথম কারণ হযরত হাওয়া আলাইহিস্ সালাম নিষিদ্ধ ফল আবার আদম আলাইহিস্ সালামকেও খাওয়াল, তাঁরই কারণে পুরুষকেও বেহেশত হতে বঞ্চিত হতে হল। দ্বিতীয় কারণ, নারী পাপের প্রায়শ্চিত্যের জন্যই হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর মত একজন শুদ্ধ মানুষের শূল বরণ করতে হল। তাদের ভাষায় পাপ ও ঈসা আলাইহিস্ সালাম হত্যা উভয়েরই মূল কারণ নারী, কাজেই সেই-ই দোষী। এই মনগড়া কথা ও ধারণার কারণেই আবহমানকাল থেকে নারীকে হীন জীব বলে মনে করে আসছে তারা। এ কারণেই নারীদেরকে লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করা তো দূরের কথা, জুলুম অত্যাচার আরো বাড়ানো হয়েছে। তাদের বানান ইঞ্জিল পাঠ করলে জানা যায়, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম নাকি নিজের পূতঃপবিত্রা মা মরিয়মকেও ধিক্কার দিয়েছিলেন।[৩৯] (নাউযুবিল্লাহ) ঈসায়ী জগতের এক প্রধান ধর্ম যাযক 'ইউহান্না' বলেন, 'নারী ছলনার কন্যা, তা থেকে দূরে থাক।'[৪০]

ঈসায়ী ধর্মে তালাকের ব্যবস্থা না থাকায় সম্পর্ক খারাপ হলে স্বামী স্ত্রীর 'বদকারী' করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকত না। নারীর কোন অধিকার নেই, কুমারী মেয়ের নিজস্ব সম্পত্তিও বিয়ের পর স্বামীর বলে গণ্য হত, এমনকি স্ত্রীর নিজ নামটি পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে মিসেস হেনরী, মিসেস ক্লার্ক ইত্যাদি হয়ে স্বামীর নামেই পরিচিত হতে হয়। বেচাকেনার ব্যাপারেও নারীদেরকে কোন স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হত না। এই জাতীয় দায়িত্ব স্বামীর ওপরই ন্যস্ত থাকত।

চার্চের আইনে স্ত্রী জাতি নাপাক পদার্থ বলে বিবেচিত হত। এ জন্যই নারীরা চার্চের 'কুরবান গাহ' স্পর্শ করতে পারত না, যদি তাও নাপাক হয়ে বসে।

---

৩৯. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

৪০ খ্রিস্ট জগতে সেন্ট বার্নার্ড, সেন্ট সিপ্লিল, সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট জিরাম প্রভৃতি মধ্যযুগীয় মনীষীদের এক বিশেষ স্থান আছে। তাঁদের বাণী ঈসায়ীরা বিশেষভাবে পালন করে থাকে।

এই মনীষীরা নারী চরিত্রের যে লজ্জাকর ছবি এঁকেছেন, তা নিতান্তই দুঃখজনক। তাঁরা একই মর্মে লিখেছেন, 'নারী শয়তানের শক্তি, অজগর সাপের মত রক্তপিপাসু, তার মধ্যে সাপের বিষ নিহিত আছে, সমস্ত নৈতিক ত্রুটির মূল উৎস, শয়তানের বাদ্যযন্ত্র, দংশনোন্মুখ বিচ্ছু এবং প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মনের ওপর শয়তানের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নারী শয়তানের সাহায্যকারিণী।' উক্ত ধর্ম যাযকরা অন্যত্র লিখেছেন, 'তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা প্রবৃত্তি সব সময়ই পুরুষদের অধীনে থাকবে এবং পুরুষরাই তোমাদের প্রভুত্ব করবে।'

গ্রেট পোল খ্রিস্টানদের একজন পুণ্যবান নেতা বলে খ্যাত হন। তিনি বলেছেন, 'পুরুষ নারীর জন্য সৃষ্টি হয়নি, বরং নারীই পুরুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।' হিন্দু ধর্মের মত ঈসায়ী ধর্মেও তালাক প্রথা অনুমোদিত নয়। একবার বিয়ে হলে শত অসুবিধা থাকলেও এই বন্ধন ছাড়ানো যাবে না। না পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে, না স্ত্রী স্বামী থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৬-২৭)।

Dhaka University Institutional Repository

হাজার হাজার নির্দোষ পরীসম সুন্দরী নারীকে শুধু নারী হওয়ার অপরাধে এবং কন্যা প্রসবের অভিযোগে জীবিত অবস্থায় আগুনে জ্বালানো ও ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। যদি কালে ভদ্রে দুই একজন বেঁচে গেছে, তা হলে তাদের জীবন মৃত্যুর চেয়ে অধিক দুঃখের হত।

অবশেষে মার্টিন লুথার[৪১] নামের এক সংস্কারক খ্রিস্ট সমাজে শান্তির দূত হিসেবে পৃথিবীতে এলেন। তিনি নারীদের প্রতি এই জুলুম-অত্যাচার ও অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ঈসায়ী দুনিয়ার এক মহাপরিবর্তন আনয়ন করলেন। মার্টিন লুথারের প্রচারের ফলে জনসাধারণ বুঝতে পারল যে, এতোদিন ধর্মের নামে যা শোনানো হয়েছিল তা কোন ধর্মের বিধান ছিল না, বরং তা ছিল পাদ্রীদের মনগড়া বিধান। আমাদেরও বিশ্বাস, এক খোদায়ী ধর্মে কখনো মানুষেরই একাংশ স্ত্রী জাতির বিরুদ্ধে এত বিষ উদগিরণ করতে পারে না। ঈসা (আ)-এর মত দয়ার আধার নবী এ ধরনের শিক্ষা দিতে পারেন না।[৪২]

মূল বা আসল ইঞ্জিল কিতাব তো আর নেই। বর্তমান ইঞ্জিল পরিবর্তিত ও সংশোধিত ইঞ্জিলের সংস্করণ। ইংলিশ চার্চগুলো সব সময় সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এরা সব সময় উন্নতিকামী সম্প্রদায়সমূহকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে।[৪৩]

---

৪১. বর্তমান খ্রিস্টীয় সভ্যতার উৎপত্তি ৮ম শতাব্দীতে স্পেনীয় মুসলমানদের কল্যাণেই হয়েছে। তখন খ্রিস্টান দুনিয়ার চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে বসেছিল। ইউরোপ ও ঈসায়ী দুনিয়ায় সংস্কারের প্রেরণা সৃষ্টি বা মার্টিন লুথারের মত সংস্কারকের আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নারী জাতির তেমন উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয় নি। কারণ পুরনো কিংবদন্তিগুল মানুষের শিরায় শিরায় অনুপ্রবেশ করেছিল এবং তাদের চোখের ওপর গোঁড়ামির মজবুত পট্টি বাঁধা ছিল।

৪২. ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৮-২৯।

৪৩. খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে আলেকজান্ডার রাসেল লিখেছেন, 'পশ্চিমা খ্রিস্টীয় সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে মানব মনের ওপর কোন দাগ কাটতে পারেনি। কারণ তা স্বার্থপরতা ও ভোগাসক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। (ইসহাক ওবায়দী, **যুগে যুগে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৮)।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আরব সভ্যতা

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব[১] দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ঐতিহাসিকগণ ঐ সময়কে 'আল-আয়্যামুল জাহিলিয়্যাহ'[২] বা অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। 'জাহিল অর্থ আল্লাহ, নবী এবং শরীআত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও জাহিলিয়্যা কে 'অজ্ঞানতা ধর্মহীনতার যুগ হিসেবে কুর'আনের ভাষ্যকারগণ আখ্যায়িত করেছেন। কুর'আন মজিদে 'জাহিলিয়্যা' শব্দটি চারবার উল্লিখিত হয়েছে।[৩] এই

---

১. এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম কোণে অবস্থিত বিস্তৃর্ণ মরুময় ভূখণ্ড নিয়ে যে দেশগুলি গঠিত তাকে জাজিরাতুল আরব বা 'আরবের দ্বীপ' বলা হয়। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপটি অসম চতুর্ভুজাকৃতির। উত্তর-পশ্চিম হতে দক্ষিণ-পূর্ব এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২০০ কিঃ মিঃ। উমানের স্ফীতাংশের ফলে চতুর্ভুজটির সাম্য নষ্ট হয়েছে। এর স্ফীতাংশটি পূর্বদিকে ইরানী উপকূলের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত। উপদ্বীপটির পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব সীমায় রয়েছে লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর, আরব সাগর, উমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগর। উত্তরে কোথায় আরব শেষ হয়েছে আর সিরিয়া (ব্যাপক অর্থ) শুরু হয়েছে আরবরা নিজেরাই ক্রমশ এই বিষয়ে একমত নয়। বিপুল এক তৃণভূমি নাফুদের বিশাল মরুভূমি হতে শুরু হয়ে উত্তরে বিস্তৃত হয়েছে। উপদ্বীপটির উত্তরসীমা সউদী আরব ও কুয়েতের সাথে জর্ডান ও ইরাকের সীমা পর্যন্ত বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। এই ধারণা অনুসারে উপদ্বীপটির সর্বোত্তরস্থ স্থান উনাযা, এটি জেরুযালেম ও আম্মানের উত্তরে অবস্থিত। মরুভূমিস্থ নিম্ন মালভূমি উনাযা হতে সউদী আরব ও জর্ডানের সীমানা আকাব উপসাগরের কোনায় সাগর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এককভাবে কোন আরবি গ্রন্থেই আরবের সঠিক ও পরিপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে আরবি ভাষায় আল-হামদানী (মৃ. ৩৩৪/৯৪৫-৪৬) প্রণীত 'সিফাত জাজিয়াতুল আরাব' গ্রন্থটি তথ্যসমৃদ্ধ। (**ইসলামী বিশ্বকোষ,** ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, একাদশ খণ্ড, ১৯৯২ খ্রিঃ, পৃ ৩৭৬)।

২. ইসলামের পূর্ববর্তী যুগকে যমানায়ে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগ বলা হয়। আরবদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ম ছিল। তাহারা পুরাতন ইতিহাস মুখস্থ করে রাখত। বড় বড় কবিদের কবিতাও একে অপরের নিকট হতে মুখস্থ করে বর্ণনা করত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম 'হিবা' রাজ্যের রাজ পুস্তকাগার হতে কতকগুলি পুস্তক হস্তগত হওয়ার কথা কিতাবুত্ তিজাম নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৩. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মজিদে বলেন,

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ ـ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ـ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْئٍ ـ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ ـ يُخْفُوْنَ فِىْ أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُوْنَ لَكَ ـ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْئٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ـ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ـ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ-

অর্থাৎ– এই চিন্তা ও দুঃখের পর পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য হইতে কিছু লোকের উপর এরূপ সান্ত্বনার অবস্থা বিস্তার করিয়া দিলেন যে, তাহারা তন্দ্রাবিষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু অপর একটি দল যাহার নিকট সমস্ত গুরুত্ব ছিল একমাত্র স্বার্থের, আল্লাহ সম্পর্কে নানা জাহেলী মনোভাব পোষণ করতে লাগিল,

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আরবরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজ খেয়ালখুশী মত চলত। তাদের নৈতিক চরিত্র অবনতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তারা পরস্ত্রী সম্ভোগ করতো আর তা নিয়ে অলঙ্কারিক ভাষায় কবিতা লিখত[৪] এই শালীনতা বিবর্জিত কবিতা কাবাগৃহের সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা

যাহা ছিল সত্যের সুস্পষ্ট খেলাফ। ইহারা এখন বলে যে, "এই কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও কি কোন অংশ আছে? তাহাদিগকে বল, (কাহারো কোন অংশ নাই,) এই কাজের সমস্ত ইখতিয়ারই খোদার হাতে রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা যে কথা নিজেদের মনে গোপন করিয়া রাখিয়াছে তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছেনা। ইহাদের আসল বক্তব্য এই যে, "যদি কর্তৃত্বের ইখতিয়ারে আমাদেরও কোন অংশ হইত তবে এখানে আমরা নিহত হইতাম না।" তাহাদিগকে বলঃ তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও অবস্থান করিতে তবে যাহাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকে বাহির হইয়া আসিত। আর এই যে ব্যাপার ঘটিল ইহা এই জন্য ঘটিয়াছিল যে, তোমাদের বুকের মধ্যে যাহা কিছু লুকাইয়া রহিয়াছে আল্লাহ তাহা পরীক্ষা করিবেন এবং তোমাদের মনে যে কুটিলতা লুকাইয়া রহিয়াছে আল্লাহ তাহার পরীক্ষা করিবেন এবং তোমাদের মনে যে কুটিলতা রহিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবেন। আল্লাহ মনের অবস্থা খুব ভাল করিয়া জানেন! (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৫৪);

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ - وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

অর্থাৎ– (তাহারা যদি খোদার আইন হইতে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয়) তবে কি তাহারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার কামনা করে? অথচ যাহারা খোদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাহাদের নিকট খোদার অপেক্ষা উত্তম ফয়সালকারী কেউই নাই। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল মায়েদা, আয়াত ঃ ৫০);

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَأٰتِيْـنَ الزَّكٰـوةَ وَأَطِعْـنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ - إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

অর্থাৎ– নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজগোজ দেখাইয়া বেড়াইও না। নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ ইহাই চাহেন যে, তোমাদের নবীর ঘরের লোকদের হইতে অপরিচ্ছন্নতা দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করিয়া দিবেন। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল আহযাব, আয়াত ঃ ৩৩);

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجٰهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَـكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَـى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى - وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا - وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا -

অর্থাৎ– (এই কারণেই) এই কাফেররা যখন নিজেদের মনে বর্বরতামূলক আত্মগর্ব ও বিদ্বেষ বসাইয়া লইল তখন আল্লাহ তাঁহার রসূল ও মু'মিনদের প্রতি পরম প্রশান্তি নাযিল করিলেন; এবং মু'মিনদিগকে তাকওয়ার নীতির অনুসারী করিয়া রাখিলেন এবং তাহারাই উহার অধিক উপযুক্ত ও অধিকার সম্পন্ন ছিল। আল্লাহতো সর্ব বিষয়ে জ্ঞানবান। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল ফাত্হ, আয়াত ঃ ২৬); অজ্ঞানতা ব্যতীত জাহেল শব্দের আরো কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন– বর্বরতা, দয়াহীনতা, কঠোরতা, রূঢ়তা, অশিষ্টতা, আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস, মূর্তিপূজা প্রভৃতি।

৪. তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি ছিলেন ইমরুল কায়েস। **'মুয়াল্লাকা'** তার রচিত অন্যতম কাব্যগ্রন্থ। ইমরুল কায়েস আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং কিন্দা রাজ্যের যুবরাজ ছিল। সে তার ফুফাত বোন উনায়যার সাথে এবং অন্যান্য আরও মহিলাদের সাথে যে সমস্ত অপকর্ম করত তা নিজের রচিত "কাসীদায়ে লামিয়া" নামক কবিতায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। আরবের খ্যাতনামা কবিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই কবিতাটি প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। সম্মানার্থে এই কবিতাটি পবিত্র কাবার প্রাচীরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের মুখেই এই কবিতাটি শুনতে পাওয়া যেত।

Dhaka University Institutional Repository

হত। পবিত্র কুরআনে তাদের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক ফুটে উঠেছে। কুরআনে রয়েছে 'তারা কথায় কথায় মিথ্যা শপথ করে, তারা লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, একের কথা অপরের নিকট লাগায়, কল্যাণকর কাজে বাধা দেয়, সীমা লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি জারজ।'[৫]

ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন আরবের অধিবাসীদেরকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

এক. আরাবুল বায়িদা। এরা প্রাচীনতম আরব বনু কাহ্তানের বহু পূর্বেই এদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

দুই. আল আরাবুল 'আরিবা। এরা বহু কাহ্তান নামক পরিচিত। ইয়েমেন ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে দীর্ঘকাল যাবত এদের আধিপত্য ছিল। প্রাচীন আরবের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিবাসীদেরকে আরিবাহ বলা হয়। আরিবহ আরবরা ছিলেন দক্ষিণ আরবের অধিবাসী। তারা ছিলেন অরুব বিন কাহতানের বংশধর। তাদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ইয়েমেন।

তিন. আল আরাবুল মুস্তারিবা। এরা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম এর বংশধর। এজন্যই এরা বনু ইসমাঈল নামে পরিচিত। এদেরকে বনু আদনানও বলা হয়। এরা হিজায এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে অবস্থান করত।[৬] তৃতীয় শ্রেণীর অধিবাসীগণ মুস্তারিব নামে পরিচিত আরবরা ছিলেন হযরত ইসমাইল (আ)-এর বংশধর।[৭]

উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী আদ, সামুদ, তসম, জাদীন, আমালিক ইত্যাদি গোত্রসমূহ আল্-আরাবুল বায়িদার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে 'আদ ও সামুদ জাতির কথা উল্লেখ আছে। এরা অতি প্রাচীন জাতি। এদের রাজত্যকাল নূহ আলাইহিস্ সালাম -এর অব্যবহিত পরেই ছিল। কোন জাতি কত বছর রাজত্ব করেছিল, তার পর কে রাজত্ব করেছিল, সন তারিখসহ

---

৫. আল্লাহপাক পবিত্র কুরআ'নে এ সম্পর্কে ঘোষণা করেন,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ - مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ - عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيْمٌ -

অর্থাৎ- তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে, যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমলংঘন করে, সে পাপিষ্ঠ কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল কালাম, আয়াত ঃ ১০-১৩)।

৬. খাদরী বিক মুহাম্মদ শায়খ, **মুহাদারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যা,** মিসর ঃ আল মাকতাবাতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, ১৩৮২ হিঃ, ১ম খণ্ড, পৃ ১১-১৩; ফুয়াদ হামযা, **কালবু জাযীরাতিল আরব,** মিশর ঃ আলমা'আতুস সালাফিয়া, ১৩৫২ হিঃ, পৃ ২৩১-২৩৫; আবুল হাসান আবুল নদভী, **আসসীরাতুন নব্বিয়্যা,** বৈরুত ঃ দারুশ শরুক, ১৯৮৩ খ্রীঃ), পৃ ৫৩-৭১।

৭. হযরত ঈসা (আ) এর জন্মের প্রায় ১৯০০ শত বছর পূর্বে তিনি হিজাজে বসবাস করছিলেন এবং জুরহুম বংশীয় জনৈক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এ বংশেরই একজন আদনান, যার পূর্বের বংশ তালিকা সঠিকভাবে জানা যায় না। সমগ্র আরববাসী কাহতান এবং আদনানের বংশধরগণের শাখা-প্রশাখাভুক্ত। ঐতিহাসিকদের মতে আরবরা প্রায় সকলেই সামী (সেমেটিক) অর্থাৎ নূহের পুত্র সামের বংশধর।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারিতভাবে এর পূর্ণ ইতিহাস জানার নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র নেই। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, এরা অতি উন্নত ও প্রতাপশালী জাতি ছিল।[৮]

আদ জাতির[৯] হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তায়ালা হুদ আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করেছিলেন। তারা বালুকাময় উচ্চ স্থানে (ইয়ামেন দেশে) বাস করত। আল্লাহ তাদের চক্ষু, কর্ণ এবং অন্তর দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তারা অতি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং সাহসী ছিল।[১০]

তারা ইরাম নগরে বাস করত। এ নগরে বাসগৃহসমূহ অতি মজবুত ও সুরম্য ছিল। এই নগরের সৌধ স্তম্ভগুলো এত সুন্দর, মজবুত ও উচ্চ ছিল, যার তুলনা জগতের কোন নগরে ছিল না।[১১] এরা হযরত নূহ (আ) এর পরের জাতি ছিল এবং অতি শক্তিশালী জাতি ছিল।[১২] উচ্চস্থানে

---

৮. তফাজ্জল হোছাইন, মুজতবা হোছাইন, **হযরত মুহাম্মদ (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন,** ঢাকা ঃ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৮ খ্রিঃ, পৃ ৩৭।

৯. আদ জাতি ছিল আরবের অতি প্রাচীন জাতি। এ জাতির কাহিনী আরববাসীদের মুখে মুখে শুনা যেত। তাদের শান শওকত ও প্রভাব প্রতিত্তি ছিল দৃষ্টান্তমূলক। তাদের এ খ্যাতির জন্য আরবি ভাষায় প্রত্যেক প্রাচীন জিনিষকে আদী বলা হয়। কুরআনের দৃষ্টিতে এ জাতির প্রকৃত আবাসস্থল ছিল আহকাফ অঞ্চল যা হেজায, ইয়ামেন, এবং ইয়ামামার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে হুদ (আ) –এর কবর আছে বলে কথিত আছে। ১৮৩৭ খ্রিঃ ব্রিট্রিশ নৌবাহিনীর জনৈক অফিসার James R. Wellested হিসনে গোরবে একটা শিলালিপি দেখতে পান যাতে হযত হুদ (আ) এর উল্লেখ ছিল। এ লেখা থেকে পরিষ্কার মনে করা হয় যে ঐ সব লোকের লেখা যারা হযরত হুদ (আ) –এর শরীয়তের অনুসারী ছিল। (তফাজ্জল হোছাইন, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৩৭-৩৮)।

১০. আল কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا إِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ـ فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْئٍ إِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ـ بِأٰيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

অর্থাৎ– তাহাদিগকে আমরা সেই সবই দিয়াছিলাম যাহা তোমাদিগকে দিই নাই। তাহাদিগকে আমরা কান, চক্ষু, ও হৃদয়-মন সব কিছুই দিয়াছিলাম। কিন্তু, তাহাদের সেই কান কোন কাজে আসে নাই, চক্ষুও নয়, হৃদয়ও নয়। কেননা তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অমান্য করিতেছিল। আর সেই জিনিসেরই পরিবেষ্টনীর মধ্যে তাহারা পড়িয়া গেল, যাহারা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ তাহারা করিতেছিল। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহকাফ, আয়াত ঃ ২৬)।

১১. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ـ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ـ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِىْ الْبِلاَدِ ـ

অর্থাৎ– তুমি কি দেখ নাই তোমার রব উচ্চ স্তম্ভনির্মাণকারী আদ-ইরেমের সহিত কি ব্যবহারটা করিয়াছে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ ফজর, আয়াত ঃ ৬-৮)।

১২. এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ـ وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِىْ الْخَلْقِ بَصْطَةً ـ فَاذْكُرُوْا آلاَءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থাৎ– তোমরা কি এই জন্য আশ্চর্যান্বিত হইয়াছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদেরই নিজ জাতির এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের খোদার 'স্মারক' আসিয়াছে, এই জন্য যে, সে তোমাদিগকে সাবধান সতর্ক করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

তারা বিরাট বিরাট স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিল। এই জাতি এত সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল যা দেখলে মনে হত যে তারা যেন চিরদিন এই জগতে থাকারই মনস্থ করেছে। তাদের ক্ষমতা অতি ব্যাপক এবং তাদের আক্রমণ ছিল অতি কঠোর। আল্লাহ তায়ালা তাদের গৃহপালিত পশু, সন্তান-সন্ততি, বাগান এবং জলাশয় দান করেছিলেন।[১৩] এই বংশের একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন যার নাম ছিল শাদ্দাদ।[১৪] কিন্তু ইবনে খালদুন পর্যন্ত তার 'মুকাদ্দিমায়' এই সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং বেহেশতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন।[১৫]

ভুলিয়া যাইও না, তোমাদের খোদা নূহের জাতির পরে তোমাদিগকেই তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে খুবই স্বাস্থ্যবান বানাইয়াছেন। অতএব খোদার কুদরতের কীর্তিকলাপ স্মরণে রাখিও। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করিবে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ 'আরাফ, আয়াত ঃ ৬৯)।

১৩. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ـ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ـ فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ ـ وَاتَّقُوْا الَّذِىْ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ـ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ـ

অর্থাৎ – আর বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করিতেছ, যেন তোমরা চিরদিনই এখানে থাকিবে! আর যখন কাহাকেও পাকড়াও কর তখন অত্যাচারী হইয়াই কর! অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে সেই সব কিছুই দিয়াছেন, যাহা তোমরা জান। তিনি তোমাদিগকে জন্তু-জানোয়ার দিয়াছেন, সন্তান-সন্ততি দিয়াছেন। (**আল কুর'আন,** সূরাতুশ শু'আরা, আয়াত ঃ ১২৯-১৩৩)।

১৪. লিওনারম্যান্ট, অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রি অব দি ইস্ট, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯৩। কুরআনের সূরা ফাজরের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে আদ ইবনে আউস ইবন ইরামের দুইপুত্র ছিল। তাদের নাম ছিল শাদিদ ও শাদ্দাদ। তাঁরা উভয়েই পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর শাদিদের মৃত্যু হলে শাদ্দাদ নিজেকে সমগ্র রাজ্যের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রায় সকলেই তার আনুগত্য স্বীকার করে। শাদ্দাদ একদিন বেশেতের বর্ণনা শুনে নিজেই অনুরূপ একটি বেহেশত নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। এডেনের প্রান্তরে তিনশত বছর সময়কালে এই বেহেশত নির্মিত হয়। শাদ্দাদ নূহ নবীর মত নয়শত বছর জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এই বেহেশতের সৌধগুলি ছিল মনিমানিক্য খচিত। এর চারিদিকে সুশোভিত বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, ছিল চমৎকার ফোয়ারার সমাহার ও বিচিত্র বর্ণের ফুলে সৌরভে সুসজ্জিত। এভাবে বেহেশতের সৌন্দর্যবিন্যাস সমাপ্ত হওয়ায় নৃপতি শাদ্দাদ তার সভাসদবর্গসহ এই বেহেশতে প্রবেশ করতে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। শাদ্দাদ বেহেশতে থেকে এক রাত্রের দূরত্বে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাদের উপর বজ্রপাত ঘটিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। শাদ্দাদসহ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নৃপতি শাদ্দাদের এই সকল বেহেশতের কথা কিংবদন্তির মত জনসাধারণের মুখে মুখে যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল।

১৫. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই আয়াতের সত্যতা সাম্প্রতিক এক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা NICHOLAS CLAPP ব্রিটিশ নভোখেয়ার বিজ্ঞানী SIR RANULPH FIENNES –এর যৌথ প্রচেষ্টায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ১৯৮১ সালে আরবের ওমানে আধুনিক উপকরণের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের পর শত শত ফুট নিচে বালির স্তূপের তলায় ইরাম তথা উবার (UBAR) নগরীর সন্ধান পাওয়া যায়। কথিত শাদ্দাদের নকল বেহেশতেরও ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়। এই ইরামকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে ও প্রত্নতাত্ত্বিক দলিলদস্তাবেজে উবার (UBAR) নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে NASA –এর উদ্যোগে মার্কিন নভোখেয়াযান CHALLENGER থেকে প্রাপ্ত ছবির মাধ্যমে এই বিলুপ্ত নগরীটির ধ্বংসাবশেষের আরো প্রচুর তথ্য উদঘাটিত হয়। আন্তর্জাতিক **NEWSWEEK** পত্রিকায় ১৭-২-১৯৯২ তারিখে THE ATLANTIS OF THESANDS CALLING

Dhaka University Institutional Repository

সামুদ জাতির হিদায়েতের জন্য হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন।[১৬] তারা হিজর এবং ওয়াদিল কুরা নগরদ্বয়ে বাস করত।[১৭] সামুদ জাতি আদ জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত ছিল। পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য ছিল নরম ভূমিতে তাদের অট্টালিকা ও আবাসগৃহ নির্মাণ করেছিল। আবার প্রস্তরময় পাহাড় কেটেও বাড়িঘর বানিয়েছিল।[১৮] তারা অত্যন্ত আমোদ-প্রমোদ ও সুখ-শান্তিতে ছিল।[১৯] আদ ও সামুদ জাতি এককালে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের মোহে মত্ত হয়ে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার দরুন তাদের প্রতি আল্লাহর গজব ও আজাব নাযিল হয়েছিল। রাসূল (স) তাবুক যাওয়ার পথে 'হিজর' নামক স্থানে পৌঁছে

ON ANCIENT DREAMS & MODERN TECHNOLOGY, A TEAM MAY HAVE FOUND THE ANCIENT CITY OF UBAR শিরোনামে শাদ্দাদের বেহেশতে পূর্বের এবং বর্তমান ধ্বংসাবশেষের ছবিসহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

১৬. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ـ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ قَدْ جَـاءَتْكُمْ بَيِّنَـةٌ مِـنْ رَّبِّكُمْ ـ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِىْ أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অর্থাৎ- এবং সামুদ জাতির প্রতি আমরা তাহাদের ভাই সালেহকে পাঠাইছি। সে বলিলঃ হে জাতির ভাইরা, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কেহ খোদা নাই। তোমাদের নিকট তোমাদের রব এর নিকট হইতে সুস্পষ্ট দলীল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শনস্বরূপ। অতএব উহাকে ছাড়িয়া দাও- খোদার যমীনে চরিয়া বেড়াইবে; কোন খারাপ উদ্দেশ্যে উহাকে সম্পর্শ করিও না, অন্যথায় এক কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করিবে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ 'আরাফ, আয়াত ঃ ৭৩)।

১৭. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأٰتَيْنٰهُمْ اٰيَاتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ـ

অর্থাৎ-হিজর্ এর লোকেরাও নবী-রাসূলেদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ হিয্‌র, আয়াত ঃ ৮০);

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوْا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

অর্থাৎ- আর সামুদের সাথে, যাহারা উপত্যকায় প্রস্তর ভূমিসমূহ খোদাই করিয়াছিল। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ ফযর, আয়াত ঃ ৯)।

১৮. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّأَكُمْ فِىْ الْأَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِـنْ سُـهُوْلِهَا قُصُـوْرًا وَّتَنْحِتُـوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ـ فَاذْكُرُوْا اٰلَاءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِىْ الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ- স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ 'আ'দ' জাতির লোকদের পরে তোমাদিগকে উহার স্থলাভিষিক্ত বানাইয়াছেন এবং জীবনে তোমাদের এই মর্যাদা দিয়াছেন যে, আজ তোমরা উহার সমতল ভূমির উপর সু-উচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করিতেছ ও উহার পর্বত খোদাই করিয়া বাড়ি-ঘর বানাইতেছ। অতএব তাহার কুদরতের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে গাফিল হইও না এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করিও না। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ 'আরাফ, আয়াত ঃ ৭৪)।

১৯. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, أَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ ـ অর্থাৎ- তোমাদিগকে কি এখানে যাহা কিছু আছে সেই সব জিনিসের মধ্যে এমনিই নিশ্চিন্তে থাকতে দেওয়া হইবে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ শু'আরা, আয়াত ঃ ১৪৬)।

Dhaka University Institutional Repository

বললেন– ইহা অভিশপ্ত সামুদ জাতির দেশ এবং তিনি কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে অতি দ্রুত বেগে ঐ স্থানটি অতিক্রম করতে লাগলেন। সাহাবীদেরকে ঐ স্থানের পানি পান করতে নিষেধ করলেন। ঐ জায়গার পানি দিয়ে সাহাবীরা যে আটা রুটি তৈরি করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন তা ফেলে দিতে অথবা উটকে খাইয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।[২০] রাসূল (স) –এর সময় হিজর শহরে ভগ্নাবশেষ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। প্রাক ইসলামী যুগে বনু কাহতান এবং বনু ইসমাঈলই ছিল মূল অধিবাসী। বনী সামুদগণ ছিলেন হিমিটিক বংশের অন্তর্ভুক্ত। তারা প্রথমে ইদম সীমান্ত এবং পরে হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী হিজর নামক দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। এর ধ্বংসাবশেষ মদীনার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান শহর 'আলা-উলা' থেকে কয়েক মাইল ব্যবধানে দেখতে পাওয়া যায়। মদীনা থেকে তাবুক যাবার পথে এই স্থানটি প্রধান সড়কের উপর অবস্থিত। এই উপত্যকার উপর দিয়েই কাফেলা চলাফেরা করে। স্যার হেনরী লেয়ার্ড EARLT TRABELS নামক গ্রন্থে এ সকল পার্বত্য ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপের বর্ণনা করেছেন।[২১]

প্রাক ইসলামী যুগে সমগ্র আরবে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজমান ছিল। সারা আরব দৌরাত্ম্য ও অসভ্যতার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপকভাবে সর্বত্র অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, আত্মকলহ, হত্যা, রক্তপাত অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকত।[২২] হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রকাশ্যভাবে যিনা করা যদিও অবৈধ ছিল কিন্তু গুপ্তভাবে যিনা করাকে তারা অন্যায় মনে করত না এবং বলত যে, প্রকাশ্যে যিনা করা ইতরামি কিন্তু গুপ্তভাবে যিনা করাতে কোন দোষ নেই। অর্থাৎ জাহিলিয়াতের যুগে ব্যভিচার ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।[২৩] যদিও গুপ্তভাবে ব্যভিচার করা হত কিন্তু ধর্ষণের পর প্রকাশ্য সভায় নিজের বদমাশী এবং গুণ্ডামীর কাহিনী বর্ণনা করাকে গৌরব মনে করত। তদানীন্তন আরবে লজ্জাবলে কোন বস্তু ছিল না। মহিলারা উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করার সময় মন্ত্রস্বরূপ বলত। "কেউ যদি আমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার উপযুক্ত বস্ত্র দান করত। অতএব তারপর এই কবিতাটি পাঠ করত ঃ

"আজ আমার শরীরের কিয়দংশ অথবা পূর্ণাঙ্গ উলঙ্গ থাকবে কিন্তু কাউকে উলঙ্গ দর্শানোপভোগ করে তৃপ্তি লাভ করার অনুমতি দেই না।"[২৪]

সেকালের অসভ্য আরবগণও পবিত্র কা'বা ঘরের হজ্জ করাকে মহাপুণ্য বলে মনে করত। হজ্জের মৌসুমে লক্ষ লক্ষ লোক সমাবেত হত। কুরাইশ বংশীয় লোক ব্যতীত আর সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করত। উন্মুক্ত মাঠে অনাবৃত স্থানে উলঙ্গ হয়ে স্নান করত।[২৫]

---

২০. **সহীহুল বুখারী**, ২য় খণ্ড, পৃ ৩০৭।

২১. সৈয়দ আমীর আলী, **দ্য স্পিরিট অব ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮-৪৯।

২২. মোল্লা মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তাফা** (দিল্লী ঃ মাকতাবা উসমানিয়া, ১৯৫৭ খ্রিঃ), পৃ ৫৫-৫৬।

২৩. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জরির আত্‌তাবারি, **জামি'উল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন** (কায়রো ঃ মাকতাবা দারুল আরুবা, ১৯৭২ খ্রিঃ), ৫ম খণ্ড, পৃ ১৩।

২৪. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, **সীরাতুন্নবী,** প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৯৪।

২৫. আবু আব্দুর রহমান, **আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন নাসায়ী সুনানুন্নাসাফযী** (লাহোর ঃ মাকতাবা সাফিয়া, ১৯৮২ খ্রিঃ), اَلِاسْتِتَارُ عِنْدَ الْغُسْلِ অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উন্মুক্ত স্থানে পায়খানা-প্রসাব করত। লোকসভায় বসে স্ত্রী সহবাস সম্পর্কীয় সমস্ত ঘটনা খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করত।[২৬]

এই ব্যভিচার তখনকার আরবদের কাছে দূষণীয় ছিল না। পুং মৈথুন, নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন, পশু মৈথুন এ সকল অশ্লীল কার্যকলাপ তখনকার আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এ সকল কিছু স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই পরিগণিত ছিল। নারী তথা স্ত্রী লোক ছিল পুরুষদের ভোগের বস্তু এবং নারীদের কোন প্রকার সামাজিক মর্যাদা ছিল না। একজন পুরুষ তার আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী অগণিত নারীর পানি গ্রহণ করত অথবা বলপূর্বক নারীকে স্ত্রী বা দাসীতে পরিণত করতো। একইভাবে নারীরাও তাদের ইচ্ছা ও সামর্থানুযায়ী বহু পুরুষের সাথে যৌনমিলনে রত হতে পারত। শুধু নিজের গর্ভধারিনী মা ছাড়া পুরুষরা যে কোন নারী এমনকি সহোদরা ভগ্নী ও বিমাতার সাথেও যৌন সম্ভোগ করত। পিতার মৃত্যুর পর অন্যান্য তৈজসপত্র ও পশুপালের মত পুত্ররা পিতার স্ত্রী ও কন্যাদের উত্তরাধিকারসূত্রে ভাগ করে নিত এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অবাধে ভোগ করতা। শরাব খুরীর ন্যায় আরবের ঘরে ঘরে জুয়া খেলারও আড্ডা লেগে থাকত। জুয়া খেলায় তৎকালীন আরবের লোকেরা এতই মত্ত ছিল যে, জুয়ায় পরাজিত হয়ে সমস্ত ধন-সম্পত্তি নষ্ট করার পর নিজের স্ত্রী, কন্যার উপর বাজি রেখে জুয়া খেলত এবং পরাজিত হলে স্ত্রী, কন্যাকে প্রতিপক্ষের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হত।[২৭]

জাহিলিয়াতের সে যুগে এক একজন পুরুষ তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী অসংখ্য নারীকে বিবাহ করতে পারত বা দাসী বানিয়ে রাখতে পারত। সেই অন্ধকারচ্ছন্ন যুগে প্রধানত চার প্রকারের বিবাহ প্রচলিত ছিল। জাহেলী যুগের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারীর একটি হাদীস থেকে জানা যায় 'ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান ও আহমদ ইবন সালিহ রাযী আল্লাহু 'আনহু..... উরওয়া ইবন যুবায়র রাযী আল্লাহু 'আনহু বলেছেন, জাহিলী যুগে চার প্রকারের বিবাহ প্রচলিত ছিল। এক প্রকার হচ্ছে বর্তমানে যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন বক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ মহিলা অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই কথা বলত যে তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সাথে যৌনমিলন কর। এরপর স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকত এবং কখনও একই বিছানায় ঘুমাতো না যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হত যার সাথে স্ত্রীর যৌনমিলন হত। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হত তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করত। এটা ছিল তার স্বামীর অভ্যাস, এতে উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিবাহকে নিকাহুল ইসতিবযা (ISTIBDA COHABITION) বলা হত। তৃতীয় প্রথা ছিল যে, দশজনের কম কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পালাক্রমে মহিলার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হত। যদি মহিলা এর ফলে গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুদিন অতিবাহিত হত, সেই মহিলা এ

---

২৬. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, **প্রাগুক্ত**, পৃ ২৯৪।

২৭. ফখরুদ্দীন রাযী, **আত্তাফসীরুল কবীর** (মাকতাবা ইস্হাকিয়া করাচী), ৩য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড।

Dhaka University Institutional Repository

সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। যখন সকলেই সেই মহিলার সামনে একত্রিত হত, সে তাদেরকে বলত তোমরা সকলেই জান তোমরা কি করেছ। এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি, সুতরাং হে অমুক এটা তোমারই সন্তান। ঐ মহিলা যাকে খুশি তার নাম ধরে ডাকত, তখন ঐ ব্যক্তি উক্ত শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং ঐ মহিলা তার স্ত্রীরূপে গণ্য হত। চতুর্থ প্রকার বিবাহ হচ্ছে, পুরুষ আসত তাদের কাউকে শয্যা-শায়িত করতে অস্বীকার করত না। এরা ছিল বারবণিতা যারা চিহ্ন হিসেবে নিজ ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত।[২৮] যে কেউ ইচ্ছা করলে অবাধে এদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারত। যদি এ সকল মহিলাদের মধ্য থেকে কেউ গর্ভবতী হতো এবং কোন সন্তান প্রসব করত তাহলে যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়া সকল পুরুষরা এবং একজন কিয়াফা শেনাস ডেকে আনা হত।[২৯] সে সন্তানটির যে লোকটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে দেখতে পেত তাকে বলত এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি ঐ সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হত এবং সে সেই সন্তানকে অস্বীকার করত না।[৩০] কিন্তু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দ্বীনসহ পাঠান হল তখন তিনি জাহেলী যুগের সমস্ত বিবাহ প্রথাকে বাতিল করে দিলেন এবং বর্তমানে প্রচলিত শাদী ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিলেন।[৩১]

ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে এক ব্যক্তি দুই সহোদরা ভগ্নীকে একই সাথে বিবাহ করতে পারত। কেউ কেউ বিবাহ করে দু'একদিন পরই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করত।[৩২] নিপীড়িত এই নারী শ্রেণীকে যখন তারা বেঁচে থাকার অধিকার দিত তখন তার জীবনের সব অধিকার ছিনিয়ে নিত। বিয়ের কোন সীমা সংখ্যা ছিল না। যত সংখ্যক নারীকে ইচ্ছা বিয়ে করতো। ইসলাম কবুল করার সময় ওয়াহাব আসাদিয় রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর দশজন স্ত্রী ছিল।[৩৩] গাইলান সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল।[৩৪] অবাধ্য স্ত্রীকে প্রয়োজনবোধে তারা মেরে ফেলত। বিবাহের বাইরে পুরুষরা তাদের অধীনস্থ স্ত্রী, দাসী

---

২৮. **সহীহুল বুখারী,** ২য় খণ্ড, পৃ ৭৬৯।

২৯. এমন একজন বিশেষজ্ঞ, যারা শরীরের মুখ অথবা শরীরের কোন অংশ দেখে বলতে পারত অমুকের ঔরসজাত সন্তান। আর যে ব্যক্তি বলতে পারে তাকে কিয়াফা সেনাস বলা হয়।

৩০. মুল্লা মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তফা,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬২-৬৩।

৩১. **বুখারী শরীফ,** অষ্টম খণ্ড, বহু বিবাহ, দ্রঃ ১৯৫৩ অনুচ্ছেদ, ৬০৪২, পৃ ৩৯৭. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সালে প্রকাশিত। (**সহীহ বুখারী,** কিতবুন নিকাহ অনুচ্ছেদে পৃ ঃ ৬২-৬৩) (এই ত্রিবিধ বিবাহের কথা বর্ণিত হয়েছে); **আবু দাউদ শরীফ,** বাবে ওজুহুন নেকাহ অধ্যায়।

৩২. **সুনানে আবু দাউদ,** আত্ তালাকু মাররাতান।

৩৩. **সুনানে আবু দাউদ,** কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ফি মান আসলামা ওয়া ইনদাহু নিসাওন আকছারু মিন আরবা'; **সুনানে আবু দাউদ,** প্রথম খণ্ড, পৃ ৩০৪।

৩৪. **তিরমিযি শরীফ,** আবওয়াবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ– "মা জাআ ফির রাজুলি ইউসাল্লিমু ওয়া ইনদাহু আশারা নিসওয়াহ।"

Dhaka University Institutional Repository

তথা নারীদেরকে দিয়ে গণিকাবৃত্তি করত।[৩৫] সে সময় দু'ধরনের গণিকাবৃত্তি প্রচলিত ছিল। প্রথমটি হচ্ছে ঘরোয়া গণিকাবৃত্তি (Private Prostitution)[৩৬] এবং দ্বিতীয়টি ছিল প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি। অধিকাংশ মুক্তি প্রাপ্ত দাসীরা যাদের কোন অভিভাবক ছিল না তারা ঘরোয়া গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকত। দ্বিতীয়টি ছিল প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি (Open Prostitution) যা ছিল দুই ধরনের।[৩৭] সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিরা এই প্রকার গণিকাবাড়ি খুলে রাখত। ইসলামের প্রধান

---

৩৫. মুসায়বা ও উসায়মা নামক আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাইর দুইটি দাসী ছিল। সে তাদেরকে বলপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি করে টাকা উপার্জন করতে বাধ্য করত। তাদের এইসব জঘন্য কাজের প্রতিবাদ করার কেউ কোন প্রয়োজনও অনুভব করতো না। এ সম্পর্কে কুর'আনের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ـ وَّاٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتٰكُمْ ـ وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থাৎ– আর যাহারা বিবাহের সুযোগ পাইবে না তাহাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদেরকে ধনী বানাইয়া দেন। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে হইতে যাহারা চুক্তিপত্র করার দরখাস্ত দিবে তাহাদের সহিত চুক্তি-পত্র কর। তোমরা যদি জানিতে পার যে তাহাদের মধ্যে কল্যাণ রহিয়াছে, আর তাহাদেরকে সেই মাল সম্পদ হইতে দাও যাহা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়াছেন। আর তোমাদের দাসীদের নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য করিও না। যখন তাহারা নিজেরা চরিত্রবতী থাকিতে চায়। যে তাহাদের জন্য জবরদস্তি করিবে, আল্লাহ এ জবরদস্তির পর তাহাদের জন্য ক্ষমাশীল, দয়াময়। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নূর, আয়াত ঃ ৩৩)।

৩৬. কোন এক গৃহে এই পেশার জন্য তারা অবস্থান করতো। সেখানে কয়েকজন পুরুষের সাথে তারা একইভাবে চুক্তিবদ্ধ হতো যে তারা তাদের ভরণপোষণ করবে এবং বিনিময়ে তারা সেই সব পুরুষদের সাথে যৌনমিলনে রত হবে।

৩৭. প্রথমটি হলো যুবতী দাসীদের, মালিকরা দাসীদের উপর একটি নির্দিষ্ট টাকার অংশ নির্ধারণ করে বলতো যে প্রতিমাসে তারা ঐ পরিমাণ অর্থ তাদেরকে প্রদান করবে। হতভাগী যুবতী দাসীরা বেশ্যাবৃত্তি করে তাদের মালিকদের দাবী পূরণ করতো। এই গণিকাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এত অধিক পরিমাণ অর্থ তারা উপার্জন করতে পারতো না। দ্বিতীয়টি ছিল পুরুষ তথা মালিকরা তাদের অধীনস্থ যুবতী দাসীদের একটি গৃহের মধ্যে রাখতো এবং বাড়ির দরজার উপর পতাকা টানিয়ে রাখত। বাড়ির উপর এই প্রকার পতাকা লটকানো দেখে দূর দূরান্ত থেকে আগত অতিথিরা বুঝতে পারত এখানেই তাদের যৌন প্রয়োজন পূরণ করা যাবে। এই সকল স্ত্রী লোকদের বলা হত 'কালিকিয়াত' এবং তাদের বাড়ীগুলিকে 'রাওয়াখীর' নামে অভিহিত করা হত। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স),** প্রাগুক্ত পৃ ৭১-৭২)।

Dhaka University Institutional Repository

দুশমন মুনাফিকদের প্রধান আব্দুল্লাহ বিন্ উবাই-এরও এই ধরনের বেশ্যাবাড়ি ছিল।[৩৮] আরবের ইহুদী খ্রিষ্টানদের মধ্যেও এই ধরনের বেশ্যাবৃত্তির প্রচলন ছিল।[৩৯]

একইভাবে তালাকের ব্যাপারেও কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষরা যখনই চাইতো এবং যতবার চাইত স্ত্রীকে তালাক দিত এবং ইদ্দতপূর্ণ হওয়ার পরই রুজু বা প্রত্যাহার করত।[৪০] উল্লেখিত বিবাহের বা যৌন সম্পর্কের বাহিরে ইসলাম পূর্ব আরবদেশে আরো কয়েকটি বিবাহের প্রচলন ছিল যা সংক্ষেপে এরূপ ঃ

মুতয়া বিবাহ (Muatah Marriage) ঃ এই প্রকার বিবাহ ব্যবস্থায় বিবাহিত দম্পতি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাময়িক ভিত্তিতে একসাথে বসবাস করত। যে সকল লোক নিজ নিজ বাড়ি ছেড়ে বিদেশ গমন করত এবং বিদেশে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করত প্রধানত তারাই সাময়িক ভিত্তিতে এরূপ দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হতো যাকে মুতয়া বা যৌন তৃপ্তির জন্য বিবাহ বলা হয়। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় রাসূলে করীম (স) ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম দিকে প্রচলিত প্রথা অনুসারে মুসলমানদেরকে দীর্ঘ প্রবাসে থাকাকালীন সময়ে মুতয়া বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছিলেন কিন্তু পরে তিনি এরূপ বিবাহ প্রথাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) তাঁর রাজত্বকালে তিনি মুতয়া বিবাহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন।

প্রেমিক-প্রেমিকার গোপনে একত্রে বসবাস (Lover's secret cohabitation) ঃ জাহেলী যুগে বৈবাহিক কোন প্রকার চুক্তি ছাড়া তাদের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী প্রেমিক-প্রেমিকা স্বামী-স্ত্রীর মতো গোপনে একত্রে বসবাস করত এবং এর কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। কিন্তু যখন তাদের এরূপ গোপন সম্পর্ক প্রকাশ হয়ে পড়ত তখন এরূপ সম্পর্ক অসম্মানজনক বলে অভিহিত হতো। ফলে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কে ইতি ঘটত।

বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ (Marriage by Exchange) ঃ একজন বিবাহিত পুরুষ তার নিজের স্ত্রী বা কন্যাকে অপর ব্যক্তির স্ত্রী বা কন্যার মাধ্যমে বিনিময় করত। এর জন্য কোন প্রকার মোহরানা প্রদান করতে হত না।[৪১]

জোরপূর্বক বিবাহ (Marriage by capture) ঃ প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের মত ইসলাম পূর্ব আরবে এরূপ বিবাহের প্রচলন ছিল। এরূপ বিবাহ সম্পর্কে ইসলামী পণ্ডিত হাম্মুদাহ আবদ আল আতি তাঁর THE FAMILY STRUCTURE IN ISLAM নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

---

৩৮. আবদুল্লাহ্ বিন উবাই এর বেশ্যালয়ে ছয়জন সুন্দরী নারী থাকত যাদেরকে দিয়ে সে শুধু অর্থই উপার্জন করত না বরং তাদেরকে দিয়ে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অতিথিদেরকে সে আপ্যায়নও করত। তাদের গর্ভে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মলাভ করত তাদেরকে দিয়ে দাস দাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হত। (আহমদ মনসুর, **বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত পৃ ৭২)।

৩৯. আহমদ মনসুর, **বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১-৭২; মুল্লা মজদুদ্দীন সীরাতে মুস্তাফা। মাকতাবা উসমানিয়া, ১৯৯৫ খ্রীঃ, দিল্লী, পৃ ৬১।

৪০. **আবু দাউদ,** কিতাবুত তালাক।

৪১. আহমদ মনসুর, **বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)**, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

This form is believed by some scholar's e. g. smith to have preceded marriage by purchase and is one of the heatedly debated points in the history of marriage.[৪২]

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিবাহ (Marriage by Inheritance) ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের তাদের উত্তরাধিকারদের কাছে অর্পণ করা হত। এমতাবস্থায় ঐরূপ বিধবাদের উত্তরাধিকারীগণ তাদের পূর্বের স্বামীর প্রদত্ত সমপরিমাণ মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করতে পারত। উত্তরাধিকারীগণ ঐ সকল বিধবাদের যদি বিবাহ না করতে চাইত তখন তারা তাদেরকে ভাল মোহরানার বিনিময়ে অন্য লোকের কাছে বিবাহ দিত এবং মোহরানা প্রাপ্ত সকল অর্থ নিজের জন্য রাখত উত্তরাধিকারীগণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জোরপূর্বক সারাজীবন স্থায়ী বিধবা হিসেবে রাখতে পারত।[৪৩]

নিকা উল মেকত বা লজ্জাজনক ঘৃণিত বিবাহ ঃ এরূপ বিবাহ অনুযায়ী পিতার মৃত্যুর পর বৈমাত্রেয় পুত্র তার বিমাতাকে বিবাহ করতে পারত অথবা মাতাকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন লোকের সাথে বিয়ে দিতে পারত। ইসলামের আবির্ভাবের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে এই বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৪৪] আর সে তার বিয়ে বন্ধ করতেও পারত। মাতা অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে হত। কোন নারী বিধবা হলে মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে একটি সংকীর্ণ অন্ধকার কক্ষে পূর্ণ এক বছর আবদ্ধ থাকতে হত। এই সময়ের মধ্যে তেল বা সুগন্ধি কোন দ্রব্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলে তার কাছে একটি গর্দভ অথবা একটি ছাগল আনা হত। তখন সে তার লেজ দিয়ে নিজের গুপ্তাঙ্গ মালিশ করত। তারপর ঐ অন্ধকার কক্ষের বাইরে আসত এবং তার হাতে একমুষ্টি ছাগ নাদি দেয়া হত। সে এই নাদিগুলো নিক্ষেপ করে দিলেই বিধবা হওয়ার কঠিন ইদ্দত হতে নিস্কৃতি লাভ করতো। এটাই ছিল স্বামী হারানোর পাপের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত।[৪৫]

হতভাগিনী বিধবা নারী দীর্ঘ এক বছর পর অন্ধকার প্রকোষ্ঠের কারাগার হতে মুক্তি পেলেও মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীদের উৎপীড়নের হাত হতে মুক্তি লাভ করতে পারত না। কারণ বিধবারা মৃত স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে উত্তরাধিকারীর অধিকারে আসত। অন্য স্বামী গ্রহণ করার কিংবা পিত্রালয়ে অথবা অন্য কোন স্থানে চলে যাওয়ার তার কোন অধিকার থাকত না।[৪৬] বিয়ের

---

৪২. **American Trust Publication,** 1977, P- 101.

৪৩. Said Abdullah Sefi Al Haatimy, **Ibid**, P- 3-4.

৪৪. **সুনানে আবু দাউদ,** কিতাবুত তালাক অনুচ্ছেদ, فی نسفل مرجیا بعکت تتلکات السلام।
O'Leary, Delacy : Arabia Before Muhammad London 1927, P- 202.

৪৫. **সুনানে আবু দাউদ,** ১ম খণ্ড, পৃ ৩১৪।

৪৬. মুল্লা মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তাফা,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সময় মোহর হিসেবে যে অর্থ দেয়া হত তাতে স্ত্রীর কোন অধিকার থাকত না। এই অর্থের অধিকারী হতো তার পিতা।[৪৭]

প্রাচীন আরবে এক একজন মালিকের অধীনে অজস্র ক্রীতদাসদাসী থাকত যাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। তাদের উপর হিংস্র পশুর মত নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ করা হত। বিভিন্ন স্থান থেকে তারা নরনারীদের লুণ্ঠন করে নিয়ে এসে তাদেরকে দাসবৃত্তিতে নিয়োজিত করত। এ সকল দাসীরা তার প্রভূর সাথে যখন তখন যৌনলীলায় রত হতে বাধ্য হত। মালিক ইচ্ছা করলে প্রতিমার সম্মুখে তার অধীনস্থ দাস দাসীদের বলি পর্যন্ত দিতে পারত। প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী এ সকল দাস-দাসীদেরকে আরবের বিভিন্ন হাটে বাজারে ভেড়া ছাগলের মত বিক্রি করা হত। এছাড়া বছরে প্রায় তেরটি মেলা আরবের বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত বসত যার মধ্যে 'উকায' মেলা ছিল প্রধান। এই সকল মেলায়ও দাস-দাসীদেরকে ভেড়া ছাগলের মত বিক্রি করা হত। নারীর ন্যূনতম সামাজিক কোন মর্যাদাই ছিল না।

ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে মেয়ে জন্মকে পাপ বা অভিশাপ বলে গণ্য করা হত। এ কারণে কারো পরিবারে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে লজ্জায় সে কাউকে মুখ দেখাতে পারত না। অনেকেই জন্মের সাথে সাথে কন্যা সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করত। অনেকেই নবজাত কন্যাশিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে কবর দিত। অনেকে পল্লী থেকে দূরবর্তী প্রান্তে গর্ত খুঁড়ে রাখত এবং তারপর কন্যা শিশু জন্মের পর হতভাগিনী জননীকে প্রবঞ্চিত করে শিশু কন্যাকে নিয়ে গিয়ে সেই গর্তে ফেলে দিত, তারপর পাথর ছুঁড়ে সেই কচি মেয়ের মাথা গুঁড়িয়ে দিত।[৪৮] কেউ কেউ আবার অধিক খরচের আশঙ্কায় কন্যা শিশুকে নিজ হাতে হত্যা করত। প্রসব বেদনার সময়েই সেই বাড়ির পাশে গর্ত খুঁড়ে রাখা হত যেন মেয়ে জন্ম হলে তাকে সেই গর্তে ফেলে জীবন্ত কবর দেয়া যায়। মা এতে রাজি না হলে বা তার পরিবারের লোকজন বাধা দিলে বাপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুদিন কন্যা সন্তানের প্রতিপালন করত। তারপর কোন একসময় সুযোগ বুঝে বাপ কন্যা সন্তানকে মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জীবিত দাফন করে দিত। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সম্মুখে জাহিলিয়াতের যুগের এমনি একটি লোমহর্ষক ঘটনার কথা এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছিলেন।[৪৯] কায়েস ইবনে আসিম জাহেলী যুগে আট দশটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করেছিল।[৫০]

---

৪৭. সাইয়্যেদ সুলায়মান নদবী, **সীরাতুন্নবী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৬।

৪৮. আল কুরআনে আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- অর্থাৎ– অথচ যখন ইহাদের কাহারো কন্যা-সন্তান পয়দা হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমণ্ডল কালিমা লিপ্ত হইয়া যায়। আর সে তখন শুধু ক্রোধের রক্ত পান করিয়া থাকে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নাহল, আয়াত ঃ ৫৮)।

৪৯. আমার একটি মেয়ে ছিল এবং সে আমার প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিল। তাকে ডাকলে সে দৌড়ে আমার কাছে আসত। একদিন তাকে আমি বাড়ি থেকে নিয়ে অনেক দূরে জনশূন্য একটি জায়গায় গেলাম। সেখানে একটি কূপ দেখতে পেয়ে আমি আমার মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে সেই কুপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তার শেষ শব্দ যা কানে এলো তা ছিল হায় আব্বা, হায় আব্বা! একথা শুনে দয়ালু নবী কেঁদে ফেললেন এবং তার

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলায়াতের যুগের এরূপ ঘৃণ্য বর্বর, অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে কুরআনে সতর্ক বাণী উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ এ কথাই ঘোষণা করেছেন যে, পুনরুত্থান দিবসে জাহিলিয়াতের যুগের প্রতিটি পিতা মাতাকে তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করার জন্য প্রশ্ন করা হবে এবং এর যোগ্য প্রতিফল বা শাস্তি প্রদান করা হবে। মোটকথা জাহিলিয়াতের সময়কালীন কোন অপরাধী পিতামাতাই আল্লাহর শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাবে না।[৫১]

জাহিলিয়াতের যুগে এতিম কন্যা সন্তানদের ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখে তাদেরকে বিয়ে করত এবং এসব এতিম মেয়েদের কোন অভিভাবক না থাকার কারণে তাদের স্বামীরা তাদের সকল সম্পত্তি গ্রাস করত এবং প্রয়োজনে তালাক দিয়ে মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দিত। যাদেরকে তালাক দিত না তাদের উপর অমানুষিক বর্বরভাবে জুলুম করত। হযরত আয়েশার রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরনের এতিম কন্যা সন্তানরা থাকত। এতিম মেয়ে যদি সম্পদশালী ও সুন্দরী হত সে ক্ষেত্রেও স্বামীরা তাদের বিয়ে করে তাদের ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য এই দুইই ভোগ করত।[৫২] যদি মেয়েটি দেখতে কুশ্রী হত সে ক্ষেত্রে তারা সেই মেয়েটিকে বিয়ে করত না বা মেয়েটি অন্য কাউকে বিয়ে করতে চাইলেও তাকে বিয়ে করতে দেয়া হত না। এর পিছনে কারণ ছিল যেন তাকে বিয়ে করে স্বামী তার সম্পত্তির অধিকার দাবি করতে না পারে।

ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে মদীনাবাসীরা ইহুদীদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। ইহুদী সমাজের মত তারা স্ত্রীদেরকে মাসিক ঋতুর সময় এতো বেশি অপবিত্র বলে মনে করত যে তাদের হাতের রান্না করা খাদ্য এমনকি পানি পর্যন্ত পান করত না। স্ত্রীদের সাথে এক বিছানায় শয্যা গ্রহণ করত না। তাদের হাতের স্পর্শও তারা অপবিত্র বলে গণ্য করত। এরই ফলশ্রুতিতে নারীরা ঋতুর এই সময় সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী জীবন যাপন করত।

ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে সমগ্র জাজিরাতুল আরব জুড়ে একাধিক বিবাহ, ব্যভিচার, গণিকাবৃত্তি, বিভিন্ন নারী ও দাস দাসীদের সাথে অবৈধ মিলন, অস্বাভাবিক উপায়ে যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করা, কন্যা সন্তান জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা প্রভৃতি চূড়ান্ত অশ্লীলতা ও ঘৃণ্য বর্বরতায়

চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে থেকে একজন বললেন হে লোক! কেন তুমি আল্লাহর রাসূল (সা) - কে কষ্ট দিলে? নবী (সা) বললেন তোমরা তাকে বাধা দিও না, মেয়ের ব্যাপারে তার যে কঠিন অনুভূতি আছে সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করতে দাও। লোকটি পুনরায় তার কাহিনী বর্ণনা করল যা শ্রবণ করে রহমতের নবী এত কাঁদলেন যে, তাঁর দাঁড়ি মোবারক অশ্রুতে ভিজে গেল। তারপর তিনি বললেন জাহিলিয়াতের যুগে যা হয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন, তুমি এখন নতুন করে জীবন শুরু কর। (**সুনানে দারেমী,** প্রথম অধ্যায়)

৫০. **তাফসীরে ইবন কাসীর,** চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৪৭৭-৪৭৮।

৫১. আল কুর'আনে আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ -

অর্থাৎ- যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, সে কোন অপরাধে নিহত হইয়াছিল? (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত তাকবীর, আয়াত ঃ ৮-৯)।

৫২. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুত তাফসীর, সূরাতুন নিসা।

Dhaka University Institutional Repository

আকাশ বাতাস কলুষিত হয়ে পড়েছিল। এই যৌনলালসা চরিতার্থ করার জন্য আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী এক একজন পুরুষ অগণিত নারীকে বিয়ে করতো অথবা নিজস্ব হারেমে নারীদেরকে উপপত্নী হিসেবে রাখা হতো। একটি পণ্যেরও মূল্য ছিল কিন্তু মূল্য ছিল না একজন নারীর। নারীদেরকে মনে করা হত শয়তানের মন্ত্রণাদাতা এবং কোন নারীকেই তারা বিশ্বাস করত না। নারীদের সম্পর্কে ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে যে সকল প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল তা হল (1) Women are the whips of Satan (2 Trust neither a king, a horse nor a woman (3) Our mother forbids us to err and (herself) runs into error (4) Obedience to a woman will have to be repented.[৫৩] সে সময় ইহুদিদের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছাড়াও শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ী বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইহুদী ও অযাযাবর আরবদের মধ্যে নারীর অবস্থা অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। হিব্রু কুমারীগণ তাদের পিতৃগৃহে ভৃত্যের চাইতে অধিকতর মর্যাদা পেত না। নাবালিকা অবস্থায় পিতা তার কন্যাদিগকে বিক্রি করতে পারত। কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না তবে কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলে সে ক্ষেত্রে কন্যার উপর উত্তরাধিকার বর্তাতো। নারী শুধুমাত্র অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত। সে তার স্বামী কিংবা পিতার সম্পত্তির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হত এবং কোন ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মতো উত্তরাধিকারসূত্রে তার পুত্র সন্তানদের নিকট হস্তান্তরিত হত। এর ফলশ্রুতিতে বৈমাত্রেয় পুত্রের সংগে বিমাতার প্রায়শই মিলন ঘটতো যা পরবর্তীকালে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এটি 'নিকাহ উল মেকাত' বা লজ্জাজনক ঘৃণিত বিবাহ বলে চিহ্নিত হত। ইয়েমেনের অর্ধ ইহুদী, অর্ধ-সেবীয় গোত্রসমূহের মধ্যেও স্ত্রীলোকদের মধ্যে একাধিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।[৫৪] কন্যা সন্তানদের অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ভয়াবহ প্রথাটি কুরাইশ ও কিন্দাহ গোত্রের লোকদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এই জঘন্য নির্মম প্রথা বাতিল করেন এবং দেবতাদের কাছে সন্তান বলিদানের প্রথাটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। PIERRE CRABITES নামক আমেরিকান এক বিচারক সুদীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম আইনের উপর গবেষণা করে মন্তব্য করেন ঃ

Muhammad (Sm) was probably the greatest champion of womens rights the world has ever seen. Islam has conferred upon the Muslim wife property rights and judicial status exactly the same as that of her husband.

নারী পুরুষের নিকট হস্তচালিত যন্ত্রের ন্যায় ছিল– যাকে সে নিজ খেয়াল খুশি মতো ব্যবহার করে থাকে! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পয়গাম ও পবিত্র

৫৩. **The Family of the Holy prophet (SM)** By S. M. Madani, Published by Adam Publishers, Delhi, India, P- 31.

৫৪. **Ancient History of the East** by- Lenormant, Second part P- 318.

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের অমিয় বাণী নিয়ে আগমণের পূর্ব পর্যন্ত নারীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চলছিল। এর পূর্বে কোন পুরুষ তার স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার কোন পুরুষ আত্মীয় তাকে স্বীয় চাদর দ্বারা ঢেকে ফেলত যেন লোকে তাকে দেখতে না পায়। বিধবাটি সুন্দরী হলে সে আত্মীয় তাকে বিয়ে করত। আর সুন্দরী না হলে তাকে যাবজ্জীবন কারাগারে রাখা হত এবং কারাগারে মৃত্যুর পর সে তার সম্পত্তি দাবি করত।[৫৫]

সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের কোন জ্ঞান ছিল না। তারা বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত হয়ে যাযাবররূপে বসবাস করত। গোত্রে গোত্রে তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। এ সকল যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারীদেরকে ধরে নিয়ে বিয়ে করত। এ জন্যই আরবগণ কন্যা সন্তানদের জন্মকে অত্যন্ত ভয় ও ঘৃণা করতো এবং পুত্র সন্তান জন্মকে পছন্দ করত। কারণ পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হতো। এবং এ কারণেই আরবগণ কন্যাদেরকে জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করত।[৫৬]

This revolting custom prevailed extensively until it was supressed by Muhammad peace be on him.[৫৭]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহি ওয়াসাল্লাম দমন না করা পর্যন্ত এই নিদারুণ ঘৃণ্য প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও বিমাতার উত্তরাধিকারী হত। সে নিজেই তাকে বিয়ে করতে পারত। অথবা নিজে ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকের সাথে বিয়ে দিতে পারত আর সে তার বিয়ে বন্ধও করতে পারত। মাতা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে হত।[৫৮]

আরব রমণীর স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার ছিল না। পিতা বা তার কোন পুরুষ আত্মীয়ের তার স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। আরববাসীরা তার বৈমাত্রেয় বোন, বিমাতা এমনকি তার বিধবা পুত্রবধূকে বিয়ে করতে পারত। ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধূকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারত।[৫৯]

বস্তুত স্ত্রীর উপর স্বামীর অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্ব নারীর মর্যাদা একেবারে হীন করে দিয়েছিল এবং নারী ভূ-সম্পত্তি ও লাখেরাজ সম্পদরূপেই পরিগণিত হত।

---

৫৫. **তাফসীরে ইবনে কাসীর,** ১ম খণ্ড, পৃ ৪৬৫।

৫৬. Nazira Zei Ed-Din, Edited by Aziah Al-Hibri : **Women and Islam,** P- 222, Pergamon press, Oxford, England.

৫৭. Rustum and Zurayk, **History of the Arabs and Arabic Culture,** Beirut 1940, P- 36.

৫৮. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, Ibid P- 15.

৫৯. Jones Beven, **Woman in Islam,** Luchnow 1951, P. 23, 28, 18-21; Smith, W : **Kinship and Marriage in Ancient Iran,** Bombay 1956, P- 36; Thomas, Bertram : The Arabs, London 1937, P- 16.

Dhaka University Institutional Repository

জগতের তৎকালীন সভ্যতায় যেমন বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তদ্রূপ আরবেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে সরকারি আইনে, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না; বরং সামর্থ্য থাকলে যে যত খুশি বিয়ে করতে পারত।[৬০] তখনকার আরবে প্রতিষ্ঠিত পতিতালয় না থাকলেও নারী-পুরুষের মধ্যে শর্তাধীনে ও অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য পতি-পত্নী সম্পর্ক অবাধেই স্থাপিত হতে পারত। এতদ্ব্যতীত সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে পেশাধারী নর্তকী ও গায়িকা ছিল। তারা অবাধে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করত এবং তারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে বলে জনগণ মনে করত।[৬১]

মোটকথা আরবে সামগ্রিক অবস্থা ছিল চরম দদঅবনতিশীল। অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছিল সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান, অশ্লীলতা, নোংরামী, পাপাচারে ডুবে ছিল সারাদেশ। মানুষ মনুষ্যত্বহীন পশুর মতো জীবন যাপন করত। ভোগের প্রয়োজনে ভাগ্যহীন নারীজাতিকে বেচাকেনার নিয়ম প্রচলিত ছিল। মানুষ হয়েও পুরুষরা নারীদের প্রতি এমন আচরণ করত যেন তারা জড়বস্তু মাটি বা পাথর।

---

৬০. O'Leary De Dacy : **Ibid,** P-191; Thomas, Bertram, Ibid P- 16.
৬১. Ameer Ali : **Ibid,** P- 24-25.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

জন্মগতভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

সম্মান ও মর্যাদার বিচারে সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষের মাঝে ইসলামে কোনই পার্থক্য ও ভেদাভেদ নেই। নারীকে শুধু নারী হয়ে জন্মাবার কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা সম্পূর্ণ জাহিলী ধ্যান-ধারণা,[১] এরূপ চিন্তাভাবনা ইসলাম[২] স্বীকার করে না।[৩]

আল কুর'আনে[৪] সুস্পষ্টভাবে নারীর এ সম্মানকে চিহ্নিত করেছে। আল্লাহ বলেন ঃ

---

১. জাহেলী যুগে নারী সম্পর্কে ধ্যান ধারণা ছিল অত্যন্ত ন্যাক্কার জনক। নারীকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তারা নারীকে ভোগের সামগ্রী মনে করতো। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা ছিল একটি অভিশাপ ও অপমানকর বিষয় তাই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে তাদেরকে জীবন্ত কবর দিতো।

(মুল্লা' মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তফা,** দিল্লী ঃ মাকতাবা 'উমসানিয়ো, ১৯৫৭ খ্রিঃ, পৃ ৭৬)।

২. 'إِسْلَامٌ' শব্দটি باب إفعال এর মাসদার। মূল ধাতু س ل م আভিধানিক অর্থ ঃ মেনে চলা, আনুগত্য করা। পারিভাষিক অর্থ ঃ আল্লাহর প্রতি তাঁর আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া। যে শক্তিশালী বিধানের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, দুনিয়া জাহানের বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সব কিছু তা হচ্ছে এক মহাশক্তিমান বিধানকর্তার সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্টি এবং সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থ এ বিধানকর্তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং সবাই মেনে চলে তাঁরই দেয়া নিয়ম। দুনিয়া জাহানের প্রভু আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম, তাই এদিক দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **ইসলাম পরিচিতি,** ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৯ ইং/১৪০৯ খ্রিঃ, পৃ ৫- ৬)।

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, **নারী** (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রিঃ), পৃ ২৬।

৪. **আল কুরআন ঃ আভিধানিক অর্থ ঃ** আল ফাররা রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর মতে, আল-কুরআন নামটি أَلْقَرَائِنُ থেকে উদ্ভূত। এটি قَرِيْنَةٌ এর বহুবচন, যার অর্থ অনুরূপ। যেহেতু কুর'আনের একটি আয়াত অপর আয়াতকে সত্য প্রতিপন্ন করে এবং এক আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ। এ কারণে তাকে কুর'আন বলা হয়। আল-লিহয়ানী –এর মতে– 'কুর'আন' শব্দটি মাসদার, হামযাযুক্ত, আল-গুফরান এর ওযনে গঠিত এবং قَرَأَ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ পাঠ করেছে। মাসদারকে مفعول অর্থে গ্রহণ করতঃ এখানে কুর'আনকে مَقْرُوْءٌ অর্থাৎ পঠিত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।" উল্লেখিত মতগুলোর মধ্যে শেষ মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। অতএব, আভিধানিক অর্থে القران শব্দ قِرَاءَةٌ এর সমার্থবোধক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرَانَهُ ـ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ـ

অর্থাৎ "এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।" (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল-কিয়ামাহ, আয়াত ঃ ১৭-১৮)

Dhaka University Institutional Repository

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِيْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ـ

অর্থাৎ– নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, জলে ও স্থলে তাঁদেরকে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাঁদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি তাঁদেরকে সৃজন করেছি তাঁদের অনেকের ওপর তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[৫]

এ সম্মান ছিল আদম আলাইহিস্ সালাম[৬] ও তাঁর সন্তান নারী-পুরুষ সবার জন্য। সম্মান ও মর্যাদার মানদণ্ড নারী বা পুরুষ নয়। ইসলাম[৭] ঈমান[৮] ও সৎকর্মকে নারী পুরুষের মর্যাদার মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছে ঃ

এ প্রসঙ্গে আল কুর'আনে আল্লাহ বলেন ঃ

পারিভাষিক অর্থ ঃ আহমদ মোল্লাজিওন বলেন–

اَمَّا الْكِتَابُ فَألقُرْاٰنَ الْمُنَزَّلُ عَلىَ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكْتُوْبَ فِيْ الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلِ عَنْهُ نَقلاً مُتَوَاتِرًا بِلاَ شُبْهَةٍ ـ

অর্থাৎ– "কিতাব বলতে এমন কুরআনকে বুঝায়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে নিঃসন্দেহভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।"

মান্না' আল-কাত্তান বলেন, هُوَ كَلاَمُ اللّٰهِ اَلْمُنَزَّلُ عَلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِه ـ

অর্থাৎ– "কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম –এর ওপর ইহা অবতীর্ণ। এর তেলাওয়াত করা 'ইবাদত।' (জালালুদ্দীন আস-সূয়ূতী, **আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুরআন,** মিসর ঃ মুস্তফা আল বারী, **আল হালবী,** ২য় মুদ্রণ ১৩৭০ হিঃ/১৯৫১ ইং) ১ম খণ্ড, পৃ ৫১; ড. সুবহী সালেহ, **মাবাহিন ফী 'উলূমিল্-কুরআন,** বৈরুত ঃ দারুল-ইলম ১৯৮৫ ইং, পৃ ২১; আহমদ মোল্লাজিওন, **নূরুল-আনওয়ার,** ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮২ খ্রিঃ, পৃ. ৩০)।

৫. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৭০।

৬. **হযরত আদম আলাইহিস সালাম** ঃ প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। জান্নাতই ছিল তার বসবাস। আল্লা তা'আলা তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। পৃথিবীর সকল মানুষ আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম থেকে জন্ম নিয়েছে। তিনি সকল মানুষের পিতা। (ইব্‌ন কাসীর, **আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা,** কায়রো ঃ ঈমান বাবিল হলবী, ১৯৬৪ খ্রিঃ, ১ম খণ্ড, পৃ ১০।

৭. **ইসলাম** ঃ إِسْلاَمْ শব্দটি باب إفعال এর মাসদার। এবং سِلْمٌ মূল ধাতু থেকে নির্গত। শাব্দিক অর্থ মেনে চলা, আনুগত্য করা। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়াই ইসলাম ।

৮. إِيْمَانٌ শব্দটি اَمْنٌ ধাতু থেকে নির্গত। 'আমন' এর সারকথা হচ্ছে, আত্মার প্রশান্তি ও নির্ভীকতা লাভ। এ ধাতু থেকেই أَمَانَةٌ শব্দটি এসেছে। এ হচ্ছে খিয়ানতের বিপরীতশব্দ। এই امن ধাতুরই ক্রিয়ারূপ হচ্ছে ঈমান। এর তাৎপর্য হচ্ছে, মনের ভিতর কোন কথা প্রত্যয় ও সততার সাথে এমনিভাবে দৃঢ়মূল করে নেয়া যেন, তার প্রতিকূল কোন জিনিসের পথ খুঁজে পাওয়া ও প্রবেশ করার কোন প্রকার আশংকা না থাকে। প্রসিদ্ধ মতানুসারে, আন্তরিক বিশ্বাস মৌখিক স্বীকৃতি ও আমলের সমন্বয়ের নাম ঈমান। (ইব্‌ন মানযুর, **লিসানুল-'আরব,** বৈরুত ঃ দারুল ইহইয়াইত্-তুরাসীল আরাবী, তারিখ বিহীন, ১ম খণ্ড, পৃ ১১০)।

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "পুরুষ হোক কি নারী, যে-ই পুণ্যময় কাজ করবে ঈমানদার হয়ে তাকেই আমরা উত্তম পবিত্র জীবন যাপনের সুযোগ দিব এবং তাদের উত্তম আমলসমূহের শুভ প্রতিফল তাদের দান করব।[৯]

অর্থাৎ– মানব জাতির নারী পুরুষ এই উভয় সৃষ্টির মধ্য থেকে যে কেউই উত্তম স্বভাব-চরিত্র ও কাজ কর্মের ধারক হবে। সেই প্রকৃতপক্ষে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে।[১০]

মর্যাদার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনের অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ ـ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ـ

অর্থাৎ– "নিশ্চয়ই যে সব পুরুষ ও যে সব স্ত্রী লোক মুসলমান,[১১] মু'মিন, খোদার অনুগত, সত্য পথের পথিক, ধৈর্যশীল, খোদার সম্মুখে অবনত, সাদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী এবং অধিক মাত্রায় খোদার স্মরণকারী। আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।[১২]

উপরোক্ত আয়াতাবলী থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য অর্জনের উপায় ও মানদণ্ড পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। সুতরাং কুর'আনের আলোকে নারীর ও পুরুষের মর্যাদা সমান।

সভ্যতা সংস্কৃতির নির্মাতা হিসেবে নারী পুরুষের সহযোগী

কুর'আন মাজীদ আমাদের একথাও বলে যে, জীবনের সব রকম তৎপরতা ও উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে সর্বদাই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে। উভয়ে মিলে জীবনের কঠিন ভার বহন করেছে এবং উভয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। মানুষের এ দুটি শ্রেণীর কোনটিকেই কোন জাতির আন্দোলন কোনদিনই গুরুত্বহীন মনে

---

৯. **আল কুরআন,** সূরা ঃ নাহল, আয়াত ঃ ৯৭।

১০. মাওলানা আব্দুর রাহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

১১. **মুসলিম** ঃ ইসলামের অনুগামী বোঝায়। মুসলমান শব্দের মূল হল মুসলিম। আরবী সাহিত্যে শব্দটি ইসলামের অনুসারী বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। (**সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,** ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় খণ্ড, পৃ ২২৩)।

১২. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহযাব, আয়াত ঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের প্রচার ও প্রসার এবং তার বিজয় লাভ ও প্রভাব বিস্তারে নারী ও পুরুষকে যেমন পাশাপাশি কর্ম তৎপর দেখা যায় ঠিক তেমনি বাতিলের উন্নতি ও শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও তারা সমানভাবে অংশীদার হয়ে থাকে।[১৩]

আল কুর'আনের ঘোষণা ঃ

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوْا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ـ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

অর্থাৎ– মুনাফিক[১৪] পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পরের অনুরূপ ভাবাপন্ন, তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভাল ও ন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ ও তাদের ভুলে গেছেন। এই মুনাফিকরাই নিঃসন্দেহে ফাসেক[১৫]।[১৬]

---

১৩. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, অনুবাদ– মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, **ইসলামী সমাজে নারী** (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১ খ্রিঃ), পৃ ৫৫।

১৪. **মুনাফিক** ঃ "নিফাক" শব্দের অর্থ কপটতা, প্রতারণা ধোঁকবাজী, ভণ্ডামী, দ্বিমুখীভাব পোষণ করা। ইসলামী পরিভাষায় অন্তরে কুফর রেখে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাবার আশায় মুখে ঈমানদার সুলভ বাক্য উচ্চারণ ও লোক দেখানো অনুষ্ঠান পালন করাকে নিফাক বলে। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

অর্থ ঃ নিশ্চয়, মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে, আর তুমি তাদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে কাউকেও পাবে না। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১৪৫)।

রাসূল (সঃ) মুনাফিকদের পরিচয় দিতে বলেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চারটি (দোষ) যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোন একটি স্বভাব থেকে যায়। (১) তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে। (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে। (৩) ওয়াদা করলে তা ভংগ করে। (৪) আর সে ঝগড়া করলে, গালাগালি দেয়। (**সহীহ বুখারী,** অধ্যায় ঃ ঈমান অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিকের আলামত, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, মে– ১৯৯১ খ্রিঃ/জ্বিলকদ– ১৪১১, ৪র্থ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৬)।

১৫. **ফাসেক** ঃ ফাসেক এর অর্থ খোদার নির্দেশ অমান্যকারী, তার আনুগত্যের সীমা লংঘনকারী। রাজা বা সম্রাট তাঁর কর্মচারী ও প্রজাগণের প্রতি যে আদেশ বা নির্দেশ দান করেন তাকে আরবী ভাষায় আহদুন (عَهْدٌ) বলা হয়। আল্লাহর "আহদ" অর্থ ঃ তাঁর সেই স্থায়ী ফরমান যাতে সমগ্র মানব জাতিকে একমাত্র তারই আনুগত্য, উপাসনা, বন্দেগী করার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

১৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত-তাওবা, আয়াত ঃ ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض - يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - أُوْلٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ - إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

অর্থাৎ- মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মেয়ে লোক এরা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত রখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।[১৭]

জাহেলিয়াতের যুগে নারি জাতিকে একটি অকল্যাণকর তথা সভ্যতা ও তামাদ্দুনের জন্য অপ্রয়োজনীয় উপাদান মনে করে কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত করেছিল। তাকে অধঃপতনের এমন এক অন্ধকার গুহায় নিক্ষেপ করেছিল যেখান থেকে তার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের আশা করা ছিল বাতুলতা।[১৮]

ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে–

মানব জীবনধারা সমানভাবে নারী ও পুরুষ উভয়েরই মুখাপেক্ষী। নারীকে সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশরূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষকে যেমন উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে– তাকে দেয়া হয়েছে একটা সুস্পষ্ট জীবন লক্ষ্য। নারীদের ব্যাপারে ও ঠিক একথাই সত্য। তার ও জীবন লক্ষ্য সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট। উভয়ের জীবন উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়াই স্রষ্টার ইচ্ছা। বিশ্বলোকের স্রষ্টা যিনি, তিনিই সৃষ্টি করেছেন নারী ও পুরুষ। সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে সাধিত বিপ্লব নারী ও পুরুষের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা সাধনার ফল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ও সঠিক মর্যাদায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করার ঘোষণা দিয়ে বলেন ঃ

عَنْ الْمُغِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتَ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَالِ وَاضَاعَةِ الْمَالِ -

মুগীরা রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য অন্যের সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করা, অতিমাত্রায় যাঞ্চা করা এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা অপছন্দ করেন।[১৯]

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা[২০] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

---

১৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত-তাওবা, আয়াত ঃ ৭১।

১৮. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

১৯. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য অনুবাদক মন্ডলী কর্তৃক অনূদিত, **সহীহ আল-বুখারী,** অধ্যায়; কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ। (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খ্রিঃ) ৫ম খণ্ড, পৃ ৩৯১।

২০. হযরত 'আয়েশা ছিলেন হযরত আবু বকরের কন্যা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নবুওয়াত প্রপ্তির চতুর্থ সনে তাঁর জন্ম। ছয় বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে তাঁর বিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

جَاءَتْنِى إِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا إِبْنَاتَـانِ تَسَـأَلُنِى فَلَـمْ تَجِـدْ عِنْـدِىْ غَـيْرَ تَمَـرَّةٍ وَّاحِـدَةٍ فَأَعْطَتَيْـهَا فَقَسَّمْتَهَا بَيْنَ إِبْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَجَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَحَدَّثْتُـهُ فَقَـالَ مِنْ بُلِىَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سَتْرًا مِنَ النَّارِ ـ

এক মহিলা তার দু'টি মেয়েকে সাথে নিয়ে কিছু চাইতে আমার কাছে আসলো। একটি মাত্র খেজুর ছাড়া সে আমার কাছে কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিল এবং তারপর চলে গেল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। আমি তার কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, আল্লাহ যদি কাউকে কন্যা সন্তানের মাধ্যমে কোন রকম পরীক্ষায় ফেলে থাকেন আর সে যদি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে তাহলে ঐ সব কন্যা সন্তান তার জন্য দোযখের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে।[২১]

মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার আইনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে আইন সবদিক দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ। এ আইন বাস্তবায়িত হলে নারীর পরিপূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বস্তুত ইসলামী আদর্শ[২২] গঠিত সমাজই হচ্ছে মানুষের সকল প্রকার অধিকার বাস্তবায়িত ও কার্যকর রাখার জন্যে দায়ী।[২৩]

কুরআন মাজীদ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُوْلِى الْأَلْبَابِ ـ

অর্থাৎ– "হে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা। আইনভিত্তিক বিচারব্যবস্থা শাণিতভাবে কার্যকর হওয়াতেই তোমাদের জীবন নিহিত।[২৪]

শরী'আতের একটি সামগ্রিক স্থায়ী নীতি হলো, হন্তার প্রাণবধ করা। এ ক্ষেত্রে সে নারীকে হত্যা করেছে না পুরুষকে হত্যা করেছে তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ একজন পুরুষের প্রাণ

হয়। নয় বছর বয়সে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম –এর গৃহে প্রেরিত হন। তাঁর বয়স যখন আঠার বছর তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন। কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ফতওয়া মোটকথা ইসলামী শিক্ষার সকল বিভাগেই তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা কর্তৃক ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ৬৬ বছর বয়সে ৫৭ হিঃ তিনি ইন্তিকাল করেন। (শায়খুল হাদীস মাও. মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, **হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন** (ঢাকা ঃ ১৯৯৮/১৪১৯ হিঃ), পৃ ৯৬৫-৯৬৯।

২১. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ সন্তান-সন্ততিকে আদর স্নেহ করা, (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী), ৫ম খণ্ড, পৃ ৩৯৮।

২২. **ইসলামী আদর্শ,** কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আদর্শই ইসলামী আদর্শ।

২৩. মাও. আব্দুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

২৪. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল-বাকারা, আয়াত ঃ ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন নিষিদ্ধ তেমনি একজন নারীর প্রাণও নিষিদ্ধ ও সম্মানিত। তাই যে হাত এ দু'টির যে কোন একটির খুন দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে সে জন্য নিজের প্রাণের মূল্যই খুইয়ে বসেছে।[২৫]

সুতরাং হত্যাকারী নারী হোক, পুরুষ হোক হত্যাপরাধের শাস্তি স্বরূপ তার প্রাণ হরণ করা হবে; নিহত ব্যক্তি পুরুষ কিংবা নারী হোক।[২৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের জন্য যে সব আইন লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে এ কথাটিও সুস্পষ্টভাবে ছিল ঃ اِنَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ بِالْمَرَاةِ -

কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।[২৭]

عَنْ اَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ يَهُوْ دِيًّا رَضَّ رَأْس جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْن فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هذَا؟ أَفْلَانٌ أَمْ فُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَتِي بِه النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ بِه حَتَّى أقَرَّبه فَرُضَّ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ -

"আনাস ইবনে মালেক রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। জনৈক ইয়াহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে (প্রস্তারাঘাতে) যখম করল এবং বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার এ অবস্থা কে করল? অমুক অমুক অথবা অমুক? তার সামনে কতিপয় লোকের নাম বলা হলো এমনকি সেই ইয়াহুদীটির নাম বলা হলো, (তখন সে একমত হলো)। ইয়াহুদীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আনা হলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম তাকে ততক্ষণ প্রশ্ন করতে থাকলেন যতক্ষণে সে (অপরাধ) স্বীকার করল। অতঃপর দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে তার মাথাও যখম করা হলো।[২৮]

হযরত উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এক মহিলার কিসাসে[২৯] তিনি হত্যার অংশীদার কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন।[৩০]

আবু যানাদ বলেছেন ঃ

২৫. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫।

২৬. মাওলানা আব্দুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

২৭. **আস্‌সুনানুল কুবরা,** ৩য় খণ্ড, পৃ ২।

২৮. **সহীহ বুখারী,** অধ্যায় ঃ দিয়াত, অনুচ্ছেদ ঃ হত্যাকারীকে স্বীকৃতি প্রদান পর্যন্ত প্রশ্ন করা (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, জুন ঃ ২০০১/ রবিউল আউয়াল ঃ ১৪২২), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ২২১।

২৯. قصاص (কিসাস) -এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ কারো ওপর যতটুকু যুলুম করা হয়েছে তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা মাজলুমের জন্য জায়েয। তার চেয়ে বেশী করা বৈধ নয়। সূরা আল বাকারার ১৯ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ অর্থ ঃ "তার ওপর ততটুকু বাড়াবাড়ী কর যতটুকু বাড়াবাড়ী সে তোমাদের ওপর করেছে।" তেমনিভাবে সূরা নহলের ১২৬ আয়াতে রয়েছে- وَاِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِه - আর যদি তোমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাও তবে ততটুকু প্রতিশোধ নাও, তারা তোমাদের কে যতটুকু কষ্ট দিয়েছে।

৩০. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের যে সব ফকীহর মতামত ফিকহ শাস্ত্রে উদ্ধৃতির উপযুক্ত তাদের মধ্যে যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তারা হচ্ছেন সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব,[৩১] উরওয়া ইবন যুবায়ের,[৩২] কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ, আবু বকর ইব্‌ন আব্দুর রহমান, খারেজা ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন সাবিত, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমবাহ, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার এবং তাদের পর্যায়র্ভুক্ত আরো ফকীহ ও জ্ঞানীগণ। তাঁরা সবাই বলেছেন ঃ কিসাসের ব্যাপারে নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নাই। নারীর চোখ, কান এবং যে কোন অঙ্গের জখমের পরিবর্তে পুরুষের (যদি পুরুষ অপরাধী হয়) নিকট থেকে অনুরূপ বদলা নেয়া হবে। আর যদি কোন পুরুষ নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে।[৩৩]

অর্থনৈতিক সমতা

ইসলামী শরী'আতের সীমার মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে শ্রম-সাধনা করার অনুমতি রয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। প্রত্যেকেই আপন শ্রমের মজুরী লাভ করার অধিকারী। কারো মালিকানা কেউ হস্তগতও করতে পারে না। সে মালিক নারী হোক বা পুরুষ। স্বামীও পারে

---

৩১. **সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব** ঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব দ্বিতীয় তব্‌কার প্রখ্যাত তাবেয়ী। মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শীর্ষস্থায়ীন তাবেয়ীদের অন্যতম ছিলেন। যার মধ্যে ফিক্‌হ, হাদীস, দুনিয়া বিরাগ, ইবাদাত গোযারী ও পরহেযগারীর গুণ সমবেত ছিল। এই সবের যে কোন একটির অনুপম আদর্শের জন্য তার প্রতিই ইংগিত করা হত। হযরত আবূ হুরায়রা রাযী আল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সম্ভার এবং হযরত ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু এর প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থার তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ আলেম। বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় এবং তাদের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তাঁর নিকট হতে ইমাম যুহরী ও অন্যান্য বহু সংখ্যক তাবেয়ী রিওয়াত করেছেন ইমাম মাকহুল বলেন, 'ইলমে দ্বীন অন্বেষণে ভূ-পৃষ্ঠ পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছি; কিন্তু ইবনুল মুসাইয়্যাব অপেক্ষা বড় আলেম আমি দেখতে পায়নি। সমস্ত ওলামাদের সম্মিলিত ঐক্যমত ইবনুল মুসইয়্যাবের বর্ণনাকৃত 'মুরসাল' হাদীসমূহ أَصَحُّ الْمُرَاسِيْل বিশুদ্ধ মুরসাল হাদীস। অর্থাৎ مُتَّصِـــل হাদীসের ন্যায় নিঃসংকোচে গ্রহণযোগ্য। হিজরী ৯৩ সালে এই 'বাহরুল উলুম' ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। (এম, আফলাতুন কায়সার অনূদিত, **'আসমাউর রিজাল'**, ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫ খ্রিঃ, পৃ. ৫৬)।

৩২. **ওরওয়া ইবনু যুবায়র** ঃ ওরওয়া ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম ইব্‌ন খুয়াইলিদ আসাদী, কোরাইশী। কুনিয়ত আবু আব্দুল্লাহ (সেকাহ তাবেয়ী ও মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন আয়েশা এবং অন্যান্য প্রবীণ সাহাবাদের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর নিকট হতে তার পুত্র হিশাম ও ইমাম যুহরী প্রমুখগণ রেওয়ায়েত করেন। তিনি ছিলেন তাবেয়ীদের মধ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। মদীনায় খ্যাতনামা যেই সাতজন ফকীহ ছিলেন, হযরত ওরওয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আবু যিনাদ বলেন ঃ মদীনায় আমাদের ফকীহদের মধ্যে যার রায় চূড়ান্ত বলে মনে করা হত তাদের মধ্যে সাঈদ ইবন মুসাইয়াব এবং হযরত ওরওয়া ছিলেন। ইবনে শিহাব বলেন ঃ ওরওয়া ছিলেন অকুল সাগর। তিনি ২২ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। (এম, আফলাতুন কায়সার অনূদিত, **'আসমাউর রিজাল'**, প্রাগুক্ত, পৃ ১১২।

৩৩. আবূ দাঊদ, كِتَابُ الدِّيَةِ ; بَابُ عَضْوُ النِّسَاءِ مِنَ الدَّمِ - كِتَابُ الدم - باب عفوالنساء عن الدم নাসাঈ القِصَاصَةِ। জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

না নিজ স্ত্রীর মালিকানাধীন ধন সম্পত্তি হস্তগত করতে; স্ত্রীও পারে না স্বামীর বিত্ত-সম্পত্তি নিজ ইচ্ছামত ব্যয় ব্যবহার করতে বা উড়াতে।[৩৪]

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْئَلُوْا اللهَ مِنْ فَضْلِه - إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا -

অর্থাৎ– "পুরুষের জন্য তাদের উপার্জনের ন্যায্য অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আর নারীদের জন্যও তাদের উপার্জনের ন্যায্য অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আল্লাহর কাছেই তোমরা তার নি'আমতের জন্য প্রার্থনা কর।[৩৫]

উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভের অধিকার

পুরুষরা যেমন উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে, তেমনি নারীর জন্যেও উত্তরাধিকারের অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। উত্তরাধিকারের লাভের অধিকারের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا -

অর্থাৎ– "পুরুষদের জন্যে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে যেমন প্রাপ্য অংশ রয়েছে। তেমনি নারীদের জন্য পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে। চাই তা কম হোক অথবা বেশি হোক, উভয়ের এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকেই) নির্ধারিত।[৩৬]

ইসলাম উত্তরাধিকার আইনের প্রথম যে মূলনীতি পেশ করে তা হলো ঃ

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ -

একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।[৩৭]

দুই অবস্থায় এ নীতি কার্যকর হবে। প্রথম অবস্থা হলো, ওয়ারিশ ব্যক্তি কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি মৃতের সাথে বৈধভাবে সম্পৃক্ত হবে। যেমন ঃ স্বামী ও স্ত্রী। দ্বিতীয় অবস্থা হলো,

401375

৩৪. মাও. আব্দুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

৩৫. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ৩২।

৩৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ ৭।

৩৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ ১১। ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যেহেতু ভুল বুঝাবুঝি পরিলক্ষিত হয় এবং ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত লোকেরা ধোকায় পতিত হয়। তাই ইসলামের উত্তরাধিকার আইন যে মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আমরা এখানে তার সার সংক্ষেপ তুলে ধরছি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ারিশগণ[৩৮] যদি আত্মীয়তার দিক দিয়ে একই পর্যায়ের হয় এবং আসাবা[৩৯] হিসেবে মৃতের পরিত্যক্ত সব সম্পদের ওয়ারিশ হয়। যেমন মৃতের ছেলে মেয়ে, ভাইবোন ইত্যাদি।

এদু'টি অবস্থায় বাহ্যত নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান করা হয়নি এবং পুরুষের তুলনায় নারীর আর্থিক পজিশন অনেক দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু গোটা পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বাস্তব অবস্থা বিপরীত প্রমাণিত।[৪০] কেউ যদি প্রশ্ন করে, মহিলা দুর্বল ও সম্পদের অধিক মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সম্পদের পুরুষের অর্ধেক দেয়া হয় কেন? এর জবাবে বলা হয় ইসলামী শরী'আত 'মীরাসে[৪১] উভয়ের মধ্যে বিবিধ যুক্তিসংগত কারণে পার্থক্য করেছেন। যেমন ঃ

প্রথমত ঃ মহিলার প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণে তার ব্যয়ভার ছেলে, পিতা, ভাই অথবা অন্যান্য আত্মীয়ের ওপর ওয়াজিব।

দ্বিতীয়ত ঃ মহিলা কারো ব্যয় বহনে আদিষ্ট না। যা পুরুষের বিপরীত, কেননা পরিবার আত্মীয়-স্বজন ও যাদের দাবি তার ওপর ন্যস্ত তাদের ভরণ-পোষণে সে আর্দিষ্ট।

---

৩৮. **ওয়ারিশ ঃ** আভিধানিক অর্থে কোন বস্তু এক সম্প্রদায় থেকে অপর সম্প্রদায় বা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হওয়া, চাই তা বিদ্যা, পদমর্যাদা বা সম্পদ হোক। পরিভাষায় যারা মৃত ব্যক্তি হতে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অথবা শরী'আতের দৃষ্টিতে যে কোন প্রাপ্ত বস্তু লাভ করে। (মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, অনুবাদ কাজী গিয়াস উদ্দিন আহমদ, **ইসলামে উত্তরাধিকার আইন,** ঢাকা ঃ ১৯৯৮ খ্রিঃ/১৪০৯ হিঃ, পৃ ২২-২৩)।

৩৯. আভিধানিক অর্থে 'আসাবা' হলো কোন ব্যক্তি তাঁর পিতার কারণে আত্মীয় হওয়া। আসাবা নাম দেয়ার কারণ হলো তারা তার সাথে সম্পৃক্ত। শক্তিশালী দলকে عُصْبَةٌ বলা হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

قَالُوْا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

"তারা বললো, আমরা একটি শক্তিশালী দল থাকতে যদি তাঁকে (ইউসুফ আঃ) বাঘ খেয়ে ফেলে তাহলে আমরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।" (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ ইউসুফ, আয়াত ঃ ১৪) নিকটবর্তী আত্মীয়দেরকে আসাবাত বলে। যেহেতু তারা আত্মীয় ব্যক্তিকে বিপদের মুহূর্তে সাহায্য করতে ও শত্রু আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পরিবেষ্টিত থাকে। ফারায়েযের পরিভাষায় আসাবা হলো ঐ সকল ওয়ারিশ যাদের অংশ কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। যেমন ঃ ছেলে, ছেলের ছেলে, সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই পমুখ। তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ়। কেননা তারা পিতার মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, মায়ের মাধ্যমে নয়। যেহেতু তার মাধ্যমে সম্পৃক্ত আত্মীয়তা ক্ষীণ ও দুর্বল, যেমন বৈপিত্রেয় ভাই। সে আত্মীয় হয়েছে মাতৃগর্ভের মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়ের মাধ্যমে আত্মীয়দের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি অন্য গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। আসাবার একটি সংক্ষিপ্ত পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণিত আছে তা হলো ঃ "প্রত্যেক এমন ব্যক্তি আসাবা যে একাবস্থায় সব সম্পদের ওয়ারিশ হয়। আর নির্ধারিত অংশের হকদারগণ তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিস্ট সম্পদের সবটাই লাভ করে থাকে।" এ সংজ্ঞাটি ফারায়েয বিশারদদের নিকট সবিশেষ প্রসিদ্ধ। (মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, অনুবাদ ঃ কাজী গিয়াস উদ্দিন আহমদ, **ইসলামে উত্তরাধিকার আইন,** ঢাকা ঃ ১৯৮৮ খ্রিঃ, পৃ ৫০)।

৪০. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮।

৪১. **মীরাস ঃ** মীরাস অর্থ উত্তরাধিকার। মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে যারা পায় তাদের বলা হয় ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত ঃ পুরুষের ব্যয় অপরিমেয় এবং সম্পদের আবশ্যকতা ব্যাপক। সেহেতু তার অর্থের প্রয়োজন মহিলার তুলনায় অধিক।

চতুর্থত ঃ পুরুষ তার স্ত্রীর মোহর[৪২] প্রদান করে এবং সন্তানদের ও স্ত্রীর বাসস্থান এবং অন্ন-বস্ত্রের ব্যয়ভার ও তার উপর ন্যস্ত।

পঞ্চমত ঃ সন্তানদের পড়ালেখার খরচ এবং চিকিৎসা ওষুধ-স্ত্রী ও সন্তানদের সকল ব্যয়ভার পুরুষের ওপরেই ন্যস্ত; মহিলার ওপর নয়।

সংসার জীবনের যাবতীয় ভরণ-পোষণ ও খরচ পুরুষের কাঁধে ন্যস্ত, যা ইসলামী শরী'আতে স্বীকৃত। মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এ সম্পর্কে আদেশ করেন ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ -

অর্থাৎ– "সম্পদশালীদের উচিত যে, সে স্বীয় অবস্থানুসারে ব্যয় করে, এবং যার আয় কম তার উচিত যে, আল্লাহ তাকে যতটুকু দান করেছেন; তা হতে ব্যয় করা।[৪৩]

এ সূক্ষ্ম আলোকপাত দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মাঝে অংশের পার্থক্য সম্পর্কে আল্লাহর মহাহিকমত উদ্ভাসিত হয়েছে– পুরুষের ওপর ব্যয়ভার অধিক, তার সম্পদের আবশ্যকতা ব্যাপক ও অধিক, তাই ন্যায় ও ইনসাফের যুক্তি প্রমাণে তার অংশ অধিক ও ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছণীয়।

এতদসত্ত্বেও ইসলাম পুরুষকে মহিলার দ্বিগুণ প্রদান করেছে,[৪৪] মহিলাদেরকে তাদের ধারণার উর্ধ্বে করুনা ও মর্যাদা দিয়েছে। এ ব্যবস্থায় সে পুরুষের চেয়ে অধিক নি'আমত প্রাপ্ত। কেননা সে কোন প্রকার কষ্ট ব্যতিরেকে 'মীরাসে' শরীক হয়, সে প্রদান না করে গ্রহণ করে, বিনা পরিশ্রমে ভোগ করে, জীবন সংগ্রামে পুরুষের সাথে শরীক না হয়ে ব্যয়ভার ব্যতীত সম্পদ জমা করে ও সুখী জীবনের অনুসন্ধিৎসু।[৪৫]

+প্রচুর ধনাঢ্য অবস্থায় স্বামীর উপস্থিতিতে নিজের বা সন্তানের জন্য ইসলামী শরী'আতে মহিলা তার মাল হতে খরচ অপরিহার্য নয়। কেননা অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান সহ যাবতীয় ব্যয়ভার স্ত্রী এবং সকল সন্তানের স্বামীর ওপর ন্যস্ত। যেমনি আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

---

৪২. যে টাকা বা বস্তু বিবাহিতা নারীকে কোন বিনিময় ব্যতীত স্বামীর পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করা হয় উহাই 'মোহর'। 'মোহর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاٰتُوْا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً -

" আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও।' (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ৪); (মালিক রাম, অনুবাদ মাহমুদা বেগম নেকু, **নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা,** ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ– ১৯৮৭, রজব– ১৪০৭, পৃ ৯৪)।

৪৩. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত-তালাক, আয়াত ঃ ৭।

৪৪. একজন মহিলা কন্যা হিসেবে বাবার সম্পত্তির একটি অংশ পায়, বিয়ের সময় মোহরানা পায়, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর সম্পত্তির একটি অংশ পায় এবং নিজের উপার্জিত সম্পত্তির মালিক হয়। এই সকল সম্পত্তির কোন ক্ষেত্রেই পরিবার অথবা নিজের জন্য ব্যয়ের কোন বাধ্য বাধকতা ইসলামী শরীয়াতে কোন নারীর জন্য নাই।

৪৫. মূল ঃ মুহাম্মদ আলী আস্-সাবুনী, ভাষান্তর ঃ কাজী গিয়াস উদ্দিন আহমদ, **ইসলামে উত্তরাধিকার আইন** (ঢাকা ঃ ১৯৮৮ খ্রিঃ), পৃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

অর্থাৎ– "এবং সন্তানের খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ম মাফিক জন্মদাতার উপরই ন্যস্ত।[৪৬]

একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত ঃ

যেমন, কোন মৃত ব্যক্তি দুই সন্তান– ছেলে মেয়ে রেখে মারা যায় এবং তার পরিত্যক্ত তিন হাজার টাকা। ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী মেয়ে ১০০০ ও ছেলে ২০০০ গ্রহণ করে। উভয়ের বিবাহ সময় উপস্থিত হল। ছেলে শুধু দুই হাজার টাকা নির্ধারিত মোহরের বিনিময়ে বিবাহ সনদে আবদ্ধ হয়, ফলে পিতা থেকে যা ওয়ারিশ হয়েছে, তা স্ত্রীকে মোহর দেয়াতে কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। অতঃপর বিবাহের পর ভরণ পোষণের সকল দায়িত্ব তথা পানাহার বাসস্থান তার ওপরই ন্যস্ত।

পক্ষান্তরে মেয়ে দুই হাজার টাকা মোহরের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে পিতা থেকে এক হাজার টাকার ওয়ারিশ, স্বামী থেকে মোহর বাবদ দুই হাজার টাকা, সর্বমোট তিন হাজার টাকার অধিকারিণী। অতঃপর ধনবান হওয়া সত্ত্বেও তার ওপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। কেননা, তার ভরণ পোষণের ভার স্বামীর, স্ত্রীর বাসস্থান, রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল প্রকার খরচ প্রদানে সে নির্দেশিত। তাহলে মেয়ের সম্পদ বৃদ্ধি পেল আর ছেলের সম্পদ হ্রাস পেলো। পিতা হতে প্রাপ্ত সম্পদ মেয়ের অবশিষ্ট থাকলো ও বৃদ্ধি পেল। পক্ষান্তরে ছেলের প্রাপ্ত সম্পদ বিলুপ্ত ও নিঃশেষ হল।[৪৭]

অভিন্ন আইন ঃ

প্রাচীন ধর্মসমূহ নারী ও পুরুষকে একই মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই সে সব ধর্ম নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা আইন রচনা করেছিল।[৪৮] পক্ষান্তরে ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে সমানভাবে অনুসরণীয় জীবন বিধান বিধিবদ্ধ করেছে। কারোর জন্যে স্বতন্ত্র বা ভিন্নতর কোন ব্যবস্থা দেয়া হয়নি ইসলামে। মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্তও করা হয়নি, নারী ও পুরুষ উভয়ে একই আদর্শের অনুসারী একই পথের পথিক। অধিকারসমূহের তালিকায় নারী পুরুষকে অভিন্ন মর্যাদা দিতে হবে।[৪৯]

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا -

---

৪৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল-বাকারাহ, আয়াত ঃ ২৩৩।

৪৭. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৯-১০।

৪৮. সায়্যিদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৭০।

৪৯. মাওলানা আব্দুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মু'মিন[৫০] পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক যে-ই হোক আল্লাহ এবং তার রাসূল কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ দিয়ে থাকলে সেই ব্যাপারে এদের কারোরই কোন ইখতিয়ার থাকে না।

যে লোকই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, সে-ই সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হবে।[৫১]

ইসলাম নারীকে নগণ্য ও নীচু মর্যাদার এবং পুরুষকে সম্মানিত ও উঁচু মর্যাদার অধিকারী মনে করে আলাদা আলাদা আইন রচনা করেনি। ইসলাম নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা দিয়ে সম্বোধন করে ও অভিন্ন নির্দেশনামা দান করে। পুরুষ ও নারী একই রণাঙ্গণের সৈনিক। তাই তাদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হলেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন।[৫২]

আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, ইবাদত-বন্দেগী, অভ্যাস, আদান-প্রদান ও পারস্পরিক সম্পর্কের কোন ক্ষেত্রেই ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেনি।[৫৩] তবে নারী ও পুরুষ হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই যতটা ব্যতিক্রম হওয়া দরকার, ইসলাম তা স্বীকার করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَال নারীরা পুরুষের অর্ধাংশ।[৫৪] ও সামষ্টিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়।

উদাহরণস্বরূপ মেয়েরা নামাজের সময় কোথায় হাত বাঁধবে? কাফনে মেয়েদের কয়টা কাপড় দিতে হবে আর পুরুষদের কয়টা কাপড় দিতে হবে? মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ কি? এর মধ্যে থেকে মাত্র ছয় সাতটি মাসআলা সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।[৫৫]

বস্তুত ইসলামী জীবন বিধানের দাবি হলো, আইনের ক্ষেত্রে, নৈতিক ক্ষেত্রে এবং অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে একই মর্যাদা দিতে হবে। উভয়ের মর্যাদা ও অমর্যাদার মানদণ্ড এক হবে, উভয়ের উন্নতি ও সফলতার সুযোগ সমান হবে এবং উভয়েরই জানমাল ও ইজ্জত আবরু হিফাজত করতে হবে।[৫৬]

---

৫০. **মুমিন ঃ** ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস, যারা মহান আল্লাহর মূল সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতা, রাসূল, কিতাবসমূহ আখেরাত ও তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে তাদেরকে মুমিন বলে।

৫১. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল আহযাব, আয়াত ঃ ৩৬।

৫২. সায়্যিদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৭১।

৫৩. আল্লামা ইবনুল আবেদীন হানাফী শরঈ আইনের গোটা ভাণ্ডার ঘেটে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরূহ ও নিষিদ্ধ বিষয়ে মাত্র পঁচাত্তরটি ক্ষেত্র এমন খুঁজে পেয়েছেন যেখানে ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছে। এর মধ্যে অধিকাংশ বিষয়েই আবার সামাজিক।

৫৪. **আবু দাউদ,** كِتَابُ الطَّهَارَة - بَابُ فِيْ الرَّجُل يَجِدُ إِحْتِلَامًا فِيْ مَنَامِه
তিরমিযী, أَبْوَابُ الطَّهَارَة - بَابُ فِيْمَنْ يَّسْتَيْقِظُ وَيَرَى بل وَلَا يَذْكُرُ إحتلامًا

৫৫. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনাসর উমরী, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৭২।

৫৬. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭২; মাওলানা আব্দুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারীর সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছেন তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত ঃ মানুষ হিসেবে নারীও পুরুষ সমান।[৫৭]

দ্বিতীয়ত ঃ নারী অভিশাপ নয়, নারী আশির্বাদ।[৫৮]

তৃতীয়ত ঃ সৎকর্মশীল পুরুষ ও নারী উভয়ে জান্নাতে যেতে পারবে।[৫৯]

চতুর্থত ঃ নারী শিশু অপয়া ও অশুভ নয়।[৬০]

---

৫৭. আল্লাহর নিকট সম্মান শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মানদণ্ড হচ্ছে– তাকওয়া। সেখানে নারী ও পুরুষের কোন পার্থক্য করা হয়নি إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ـ

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট প্রিয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে। নারী জাতির প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ করে।

৫৮. রাসূল (সঃ) বলেন– حَبَّبَ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ وَجَعَلْتَ قُرَّةَ عَيْنِى فِى الصَّلٰوةِ بِه ـ

অর্থাৎ– দুনিয়ার বস্তু নিচয়ের মধ্যে অমি ভালবাসি নারী এবং সুগন্ধি আর আমার চক্ষু শীতলকারী হলো নামায। (নাসায়ী, কিতাবু ইশরাতিন নিসা, অনুচ্ছেদ হুব্বুন নিসা)

৫৯. আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ـ

পুরুষ বা নারী যে কেউ নেক আমল করবে ঈমানদার হয়ে, সেই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং এদের কারো প্রতি এক বিন্দু যুলুম করা হবে না। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১২৪)।

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ ـ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ـ

অর্থাৎ– "নিশ্চয়ই যে সব পুরুষ ও যে সব স্ত্রী লোক মুসলমান, মু'মিন, খোদার অনুগত, সত্য পথের পথিক, ধৈর্য্যশীল, খোদার সম্মুখে অবনত, সাদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী এবং অধিক মাত্রায় খোদার স্মরণকারী। আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহযাব, আয়াত ঃ ৩৫)।

এখানে উল্লিখিত নেক কাজগুলোতে স্ত্রী পুরুষের জন্য সমান মর্যাদা ও সমান প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬০. আরবের জাহেলীয়াতের সমাজ কন্যাকে শিশুকে অশুভ ও অপয়া মনে করত। সেখানে কন্যা সন্তানকে ঘৃণা করত তাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হত। কন্যা সন্তানের মুখ দেখতেও রাজি হত না স্বয়ং কন্যার পিতা। ইসলাম এ মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং এ কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। আর কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হলে কিয়ামতের দিনে তাঁর পিতাকে আল্লাহর দরবারে কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ বলেন– وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ـ بِأَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ـ

জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে– কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ তাকবীর, আয়াত ঃ ৮-৯)।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত ঃ কন্যা সন্তান মাটিতে পুঁতে ফেলা নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠত ঃ নারীর সম্মান মেয়ে, স্ত্রী এবং মা হিসেবে।[৬১]

সপ্তমত ঃ নারীকে শিক্ষাদানে ইসলাম প্রবলভাবে উৎসাহ দিয়েছে।[৬২]

অষ্টমত ঃ নারী উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকারী।[৬৩]

নবমত ঃ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সম্মান অধিকার।[৬৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে লোকের কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে ঘৃণার চোখে দেখেনি, তার উপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি। তাকে আল্লাহ তা'আলা বেহেশত দান করবেন। (**আবু দাউদ,** কিতাবুল আদব) (মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯)।

৬১. স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ সমান। তাদের অধিকার ও অভিন্ন। আল্লাহ বলেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

স্ত্রীদের তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২২৮)

মায়ের মর্যাদা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأُمَّـهَاتْ ـ মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। ইসলাম মা হিসেবে যে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন, দুনিয়ার অন্য কোন সম্মানের সাথেই তার তুলনা হতে পারে না। (মাওলানা আব্দুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭২)।

৬২. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلـى كُـلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْـلِمَةٍ "প্রত্যেক মুসলিমের জন্য 'ইল্‌ম বা জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয।"(সুনান ইব্‌ন মাজাহ ঃ (بَابُ فَضْلِ الْعُلَماءِ وَالْحَرْثُ عَلى طَلَبِ العِلمِ) অধ্যায়, ১/৮১; আনাস রাযী আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত)। **ত্বাবরানী ঃ** আল-মু'জামুস সগীর, ১/১৬; আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। আর ১/২৯ পৃষ্ঠায় হুসাইন ইবন 'আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। **আল-মু'জামুল আউসাত ঃ** ৩/২১ বর্ণনা হুসাইন রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে, ৪/২১ বর্ণনা হুসাইন রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে, ৩/২১ ও ৩/২২৯ পৃষ্ঠায় আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। **আল-মুজামুল কাবীর ঃ** ২৪/২৪০, ইবন মাস'উদ রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারী বলেন ঃ উক্ত বর্ণনায় 'উসমান বিন 'আব্দুর রহমান আল ওয়াররাক রয়েছেন, যিনি অপরিচিত এবং এ বর্ণনাতেই হাম্মাদ বিন আবু সুলায়মান রয়েছেন যিনি মুখতালাত। আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু এর বর্ণনাটি আল-বাহরুয যিখার ওরফে মুসনাদ বাযযার গ্রন্থে রয়েছে: ১/১৭২-১৭৩ কিন্তু গ্রন্থ প্রণেতা বলেন ঃ আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত সবগুলো বর্ণনা সহীহ নয়।

تَمِيْزُ الطَّيِّـبُ مِـنَ الْخَبِيْـثِ গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, ইমাম বায়হাকী বলেন, উক্ত হাদীসের মূল ভাষাটি প্রসিদ্ধ বা মাশহুর, তবে এর বর্ণনা দুর্বল। এ হাদীসে অনেক সনদ রয়েছে, যা সবই দুর্বল। ইমাম আহমদ বলেন, এ ব্যাপারে কোন সহীহ্ বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইহ বলেন ঃ বর্ণনাটি সহীহ নয়। ইমাম মুযানী বলেন ঃ উক্ত হাদীসের বর্ণনার অনেক দিক রয়েছে, তাই বর্ণনাটি মর্যাদার দিক দিয়ে হাসান হাদীসের সমপর্যায়ের। শাইখ আলবানী বর্ণনাটি সহীহ ইবন মাজাহতে সংকলন করে বলেন, বর্ণনাটি সহীহ।(১/৪৪)(ইমাম সুয়ূতী, **আদ্দুরারুল মুনতাসিরা ফিল আহদীসিল মুশতাহারাহ,** পৃ১৩০-১৩১)।

৬৩. উত্তরাধিকার হিসাবে সম্পত্তিতে তার অংশের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ বলেন–

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ـ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ

Dhaka University Institutional Repository

দশমত ঃ তালাকের সময় সীমা নির্ধারণ।[৬৫]

অর্থ ঃ পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদের অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশী হোক। এ অংশ নির্ধারিত। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ৭)।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِى أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ - فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ -

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। যদি দুই জনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদেরকে ত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১১)।

৬৪. ইসলাম তালাককে জায়েজ করেছে কিন্তু একে নিরুৎসাহিত করেছে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে।

৬৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

সমস্ত হালাল বস্তুর মধ্যে তালাকই হচ্ছে আল্লাহর সবচেয়ে ঘৃণিত। ইসলামী জীবন বিধানের শিক্ষা হচ্ছে স্ত্রী যদি তোমার অপছন্দীয় হয় তবুও যথাসাধ্য তার সাথে সদ্ভাবে মিলেমিশে জীবন যাপন করার চেষ্টা কর আল্লাহ বলেন–

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ - وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়াদংশ নিয়ে নাও, কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১৯)। কিন্তু যদি মিলেমিশে নাই থাকতে পার তাহলে তোমার এ অধিকার আছে যে, তাকে তালাক দাও। কিন্তু একত্রে তালাক দেয়া জায়েজ নয়। এক এক মাসের ব্যবধানে এক এক তালাক দাও। তৃতীয় মাসের শেষ নাগাদ তুমি চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাবে। হয়তোবা সমঝোতার কোন উপায় বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ বলেন–

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ - وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الأٰخِرِ - وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوْا إِصْلَاحًا - وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ - فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ - وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا أَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ - فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ - فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا - وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ -

অর্থ ঃ আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

একাদশত ঃ ইসলাম স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে চারে নামিয়ে এনেছে।[৬৬]

দ্বাদশত ঃ নারীকে প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় অভিভাবকদের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করেছে। আর বয়োপ্রাপ্তির পর আর্থিক দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরিভাবে পুরুষের সমান অধিকার ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।

ইসলাম জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নারীকে ঠিক সেই মর্যাদা দান করেছে যা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ও মানানসই। সেই তিনটি ক্ষেত্র হলো ঃ

১. মানবিক ক্ষেত্র ঃ

এ ক্ষেত্রে সে নারীকে পুরুষের ন্যায় পূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও অধিকার ও তার মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দান করেছে। অথচ অতীতের অধিকাংশ সভ্যজাতি হয় এ ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, নতুবা এটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

২. সামাজিক ক্ষেত্র ঃ

ইসলাম নারীর সামনে শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে এবং তার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান নির্ধারণ করেছে। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তার বয়স যত বাড়ে, তার সম্মান তত বৃদ্ধি পায়। শিশু থেকে স্ত্রী, এবং স্ত্রী থেকে মায়ে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে বিশেষতঃ বার্ধক্যে তার জন্য বাড়তি প্রীতি, ভালবাসা, ভক্তিশ্রদ্ধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

৩. আইনগত ক্ষেত্রে ঃ

বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই ইসলাম নারীকে তার সকল কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছে। পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধানের কোন কর্তৃত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়নি।[৬৭]

তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে নারীদের ওপর পুরুষেদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। তালাকে 'রাজঈ' হল দুবার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুত যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালিম। (**আল কুরআন,** সুরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২২৮-২২৯)।

৬৬. ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নরনারীর নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্বের সংরক্ষণ। আর এজন্য ইসলাম যেমন বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন এবং বিশেষ কারণে যদি একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে সে তা করতে পারে। তবে তার শেষ সীমা হচ্ছে চারজন পর্যন্ত।

৬৭. ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী, অনুবাদ আকরাম ফারুক, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী** (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার), পৃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য

এ সব সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছে। তবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, মানবতা, যোগ্যতা ও মর্যাদার ব্যাপারে ইসলাম মানুষে মানুষে ও নরনারীতে যে সাম্যের সৃষ্টি করেছে, তার সাথে এই পার্থক্যের কোন সম্পর্ক নেই। বরং ইসলাম এ পার্থক্যগুলো অনুমোদন করেছে শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের তাগিদে।

পার্থক্যগুলো কোথায় কোথায় অনুমোদন করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে

কারো পাওনা বা অধিকার নিরূপণের জন্য যে সাক্ষ্য দেয়া হয়, তার ক্ষেত্রে ইসলাম দু'জন সত্যভাষী পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীর সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করেছে। ঋণদানের বিধান সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰهُمَا الأُخْرٰى -

অর্থাৎ- "তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর। দু'জন পুরুষ সাক্ষী যদি না পাওয়া যায়, তাহলে এমন একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর, যাদের ওপর তোমরা সন্তুষ্ট, যাতে একজন স্ত্রীলোক ভুলে গেলে অপর স্ত্রীলোক তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"[৬৮]

উক্ত আয়াতের মর্মবাণী হলো, দু'জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে। কারণ মহিলারা পুরুষের তুলনায় বেশি আবেগপ্রবণ। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শিশুদের যত্ন ও পরিবারের পরিচর্যার জন্য আবেগ প্রবণভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের এ আবেগ প্রবণতাই পরিপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে অপূর্ণ চেতনার প্রতি ধাবিত করে। এর জন্য তারা আদালত কর্তৃপক্ষের সামনে জবানবন্দীতে যা বলা দরকার তার অনেকাংশ ভুলে যায়। উক্ত আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, একজন ভুল করলে, তাদের আরেকজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে।[৬৯]

আর এখানে 'ভুল করার' মর্মার্থ হলো, ভুলে যাওয়া তাই একজন অন্যজনকে মনে করিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহই তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সবচে'য়ে বেশি পরিজ্ঞাত। নারীদের সৃজনের সময় আল্লাহ তা'আলা আবেগের মাত্রা বেশি দিয়েছেন, সে বিষয়েও তিনি অধিক জ্ঞাত। তাই আদালতী কার্যক্রমে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক। কিন্তু মেয়েলী সংক্রান্ত বিশেষ

---

৬৮. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল বাকারাহ, আয়াত ঃ ২৮২।

৬৯. মূল ঃ মুহাম্মাদ সায়্যিদ আস সাফতী, অনুবাদ, মামূদুল হাসান ইউসুফ, **মুসলিম নারী প্রসংগ** (ঢাকা ঃ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ খ্রিঃ), পৃ ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ ব্যাপারে মহিলাদের সাক্ষ্যই রায়ের জন্য পরিপূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। যথা ঃ 'দুধ পান করানো সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে।"[৭০]

২. উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে

ইসলামই নারীর মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী বিধিতে নারীর অংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।[৭১]

৩. নারী হত্যার জরিমানা বা দিয়াত

যে মহিলাকে ইচ্ছাকৃতভাবে নয় বরং ভুলবশত খুন করা হয়েছে বা যে মহিলার হত্যাকারী প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ না হওয়ায় কিসাস বা প্রাণদণ্ড থেকে অব্যহতি পেয়েছে। তার জন্য শরীয়াত অর্থদণ্ড তথা দিয়াতের ব্যবস্থা করেছে। এই দিয়াত হচ্ছে একই পন্থায় নিহত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।[৭২]

৪. রাষ্ট্র প্রধানের পদ

কোন নারী রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না এরকম কোন আয়াত আজ পর্যন্ত আমরা কুর'আনে পাইনি। এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ - لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ اَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً

নিজেদের শাসন ক্ষমতা কোন স্ত্রীর হাতে অর্পন করে এমন জাতির কল্যাণ নেই।[৭৩]

---

৭০. **সহীহুল বুখারী,** সাক্ষ্য প্রদান অধ্যায়, (باب أذا شهد شاهدا أو شهود بشئ) ৫/২৫১; **সুনানু তিরমিযী,** দুধ পান করানো অধ্যায়, (باب ما جاء فى شهادة المراة الواحدة فى الرضاع) ৩/৪৫৭ হাদীসটি হাসান সহীহ; **সুনানু আবূ দাউদ,** রায় প্রদান অধ্যায়, (باب الشهادة فى الرضاع) সবগুলো বর্ণনা 'উকবা ইব্‌ন হারিম থেকে।

৭১. উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর সম্পদ প্রাপ্তির কম বেশি প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যবধান নয়। বরং একজন নারী আর্থিক দায়দায়িত্ব পালন ছাড়াই স্বামী ও বাবার পক্ষ থেকে সম্পদের মালিক হন ও মোহরানা সহ নিজের উপার্জিত সমুদয় অর্থের মালিক হন।

৭২. ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে কোন পার্থক্য নেই। কারণ মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান। উভয়েই প্রাণ বা জীবনের মূল্য সমান। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের বেলায় ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করতেই হয়। যে সন্তানদের পিতা এবং স্ত্রীর স্বামী অনিচ্ছাকৃত সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ডের স্বীকার হয় তারা যে তাদের ভরণ-পোষণকারী থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সন্তানদের মাতা এবং যে স্বামীর স্ত্রী অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে মারা যায়, তারা একটা মানসিক ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হয়ে থাকে, যা টাকা পয়সা দিয়ে পূরণ করা যায় না। তবে যদি কোন পরিবারের মাতাই ভরণ-পোষণকারী হন সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে। (মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রথম সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮)।

৭৩. এ হাদীসে কেবলমাত্র সর্বোচ্চ শাসক বা রাষ্ট্র প্রধানের পদটাই বুঝানো হয়েছে কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাটা তখনই বলেছিলেন, যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, পারস্যের সম্রাটের মৃত্যুর পর পারস্যবাসী তাঁর এক কন্যাকে দেশের শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে। তাছাড়া নারী কোন পর্যায়েই কোন শাসন ক্ষমতা ভোগ করতে পারবে না এই মর্মে কোন সর্বসম্মত বিধান ইসলামী আইনে নেই। ইমাম আবু হানিফার মতে ক্ষেত্র বিশেষে নারীকে বিচারকের পদে নিযুক্তি করা বৈধ এই বিচারকের পদটি একটি প্রশাসনিক পদ। (শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৮; ডঃ মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৮)।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এ ব্যাপারে মুজতাহিদের ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব এবং মুসলমানদের অবস্থানের আলোকে।

সারকথা এই যে, নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্য তাঁর যোগ্যতা ও মর্যাদার স্পষ্ট স্বীকৃতি দেয়ার পর ইসলাম তার স্বভাব প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী এবং যে যে কাজ বা কর্মক্ষেত্র তার স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থি ও অনুপযোগী কিংবা সমাজে তার স্বভাবসুলভ ভূমিকা পালনের পথে অন্তরায়। সেই সেই কাজ ও কর্মক্ষেত্র থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছে। দুনিয়ার সকল জাতিতে ও সকল যুগে কিছু কিছু আইন ও বিধি কিছু কিছু নাগরিকের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। এরূপ নির্দিষ্টকরণের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে বিশেষ স্বার্থ ও কল্যাণ সাধন। নাগরিকের মধ্যে যোগ্যতা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা নয়।[৭৪]

৭৪. ডঃ মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার

দুহিতারূপে নারী

ইসলাম নারীর ব্যাপক মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাক ইসলামী যুগে নারীরা ছিল সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণ তৎকালীন যুগে পিতা-মাতার জন্যে সবচেয়ে বেশি অপমান ও লজ্জাকর ছিল। কারোর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে বলে সংবাদ দেয়া হলে পিতার চেহারা মলিন হয়ে যেত। লজ্জা এবং অপমান থেকে মুক্তির জন্য কোন পিতা তার কন্যাকে নিজ হাতে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধাবোধ করতো না। প্রাক ইসলামী যুগে নারীর যখন এ অবস্থা, ঠিক তখনই পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হন রাহমাতুল্লিল আ'লামিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি কন্যা সন্তানের লজ্জা ও অপমান থেকে মুক্ত করে তাদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং কন্যা সন্তানের লালন পালনকে জান্নাত লাভের উপায় বলে ঘোষণা করেন।[১]

ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে যার সামান্যতম ধারণা রয়েছে, সে কখনো অস্বীকার করতে পারবে না যে, নারীকে এক সময় জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে সমাহিত করা হতো। এ কথা শুধু ইতিহাসেই নয়, বরং কুরআনুল কারীমও এ ব্যাপারটিকে চিহ্নিত করেছে ঃ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ـ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ
مَا بُشِّرَ بِهٖ ـ أَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ـ اَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

"তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হলে, তার মুখ বিষাদে কালো হয়ে যায়, এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শুনানো সংবাদের গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে ভাবতে থাকে, হীনতা ও অপমান সহ্য করে তাকে বাঁচতে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তাদের সিদ্ধান্ত অতীব নিকৃষ্ট।[২]

কুর'আনুল কারীম আরব্য পরিবেশে নারী নির্যাতনের শুধু সমালোচনাই করেনি বরং তাদের অপরাধবোধের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, সাথে-সাথে অপরাধীদের জন্য অঙ্গীকার করেছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। ইরশাদ হচ্ছে–

---

১. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ** (ঢাকা ঃ আর, আই, এস, পাবলিশেন্স, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর– ১৯৯৫, জামাদিউস সানি– ১৪১৬), পৃ ১৪৬।

২. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নাহল, আয়াত ঃ ৫৮-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

بِاَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ـ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ـ

অর্থাৎ– "যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল"? আর যখন আমলনামাসমূহ উন্মুক্ত হবে।[৩]

কুর'আনুলকারীম মেয়ে শিশুর প্রতি চরম বর্বরতার জাহেলী অপরাধমালা প্রকাশ করতে থাকে। নিষ্পাপ মেয়ে শিশুটি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেনি, বরং সকল সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃজন করেছেন, তার অবয়ব কাঠামো দিয়েছেন। নারী-পুরুষের বৈচিত্র্য না হলে মানব সমাজ টিকে থাকতে পারতো না, আর মানবতার বিকাশ সাধিত হতো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান রয়েছে যাকে পুঁতে ফেলা হয়নি বরং পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়নি, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে রয়েছে এবং জীবনে তাদের সুখে–দুঃখে ধৈর্য ধারণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কারণে তাঁর করুণায় সে ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ঃ দু'জন হলে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দু'জন হলেও। আবার প্রশ্ন করা হলো, একজন হলে? উত্তর হলো ঃ একজন কন্যা সন্তান হলেও।[৫]

যাকে দুইটি কন্যা সন্তান দান করা হয়েছে অথবা যে ব্যক্তি দুইটি বোনের ভার গ্রহণ করেছে এবং সে তাদের সাথে ধৈর্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, সে এবং আমি বেহেশতে এভাবে থাকব। এ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তর্জনি ও মধ্য আঙ্গুলীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।[৬]

ইসলাম মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার ও নিন্দাবাদ উচ্চারণ করেছে। কুর'আনে আল্লাহপাক বলেন–

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ـ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ـ

---

৩. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত তাকবীর, আয়াত ঃ ৮-৯।

৪. ইমাম হাকিম ঃ **মুসতাদরাক,** ৪/১৭৭, ইব্ন আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি এ বর্ণনাকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম যাহাবী এতে একমত পোষণ করেছেন; **আবু দাউদ শরীফ,** কিতাবুল আদাব; **মেশকাত শরীফ।**

৫. ইমাম হাকিম ঃ **মুসতাদরাক,** ৪/১৭৬, আবূ হুরায়রা রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বর্ণনাটি সহীহ। ইমাম যাহাবী রাযী আল্লাহু 'আনহু এতে একমত পোষণ করেছেন; মেশকাত শরীফে এ হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে।

৬. ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (র), **রিয়াদুস সালেহীন** (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার, একাদশ প্রকাশ, মহররম– ১৪২২, এপ্রিল– ২০০১), পৃ ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

"যারা নিজেদের সন্তানদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৭]

ইসলাম নারীকে জীবনসঙ্গী নির্বাচন ও যার সাথে সারা জীবন অতিবাহিত করবে তাকে যাচাই বাছাই করার অধিকার দিয়েছে। তার অপছন্দের পাত্রকে বিয়ে করার জন্য তাকে বাধ্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। যেমন নারী মুক্তির অগ্রদূত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

পূর্বে বিবাহিতা মেয়ে পরবর্তী বিয়েতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিভাবকের চেয়ে নিজে অগ্রাধিকারিণী। আর কুমারী মেয়ের কাছ থেকেও সম্মতি চাইতে হবে; নিরবতাই সম্মতির লক্ষণ।[৮]

হযরত খানসা বিনতে খাদ্দাম আনসারী রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। পূর্বের বিয়ে ছিন্ন হওয়ার পরে তার পিতা তাকে অন্যত্র বিয়ে দেন এবং তিনি ছিলেন প্রাপ্ত বয়স্কা। কিন্তু তিনি তা অপছন্দ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিয়ে বাতিল করে দেন।[৯] বিনা অনুমতিতে বিধবাকে বিয়ে দেয়া যাবে না এবং সম্মতি ব্যতিরেকে কুমারীকেও বিয়ে দেয়া যাবে না।[১০]

তাছাড়া স্বামী অপছন্দ হলে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারও নারীর রয়েছে। যদি স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি কোন অসদাচরণ না করা হয়, তাহলে স্বামীর স্বীকৃতির মাধ্যমে তা হতে পারে অথবা বিচারকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দেয়া যাবতীয় সম্পদ ফেরত দেয়া সাপেক্ষেও হতে পারে। যেমন হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاس أَنَّ إِمْرَأَةَ ثَابِتِ ابْن قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَقَالَتْ يا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثَابِتِ بْنَ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَّلاَ دِيْنٍ وَلٰكِنِّيْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ـ إِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً ـ

---

৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আনআম, আয়াত ঃ ১৪০।

৮. **সহীহ মুসলিম,** বিবাহ অধ্যায়, ২/১০৩৭; **সুনান আবূ দাউদ**, বিবাহ অধ্যায়, ২৩২; **সুনান তিরমিযী,** বিবাহ অধ্যায়, ৩/৪১৬; **সুনান নাসাঈ,** বিবাহ অধ্যায়, ৬/৮৫; **সুনান ইবন মাজাহ,** বিবাহ অধ্যায়, ১/৬০১; **মুসনাদ আহমদ,** ১/২১৯ সবাই ইবনে আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

৯. **সহীহ বুখারী**, বিবাহ অধ্যায়, কন্যার অসম্মতিতে কোন পুরুষের সাথে তাকে বিবাহ দিলে তা বাতিল সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১১শ খণ্ড, পৃ ১০০।

১০. **সহীহ বুখারী,** কিতাবু নিকাহ, পিতা তাঁর প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী কন্যাকে তার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেবে না অনুচ্ছেদ, ১১শ খণ্ড, পৃ ৯৬; **সহীহ মুসলিম,** বিবাহ অধ্যায়; বিবাহের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্কার অনুমতি নেয়া এবং চুপ থাকা অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সাবেত ইব্ন কায়েস রাযী আল্লাহু 'আনহু এর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার স্বামী সাবেতের চরিত্র বা দীনদারী সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি তার সাথে অবাধ্যতার আশংকা করছি। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তা কি তুমি ফেরত দেবে? সে বললো জি হ্যাঁ। এরপর সে বাগানটি ফেরত দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত রাযী আল্লাহু 'আনহু কে আদেশ করলেন এবং তার বিচ্ছেদ করিয়ে দিলেন।[১১]

কন্যার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আচরণ

'হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফাতেমা রাযী আল্লাহু 'আনহা পায়ে হেঁটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে আসলেন। তাঁর হাঁটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর হাঁটার মতো। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার কন্যার আগমন শুভ হোক। এরপর তিনি তাঁকে ডান বা বাম পাশে বসালেন।'[১২]

আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ ফাতেমা রাযী আল্লাহু 'আনহা যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে আসতেন, তখনই তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজ আসনে বসাতেন।[১৩]

মিসওয়ার ইবনে মাখারামা রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফাতিমা আমার শরীরের অংশ, যে তাকে অসন্তুষ্ট করে সে আমাকেই অসন্তুষ্ট করে।[১৪]

একথা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নারী শুধুমাত্র পুরুষের আজ্ঞাবাহী নয় এবং তার ইচ্ছা, সংকল্প ও মননের স্বাধীনতাও কেড়ে নেয়া হয়নি। বরং তাদের উভয়ের সম্পর্ক হলো ভালবাসা ও হৃদতার সম্পর্ক। আর যখনই এই ভালবাসা ও হৃদতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তখনই শরীয়তসম্মত উপায়ে বৈবাহিক বন্ধন সূত্র বিচ্ছিন্ন করা যায়।

---

১১. **সহীহ আল বুখারী**, তালাক অধ্যায়, খোলা অনুচ্ছেদ, ৫ম খণ্ড, পৃ ১২২। স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে তার নিকট থেকে স্ত্রী কর্তৃক আদায়কৃত তালাককে খোলা তালাক বলা হয়।

১২. **সহীহ বুখারী,** মর্যাদা অধ্যায়, ইসলামে নবুয়তের চিহ্ন অনুচ্ছেদ, ৭ খণ্ড, পৃ ৪৪০; **সহীহ মুসলিম,** সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, নবী (স) কন্যা ফাতেমার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খণ্ড, পৃ ১৪৩।

১৩. ইবনে হাজার আসকালানী, **ফতহুল বারী,** ৯ম খণ্ড, পৃ ২০০।

১৪. **সহীহ বুখারী,** চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, রাসূল (সঃ) –এর নিকটতমদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ ৮০; **সহীহ মুসলিম,** সাহাবীদের গুণাবলি অধ্যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কন্যা হযরত ফাতিমা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর গুণাবলি অনুচ্ছেদ ৭ম খণ্ড, পৃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে অনেক সময় পুত্র সন্তান না দিয়ে কেবল কন্যা সন্তানই দিয়ে থাকেন। এর দ্বারা আল্লাহপাক পিতামাতাকে এ পরীক্ষা[১৫] করতে চান যে, পিতা এ সকল কন্যা সন্তানদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেন, যারা চিরদিন পিতামাতার সঙ্গে থাকবে না, পিতামাতাকে আয় রোজগার করে খাওয়াবে না বরং বড় হয়ে স্বামীর গৃহে চলে যাবে। এমতবাস্থায় যদি এ সকল কন্যা সন্তানদের আদর স্নেহ দিয়ে বড় করা হয়, তাহলে এটা পিতামাতার জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায় হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন–

"একদিন এক মহিলা তার দুটি কন্যা সন্তান নিয়ে আমার নিকট আসলেন এবং কিছু সাহায্য চাইলেন। আমি খুরমাটি তাকে দিয়ে দিলাম। মহিলা খুরমাটি দুইভাগ করে সন্তান দুইটিকে দিয়ে দিলেন কিন্তু নিজে একটুও খেলেন না। তারপর তিনি চলে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করলেন এবং আমি ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সথে সুন্দর ব্যবহার করবে, কেয়ামতের দিন তারা অর্থাৎ এ সকল কন্যা সন্তানেরা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে দেয়াল হয়ে যাবে।[১৬]

কন্যা সন্তানকে যতদিন পর্যন্ত বিবাহ দেয়া না হবে ততদিন পিতামাতার দায়িত্ব হলো সন্তানকে আদর সোহাগ দিয়ে লালন-পালন করা, সুশিক্ষা দেয়া এবং সৎপাত্রে বিয়ে দেয়া। কিন্তু কন্যা সন্তানের উপর পিতার দায়িত্বকে ইসলাম এখানেই শেষ করে দেয়নি। কন্যা সন্তানের দৈহিক ত্রুটি ও অসৌন্দর্যের কারণে যদি তার বিয়ে না হয় অথবা বিয়ের পর যদি সে তালাক প্রাপ্তা কিংবা বিধবা হয়ে পিতার গৃহে ফিরে আসে তখনো কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতাকে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাকা[১৭] বিন মালিক রাযী আল্লাহু 'আনহু–কে লক্ষ্য করে করে বলেছেন–

---

১৫. **পরীক্ষা** ঃ আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জানমাল সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করবেন বলে কুর'আনে উল্লেখ করেছেন। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারবেন তারাই সফলকাম হবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ - وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ -

অর্থাৎ– আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানি হ্রাসের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। তাহাদেরকে সুসংবাদ দাও যারা এই সব অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ১৫৫)।

১৬. ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (র), **রিয়াদুস সালেহীন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১১, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৭. **সুরাকা ইবন মালিক (রা)** ঃ সুরাকা ইবন মালিক রাযী আল্লাহু 'আনহু যিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কে

Dhaka University Institutional Repository

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ إِبْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ ـ

অর্থাৎ "আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সাদকার কথা বলবো না? তোমার কন্যা যখন (নিরুপায় হয়ে, বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে স্বামীর গৃহ হতে) তোমার নিকট ফিরে আসে, আর তুমি ব্যতীত তাকে রোজগার করে খাওয়াবার কেউ না থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন– বিধবা ও মিসকীনদের জন্য চেষ্টা তদবীরকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর রোযা পালনকারী ব্যক্তির সমতুল্য।"[১৮]

এ অবস্থায় কন্যার ভরণ-পোষণের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা হচ্ছে পিতার উত্তম সদকা। এতে করে পিতামাতা যাতে অসন্তুষ্ট না হয় এবং নিজের ও সন্তানের উপর কোন প্রকার বদদোয়া না করে সে জন্যও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতামাতাকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

কোন শিশু সন্তানের পিতা যদি মারা যায় তাহলে মাতার উচিত শিশু সন্তানদেরকে আদর স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করা। সন্তান কন্যা হোক বা পুত্রই হোক। এ অবস্থায় মাতা অর্থাৎ বিধবা স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে এ অধিকার ইসলাম তাকে দিয়েছে। দ্বিতীয় স্বামী যদি এতীম সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন তাহলে এটা তার জন্যে সওয়াবের কাজ হবে এবং আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবেন। দ্বিতীয় স্বামী যদি এতীম সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় কিংবা বিবাহপূর্ব সময়ে

হত্যার জন্য চর্তুদিকে হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করে। কোনভাবেই যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না তখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তীস্থানে বসবাসরত গোত্রগুলোতে তারা ঘোষণা করে দিল কোন ব্যক্তি মুহাম্মদকে জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় ধরে দিতে পারলে তাঁকে একশটি উন্নত জাতের উট পুরষ্কার দেয়া হবে। এই পুরষ্কারের আশায় সুরাকা বর্ম পরে অস্ত্র–শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো। সে ছিলো গোত্রের দক্ষ ঘোড় সওয়ারদের অন্যতম। সে ছিল দীর্ঘদেহী, বিশাল বপুধারী, পদচিহ্ন বিশারদ ও বিপদে দারুণ ধৈর্যশীল। সর্বোপরি সে ছিল একজন বুদ্ধিমান কবি। তার ঘোড়াটি ছিল উন্নত জাতের। কিন্তু আল্লাহর অসীম কুদরতে ঘোড়াটি দুই বার হোঁচট খেল এবং সুরাকা ছিটকে দূরে পড়ে গেল। সেখান থেকে সুরাকা মুহাম্মদ (সঃ) কে দেখতে পেল, সে তীর ছুঁড়তে গেলে তার দুই হাত অসার হয়ে গেল এবং গোড়ার পা মাটিতে দেবে গেল। প্রচণ্ড ধুয়া উঠে ঘোড়া ও তার চোখ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ঘোড়াটি স্থির হয়ে গেল। সুরাকা আল্লাহর রাসূলের কাছে ওয়াদা করল যে, সে তাদের কোন ক্ষতি করবে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে ঘোড়ার মুক্তির জন্য দোয়া চাইল। কিন্তু মুক্তির পর আবারও বিশ্বাসঘাতকতা করল। এবার তার ঘোড়া লোহার মত স্থির হয়ে গেল। সুরাকা আবারও প্রতিজ্ঞা করল সে পিঁছু হটে যাবে এবং অন্য লোকদেরকেও হঠাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি চাও। আমাকে এ কথা লিখে দাও যে, যখন তুমি বিজয়ী হবে তখন আমাকে সম্মান দিবে। আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহা তাকে এ কথা লিখে দিলেন। সুরাকা ফিরে যাওয়ার উপক্রম করছে এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুরাকা তুমি যখন কিসরার রাজকীয় পোশাক পরবে তখন কেমন হবে। বিস্ময়ের সাথে সুরাকা প্রশ্ন করলো 'কিসরা ইব্ন হুরমুজ' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ 'কিসরা ইব্ন হুরমুজ' পরবর্তীতে এই ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছিল। এ ঘটনার জন্য সুরাকা ইব্ন মালেক রাযী আল্লাহু 'আনহু ইতিহাসে বিখ্যাত ছিলেন। সুরাকা চব্বিশ হিজরীতে হযরত উসমান রাযী আল্লাহু 'আনহু এর খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেন।

১৮. **ইব্ন মাজাহ; সহীহ আল বুখারী,** ৫ম খণ্ড, ভরণ-পোষণ অধ্যায়, পৃ ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি দিলেও বিবাহোত্তর এ ব্যাপারে আশংকা দেখা দিতে পারে বলে মনে হয়, তাহলে এ অবস্থায় এতীম সন্তানদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে বিধবা স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ না করার জন্য আল্লাহর রাসূল উপদেশ দিয়েছেন এবং এটাই উত্তম কাজ। যদি কোন বিধবা স্ত্রী তার এতীম সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজকে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত ও পবিত্র রাখে এবং কোন প্রকার যৌন লাম্পট্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন যাপন করে যায়, তাহলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে বেহেশতে পাশাপাশি অবস্থান করবে বলে বলা হয়েছে।[১৯] এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আমি এবং বিবর্ণা চেহারার ঐ মহিলা কিয়ামতের দিন এ দু'টি আঙুলের ন্যায় পাশাপাশি অবস্থান করব (ইয়াযিদ ইবনে যুরাই রাযী আল্লাহু 'আনহু এ হাদিস বর্ণনাকালে মধ্যমা ও শাহাদত আঙুলের দিকে ইংগিত করেছেন) যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী রমণীর স্বামী মারা গিয়েছে এবং সে স্বামীর ঔরসজাত এতীম সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের পৃথক হওয়া অথবা মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রয়েছে।[২০]

এমনিভাবে ইসলাম একটি মেয়ের জন্মকে বাবা মায়ের জন্য সম্মান ও মর্যাদার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। সাথে সাথে সে বাবা মা এই কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব ও স্নেহ ভালবাসা দিয়ে লালন পালন করবেন এই দায়িত্ব পালনই তাঁদের নাজাতের কারণ হবে বলে আল্লাহ সুবহানু তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন। সুতারাং কন্যা হিসেবে প্রতিটি মেয়েরই নিজস্ব মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অথবা আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে চাইলে নিজের ইচ্ছাকে কুরবাণী করার স্বাধীনতা রয়েছে। একমাত্র ইসলামই কন্যা হিসেবে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে।

সহধর্মিণীরূপে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

তদানীন্তন আরব সমাজ, সমগ্র জাতি, দেশ, সমাজ, সভ্যতায় স্ত্রী হিসেবেও নারীদের চরম অমর্যাদা অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন ভোগ করতে হত। স্বামীর ঘরে জীবন সাথী হিসেবে সম্মান বা অধিকার দেয়া হত না। বরং হীন, নগণ্য ও দয়ার পাত্রী মনে করা হত এবং নিতান্ত দাসী-বাদীর মত ব্যবহার করা হত তাদের সাথে।[২১]

---

১৯. মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আশরাফি, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯।

২০. **আবু দাউদ; সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল আদাব, ইয়াতীম লালন পালনের মর্যাদা অনুচ্ছেদ, পৃ ৪০২।

২১. আবদুর রহিম মাওলানা মুহাম্মদ, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন** (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১২১৭, নবম প্রকাশ, জিলহজ্জ- ১৪১৯, মার্চ- ২০০০), পৃ ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম একজন স্ত্রী হিসেবে নারীদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। প্রথমতঃ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা নারী বলে মৌল অধিকারের[২২] দিকে দিয়ে পুরুষদের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। আল্লাহ বলেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

অর্থাৎ– স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।[২৩]

একমাত্র ইসলামই স্ত্রী হিসেবে নারীদেরকে তাদের লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে মুক্ত করে মর্যাদা ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার অধিকার প্রদান করেছে। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُـوا شَـيْئًا وَّيَجْعَـلَ اللّٰهُ فِيْـهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

অর্থাৎ– তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছে।[২৪]

নারীর সাহায্যে পুরুষ কেবল যৌন পরিতৃপ্তি লাভ করে না পারিবারিক জীবনেও সে পুরুষের সঙ্গী। কেননা, নারী যেমন পুরুষের আচ্ছাদন স্বরূপ অনুরূপভাবে পুরুষও নারীর আচ্ছাদন স্বরূপ। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ـ

অর্থাৎ– তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরাও (স্বামীগণ) তাদের ভূষণস্বরূপ।[২৫]

এখানে আল্লাহপাক স্বামী এবং স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলে উল্লেখ করেছেন। পোশাক মানুষের শরীরের সাথে মিলেমিশে থাকে তাকে আবৃত করে রাখে এবং বাহিরে অনিষ্টকর বস্তু থেকে হেফাযত করে। শীত, গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করে। স্বামী স্ত্রীর জন্য পোশাকের এই রূপক ব্যবহার করে এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, ব্যক্তিগত দিক থেকে তাদের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যেমন সম্পর্ক পোশাক ও শরীরের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের অন্তর ও আত্মা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকবে। একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করবে এবং একজন অপরজনের চরিত্র ও সম্ভ্রমকে কলঙ্কের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এটাই হচ্ছে প্রেম, ভালবাসা

---

২২. মৌলিক অধিকার বলতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রকৃত প্রয়োজন বা মৌলিক অধিকারকে বুঝায়। যেমন– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর হক যথাযথভাবে আদায় করার অধিকারকেও মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২৩. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২২৮।

২৪. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১৯।

২৫. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল বাকারা, আয়াত ঃ ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ও আন্তরিকতার দাবি। স্বামী স্ত্রীকে এইজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, একজন যেন অপরজনের কাছ থেকে শান্তি লাভ করতে পারে।[২৬]

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً - إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

অর্থাৎ- এবং তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তার কাছে মানসিক শান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও আন্তরিকতার সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[২৭]

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ كُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا -

অর্থাৎ- তিনি আল্লাহ, যিনি একটি মাত্র আত্মা হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট হতে শান্তি পায়।[২৮]

ইসলাম কেবলমাত্র স্বামীকেই দেয়নি বরং স্ত্রীদের অধিকার প্রদান করেছে। কেউ কারো অধিকারকে ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। যেহেতু পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বামীর দায়িত্ব বেশি সেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বামীদের মর্যাদাকে স্ত্রীদের উপর একগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

অর্থাৎ- আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।[২৯]

স্বামীদের যে একগুণ মর্যাদা অধিক দেওয়া হয়েছে তার অর্থ এই নয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করবে এবং স্ত্রীর অধিকারকে স্বীকার করবে না।

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ - إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

অর্থাৎ- পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহৃদয়তা দেখাতে কখনো ভুল করো না। তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ দেখেন।[৩০]

---

২৬. আবুল 'আলা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার** (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, সফর- ১৪১৭, জুলাই- ১৯৯৬), পৃ ২৩।

২৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ রূম, আয়াত ঃ ২১।

২৮. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৮৯।

২৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২২৮।

৩০. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

তবে যদি স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য এবং দুশ্চরিত্রা হয় তাহলে স্ত্রীর শাসন করার ক্ষমতা ইসলাম স্বামীকে দিয়েছে। কিন্তু শাসনের নামে স্বামী স্ত্রীকে এমন কোন আঘাত করতে পারবে না যার দরুণ স্ত্রীর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

وَالّتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِىْ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ـ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً ـ

অর্থাৎ– তোমরা যেসব স্ত্রীদের বিদ্রোহী হওয়ার আশংকা কর, তাদেরকে উপদেশ দাও, বিছানায় তাদের থেকে পৃথক থাক এবং তাদেরকে দৈহিক শাস্তি দাও। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্যে কোন পথ খুঁজবে না।[৩১]

এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, স্ত্রী যখন বিদ্রোহাত্মক মনোভাব এবং আনুগত্যহীনতার পথ গ্রহণ করে, কেবল তখনই তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়েছে।[৩২]

যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে যায় এবং নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেওয়ার কোন পথ সৃষ্টি না হয় তাহলে এ বিবাদ মীমাংসার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পূর্বে পুরুষ আত্নীয়দের মধ্যে থেকে একজন এবং স্ত্রীর আত্নীয়দের মধ্য হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা উচিত। যাতে তারা উভয়ে মিলে এদের মধ্যকার ঝগড়া মীমাংসা করবার চেষ্টা করবে। যেমন আল্লাহ বলেন–

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُّرِيْدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ـ

অর্থাৎ– তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা কর, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস পাঠাও। তারা যদি সংশোধনের ইচ্ছা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের মধ্যে আনুকূল্য সৃষ্টি করে দেবেন।"[৩৩]

স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কে সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে বর্ণনা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যাকে চারটি বস্তু দেওয়া হয়েছে মনে করতে হবে তাকে দুনিয়া ও

---

৩১. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ৩৪। এই আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, যদি স্ত্রী বিদ্রোহী মনোভাব এবং আনুগত্যহীনতার পথ গ্রহণ করে কেবল তখনই তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি শরীয়তসম্মত নয়। তাছাড়া স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই আইনের আশ্রয় নিতে পারে। বর্তমান সভ্য জগতে শাস্তি প্রয়োগের এ বিধান প্রযোজ্য নয় বলে আমি মনে করি। আল্লাহর এই আয়াত সামনে রাখার সাথে সাথে শাস্তি প্রয়োগের কারণ এবং প্রেক্ষাপট যুক্তিগত কিনা সে কথা অবশ্যই সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে করে আল্লাহর আইনের অপপ্রয়োগ না করা হয়।

৩২. আবুল আ'লা মওদুদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫।

৩৩. **আল কুর'আন,** সূরা নিসা, আয়াত নং ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

আখিরাতের সর্বোৎকৃষ্ট চারটি বস্তু দেওয়া হয়েছে। এক. কৃতজ্ঞ হৃদয়,[৩৪] দুই. যিকির যুক্ত রসনা,[৩৫] **তিন.** কষ্টে ধৈর্যশীল শরীর, চার. পবিত্র স্ত্রী, যে স্বামীর অনুপস্থিতে স্বামীর সম্পদ ও নিজেকে সংরক্ষণ করে। পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ হল– সৎ কর্মশীলা স্ত্রী। তার দিকে তাকালে স্বামী আনন্দিত হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতে সে স্বামীর মর্যাদা ও সুনাম রক্ষা করে।[৩৬]

✓স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই আল্লাহর নিকট সমান। তাদের অধিকারও অভিন্ন এবং এই দুইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করা যেতে পারে না। মৌল অধিকারের দিক দিয়ে কেউ কম নয়, বেশিও নয়। বরং পরিবারের একজন স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি সঠিক ব্যবহার যথাযথ সম্মান এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য কতগুলো মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে।[৩৭]

প্রথমত স্বামী স্ত্রীকে মোহর[৩৮] প্রদান করবে। কেননা স্বামী হিসেবে স্ত্রীর উপর তার যে অধিকার সৃষ্টি হয়েছে তা মোহরের বিনিময়েই। আল্লাহ বলেন,

"وَأٰتُوْا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ـ

অর্থাৎ- এবং স্ত্রীদের মোহর মনের সন্তোষ সহকারে আদায় কর।"[৩৯]

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ـ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَأٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً"ـ

অর্থাৎ- এ মুহরিম স্ত্রীলোকদের[৪০] ছাড়া অন্য সব নারীদের তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, যেন তোমরা নিজদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে হাসিল করার আকাঙ্খা কর।

---

৩৪. যে হৃদয় ও মন তার জীবনের প্রাপ্ত আল্লাহর ছোট বড় সকল নেয়ামতের অকুণ্ঠচিত্তে শোকর আদায় করে তাকেই কৃতজ্ঞ হৃদয় বলা হয়।

৩৫. **যিকির ঃ** যিকির শব্দের অর্থ স্মরণ করা। রসনা অর্থ জিহ্বা। যে ব্যক্তির মুখে সর্বাবস্থায় সকল কাজে আল্লাহর নাম স্মরণ হয় এবং সকল কাজ সে আল্লাহর নামে ও নির্দেশিত পথ অনুযায়ী করে সাথে সাথে মুখে আল্লাহর মহান তাসবীহ উচ্চারণ করে তাই যিকির যুক্তরসনা।

৩৬. **মাজমা'উল হাইসামী;** ৪/২৭৬, ইব্ন আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, হাইসামী বলেছেন যে, বর্ণনাটি ইমাম ত্বাবরানীর কাবীর ও আউসাত গ্রন্থে রয়েছে। তিনি বলেন যে, আউসাত গ্রন্থে বর্ণনাকারীগণ সবাই সহীহ।

৩৭. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭১।

৩৮. **মোহর বলতে বুঝায়–**

إِنَّهُ اِسْمُ لِلْمَال الَّذِىْ يَجِبُ فِىْ عَقْدِ النَّكَاحِ عَلى لاَزَوْجِ فِىْ مَقَابَلَةِ الْبُضْعِ إِمَّا بَالَتْ مِنْهُ أَو بِالْقِيْمَةِ أَوْ بِالْعَقْدِ ـ

অর্থাৎ- "দেন মোহর বলতে এমন অর্থ সম্পদ বোঝায়, যা বিয়ের বন্ধনে স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়, বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে। নয় বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে।

৩৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এবং অবাধ যৌন চর্চার প্রতিরোধের জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং বিনিময়ে তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আস্বাদন করেছ তার চুক্তি অনুযায়ী তাদের মোহর পরিশোধ কর।"[৪১]

فَأَنْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأْتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

অর্থাৎ- "অতএব দাসীদেরকে[৪২] তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে বিয়ে কর এবং তাদের ন্যায়সংগত মোহর আদায় কর।"[৪৩]

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ ـ

অর্থাৎ – এবং মোহর আদায়ের বিনিময়ে তোমাদের জন্য সম্ভ্রান্ত ঈমানদার নারী এবং যাদের কাছে তোমাদের পূর্বে কিতাব পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যেকার সতী নারী হালাল করা হয়েছে।[৪৪]

সুতরাং বিয়ের সময় নারী ও পুরুষের মধ্যে মোহরের যে চুক্তি হয়ে থাকে তা পূর্ণ করা পুরুষের জন্য অপরিহার্য। যে যদি চুক্তি মোতাবেক মোহর আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী তার থেকে নিজেকে আলাদা রাখার অধিকার রাখে। পুরুষের ওপর এটা এমন এক দায়িত্ব যা

---

৪০. **মুহরিম স্ত্রী লোক–** কুরআনে উল্লেখিত চৌদ্দ প্রকার নারী যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। তাদেরকে মুহরিম স্ত্রীলোক বলা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ـ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ـ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ـ

অর্থাৎ- তোমাদের উপর হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নি, এবং তোমাদের সেইসব মা যাহারা তোমাদের দুধপান করিয়েছে, আর তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা যাহারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিতা-পালিতা হইয়াছে, সেই সব স্ত্রীর মেয়েরা যাহাদের সহিত তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যদি (কেবল বিবাহ হইয়া থাকে আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে (তাহাদের পরিবর্তে তাহাদের মেয়েদের সহিত বিবাহ করায়) তোমাদের কোন দোষ হইবে না। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং একই সংগে দুই বোনকে বিবাহ করা তোমাদের প্রতি হারাম করা হইয়াছে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ২৩।

৪১. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ২৪।

৪২. **দাসী ঃ** প্রাক ইসলামী যুগে ও ইসলামী সূচনাকালে যে কৃত দাস-দাসীর প্রথা ছিল। উল্লেখিত আয়াতে দাসী বলতে ঐ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

৪৩. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ২৫।

৪৪. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ মায়েদা, আয়াত ঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ নেই। তবে স্ত্রী যদি তাকে সময় দেয় অথবা তার দারিদ্রের কথা বিবেচনা করে সন্তুষ্ট মনে মাফ করে দেয় অথবা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে খুশির সাথে নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নেয় তবে ভিন্ন কথা।[৪৫] ইসলাম স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় স্ত্রীকে মোহার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মোহরের উপর স্ত্রীর একক অধিকার। স্ত্রীকে মোহরের টাকা পরিশোধ না করা, গড়িমসি করা কিংবা কৌশলে স্ত্রীর নিকট থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া মারাত্মক গুনাহের কাজ।

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ـ

অর্থাৎ– অবশ্য তাহারা নিজেরা যদি নিজেদের খুশিতে 'মোহরাণার' কোন অংশ তোমাদের মাফ করে দেয় তবে তাহা তোমরা সানন্দে খাইতে (গ্রহণ করিতে) পার।[৪৬]

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ـ

অর্থাৎ– "মোহরানার চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণে কম-বেশি করে নাও, তাহলে এতে কোন দোষ নেই"।[৪৭]

স্বামীর দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে– স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। ইসলামী আইন বিধান অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রের সীমা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে ঘরে অবস্থান করা এবং পারিবারিক জীবনের দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দেওয়া।[৪৮]

আল্লাহ বলেন– وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُوْلَىٰ ـ

অর্থাৎ– "নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজগোজ দেখাইয়া বেড়াইও না। [৪৯]

পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে আয় উপার্জন করা এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা। এ বিষয়টির ভিত্তিতেই স্বামীকে স্ত্রীর ও পরিবারের দায়িত্বশীল করা হয়েছে।[৫০] একই সঙ্গে আল্লাহ অবশ্য নারীদেরকে গৃহ পরিচর্যা ও সন্তান-সন্ততি লালন-

---

৪৫. আবুল 'আলা মাওদুদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।

৪৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ৪।

৪৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ২৪।

৪৮. আবুল আলা মাওদুদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

৪৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহযাব, আয়াত ঃ ৩৩।

৫০. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদেরকে আয় রোজাগারের দায়িত্ব দেয়নি। বরং এ দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে কোন স্ত্রী চাইলে উপার্জন করতে পারবেন এবং উপার্জিত অর্থ নিজের ইচ্ছামত ব্যয় ব্যবহার করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পালনের উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– নারী নিজের স্বামীর গৃহ ও সন্তানের জন্য দায়িত্বশীল তাই সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৫১]

কুরআনের আয়াত থেকে যেরূপ মোহর আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে অনুরূপভাবে খোরপোষের ব্যবস্থা করাও ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে।[৫২] স্বামী যদি এ দায়িত্ব পালন না করে তাহলে আইন তাকে এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে। সে যদি তা অস্বীকার করে অথবা অসামর্থ্য হয় তাহলে আইন তাদের বিয়ে ভেঙ্গে দিবে।[৫৩]

পুরুষের তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে– স্ত্রীর উপর তার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সে তার অপব্যবহার করবে না, অন্যায় আচরণ করবে না বরং সৎ ব্যবহার করবে। এটা স্বামীর নিকট স্ত্রীর অধিকার। অন্যায় আচরণের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন– কোন ন্যায় সংগত কারণ ছাড়াই[৫৪] স্ত্রীকে শুধু শাস্তি ও যাতনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে ঈলা করা।[৫৫] যদি কোন কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান হচ্ছে সর্বোচ্চ চার মাসের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।[৫৬] আল্লাহ বলেন–

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - فَإِنْ فَاءُوْ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - وَإِنْ عَزَمُوْا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

অর্থাৎ– যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের সহিত সম্পর্ক না রাখবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রহিয়াছে। যদি তাহারা ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। আর যদি তাহারা তালাক দেওয়ারই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে তবে জানিয়া রাখা দরকার যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং সব জানেন।"[৫৭]

---

৫১. **সহীহ বুখারী,** বিধানাবলি অধ্যায়, ১৬ খণ্ড, পৃ ২২৯; **সহীহ মুসলিম,** নেতৃত্বদান অধ্যায়, ন্যায় বিচারক ইমামের ফজিলত অনুচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৮।

৫২. খোরাকি তথা ভরন-পোষণ দেওয়ার পরিমাণ নির্ধারণ স্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বরং তার স্বামীর সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। কুরআনে এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে–

عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ -

অর্থাৎ– ধনী ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং গরিব ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্যানুযায়ী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।" (**আল কুরআন,** সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৩৬)।

৫৩. আবুল আলা মাওদুদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

৫৪. **ন্যায়সঙ্গত কারণ হচ্ছে–** স্বামী অথবা স্ত্রী রোগাক্রান্ত হওয়া অথবা স্বামীর সফরে থাকা অথবা এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া যে, স্ত্রীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে কিন্তু তার কাছে যাওয়ার সুযোগ হচ্ছে না।

৫৫. কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে শুধু শাস্তি ও যাতনা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করা থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে ঈলা।

৫৬. আবুল আলা মাওদুদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

৫৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২২৬-২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সাহায্যে পুরুষ কেবল যৌন পরিতৃপ্তিই লাভ করে না, পারিবারিক জীবনেও সে পুরুষের সঙ্গী। কেননা নারী যেমন পুরুষের আচ্ছাদনস্বরূপ অনুরূপভাবে পুরুষও নারীর আচ্ছাদন স্বরূপ। একথা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নারী শুধুমাত্র পুরুষের আজ্ঞাবাহী নয় এবং তার ইচ্ছা, সংকল্প ও মননের স্বাধীনতাও কেড়ে নেয়া হয়নি। বরং তাদের উভয়ের সম্পর্ক হল ভালবাসা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের মর্যাদা

হযরত আবু হুরায়রা আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। একদা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ খাদীজাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিবেন।[৫৮] একজন স্ত্রীকে আল্লাহর পক্ষ থেকেও যে অতুলনীয় মর্যাদা দেয়া হয়েছে এটা তারই উজ্জল দৃষ্টান্ত।

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "হে আয়েশা এই জিবরাঈল তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন।[৫৯]

নিজ স্ত্রীগণের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর আচরণ ঃ তিনি গৃহ দায়িত্ব পালন করতেন ঃ

سُئِلَتْ عَائِشَةَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ -

অর্থাৎ– "হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম ঘরে কি করতেন? তিনি বললেন, তিনি গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করতেন।"[৬০]

---

৫৮. **সহীহ বুখারী,** আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলি অধ্যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম –এর খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর সাথে বিবাহ ও তাঁর গুণাবলি অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ ১৩৮; **সহীহ মুসলিম,** সাহাবীদের গুণাবলি অধ্যায় উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর গুণাবলি অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ ১৪৪।

৫৯. **সহীহ বুখারী,** সাহাবীদের গুণাবলি অধ্যায়, হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ ১০৭; **সহীহ মুসলিম,** সাহাবীদের গুণাবলি অধ্যায়, হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর গুণাবলি অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ ১৩৯।

৬০. **সহীহ বুখারী,** আযান অধ্যায়, যে স্বীয় পরিবারের প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকবে, তারপর নামায প্রতিষ্ঠা করবে, তারপর বের হবে অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃ ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

সফরে স্ত্রীদের সঙ্গে নিতেন

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْـرَعَ بَيْـنَ أَزْوَاجِه فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمِهَا خَرَجْتُهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ ـ

অর্থাৎ– "হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম যখন কোন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠত তিনি তাকেই সঙ্গে নিতেন।"[৬১]

ই'তিকাফের সময়ও তিনি স্ত্রীদের অভ্যর্থনা জানাতেন

عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ : أَخْـبَرَتْ إِنَّـهَا جَـاءَتْ رَسُـوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُوْرُهُ فِيْ اعْتِكَافِهِ فِيْ الْمَسْجِدِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَـانَ فَتَحَدَّثَـتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ مَعَهَا يَقْلِبُهَا ـ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجِه فَرَحنُوْ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِّي : لاَ تَعْجَلِـى حَتَّـى أَنصَرَفُ مَعَكَ) ـ

অর্থাৎ– "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সহধর্মিনী সফিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রমযানের শেষ দশকের কোন একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম –এর ই'তিকাফ অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং চলে যেতে উদ্যত হলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁকে বিদায় দিতে উঠে দাঁড়ালেন।[৬২] (অন্য বর্ণনায় আছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তাঁর স্ত্রীগণও সাথে ছিলেন। এরপর তাঁরা চলে গেলেন। তারপর তিনি সফিয়াহ বিনতে হুয়াইকে বললেন, ব্যস্ত হয়ো না, আমি তোমার সাথেই আসছি।"[৬৩]

---

৬১. **সহীহ বুখারী,** যুদ্ধ অধ্যায়, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ ৪৩৬; **সহীহ মুসলিম**, তওবা অধ্যায়, হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর বিরুদ্ধে অপবাদের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ ১১২।

৬২. **সহীহ বুখারী,** ই'তিকাফ অধ্যায়, ই'তিকাফ স্ত্রীর সাথে স্বামীর সাক্ষাত অনুচ্ছেদ, ৫ম খণ্ড, পৃ ১৮৬।

৬৩. **সহীহ বুখারী,** ই'তিকাফ অধ্যায়, ই'তিকাফকারী কি স্বীয় প্রয়োজনে মসজিদের গেটে যেতে পারবে অনুচ্ছেদ, ৫ম খণ্ড, পৃ ১৮৬; **সহীহ মুসলিম,** সালাম অধ্যায়, যে ব্যক্তি একাকী নিজের স্ত্রী বা মাহরাম মহিলার সাথে চলে তার জন্য অন্য কাউকে ইনি হচ্ছেন অমুক একথা বলে মহিলার পরিচয় দেয়া ভাল, ৭ম খণ্ড, পৃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান

عَنْ أنَس أنَّ جَارًا لِرَسُوْل اللهِ فَأرسِيًا كَانَ كِيْتَ الْمَرْقِ فَصَنَع لِرَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَدْقُوْهُ فَقَال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهٰذه؟ لِعَائشَةَ فَقَال : لاَ ـ فَقَال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ فَقَادْ يَدْقُوْهُ فَقَال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهٰذِه؟ قَالَ : لاَ ـ قَالَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ ـ ثُمَّ عَادَ يَدْقُوْهُ فَقَال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهٰذِه؟ قَالَ : نَعَمْ فِيْ الثَّالِثَةَ فَقَامَا يَتَدَافَعَان حَتَّى أتِيَا مَنْزَلَهُ ـ

অর্থাৎ– "হযরত আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর এক পারসিক প্রতিবেশী, যে ভাল গোশত রান্না করতে পারত, তাঁর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত দিতে এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহাকে দেখিয়ে বললেন, এ আমার সাথে যাবে না? সে বলল, জী না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আমার যাওয়া হবে না। এরপর লোকটি ফিরে গিয়ে পুনরায় তাঁকে ডাকতে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা আমার সাথে যাবে না? সে বলল, জী-না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তবে আমি যেতে পারছি না। লোকটি পুনরায় তাঁকে ডাকতে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা কি যাবে? এবার তৃতীয়বারে লোকটি বলল, জী হ্যাঁ। এরপর তাঁরা উভয়ে উঠলেন এবং একে অপরের পেছনে পেছনে সে লোকটির গৃহে গিয়ে পৌছলেন।[৬৪]

তিনি স্ত্রীর আরোহণের জন্য কোমল আসন রেখেছেন এবং নিজের হাঁটু স্থাপন করে তার উপর স্ত্রীকে আরোহণ করিয়েছেন।

عَنْ أنَسْ قَالَ : ثُمَّ خَرَجْنَا إلى الْمَدِيْنَةَ (قَادِمِيْنَ مِنْ خَيْبَر) فَرَأيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّى لَهَا (أىْ لِصَفِيَّةَ) وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِه فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلى رُكْبَتِه حَتَّى تَرْكَبَ ـ

অর্থাৎ– "হযরত আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারপর আমরা খায়বর থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–কে তাঁর স্ত্রী সফিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর জন্য বাহনের পিছনে পর্দা টানাতে দেখলাম। এরপর তিনি উটের কাছে বসে নিজ হাঁটুদ্বয় স্থাপন করলে সফিয়াহ রাযী আল্লাহু 'আনহা তাঁর হাঁটুর উপর পা রেখে বাহনে আরোহণ করলেন।"[৬৫]

---

৬৪. **সহীহ মুসলিম,** পানীয় অধ্যায়, মেজবান যে ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়নি সে যখন মেহমানের অনুসরণ করবে তখন মেহমান কি করবে সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ২০।

৬৫. **সহীহ বুখারী,** যুদ্ধ অধ্যায় খায়বরের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, হিঃ ১৪২২/২০০১ খ্রিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হাবশীদের খেলাধুলা দেখতে নিজ স্ত্রীকে আহবান জানাতেন এবং তাঁর চলে যাওয়া অবস্থান করতেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ فِيْهِ السُّوْدَانُ بِالدَّرقِ وَالْحَرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُوْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ : تَشْتَهِيْ تَنْظُرِيْنَ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَأَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : دُوْنَكُمْ يَا بَنِيْ أَرْفِدَةَ حَتّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ : حَسْبُكِ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : فَاذْهَبِيْ ـ

"হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেদিন ছিল ঈদের দিন। কতিপয় হাবশী চামড়ার ঢাল ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। সে সম্পর্কে হয়তো বা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি অথবা তিনি নিজেই বলেছেন, তুমি কি খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম হ্যাঁ, এরপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তখন আমার গাল তাঁর গালের সাথে মিলানো ছিল। এ সময় তিনি বলে চলছিলেন, হে বনী আরফিদা! খেলা চালিয়ে যাও। এরপর যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তিনি বললেন, তোমার দেখা হয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এখন যাও।[৬৬]

মুমিনদের স্ত্রীদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর আচরণ

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّي لأَدْخُلُ فِيْ الصَّلاَةِ فَأُرِيْدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ النَّبِيِّ أَتَجَوَّزَ فِيْ صَلاَتِيْ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجَدَ أُمِّه مِنْ بُكَائِه ـ

অর্থাৎ– হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাই। আমি চাই সালাতকে দীর্ঘায়িত করি। কিন্তু আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে তার মায়ের ভাবনার কথা মনে করে সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলি।[৬৭]

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا قَامَ النِّسَاءُ حَيْنَ نَقْضِيَ تَسْلِيْمَهُ وَمَكَثَ يَسِيْرًا قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ ـ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ : فَأَرى وَاللّهِ أَعْلَمُ أَنَّ مَكَثَهُ لِكَيْ يَنْفُذُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدرِكَهُنَّ مَنْ اِنْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ ـ

অর্থাৎ– হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরিয়ে কিছুক্ষণ বসতেন। তাঁর উঠার পূর্বেই মহিলারা বেরিয়ে যেত। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইব্ন

---

৬৬. **সহীহ বুখারী,** দুই ঈদ অধ্যায়, ঈদের দিনে নেযা ও তরবারি খেলা অনুচ্ছেদ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৯৫; **সহীহ মুসলিম,** দুই ঈদের দিন যে খেলায় কোন গুনাহ নেই তাতে রুখসাত অনুচ্ছেদ, ৩য় খণ্ড, পৃ ২২।

৬৭. **সহীহ বুখারী,** আযান অধ্যায়, শিশুদের কান্নার সময় যে নামায হাল্কা করে অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৪৪; **সহীহ মুসলিম,** নামায অধ্যায়, সকলকে নামায সংক্ষিপ্ত করতে ইমামের আদেশ অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

শিহাব (রা) বলেন ঃ আল্লাহই ভাল জানেন, তবে আমার মনে হয়, পুরুষদের বেরিয়ে আসার পূর্বেই যাতে মহিলারা বেরিয়ে আসতে পারে সেজন্যই তিনি এমনটি করতেন।[৬৮]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مَقْبِلِيْنَ مِنْ عُرُسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمَثَّلاً فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى قَالَهَا ثَلاَثُ مِرَارٍ -

অর্থাৎ– "হযরত আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে কতিপয় মহিলা ও শিশুকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়, একথাটি তিনি তিনবার বললেন।"[৬৯]

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ : وَكُنْتَ أَنْقُلُ النَّوِي مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ ----- وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثِيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمَا وَالنَّوى عَلَى رَأسٍ فَلَقِيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِيْ ثُمَّ قَالَ : أَخْ أَخْ لِيَحْمِلْنِىْ خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ --- فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّىْ أَسْتَحِيْيَتْ فَمَضَى -

অর্থাৎ– "হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যোবায়েরের ক্ষেত থেকে আমি বোঝা বয়ে নিয়ে আসছিলাম। ক্ষেতটি ছিল আমার গৃহ থেকে তিন মাইল দূরে। একদিন আমি বোঝাটি মাথায় করে নিয়ে আসছিলাম, পথিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সাথে সাক্ষাত হলো তখন তাঁর সাথে ছিল একদল আনসারী সাহাবী। তিনি আমাকে তাঁর বাহনের পিছনে আরোহণ করানোর জন্য ডাক দিলেন। তখন আমি পুরুষদের সাথে ভ্রমণ করব বলে লজ্জা অনুভব করছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই লজ্জা বুঝতে পেরে চলে গেলেন।"[৭০]

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ : وَإِمَّا تَغْيِبُه (أَىْ عُثْمَانْ) عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَه يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَكَ أَجْرُ رَجُلٌ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ -

অর্থাৎ– "হযরত আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে উসমান রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর অনুপস্থিতির কারণ হচ্ছে তার স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কন্যা রোগগ্রস্ত ছিলেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

৬৮. **সহীহ বুখারী,** নামাযের গুণাগুণ অধ্যায়, সালাম দান অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৬৭।

৬৯. **সহীহ বুখারী,** মর্যাদা অধ্যায়, আনসারদের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর উক্তি, সকল মানুষের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট বেশি প্রিয় অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ ১১৪;
সহীহ মুসলিম, সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, আনসারদের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ ১৭৪।

৭০. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুন নিকাহ, আত্মসম্মানবোধ অনুচ্ছেদ; ৫ম খণ্ড, পৃ ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে বললেন, বদরে অংশগ্রহণকারীর অথবা শহীদ ব্যক্তির যে প্রতিদান, তোমরাও সেই প্রতিদান।"[৭১]

عَنْ إبْنُ عَبَّاس رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ يَـا رَسُوْلُ اللهِ : إنِّـى أرِيْـدُ أنْ أخْرِجَ فِىْ جَيْش كَذا وَكَذَا ـ (وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : إنِّىْ أكْتَتَبْتُ فِىْ غزْوَةِ كَذا وَكَذَا وَإمْرأتِىْ تُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَالَ : أخْرِجْ مَعَهَا ـ

অর্থাৎ– "হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি অমুক অমুক সৈন্য দলের সাথে বের হতে চাই। (মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে যে, সে বললো, আমি অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি)। আর আমার স্ত্রী হজ্জ করতে চায়। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি বরং তার সাথে যাও।"

عَنْ أبِىْ هُرَيْرَةَ : أنَّ رَجُلاً أسْوَدْ أوْ إمْرَأةً سُوْداءَ كَانَ نَقُمُ الْمَسْجِدَ ـ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : وَلاَ أرَاهُ إلاَّ إمْرَأةٌ) فَمَاتَ فَسَألَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوْا : مَاتَ ـ قَالَ : أفَلاَ كُنْتُمْ إذْ نَبْمُوْنِىْ بِهِ؟ دَلُّوْنِىْ عَلى قَبْرِهِ ـ أوْ قَالَ ـ قَبْرُهَا، فَأتى قَبْرُهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ـ

অর্থাৎ– "হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। (অন্য বর্ণনায় আছে, রাবী বলেন, আমার নিশ্চিত ধারণা তিনি মহিলাই হবেন) তিনি মারা গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে মারা গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমাকে তা জানালে না কেন? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। এরপর তিনি তার কবরের কাছে এসে তার জানাযা পড়লেন।"[৭২]

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِـىْ بَعْـض مَغَازِيـهِ، فَلَمَّـا أنْصَرفَ جَائتِ جَارِيَةَ سَوْدَاء فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلُ اللهِ إنِّي كُنْتُ نَذِرَتْ إنْ أرْدَكِ اللهُ سَالِمًا أنَّ أضْرَتْ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدَّفِ وَأتُغْنِى ـ فَقَالَ لَـهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّـى اللهِ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ : إنْ كُنْتَ نَذِرَتْ فَاشْرَبِىْ، وَإلاَّ قَالَ ـ فَجَعَلْتُ تُضْرَبُ ـ

অর্থাৎ– "হযরত বুরাইদা রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে গেলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মানত করেছিলাম যে, আল্লাহ আপনাকে যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন, তাহলে আমি আপনার সামনে দফ বাজাব এবং গান গাইব। রাসূল সাল্লাল্লাহু

৭১. **সহীহ আল বুখারী,** মর্যাদা অধ্যায়, উসমান বিন আফফান (রা) –এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ ৬০।

৭২. **সহীহ আল বুখারী,** সালাত অধ্যায়, মসজিদের খেদমত অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃ ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, মানত যদি করে থাক, তাহলে বাজাতে পার, অন্যথায় দরকার নেই। এরপর সে মহিলা দফ বাজাতে শুরু করল।[৭৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর যুগের স্ত্রীদের অবস্থান ও মর্যাদা একজন নারীর স্ত্রী হিসাবে মর্যাদাকে স্পষ্ট করে দেয়। সুতরাং ইসলামে একজন স্ত্রীর যে মর্যাদা তা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোন ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাসে বিরল।

জননীরূপে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ইসলামে মাতা হিসাবে নারীর মর্যাদাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী হচ্ছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوآ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ـ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَآ أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

অর্থাৎ– "তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল ঃ হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[৭৪]

আল্লাহ এ ব্যাপারে আরো বলেন–

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ـ وَإِنْ جَاهَدكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْـمٌ فَـلاَ تُطِعْهُمَا

অর্থাৎ– "আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য কর না।"[৭৫]

---

৭৩. ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হযরত বুরাইদা (রা) থেকে **'হাসান' 'সহীহ'** ও **'গরিব'** সূত্রে বর্ণিত। মর্যাদা অধ্যায়, 'হে উমর! নিশ্চয়ই শয়তান তোমাকে ভয় করে' অনুচ্ছেদ, ৩৬৯১ নং হাদীস, (**সহীহ সুনানে তিরমিযী**, ২৯১৩ নং হাদীস; আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর যুগে নারী স্বাধীনতা, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট্স, ঢাকা ঃ প্রথম প্রকাশ, রমজান– ১৪১৫, ফেব্রুয়ারি– ১৯৯৫, পৃ ৩৮৭)।

৭৪. **আল কুর'আন,** সূরা বণী ইসরাঈল, আয়াত– ২৩-২৪।

৭৫. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আনকাবুত, আয়াত ঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক জীবনের পর শুরু হয় বংশীয় জীবনের সীমা। এ জীবনে সবচেয়ে উঁচু স্থান এবং সবচেয়ে বড় অধিকার হল মায়ের। বাবা এবং মায়ের উঁচু মর্যাদা এবং অধিকারের গুরুত্ব পবিত্র কুর'আনের বর্ণিত বর্ণনা ভঙ্গী থেকেই আঁচ করা যায়। পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মাতা-পিতার অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এবং আল্লাহর শুকুর গুজারীর সঙ্গে সঙ্গে মাতা-পিতার শুকুর গুজারীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৭৬]

কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলে বাবা মায়ের অধিকার ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রথমত ঃ পৃথিবীতে মুমীনের উপর আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতাপিতার। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা।

দ্বিতীয়ত ঃ বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি বিনায়াবনত হওয়া। উহ্ শব্দটি উচ্চারণেও বিরক্তি প্রকাশ না করা।

তৃতীয়ত ঃ উত্তম ব্যবহার করা।

চতুর্থত ঃ শৈশবের কথা স্মরণ করে দোয়া করা।[৭৭]

বিশেষ করে মায়ের কষ্টের কথা স্মরণ করে আল্লাহ পাক বলেন–

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنْ
اشْكُرْلِى وَلِوَالِدَيْكَ - إِلَيَّ الْمَصِيْرُ -

অর্থাৎ–"আমরা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার হক বুঝার জন্য নিজ হতেই তাকিদ করেছি তার মা দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে। আর দুইটি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে![৭৮] (এই কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে,) আমার শোকর কর এবং নিজের পিতা-মাতার শোকর আদায় কর। আমারই দিকে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।"[৭৯]

একই রকম নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন–

---

৭৬. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, **মাতাপিতা ও সন্তানের অধিকার** (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ জিলহজ্জ– ১৪২০, এপ্রিল– ২০০০), পৃ ১।

৭৭. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, **মাতাপিতা ও সন্তানের অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২।

৭৮. ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে, শিশুর দুধপান করার মেয়াদ দুই বছর। এই সময় সীমার মধ্যে কোন শিশু যদি অপর কোন নারীর দুধ পান করে, তবে দুধ পানজনিত 'হুরমাত' কার্যকর হবে। অর্থাৎ ঐ স্ত্রীলোকটি তার দুধ মা হবে এবং তার সন্তান-সন্ততির সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম সাব্যস্ত হবে, কিন্তু এ সময়সীমার পর দুধ পান করলে হুরমাত কার্যকর হবে না। ইমাম মালেক থেকেও এরূপ একটি মত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে, দুধ পানের মেয়াদ আড়াই বছর। তিনি আরো বলেন, দুই বছর বা তার পূর্বেই যদি শিশু দুধ ছেড়ে অন্য খাদ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায় তবে এরপর সে কোন নারীর দুধপান করলে তাতে বিশেষ বিধান বলবৎ হবে না। (**তাফহীমুল কুর'আন,** সূরা ঃ আল আহকাফ, আয়াত ঃ ১৫)।

৭৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ লুকমান, আয়াত ঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِه شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا ـ

অর্থাৎ– "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।"[৮০]

সন্তান লালন-পালনে মাতাপিতা উভয়েরই অংশ থাকে। পিতা শরীরের ঘামের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ সন্তানের জন্য ব্যয় করেন এবং মাতা কলিজার রক্ত পান করিয়ে তাকে লালন করেন কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, সন্তান প্রতিপালনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট স্বীকার করেন মা। নিজের অস্তিত্বকে বিলিয়ে দিয়ে মা শিশুকে পালন করেন। যে আপত্য স্নেহে শিশুর জন্য দিনের আরাম ও রাতের ঘুম অব্যাহতভাবে কুরবানী করেন সেই খিদমত ও কুরবানীর উদাহরণ নেই।[৮১] কুরআনে আল্লাহ বলেন–

وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إحْسَانًا ـ حَمَلَتْهُ أمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ـ وَحَمْلُهُ وَفِصلُـهُ ثَلاثُوْنَ شَهْرًا ـ

অর্থাৎ– "এবং আমরা মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস।"[৮২]

সর্বাবস্থায় আল্লাহপাক বাবা-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেই আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে–

وَإنْ جٰهَدكَ عَلى أنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ـ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْـهُمَا فِـى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ـ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أنَابَ إلَىَّ ـ

যদি মাতা পিতার তোমাদের উপর আমার সাথে কাউকে অংশীদার বানানোর জন্য পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে।[৮৩]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْن مَسْعُوْدٍ قَالَ سَألْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ـ أىُّ العَمَل أحَـبُّ إلى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوَاةُ عَلىَ وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أىُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أىُّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِنَّ وَلَوْ إسْتَزَدْتُهُ لِزَادَنِىْ ـ

---

৮০. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নিসা, আয়াত ঃ ৩৬।

৮১. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, **মাতাপিতা ও সন্তানের অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

৮২. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহকাফ, আয়াত ঃ ১৫।

৮৩. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ লুকমান, আয়াত ঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম কোন নেক কাজটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়, তিনি বললেন, ওয়াক্তমত নামায পড়া। আমি আবার বললাম অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন– পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন– আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।[৮৪]

নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের সঙ্গে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নেক আমলের তাকিদ দিয়েছেন ইসলামে তার গুরুত্ব কত বেশি। কোন মুসলমান যদি মাতা-পিতার অনুগত্য না হয় তাহলে সে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরও অনুগত হয় না। সে শুধু নিজ পরিবার ও ইহকালে অপরাধী নয় বরং সে আল্লাহর নিকটও অপরাধী আল্লাহর নিকটও তাকে জাবাবদিহি করতে হবে।[৮৫]

عَنْ أبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَّجُلٌ إلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ يَـا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أحَقُّ (النَّاسَ) بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ أمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أمُّـكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أبُوْكَ ـ

এক ব্যক্তি রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে এসে বলল– হে আল্লাহর রসূল। আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? তিনি বললেন তোমার মা। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার পিতা।[৮৬]

ইসলামে হিজরত ও জিহাদের অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও মাতা-পিতা যদি বার্ধক্য দুর্বলতা অথবা কোন মাজুরীর কারণে সন্তানদের সাহায্য ও খিদমতের মুখাপেক্ষী হন তাহলে সন্তান তাঁদের খিদমত এবং আরাম প্রদান করে আল্লাহর প্রতিদানের আকাঙ্খি হবে। এ ধরনের অসহায় অবস্থায় ইসলামে মাতা-পিতার সান্নিধ্যে থেকে খিদমত করা হিজরত ও জিহাদের মত উত্তম আমলের চেয়েও অতি উত্তম কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি জিহাদ করব? তিনি বললেন ঃ

---

৮৪. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুল আদাব অনুচ্ছেদ ঃ দয়া-অনুগ্রহ এবং সুসম্পর্ক (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯ খ্রিঃ), ৫ম খণ্ড, পৃ ৩৮৮।

৮৫. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, **মাতাপিতা ও সন্তানের অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭।

৮৬. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৮; ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার পিতা মাতা জীবিত আছে? সে জবাব দিল হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তাদের দু'জনের জন্য জিহাদ[৮৭] (চেষ্টা তদবীর) কর।[৮৮]

শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হল মাতাপিতার নাফারমানী

عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ إِلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتَّى قُلْتَ لاَ يَسْكُتُ ـ

আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না। আমরা বললাম হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন! শোন মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। জেনে নাও। মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া একথাটি তিনি একাধারে বলে চললেন, এমনকি আমি ভাবলাম তিনি হয়তো থামবেন না।[৮৯]

عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الأُمَّهَاتِ وَمُنْعَ وَهَاتٍ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ـ

মুগীরা রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আল্লাহ তায়ালা মায়েদের নাফরমানী করা হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য অন্যের সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করা অতিমাত্রায় যাঞ্চা করা এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা অপছন্দ করেন।[৯০]

عَنْ أَسْمَاءَ اِبْنَةِ أَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ أَتَتْنِى أُمِّى رَاغِبَةٌ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَصْلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِىْ الدِّيْنِ ـ

---

৮৭. জিহাদ যদি ফরজে আইন না হয় এবং পিতামাতা যদি মুসলমান হন তবে এই হাদীস অনুযায়ী জিহাদে যেতে তাদের অনুমতির প্রয়োজন হবে। আর যদি জিহাদ ফরজে আইন হয় তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়াই অংশগ্রহণ করতে হবে। তখন আর অনুমতির দরকার হবে না।

৮৮. **সহীহ বুখারী শরীফ,** কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৯; এ ধরনের হাদীস আবু দাউদ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

৮৯. **সহীহ বুখারী শরীফ,** কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯২।

৯০. **সহীহ বুখারী শরীফ,** কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯১।

Dhaka University Institutional Repository

আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় আমার অমুসলিম মা আমার নিকট আসলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি কি তাঁর সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার আচরণ করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, ইবনে উযাইনা বলেন, আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারেই এ আয়াত নাযিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এমন লোকদের সাথে রক্ত সম্পর্ক অনুযায়ী সদাচারণ করতে নিষেধ করেছেন, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি।[৯১]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ مَنْ أَدْرَكَ أَبْوَيهِ عِنْدَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলা মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক যে তার পিতামাতার উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) বেহেশতে যেতে পারল না।[৯২]

বাবা মায়ের মান সম্মানের প্রতি অবশ্যই সন্তানকে নজর দিতে হবে। যাতে তারা কোন ধরনের কষ্ট না পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرَ أَنَّ يَلْعَن الرَّجُل وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُل أَبَا الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবীরা গুনাহ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল–কোন লোক তার পিতা-মাতাকে লানত (অভিসম্পাত) করা। জিজ্ঞেস করা হল। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে একজন লোক তার পিতা-মাতার প্রতি লানত করতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। তখন ঐ ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাকে গালি দেয় ফলে অপর ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।[৯৩]

---

৯১. **সহীহ বুখারী শরীফ,** কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক পিতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯২; এই হাদীসে মুশরিক মায়ের সাথে রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয়তা বজায় রাখার এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মুশরিক পিতার ক্ষেত্রেও এ আদেশ প্রযোজ্য।

৯২. ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী, **রিয়াদুস সালিহীন,** প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ ২৩৬।

৯৩. ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী, **রিয়াদুস সালিহীন,** প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ ২৪৯।

প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতা মাতাকে গালি দেয়ার কারণেই সে প্রথম ব্যক্তির পিতামাতাকে গালি দেয় যদি সে গালি না দিত, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রতিত্তোরে গালি দিত না। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি নিজেই তার বাপকে গালি দেয়ার কারণ। অতএব সে নিজেই তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সা'দ রাযী আল্লাহু 'আনহু ইবনে ওয়াক্কাস[৯৪] ইসলাম গ্রহণ করলে তার মাতা খবর পেয়েই কসম খেয়ে বসলো, হয় ইসলাম ছাড়ো না হয় অভূর্ভুক্ত থেকে জীবন দিয়ে দিব। এই অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত নাযিল হয়।

আজীবন মাতা-পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ এবং তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ـ

কোন সন্তানই পিতা-মাতার প্রতিদান আদায় করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সে যদি তাঁকে পিতাকে দাস অবস্থায় পেয়ে ক্রয় করে আযাদ করে দেয় তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হবে।[৯৫]

পিতা-মাতার হক আদায় তাদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন যে সন্তান যত বেশি করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতিদান সে তত বেশিই পাবে। এবং যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে তার দোয়া কবুল হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– তিন ব্যক্তি পথ চলছিল হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হলে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। একটি বিরাট প্রস্তার খণ্ড গুহার মুখে এসে পড়ায় গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একনিষ্ঠ ভাবে তাদের নেক আমলের উছিলায় আল্লাহর নিকট দোয়া করতে লাগল যাতে গুহার মুখ আল্লাহ উন্মুক্ত করে দেন। তাদের একজন বাবা মায়ের প্রতি ভালবাসা ও ভাল ব্যবহারের উছিলায় আল্লাহর কাছে মুক্তির দোয়া করলে দোয়া কবুল হল এবং গুহার মুখ কিছুটা খুলে গেল।[৯৬]

---

৯৪. সাদ ইবন ওয়াক্কাস একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত সা'দ রাযী আল্লাহু আনহু –এর মার অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তাঁর মা কসম খেয়ে বসলো হয় ইসলাম ছাড়ো না হয় অভূর্ভুক্ত থেকে জীবন দিয়ে দিব এবং বার বার বলতে লাগল– তোমাদের দ্বীনেতো মাতা পিতার আনুগত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মার কথা অমান্য করে তুমি স্বয়ং নিজের দ্বীনের খেলাফ করছ। আমি তোমাকে ইসলাম পরিত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছি। তিনদিন পর্যন্ত তিনি কিছু খাননি এবং পানও করেননি। ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে বেহুশ হয়ে যায়। এ অবস্থায় সা'দ রাযী আল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে গিয়ে এ অবস্থা বর্ণনা করলে এ আয়াত নাযিল হয়।

৯৫. ইমাম মহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (র), **রিয়াদুস সালেহীন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৪।

৯৬. তাদের একজন দোয়া করল– হে আল্লাহ আমার মা বাপ অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আমি পশু চরাতাম এবং সন্ধ্যা বেলা পশুগুলো দোহন করতাম এবং আমার ছেলেমেয়েদের পান করানোর আগে আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম। একদিন ফিরে আসতে দেরী হয়ে গেল। এসে দেখলাম তারা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি যথা নিয়মে দুধ দোহন করলাম এবং দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাদের ঘুম থেকে জাগানো ভাল মনে করলাম না এবং তাদের আগে ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। আমার তিন ছেলেমেয়েদের এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত চলল। হে আল্লাহ যদি তুমি মনে কর যে, শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্যই আমি এটা করেছি তাহলে পাথরটা এতটা সরিয়ে দাও যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তায়ালা পাথরটি একটু সরিয়ে দিল। (**সহীহ আল বুখারী,** অধ্যায় ঃ আদব আখলাকের বর্ণনা, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে তার দোয়া কবুল হয়, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯০-৯১)।

Dhaka University Institutional Repository

বাবা মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান ছিল এটা।

মায়ের সন্তুষ্ট ও তার মমতাপূর্ণ অন্তরের দোয়া দ্বীন ও দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। পক্ষান্তরে দ্বীন ও দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক জিল্লাতী হল সন্তানের প্রতি মাতার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বদদোয়া।

সন্তান লালন পালনে মাতা পিতা উভয়েরই অংশ থাকে। কিন্তু মাতা খিদমত, মুহাব্বাত, আনুগত্য, সুন্দর আচরণ ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার বেশি অধিকারী। কেননা সে গর্ভধারণ, জন্মদান ও প্রতিপালনে অসামান্য কষ্ট স্বীকার করে থাকে। হযরত আবু উসাইদ রাযী আল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল! মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোন পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার অব্যাহত রাখতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন জী হ্যাঁ। চারটি সুন্নত রয়েছে। (১) মাতাপিতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার (২) তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পূরণ (৩) পিতামাতার বন্ধুদের ইজ্জত ও সম্মান করা ও (৪) তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করা, যারা পিতার দিক থেকে আত্মীয় হন।[৯৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌবনে পৌছলে তাঁর মা জীবিত ছিলেন না, জীবিত ছিলেন হযরতের দুধ মা হালিমা। দুধ মাকেও তিনি মায়ের মত সম্মান করতেন।[৯৮]

একবার মসজিদে নববীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। একজন বৃদ্ধা মহিলা মসজিদে প্রবেশ করলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদর মুবারক বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। এরপর তিনি যখন উঠলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানে আবার দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দুধ মা হালিমা বিনতে সাদিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহু।[৯৯] ইসলাম একজন নারীকে সম্মান, অধিকার, ও মর্যাদার পূর্ণতায় পৌছে দিয়েছে এভাবে। যখন সে একজন সন্তানের মায়ের স্থানে সমাসীন হয়। বিশ্বকোষ ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে–

---

৯৭. আল আদাবুল মাহরুজ; আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, **মাতাপিতা ও সন্তানের অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৯৮. নবুয়তের যুগে হযরত হালিমা একবার রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর নিকট মদীনাতে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাঁকে গভীর মমতায় মা বলে সম্বোধন করেন এবং নিজের মাথায় পাগড়ি বিছিয়ে বসতে দিতেন। (মুহাম্মদ আব্দুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৩০)।

৯৯. আল্লাহর হাবীবের চাদরের উপর স্বয়ং আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ) বসতে সাহস পাননি। মায়ের সম্মান এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (মুহাম্মদ আব্দুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৩০)।

Dhaka University Institutional Repository

In Muslim Society Women are not only regarded as the creators of human life, as providers of food, and as helpmates, but also as symbols of fertility. As such they enjoy high prestige and are often held in awe.[১০০]

নারী শিক্ষার অধিকার

মুসলমানদের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত প্রয়োজন। এই জন্যই জ্ঞানার্জনকে ইসলাম প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরয করে দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

"প্রত্যেক মুসলিমের জন্য 'ইল্‌ম বা জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয।"[১০১]

'ইল্‌ম বা জ্ঞানার্জন ফরয বলে, এতে নারী-পুরুষ সবাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতগণ মনে করেন (ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে) মুসলিম নারীর এমন বিদ্যা অর্জন করবে যা তাদের জীবনে ও দায়িত্বের সাথে সুসামঞ্জস্য ও প্রয়োজনীয়।

মুসলিম সমাজে সাম্প্রতিকালে নারীরা সাধারণভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। অথচ ইসলাম শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করে এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কুরআন ও হাদীসের কোথাও একটি উক্তিও এমন নেই, যা নারীর শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে বা নিরুৎসাহিত

---

১০০. **বিশ্বকোষ ব্রিটানিকা,** পৃ ৯০৯।

১০১. **সুনান ইব্‌ন মাজাহ** ঃ (بَابُ فَضْلُ الْعُلَمَاءِ وَالْحجرْثِ علي طَلَبِ الْعِلْمِ) অধ্যায়, ১/৮১, আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত; **ত্ববরানী** ঃ আল-মু'জামুস সগীর, ১/১৬; আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। আর ১/২৯ পৃষ্ঠায় হুসাইন ইবন 'আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত; **আল-মু'জামুল আউসাত** ঃ ৩/২১ বর্ণনা হুসাইন রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে, ৩/২১ ও ৩/২২৯ পৃষ্ঠায় আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে; **আল-মুজামুল কাবীর** ঃ ২৪/২৪০ ইবন মাস'উদ রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারী বলেন ঃ উক্ত বর্ণনায় 'উসমান বিন 'আব্দুর রহমান আল ওয়াররাক রয়েছেন, যিনি অপরিচিত এবং এ বর্ণনাতেই হাম্মাদ বিন আবু সুলায়মান রয়েছেন যিনি মুখতালাত। আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু এর বর্ণনাটি আল-বাহরুয যিখার ওরফে মুসনাদ বাযযার গ্রন্থে রয়েছে; ১/১৭২-১৭৩ কিন্তু গ্রন্থ প্রণেতা বলেন ঃ আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত সবগুলো বর্ণনা সহীহ নয়। **تَمِيْزُ الطيِّبِ مِنَ الحَدِيْثِ** গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, ইমাম বাইহাকী বলেন, উক্ত হাদীসের মূল ভাষাটি প্রসিদ্ধ বা মাশহুর, তবে এর বর্ণনা দুর্বল। এ হাদীসে অনেক সনদ রয়েছে, যা সবই দুর্বল। ইমাম আহমদ বলেন, এ ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ বলেন ঃ বর্ণনাটি সহীহ নয়। ইমাম মুযানী বলেন ঃ উক্ত হাদীসের বর্ণনার অনেক দিক রয়েছে, তাই বর্ণনাটি মর্যাদার দিক দিয়ে হাসান হাদীসের সমপর্যায়ের। শাইখ আলবানী বর্ণনাটি সহীহ ইবন মাজাহতে সংকলন করে বলেন, বর্ণনাটি সহীহ। (১/৪৪) (ইমাম সুয়ূতী, **আদ্দুরারুল মুনতাসিরা ফিল আহদীসিল মুশতাহারাহ,** পৃ ১৩০-১৩১)।

Dhaka University Institutional Repository

করে। আমাদের ইতিহাসে শত শত খ্যাতনামা বিদূষী, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিস ইত্যাদি ছিলেন এবং তাদের জীবনীও লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১০২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَال ـ "নিশ্চয়ই নারীরা পুরুষদের সহোদর।"[১০৩]

"হযরত উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু বলেন, আল্লাহর শপথ জাহেলী যুগে আমরা নারীদেরকে কোন মর্যাদাই দিতাম না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে তাদের জন্য আয়াত নাযিল করলেন এবং তাদের প্রাপ্য বণ্টন করে দিলেন।[১০৪]

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমরা নারীদেরকে কিছুই মনে করতাম না। এরপর ইসলামের আবির্ভাব হল এবং আল্লাহ স্বীয় বাণীতে তাদের উল্লেখ করলেন। তারপরই আমরা জানলাম যে, আমাদের প্রতি নারীদের অধিকার রয়েছে।[১০৫] পবিত্র কুর'আনে আল্লাহপাক বলেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ـ

অর্থাৎ– "আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে কেবল আলিমগণই তাঁকে ভয় করে থাকে।"[১০৬]

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

যাদের ইল্‌ম আছে আর যাদের ইল্‌ম নাই তারা কি সমান? (নিশ্চয়ই নয়)[১০৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আল্লাহর যিকর (স্মরণ) ও এর নিকটস্থ বস্তুসমূহ এবং আলিম (ধর্ম জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি) ও ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যতীত গোটা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যত কিছু আছে সকলই অভিশপ্ত (অর্থাৎ আল্লাহর নি'আমত হতে বঞ্চিত)।[১০৮]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং পবিত্র হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে জ্ঞানের এই মর্যাদা নারী পুরুষ সকলের জন্য সমানভাবে উল্লেখ করেছেন। আলাদাভাবে শুধু পুরুষের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

---

১০২. ডঃ মুসতাফা আস সিবায়ী, পৃ ১০৯; **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজের নারী,** পৃ ৬।

১০৩. **সহীহ জামে আস সগীর,** ২৩২৯ নং হাদীস।

১০৪. **সহীহ বুখারী,** তাফসীর অধ্যায় সূরা আত তাহরীম, স্ত্রীদের সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, ১০ খণ্ড, পৃ ২৩৮; **সহীহ মুসলিম,** তালাক অধ্যায়, ইলা ও আযল সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৯০।

১০৫. **সহীহ বুখারী,** পোশাক অধ্যায়, রাসূল (স) যেভাবে ঢিলাঢালা পরিধানের অনুমতি দিতেন অনুচ্ছেদ, ১২ খণ্ড, পৃ ৪১৮।

১০৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ ফাতির, আয়াত ঃ ২৮।

১০৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আয্ যুমার, আয়াত ঃ ৯।

১০৮. **তিরমিযি,** ইবনে মাজা, বায়হাকী।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারী শিক্ষাকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করেছে। এমনকি কোন মেয়ে যদি ইসলামী সমাজের সদস্য হতে চায় তবে তার নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত নৈতিক নীতিমালাও আইনের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন–

يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ - إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

হে নবী! ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে যখন এই মর্মে বাইয়াতের[১০৯] জন্য আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুতে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোন অপবাদ গড়ে নেবে না এবং কোন ভাল কাজে তোমার অবাধ্য হবে না। তাহলে তাদের বাইয়াত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।[১১০]

এই আয়াতে নারীদের থেকে দ্বীন ইসলামে যে নীতিমালা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে পুরুষকে তা থেকে বাদ দেয়া হয়নি। কারণ পারিবারিক জীবনের সাথে তাদের যতটা সম্পর্ক তার চেয়ে বেশি সম্পর্ক পরিবারের বাইরের জীবনের সাথে। এ থেকে বুঝা যায় যে, দ্বীন ইসলামের মূলনীতি ও গোটা বিধানকে মর্যাদা দানের দাবি শুধু পুরুষের কাছে করা হয়নি বরং নারীর কাছেও একই দাবি করা হয়েছে। আর এ দাবি পূরণের জন্য দ্বীনের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়া দরকার। যাতে নারীরাও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও সমস্যার ক্ষেত্রে কুর'আনের হেদায়াত কি এবং কুর'আন কিভাবে তার সমাধান করে তা অবহিত হতে পারে।[১১১]

সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে নারীদের কাছ থেকে যে সব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে তার মধ্যে এ কথাও আছে যে, তারা কোন সৎ কাজে রাসূলের অবাধ্য হবে না। বাহ্যত এটি একটি ক্ষুদ্র বাক্যাংশ। কিন্তু এ দ্বারা সমাজে নারীকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতে বলা হয়েছে। যে জন্য একজন নারীর প্রয়োজন পরিপুর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল যে, নারীরা সে জন্য রাতদিন সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকত। ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পরে যে সব অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা দেখা দিত তা তাদেরকে বিমুখ করতে পারত না। বরং এরকম প্রতিটি জটিলতা তাদের আকাঙ্খার ঘোড়ার জন্য চাবুকের কাজ দিত।[১১২]

---

১০৯. **বাইয়াত–** কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আল্লাহর রাসূলের কাছে প্রতিশ্রুতি প্রদান করাকে শরীয়াতের পরিভাষায় বাইয়াত বলা হয়।

১১০. **আল কুরআন,** সূরা আল মুমতাহিনাহ্, আয়াত নং ১২।

১১১. জালালুদ্দীন আনসার উমরী সাইয়েদ, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮-৮৯।

১১২. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ রকম অবস্থায় মহিলা সাহাবীদের জ্ঞান অর্জনের প্রচণ্ড প্রচেষ্টার বহু নজির পাওয়া যায়। আনসারী মহিলাদের[১১৩] সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা[১১৪] বলেন–

আনসারী মহিলারা কতই না ভাল দ্বীনের বিধি বিধান সম্পর্কে পরিপক্কতা লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম তাদের বাঁধা হয়ে দাঁড়িতে থাকতে পারেনি।[১১৫]

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর উদ্ধৃতি থেকেই বুঝা যায়–

নবী সাল্লাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে পবিত্র কুর'আনের আয়াত নাযিল হত। আমরা যদিও তার শব্দগুলো হুবহু ধরে রাখতাম না কিন্তু তার হালাল হারাম ও আদেশ নিষেধগুলো স্মৃতিতে গেঁথে নিতাম।[১১৬]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা তার প্রমাণ পাই।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْل للهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَلى مِنْ هٰذِه الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سَتْرًا مِنَ النَّار ـ

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি কন্যা সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করলে ঐ কন্যা সে ব্যক্তির জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।[১১৭]

হযরত আবু বুরদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

---

১১৩. **আনসার–** সাহায্যকারী। যেসব মুসিলম ভাই ও বোনেরা মক্কা থেকে মদীনায় আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে হিজরত করেছিলেন। মদীনায় অবস্থানকারী মুসলমানরা তাদের জান ও মাল দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন; এদেরকে আনসার বলা হয়।

১১৪. **হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা–** হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী এবং হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু এর কন্যা। হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে তিনি বিশেষ স্থান অধিকারী ছিলেন।

১১৫. **মুসলিম শরীফ,** ১ম খণ্ড, কিতাবুল হায়েজ অধ্যায়, পৃ ১৭৯।

১১৬. **আল ইকদুল ফারীদ,** ১ম খণ্ড, পৃ ২৭৬; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯০।

১১৭. **সহীহ বুখারী,** শিষ্টাচার অধ্যায়, সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা ও আলিঙ্গন অনুচ্ছেদ, ১৩ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা; **সহীহ মুসিলম**, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ও শিষ্টাচর অধ্যায়, কন্যাদের প্রতি সুন্দর আচরণ অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

وَعَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اِبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا رَجُلٌ كَـانَتْ عِنْدَهُ وَلِيْدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَأَدَّبَـهَا فَأَحْسَـنَ تَأْدِيْبَـهَا ثُـمَّ أَعْتَقَـهَا وَتَزَوَجَـهَا فَلَـهُ اَجْرَانِ -

"যে ব্যক্তির অধীনে কোন দাসী থাকে, সে যদি তাকে উত্তমরূপে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয় এবং বিবাহ করে তবে সেই ব্যক্তি দুটি প্রতিদান পাবে।[১১৮]

হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। হাফেয যাহাবী বলেন– হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন মহিলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১১৯]

ইমাম শওকানী বলেন ঃ উলামায়ে কেরামের কারো পক্ষ থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি কোন মহিলার বর্ণনাকে মহিলা হওয়ার কারণে প্রত্যাখান করেছেন। এমন বহু হাদীস রয়েছে যা একজন মহিলা সাহাবী বর্ণনা করেছেন, আর গোটা উম্মত তা নির্দিধায় গ্রহণ করেছে, ইল্‌মে হাদীস সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান রয়েছে তিনি একথা অস্বীকার করতে পারেন না।[১২০]

শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তৎকালীন মহিলা সাহাবীরা আলাদা ব্যবস্থা দাবি করেছিলেন। আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে হাজির হয়ে বলল হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খিদমতে আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অধিক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন, যেদিন আমরা সবাই আপনার খিদমতে হাজির হব। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা সমবেত হবে তারা সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে তাদেরকে কিছু শিক্ষাদান করলেন।[১২১]

---

১১৮. **সহীহ বুখারী,** বিবাহ অধ্যায়, বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে তাকে বিবাহ করা অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ২৮।

১১৯. আবুল ফজল ইবরাহীমের গবেষণামূলক পর্যালোচনা সহকারে যাহাবী প্রণীত মীযানের ভূমিকা। আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ্, রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা, **ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট্‌স**। লালমাটিয়া, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, রমজান ১৪১৫, পৃ ১৪২।

১২০. **নাইনুল আওতার,** ৮ম খণ্ড, পৃ ১১২।

১২১. **সহীহ বুখারী,** কুরআন সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সক্রান্ত অধ্যায় অনুচ্ছেদ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী পুরুষ নির্বিশেষে তার সমগ্র উম্মাতকে ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ তাঁকে যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই কোন কাটছাট না করে বা অতিরঞ্জিত করা ছাড়াই শিক্ষা দিয়েছেন। ১৭ খণ্ড, পৃ ৫৫। (**সহীহ মুসলিম,** শিষ্টাচার ও আত্মীয়দের সাথে সদাচার অধ্যায়, মেয়েদের প্রতি অনুগ্রত প্রদর্শন অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ ৩৯)।

Dhaka University Institutional Repository

হাফেয ইবনে হাজার রাযী আল্লাহু 'আনহু বলেন– এ হাদীসে মহিলা সাহাবীদের দীনি ইলম অর্জনের অধীর আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১২২]

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে শাকাল ঋতুবতী মহিলার গোসল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এজন্য তোমরা প্রয়োজনীয় পানি ও এক টুকরা কাপড় কিংবা তুলা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে তা উত্তমরূপে ডালবে। যাতে পানি মাথার সব জায়গায় প্রতিটি চুলের গোড়ায় পৌছে যায়। এরপরে আবার পানি ঘষবে। এরপর মিশক (সুগন্ধি) যুক্ত কাপড় বা তুলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে।[১২৩]

জ্ঞানের আলো ছাড়া সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয়। পবিত্র কুর'আনে তাই জ্ঞান অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুর'আনের প্রথম বাক্য, বিশ্ব মানবের কাছে বিশ্ব স্রষ্টার সর্বপ্রথম বাণী হল –

إِقْرَأْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

"পড় তোমার প্রভুর নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[১২৪]

মূর্খতার অন্ধকারে আচ্ছন্নমানব অন্তরকে আলোকিত করার একমাত্র পথ জ্ঞান অর্জন করা। এই জন্যই বিশ্বমানবকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কুর'আনের প্রথম শিক্ষাই হল পাঠ কর। বিশ্ব মানবের প্রতি বিশ্ব স্রষ্টার সর্বপ্রথম দানও হল ইলম বা জ্ঞানের আলো। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

وَعَلَّمَ أدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ ـ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِى بِأَسْمَاءِ هـٰؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ

এবং তিনি আমাকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলি ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন ও বললেন, এগুলির নাম আমাকে বলে দাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[১২৫] এই শিক্ষা সমগ্র মানব মণ্ডলির জন্যই।

বিদ্যা শিক্ষা ও অজানাকে জানার সেই অদম্য স্পৃহা নিয়েই শুরু হয়েছিল ইসলামের জয়যাত্রা। এ যাত্রা পথে অংশ নিয়েছেন অসংখ্য মহিলা সাহাবী, যারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে চরম উন্নতি ঘটিয়ে মুসলমান পৃথিবীর মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। ধর্ম ও শিক্ষা ইসলামে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।[১২৬]

---

১২২. ইবন হাজার আসকালীন, **ফতহুল বারী,** ১ম খণ্ড, পৃ ২০৭।

১২৩. **সহীহ মুসলিম,** মাসিক ঋতু অধ্যায়, নির্গমন স্থানে ধৌত করার প্রাক্কালে মিশকে আম্বর মিশ্রিত কাপড় বা তুলার টুকরা ব্যবহার উত্তম হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৯।

১২৪. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল আলাক, আয়াত ঃ ১।

১২৫. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ৩১।

১২৬. কানিজ মুস্তাফা সাইয়্যেদ, **ইসলামে নারীর অধিকার,** বানী প্রকাশ কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সারা জীবনে বারবার শিক্ষার সুমহান আদর্শ এবং শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন–

"যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ করে সে আল্লাহর পথে চলে।" যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করবে।"[১২৭]

শিক্ষাকে উৎসাহিত করে আল্লাহপাক পবিত্র কুর'আনে বিভিন্ন আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন–

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ـ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِىْ الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ـ

"আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচাতে পারে?[১২৮]

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

"আল্লাহ জ্ঞান দিয়েই সূচনা করেছেন। আর আলেমগন নবীগণের ওয়ারিস। তারা জ্ঞানের ওয়ারিস হয়েছেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করে প্রচুর সম্পদ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি কোন পথে চলাকালে জ্ঞান লাভ করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেয়"।[১২৯]

"আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তিনি তাকে দ্বীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন"।[১৩০]

مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘরের বাহির হয় সে আল্লাহর রাস্তায় চলে, যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে আসে।[১৩১]

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ بِه طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ـ

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পথ ধরে, আল্লাহ তার দ্বারা বেহেশতের পথ সুগম করে দেন।[১৩২]

---

১২৭. **মিশকাত শরীফ,** ২য় খণ্ড, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, এলেম অধ্যায়, হাদীস নং ২২, পৃ ২২।

১২৮. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত তওবা, আয়াত ঃ ১২২।

১২৯. **সহীহ বুখারী,** ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম, আধুনিক প্রকাশনী, পৃ ৭১।

১৩০. **সহীহ বুখারী,** ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম, আধুনিক প্রকাশনী, পৃ ৭২।

১৩১. **আবু ঈসা তিরমিযি (রহ),** অনুবাদ মুহম্মাদ মূসা, মুহাম্মাদ শামসুল আলম খান, জামে আত-তিরমিযী ৪র্থ খণ্ড ঢাকা; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃ ৩৯৭, প্রাগুক্ত পৃ- ৩৯৮।

১৩২. **মুসলিম শরীফ,**

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ عَفْوَةَ لَمَّا مَضِىْ -

"যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, তার অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।[১৩৩]

لِفَضْلِ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرَ الْكَوَاكِبِ -

পূর্ণিমার রাতের সকল তারকার উপর চাঁদের যেমন মর্যাদা সাধারণ ইবাদতকারীর উপর জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদাও সেরকম।[১৩৪]

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْر مِّنْ أِحْيَائِهَا -

রাতের বেলা এক ঘণ্টা জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।[১৩৫]

اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَةَ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقّ بِهَا -

জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারান মহামূল্যবান ধন তা সে যেখানেই পাবে গ্রহণ করার অধিকার তার আছে।[১৩৬]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمَنْ يُّؤتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا -

আর যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।[১৩৭]

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ -

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ইলম দান করেন।[১৩৮]

আল কুর'আনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ সকল আয়াত এবং রাসূলের বাণীর কোথাও জ্ঞান অর্জন জ্ঞানীর মর্যাদা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে পুরুষ জাতিকে উল্লেখ করা হয়নি বরং সমগ্র মানবমণ্ডলির জন্যই বলা হয়েছে।

কুর'আনের এই ঘোষণা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর বাস্তব স্বাক্ষর রয়েছে তার সময়ের মহিলাগণের পাণ্ডিত্যে। ইসলাম তার বিকাশের প্রাথমিক যুগেই জন্ম দিয়েছিল অসংখ্য বিদূষী নারীর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী। তিনি ছিলেন জ্ঞানে মহিয়সী। উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না ও স্বচ্ছ সাবলীল বাচনভঙ্গীর অধিকারিণী। বিখ্যাত সাহাবীগণ ছিলেন তার ছাত্র। ইসলামের বিখ্যাত আইনবিদদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১৩৩. **আবু ঈসা তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ,** ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯৮।

১৩৪. **আবু ঈসা তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ,** ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ৪১৯।

১৩৫. **মুসনাদ দারিমী,**

১৩৬. **ইবনে মাযা, আবু ঈসা তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ,** প্রাগুক্ত পৃ. ৪২২

১৩৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২৬৯।

১৩৮. **আবু ঈসা তিরমিযী,** জামে আত তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

–এর কন্যা হযরত ফাতেমা জোহরা রাযী আল্লাহু 'আনহা, জয়নাব বিনতে আবি সালাম, শিমা রাযী আল্লাহু 'আনহা[১৩৯] প্রভৃতি নারীদের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৪০]

অথচ এই বিংশ শতাব্দীতে মুসলমান নারীর অশিক্ষা মূর্খতা ও পশ্চাৎগামিতার জন্য দায়ী করা হয় ইসলামকে। হাদীস ও কুরআন প্রমাণ করে এই ধারণা কত ভুল। ইসলামই নারীকে দিয়েছে মধ্যযুগের চরম অবমাননা ও অন্ধকারময় জীবন থেকে নিষ্ক্রান্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল অসাধারণ সম্মান ও মর্যাদায়।

উরওয়া ইবনে যুবাইর হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারিনী হওয়ার কথা এভাবে প্রকাশ করেছেন–

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ وَلاَ فَرِيْضَةٍ وَلاَ حَلاَلٍ حَـرَامٍ وَلاَ بِشِـعْرٍ وَلاَ مَجْدِيْثَ الْعَرَابِ وَلاَ أَنْسَبُ مِنْ عَائِشَةَ ـ

আমি কুর'আন, ইসলামের ফরযসমূহ হালাল ও হারাম কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখি নাই।[১৪১]

মূসা ইবনে তালহা বলেন– مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحُ مِنْ عَائِشَةَ ـ

আমি হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখি নাই।[১৪২]

অংক শাস্ত্রে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, বড় সাহাবাগণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাসলা-মাসায়েল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[১৪৩]

তাবেয়ীদের যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ কাসেম ইবন মুহাম্মদ, ইমাম যুহরীকে বললেন ঃ আমর বিনতে আবদুর রহমানের মজলিস ছেড়ে থেক না কারণ তিনি হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর লালিত পালিত। (তাই তার জ্ঞানের বড় উত্তরাধিকারিণী)।[১৪৪]

---

১৩৯. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর পালিত ভগ্নী শিমা রাযী আল্লাহু 'আনহা ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি। হযরত হোসেন রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর কন্যা সাকিনা। সে যুগের সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। খলিফা হারুণের সহধর্মিণী জোবায়দার নাম শিক্ষা ও সমাজ সেবার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

১৪০. কানিজ মুস্তাফা সাইয়্যেদ, **ইসলামে নারীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২।

১৪১. শামসুদ্দীন আয যাহাবী তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, পৃ ২৭; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩।

১৪২. আহমদ ইবন আলী হাজার আল আসকালানী, **আল ইসাবা ফী তামীযিস্ সাহাবা,** ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩৬০।

১৪৩. ইমাম হাকিম মুসতাদরিক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১১; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪।

১৪৪. শামসুদ্দীন আয যাহাবী, **তাফকিরাতুল হুফফাজ,** ১ম খণ্ড, পৃ ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা পরমা সুন্দরী হওয়ার সাথে সাথে পরিপক্ক জ্ঞান বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন।[১৪৫]

হযরত উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর কন্যা হযরত যয়নব তার যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহদের অন্যতম ছিলেন।[১৪৬]

হযরত আবু দারদার স্ত্রী উম্মে দারদার জ্ঞান ও মর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, ইমাম বুখারী (র) তাঁর আমল বা বাস্তব জীবনের কাজকে সহীহ বুখারী হাদীস গ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন– উম্মে দারদা ছিলেন একজন ফকীহ মহিলা তিনি নামাযে পুরুষের মত করে বসতেন। (তাই তাঁর একাজ দলীল হিসেবে গণ্য।[১৪৭]

ফাতেমা বিনতে কায়েসের জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক তিনি ফিকহী মাসয়ালার ব্যাপারে দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা ও হযরত উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর সাথে বিতর্ক করেছেন– ইমাম নববী তার সম্পর্কে লিখেছেন–

ফাতেমা বিনতে কায়েস প্রথম যুগে হিজরতকারীদের একজন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণতার অধিকারিণী।[১৪৮]

হযরত আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু এর মা উম্মে সুলাইম সম্পর্কে ইমাম নববী বলেন– তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারী মেয়ে সাহাবী।[১৪৯]

উম্মে আতিয়া সম্পর্কে ইমাম নববী (র) একই মন্তব্য করেন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৫০]

ইমাম মালেক (র) এর কন্যার জ্ঞান ও মর্যাদার অবস্থা এই ছিল যে, ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যায়নকালে কোথাও ভুল করে ফেললে তিনি ঘরের ভেতর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) এর এতটা আস্থা ছিল যে, করাঘাত শুনে তিনি ছাত্রদের বলতেন– আবার পড়ো তোমরা কোথাও ভুল করছ।[১৫১]

নারীদের এই যোগ্যতা সমাজের কল্যাণ সাধন করেছে এবং দ্বীনে ইসলাম ও জ্ঞানের কোন কোন ক্ষেত্রকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করেছে। তারা পুরুষের পাশাপাশি এ জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়ুম (র) বলেন–

---

১৪৫. **আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা,** ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৪৫৯।

১৪৬. **আল ইসতিয়া ফী আসমাইস সাহাবা,** তাযকিরাতু যায়নাব বিনতে আবী সালামা।

১৪৭. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুল আযান অনুচ্ছেদ, সুন্নাতুল জুলুস ফীত তাশাহুদ।

১৪৮. **তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত,** ২য় খণ্ড, পৃ ৩৫৩।

১৪৯. **তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত,** ২য় খণ্ড, পৃ ৩৬৩।

১৫০. **তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত,** ২য় খণ্ড, পৃ ৩২৪।

১৫১. **আল মাদখালু লি ইবনিল হাজ্জ,** প্রথম খণ্ড, পৃ ২১৫; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

وَالَّذِيْنَ حَفَظِتْ عَنْهُمُ الْفَتْوٰى مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ مَاةٌ وَنِيْفٌ وَثَلاثُوْنَ نَفْسًا مَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে সব সাহাবার ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাদের সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশি। এর মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত।

তাদের মধ্যে সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এতো অধিক যে, আল্লামা ইবনে হাযমের মতে এক জনের ফতোয়া একত্রিত করলে একটি বিশাল গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই সাত জনের মধ্যে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা মত ব্যক্তিত্বও অন্তর্ভুক্ত আছেন।[১৫২]

ফতোয়া দানকারী সাহাবাদের দ্বিতীয় সারিতে হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু ও হযরত উসমানে রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর সাথে হযরত উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর মত মহিলা সাহাবা রয়েছেন।[১৫৩]

ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরেক দল সাহাবা ছিলেন। এসব সাহাবাদের মধ্যে হযরত হুসাইন রাযী আল্লাহু 'আনহু, আবু যর রাযী আল্লাহু 'আনহু, আবু উবায়দা রাযী আল্লাহু 'আনহু ও অন্যান্য সাহাবাগণ। হযরত উম্মে আতিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা, হযরত হাফসা রাযী আল্লাহু 'আনহা, হযরত উম্মে হাবীবা রাযী আল্লাহু 'আনহা, হযরত আফিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা, লায়লা বিনতে কায়েস রাযী আল্লাহু 'আনহা, আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহা, উম্মে শরীফ রাযী আল্লাহু 'আনহা, খাওলা বিনতে তাওয়ীত রাযী আল্লাহু 'আনহা, উম্মে দারদা, আতেকা বিনতে যায়েদ রাযী আল্লাহু 'আনহা, সাহলা বিনতে সুহাইল রাযী আল্লাহু 'আনহা, হযরত জুয়াইরিয়া, হযরত ময়মূনা রাযী আল্লাহু 'আনহা, হযরত ফাতেমা রাযী আল্লাহু 'আনহা, ফাতেমা বিনতে কায়েস, উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা, যয়নব বিনতে উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা, উম্মে আয়মন রাযী আল্লাহু 'আনহা, উম্মে ইউসুফ রাযী আল্লাহু 'আনহা এবং গামেদিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা অন্তর্ভুক্ত।[১৫৪]

আমেরা বিনতে আব্দুর রহমানের বর্ণিত হাদীসসমূহ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের দৃষ্টিতে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি আবু বকর ইবনে হামযা রাযী আল্লাহু 'আনহুকে তা লিখে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৫৫] মারওয়ানের একটি বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে বলেন–

আমাদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র স্ত্রীগণ বর্তমান থাকতে কোন বিষয়ে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে যাব কেন? তাই তিনি লোক মারফত হযরত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সে সমস্যার সমাধান দেন।[১৫৬]

---

১৫২. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১২।

১৫৩. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১২।

১৫৪. ইবনুল কায়্যিম মুহাম্মদ ইবন আবু বকর, **ইলামুল মুকিঈন,** ১ম খণ্ড, পৃ ৯-১১।

১৫৫. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবকাতে ইবনে সা'দ,** ৮ম খণ্ড, পৃ ৩৫৩।

১৫৬. **মুসনাদে আহমদ,** ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারী শিক্ষায় বাঁধা দেয় না। যত উচ্চ শিক্ষা সম্ভব তাদের দেয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, তবে কয়েকটি শর্ত আছে। প্রথমত ঃ তারা নিজেদের বিশেষ কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হতে পারে, এমন শিক্ষাই তাদের দিতে হবে।[১৫৭]

দ্বিতীয়ত ঃ নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে। সহশিক্ষা চলবে না। নারীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষিকা দ্বারাই শিক্ষা দিতে হবে। সহশিক্ষার কুফল পাশ্চাত্য জগতে এমন প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে তারা ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।[১৫৮]

তৃতীয়ত ঃ উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদের এমন প্রতিষ্ঠানাদিতে নিয়োগ করতে হবে, যা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই নির্দিষ্ট এবং মহিলাদের কর্মের উপযোগী।[১৫৯]

ইসলাম জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সকলকে সমানভাবে সম্পৃক্ত করেছে, উৎসাহিত করেছে এবং তাগাদা দিয়েছে। সুতরাং সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই সমগ্র মুসলিম নারী জাতিকে জ্ঞানার্জনের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। স্বর্ণযুগের মুসলিম মহিলাদের মত এ যুগেও মুসলিম মহিলাদের সমাজ ও সভ্যতা নির্মানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হবে এবং বিজ্ঞানের এই যুগে এ কাজ তখনই সম্ভব যখন মুসলিম নারীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে থাকবে। মুসলিম নারীর শিক্ষার সূচনা হয়েছিল মসজিদে নববীতে মদীনায়। সেই সকল নারীরা মহিয়সী হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তথা পার্থিব বিদ্যা অর্জন করে অবদান রেখেছিলেন। সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণে এবং ইসলামকে পৃথিবীতে সুদৃঢ় করতে।[১৬০] আমাদেরকেও তাদেরই পথ অনুসরণ করতে হবে।

---

১৫৭. সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদুদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান** (ঢাকা ঃ মওদুদী রিচার্স একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রিঃ), পৃ ৩৪৪।

১৫৮. আমেরিকায় ১৭ বছর পর্যন্ত যে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়ে সহশিক্ষার কারণে প্রতি বছর গড়ে ১০০০ জন গর্ভবতী হয়। এটা ১৯৬২ সালের কথা। ব্রিটেনে ১৯৮০ সালে ১০ হাজার কুমারী মেয়ের মধ্যে এক জরিপে দেখা যায় একজন মেয়ে ২০ বছর বয়সে ১০ জনেরও বেশি পুরুষের সঙ্গী হয়েছে। ১৯৮০ সালের হিসাব অনুযায়ী মার্কিন মুল্লুকে ১৩ লাখ জারজ সন্তান সরকার লালন-পালন করছে। বহু প্রকার গর্ভ নিরোধ আবিষ্কার করেও তারা কুমারী গর্ভধারণ ঠেকাতে পারছে না। আমেরিকার প্রতি ৬ মিঃ এ ১টি ধর্ষণ হয় ব্যাংককে ১ বছরে ২ লাখ গর্ভপাত হয়। এর অর্ধেক কুমারী। বর্তমানে এ সংখ্যা বহুগুণ বেশি। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান**, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৫; জহুরী অপসংস্কৃতির বিভীষিকা, ঢাকা ঃ উতলু প্রকাশন, ৪র্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি– ১৯৯৯ খ্রিঃ, পৃ ৪১)।

১৫৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান**, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৪-৩৪০।

১৬০. একজন মুসলিম নারী ধর্মীয় জ্ঞানার্জনসহ সমসাময়িক জ্ঞান অর্জন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রতিবাদ করার জন্য সব রকমের জ্ঞান ভালভাবে রপ্ত করে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র ও বিষবৃক্ষ সমূলে উপড়ে ফেলার মাধ্যমে নারী তার পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালিকা হবে। নিজের অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবো তবেই ইসলামী পরিবার ও সমাজ স্বর্গে পরিণত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার

ইসলাম জীবন গঠনের জন্য যে নকশা পেশ করেছে তার সম্পর্ক ইবাদতের সাথে হোক বা আদান-প্রদানের সাথে, পারিবারিক শৃঙ্খলার সাথে হোক বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সাথে, এবং অর্থনৈতিক বিধি-বিধানের সাথে হোক বা সভ্যতার নীতিমালার সাথে, কোন অবস্থায়ই সে নারীর প্রকৃত মর্যাদা ব্যাহত হতে দেয়নি। ইসলাম নারীর চেষ্টা সাধনা ও কর্ম তৎপরতা শুধু জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং তার কর্মতৎপরতার ব্যাপক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাই সে জ্ঞান ও সাহিত্যের ময়দানে যেমন অগ্রসর হতে পারে তেমনি কৃষি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ময়দানে সমৃদ্ধির অধিকার রাখে। শিল্প-কারিগরী এবং বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করার অনুমতি যেমন তার রয়েছে। তেমনি রয়েছে জাতীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করার অনুমতি। এ ক্ষেত্রে অনুমতির অর্থ এ নয় যে, তার চেষ্টা সাধনা ও কর্ম তৎপরতা শুধু বরদাশত করা হয়েছে বা মেনে নেয়া হয়েছে। বরং তার অর্থ হল, জীবন এবং গতি ও অনুভূতির যে সব চাহিদা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় তাকে অবদমিত এবং ধ্বংস করার কোন প্রচেষ্টা চালান হয়নি। বরং এগুলোকে পূর্ণতায় পৌছানোর জন্য তাকে আহবান জানান হয়েছে।[১৬১]

ইসলাম নারীর যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতানুযায়ী সকল ক্ষেত্রে কাজ করার অনুমতি দেয়। তবে ইসলামের মৌল নীতিমালা ও নৈতিকতার সাথে তার সামঞ্জস্য ও সংগতি থাকতে হবে। যেমন মা ও স্ত্রী হিসেবে তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, চাকরিটা কোন ক্রমেই এমন হতে পারবে না। তাছাড়া চাকরিরত মহিলা তার পুরুষ সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা এবং শরীরের নিষিদ্ধ স্থানগুলো তাদের সামনে প্রকাশ করতে পারবে না। একই কক্ষে এক বা একাধিক পুরুষের সাথে কাজ করতে পারবে না। কেননা ভিন্ন পুরুষের সাথে নিভৃত সাক্ষাত শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। একই কক্ষে কাজ করলে সেই নিষিদ্ধ নিভৃত সাক্ষাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।[১৬২] কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের বহু নজীর রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সময়ের মহিলা সাহাবীদের জীবনে।

---

১৬১. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯; মুসতাফা আস সিবায়ী– ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।

১৬২. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১০; হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلُ عَلَى النِّسَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ الله أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوْ ؟ قَالَ الْحَمُوْا الْمَوْتَ

অর্থাৎ– মেয়েদের কাছে একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। আনসারদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল দেবরের ব্যাপারে কি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দেবরতো মৃত।

(**বুখারী শরীফ,** অধ্যায় বিবাহ, অনুচ্ছেদ– মাহাররমের সঙ্গে ছাড়া কোন পুরুষ কোন মেয়ের কাছে যাবে না এবং স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর কাছে যাওয়া। ১১ খণ্ড, পৃ ২৪৬; **মুসলিম শরীফ,** অধ্যায় সালাম, অনুচ্ছেদ– অপরিচিতার সাথে নিরিবিলিতে বসা এবং তার কাছে যাওয়া হারাম, ৭ম খণ্ড, পৃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিকাজে নারীদের ভূমিকা

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ তুমি তোমার খেজুর কাটতে পার। তুমি তো ঐগুলি অবশ্যই দান করবে অথবা ভাল কাজে ব্যবহার করবে।[১৬৩]

এ কথাগুলো বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবের রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর খালাকে মানবতার কল্যাণ কামনা ও তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এই হাদীস থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা গেল তা হল, পবিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্যে সাধন এবং কল্যাণকর কাজের পূর্ণতা সাধনের জন্য নারী ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারে।[১৬৪]

হযরত সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা[১৬৫] কে বাইরে যেতে দেখে হযরত উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু তার সমালোচনা করলে তিনি (কোন কথা না বলে) ঘরে ফিরে আসলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে বিষয়টি বললেন। এর পরপরই নবী সাল্লাল্লাহু

---

১৬৩. **সহীহ মুসলিম,** তালাক অধ্যায়, বায়েন তালাক প্রাপ্ত মহিলাদের বের হওয়ার বর্ণনা অনুচ্ছেদ ৪র্থ খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা; **আবু দাউদ**, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ, ফিল মাবতুতাতি তাখরুজু বিন নাহার; **ইবনে মাজা** ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৬৪. জালাল উদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২২।

১৬৫. হযরত সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা হযরত খাদিজা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর মৃত্যুর এক মাস পর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর নবুওয়াতের দশম বর্ষের রমজান মাসে তায়িফ ভ্রমণে বের হওয়ার পূর্বে সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর বিয়ে সুস্পন্ন হয়। যেহেতু হযরত সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা এবং হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর বিয়ের সময়কাল কাছাকাছি ছিল সে কারণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কার বিয়ে আগে হয়েছিল এই নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে ইসহাকের মতে সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর বিয়ে আগে হয়েছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে এটাই সঠিক। এই বিয়ের সময় সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর বিয়ের বয়স ছিল ৫৫ বছর। অপরদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর বয়স ছিল ৫১ বছর। বিবি খাদিজা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর মৃত্যুর পর তার দুই নাবালিকা কন্যা উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা যাহরার লালন-পালন করার জন্য এবং সংসারের যাবতীয় কর্ম-কাণ্ড পরিচালনার জন্য একজন দায়িত্বশীল স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল। হযরত সওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা এই শোকার্ত দুঃখময় সংসারে পদার্পণ করে সংসারের যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং মা হারা মেয়ে দুটিকে ভালবাসা, স্নেহ দিয়ে এমনভাবে মানুষ করেছিলেন যে, কেউ মনে করতে পারতেন না তিনি তাদের আপন মা নন। হযরত সওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘাঙ্গীণী। দানশীলতা ও পরোপকারে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা ছাড়া অন্যান্য সকল স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। মহিমাময় সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হযরত ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর খেলাফতকালে চব্বিশ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন বলে উল্লেখ আছে। ইমাম বুখারীসহ অধিকাংশ আলেম এ মতকে সমর্থন করেন। মদীনায় বাকী নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর ওপর অহী নাযিল হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল। এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বললেন ঃ

إِنَّهُ أَذِنَ لَكِنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ لَهُ ـ

"প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।[১৬৬]

নারীর বাস্তব কর্মতৎপরতা এ বিষয়ে অকাট্য এবং নিশ্চিত প্রমাণাদি পেশ করছে যে, ঘর কন্যার কাজ ছাড়াও সে ঘরের ভিতরে ও বাইরে আরো অনেক কাজ করতে পারবে।

কায়িক পরিশ্রম

হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু এর কন্যা আসমা রাযী আল্লাহু 'আনহা তার অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়ি থেকে দুই মাইল দূরে একখণ্ড জমি চাষ করে ফসল সংগ্রহ করতে দিয়েছিলেন। আমার স্বামী যুবায়ের রাযী আল্লাহু 'আনহু–কে আমি সেই জমি থেকে খেজুরের আঁটি সংগ্রহ করে আনতাম। একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি ভর্তি ঝুঁড়ি বহন করে আনছিলাম। রাস্তায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে দেখা হয়ে গেল। তাঁর সাথে কয়েকজন আনসার ছিলেন। তাই পুরুষদের সাথে পথ চলতে আমি লজ্জাবোধ করলাম। সুতরাং আমি ইতস্তত করতে থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বুঝে ফেললেন এবং আমাকে না নিয়েই চলে গেলেন।[১৬৭]

ব্যবসা-বাণিজ্যে

ফায়লা রাযী আল্লাহু 'আনহা নাম্মী এক মহিলা সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ

إِنِّي إِمْرَأَةٌ أَبِعُ فَاشْتَرِيُ আমি একজন মহিলা। আমি নানা প্রকার জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি (অর্থাৎ আমি ব্যবসায়ী) এরপর সে ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছ থেকে জেনে নিল।[১৬৮]

হযরত উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর খিলাফত যুগে আসমা বিনতে মাখরাকে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু রাবীয়াহ ইয়ামান থেকে আতর পাঠাতো আর তিনি ঐ আতরের কারবার করতেন।[১৬৯]

---

১৬৬. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুত তাফসীর: সূরাতুল আহযাব, অনুচ্ছেদ কাওলুহু লা-তাদখুলু বুয়ুতান নাবীয়ে ----- **মুসনাদে আহমদ,** ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৫৬।

১৬৭. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আল গাইরাতু, ৫ম খণ্ড, পৃ ৯৭।

১৬৮. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবকাতে ইবনে সা'দ**, ৮ম খণ্ড, পৃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী শিল্প ও কারিগরী জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। এ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের স্বামীর এবং সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন একদিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম–কে বললেন–

إِنِّيْ إِمْرَأَةٌ ذَا صَنْعَةَا مَعَ صَنْهَا وَلَيْسَ لِى وَلَا لِزَوْجِى وَلَا لِوَالِدِىْ شَيْئٌ

"আমি কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ একজন নারী। আমি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করি। (এভাবে আমি উপার্জন করতে পারি)। কিন্তু আমার স্বামী ও সন্তানদের (আয়ের কোন উৎস) কিছুই নেই। তিনি জানতে চাইলেন, তিনি কি তাদের জন্য ব্যয় করতে পারেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ তুমি তাদের জন্য ব্যয় করতে পার। এজন্য তুমি পুরস্কার লাভ করবে।[১৭০]

খাওলা বিনতে সা'লাবা[১৭১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন–

---

১৬৯. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবকাতে ইবনে সা'দ**, ৮ম খণ্ড, পৃ ২; আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু রাবী বিনতু মু'আওয়েয; কিতাবুত তাবাকাত– এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর এমন সাহাবীগণের বর্ণনা করেছেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি হিজরী ৬২৮ সালে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের একটি কপি তুরস্কের আহমদ আস্-সালিস্' গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক সংখ্যা ৬২৪/২৬ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা (কল নং) ২৭৯-২৯৭। (**ইমাম মুসলিম** ইবনুল হাজ্জাজ, পৃ ঃ ৫৬। ব্রোকেলম্যান, ৩য় খণ্ড পৃ ১৮৫; তারীখুত তুরাসীল আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৬৯।

১৭০. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবাকাতে ইবনে সা'দ**, ৮ম খণ্ড, পৃ ২১২; আল ইসাবা ফীত তামীযিস্ সাহাবা' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায় একই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

১৭১. **খাওলা বিনতে সালাবা** ঃ বনি আওস গোত্রে খাওলা বিনতে সা'লাবার জন্ম, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে বাইয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। খাওলা রাযী আল্লাহু 'আনহা দুনিয়া লয় না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সমাজে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আল কুরআন তাকে অমর করে রাখবে। কারণ, খাওলা বিনতে সা'লাবা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর স্বামী আওস বিন সামিত ছিলেন কঠোর মেজাজের অধিকারী এবং বার্ধক্যের কারণে আরও তিক্ত ও কর্কশ হয়ে গিয়েছিলেন। জাহেলী যুগের আরবদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে বলত ঃ "তোমার পৃষ্ঠদেশ আমার মায়ের মত"। খাওলা বিনতে সা'লাবার স্বামী একথা বললে। এ ব্যাপারে ফয়সালার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর দরবারে হাযির হলেন স্বামী পরিত্যক্ত খাওলা রাযী আল্লাহু 'আনহা। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম–কে বললেন, আমি শপথ করে বলছি আমার স্বামী আমাকে রাগ করে একথা বলেছেন। তিনি আমাকে তালাক দেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বললেন, আমার মনে হয় তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কথা শুনে খাওলা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন– হে আল্লাহ আমার জীবনের কঠিন তকলীফ ও বিরহ বিচ্ছেদের অভিযোগ করছি। "হে আল্লাহ আমার জন্য যা কল্যাণকর হয় তাই তোমার নবীর মারফত আমাকে জানিয়ে দাও।" হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা খাওলা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর ফরিয়াদ দেখে আল্লাহর দরবারে কাঁদলেন। অতঃপর খাওলা রাযী আল্লাহু 'আনহার পক্ষেই আল্লাহপাক ফয়সালা করে দিলেন। নাযিল হল সূরা আল মুজাদালার ১ ও ২ নং আয়াত।

Dhaka University Institutional Repository

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَهُ مِنْ شَيْئٍ وَمَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَا لَهُ

হে আল্লাহর রাসূল, তার ব্যয় নির্বাহের কোন ব্যবস্থা নেই। আমি তার ব্যয় নির্বাহ করে থাকি। (সে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিভাবে জীবন যাপন করবে?)[১৭২]

সেহেতু খাওলা রাযী আল্লাহু 'আনহা ও তার স্বামীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল এ সম্পর্কিত সমাধান হওয়ার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আলাদা থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কারণেই খাওলা বিনতে সালাবা রাযী আল্লাহু 'আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উপরোক্ত প্রশ্ন করেছিলেন।

যয়নব বিনতে জাহাশ স্বহস্তে কাজ করে আল্লাহর পথে তা দান করেছেন। হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ যয়নাব আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীলা ছিলেন। কারণ তিনি স্বহস্তে কাজ করতেন ও সাদাকাহ করতেন।[১৭৩]

হযরত জাবের রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সহধর্মিনী যয়নাবের কাছে এসে দেখলেন, তিনি চামড়া পাকা করার কাজ করছেন।[১৭৪]

হাফেজ ইবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর এ বর্ণনা ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ যে, হযরত যয়নাব রাযী

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ إِلَى اللّٰهِ - وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ - أَلَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰتُهُمْ إِلاَّ الَّئِيْ وَلَدْنَهُمْ - وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا - إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ -

অর্থাৎ– আল্লাহ শুনিতে পাইয়াছেন সেই মেয়ে লোকটির কথা, যে তাহার স্বামীর ব্যাপার লইয়া তোমার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিতে থাকিতেছে। আল্লাহ তোমাদের দুইজনেরই কথা-বার্তা শুনিতে পাইতেছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের মধ্যে যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সহিত "যিহার' করে, তাহাদের স্ত্রীরা তাহাদের মা নয়। তাহাদের মা তো তাহারা যাহারা তাহাদিগকে জন্মদান করিয়াছে। এই লোকেরা একটা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে। আর আসল কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনা দানকারী। এ কারণেই মহিলা সাহাবীদের মধ্যে খাওলা বিনতে সা'লাবা বিশেষভাবে মর্যাদাবান।

১৭২. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবাকাতে ইবনে সা'দ,** ৮ম খণ্ড, পৃ ২৭৬।

১৭৩. **সহীহ মুসলিম,** অধ্যায় সাহাবীদের মর্যাদা, অনুচ্ছেদ– উম্মুল মু'মীনীন হযরত যয়নাবের ফযিলত, ৭ম খণ্ড, পৃ ১১৪।

১৭৪. **সহীহ মুসলিম,** অধ্যায়, বিবাহ অনুচ্ছেদ– কোন মহিলাকে দেখার পর মনে এভাবের উদয় হওয়া যে তার স্ত্রী বা ইবন হাজার আসকালানী ক্রীতদাসী এলে তার সাথে মিলিত হতো এমনটি দূষণীয় নয়। ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহু 'আনহা হস্তশিল্পে খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি চামড়া পাকা করতেন এবং তা সিলাই করে আল্লাহর পথে দান করতেন।[১৭৫]

শিক্ষক হিসেবে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি অসংখ্য পুরুষ মহিলাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আয়েশা বিনতে তালহা বলেন– كَانَ النَّاسُ يَأْتُوْنَهَا مِنْ كُلِّ مِصْرٍ প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর কাছে লোক আসত।[১৭৬]

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাযী আল্লাহু 'আনহু এর মত পণ্ডিত ও ফিকাহবিদ সাহাবা হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মত আরো অনেকের অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেছেন–

مَا اَشْكَلَ عَلَيْنَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ مَالَنَا عَائِشَةَ لاَ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا كُلَّهُ ـ

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সাহাবারাও কোন হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা কে জিজ্ঞেস করতাম এবং ঐ বিষয়ে তাঁর কাছে কোন না কোন জ্ঞান লাভ করতাম।[১৭৭]

সেবামূলক কাজে

ইসলামের শত্রুদের ব্যর্থ করে দেয়ার কাজে নারীরা সরাসরি যতটা অংশগ্রহণ করেছে পরোক্ষভাবে তার চেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছে বাতিলের শক্তি সমূহের মোকাবিলার কাজে।

সে যুদ্ধক্ষেত্রে তীর না ছুঁড়লেও তীরন্দাজ হাতকে তীর যুগিয়েছে। সে তলোয়ার না চালালেও তলোয়ারধারী যোদ্ধাদের তলোয়ার চালানোর উপযুক্ত বানিয়েছে।

---

১৭৫. **ফাতহুল বারী,** ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৯-৩০।

১৭৬. **আল আদাবুল মুফরাদাত,** অনুচ্ছেদ; আল কিতাবাতুল ইলমে নিসা ও জাওযাবিহিন্না। 'আল আদাবুল মুফরাদাত, –এটি একটি হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর জীবনাদর্শ ও নিষ্কলুষ আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে ৬৪৪টি অধ্যায় রয়েছে। হাদীস সংখ্যা ১৩২২টি। এ গ্রন্থটির প্রয়োজনয়িতা অনুভব করে বিভিন্ন ভাষাতে এর অনুবাদ গ্রন্থও প্রাকশিত হয়েছে। এটি হিন্দুস্থান থেকে ১৩০৪, ইস্তাম্বুল থেকে ১৩০৬, কায়রো মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকীর সম্পাদনাসহ ১৩৪৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। (**তারিখুত্ তুরাসিল আরাবী,** ১ম খণ্ড, পৃ ২৫৮; **মু'জুমুল মাতবু'আহ,** ১ম খণ্ড, পৃ ৫৩৪)।

১৭৭. **তিরমিযী শরীফ,** আবওয়াবুল মানাবিক, বাবু ফাদলি আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন সৈনিক আহত হলে সে তার ক্ষত নিরাময়কারী মলমের ভূমিকা পালন করত। মাটিতে পড়ে গেলে তাকে সাহায্য করত এবং ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হলে তার জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়ে ছুটত।[১৭৮]

রাবী বিনতে মু'আওয়েয বর্ণনা করেছেন–

كُنَّا نَغْزُوا مَعِيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسْقِى الْقَوْمَ - نَخْدِمُهُمْ وَمَرَدَّ ا اَلْقَتْلى - الْجِرْحى إلى الْمَدِيْنَةِ

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে লড়াইয়ের ময়দানে যেতাম, সেখানে আমরা মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং যুদ্ধে নিহত ও আহতদের মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।[১৭৯]

✓ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরেকজন মহিলা সাহাবী বলেন– كُنَّا نَدَاوِى الْكَلْمِيْ وَلِقَوْمَ عَلى الْمَرضِيْ -

✓ আমরা আহতদের মলম লাগিয়ে পট্টি ও ব্যান্ডেজ করতাম, অসুস্থদের ওষুধ ও পথ্য দিতাম এবং সেবা করতাম।[১৮০]

উহুদ যুদ্ধে আহতদের মলম লাগানো, ব্যান্ডেজ করা এবং সেবার জন্য বহু সংখ্যক মহিলা সাহাবী যুদ্ধের পর মদীনা থেকে সেখানে গিয়েছিলেন। তাবরানী বর্ণনা করেন ঃ

لَمَّا كَانَ يَوْمَ اُحُدَ وَانْصُرْنِىْ الْمُشْرِكُوْنَ خَرَجَ النِّسَاءُ إلى الصَّحَابَـةِ بِعُيُوْنِـهِمْ فَكَـانَتْ فَاطِمَةُ فِى مَنْ خَرَجَ -

উহুদ যুদ্ধের দিন (যুদ্ধের পরে) মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সাহাবাদের সাহায্য করার জন্য মেয়েরা বেরিয়ে পড়ল হযরত ফাতেমা রাযী আল্লাহু 'আনহাও তাদের মধ্যে ছিলেন।" এ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হলে হযরত ফাতেমা (রা) চাটাই পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে ক্ষতস্থান ভরাট করেছিলেন।[১৮১]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত আয়েশা (রা) এবং উম্মে সুলাইম (রা) ও মুজাহিদদের সেবা করেছিলেন–

---

১৭৮. জালালুদ্দীন আনসার উমরী সাইয়েদ, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪০।

১৭৯. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুল জিহাদ; অনুচ্ছেদ ঃ রাদ্দুন নিসায়েল জারহা ওয়াল কাতলা, ২য় খণ্ড, পৃ ১২০।

১৮০. **সহীহ মুসলিম শরীফ,** কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সায়র, অনুচ্ছেদ ঃ আন নিসাউল যাসিয়াত; **মুসনাদে আহমদ,** ৫ম খণ্ড, পৃ ৮৪। বর্ণনার ভাষা মুসলিমের।

১৮১. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুল মাগাযী, গাযওয়াতু উহুদ, অনুচ্ছেদ ঃ মা আসাবান নাবী (স) মিনাল জারাহে ইয়াওমা উহুদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

لَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةُ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍوَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاَنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَابَ عَلى مُتُوْنِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهِمَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ـ

আমি আবু বকরের কন্যা আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এবং উম্মে সুলাইম রাযী আল্লাহু 'আনহা উভয়কে প্রস্তুত হয়ে মানুষের সেবা করতে দেখলাম। তারা এত দ্রুত এ তৎপরতা চালাচ্ছিলেন যে, আমি তাদের পায়ে পরিহিত মল বা খারুসমূহ দেখতে পাচ্ছিলাম তারা মশকে পানি ভরে তা কাঁধে বহন করে আনছিলেন এবং মুজাহিদদের পানি পান করাচ্ছিলেন। তারপর ফিরে গিয়ে আবার ভর্তি করে আনছিলেন এবং মুজাহিদদের পিপাসা নিবৃত্ত করছিলেন।[১৮২]

উম্মে সালিত নামক একজন আনসারী মহিলা সম্পর্কে হযরত উমর (রা) বলেন–

أنَّهَا كَانَتْ تَزَفُوْلَنَا الْقُرْبَ يَوْمَ اُحُدَ ـ

উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি আমাদের মশক ভর্তি করে পানি এনে দিচ্ছিলেন।[১৮৩]

খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক লিখেছেন ঃ

وَقَدْ شَهِدَ خَيْبَرِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مِنْ نِّسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ

বহু মুসলিম মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৮৪]

হাশরাজ ইবনে যিয়াদের দাদী এবং আরো পাঁচজন মহিলাও এ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন–

হে আল্লাহর রাসূল আমরা এজন্য এসেছি যে, আমরা পশমী কাপড় বুনবো এবং তা দ্বারা আল্লাহর পথে সাহায্য করব। আমাদের কাছে আহতদের জন্য ওযুধ আছে। আমরা তীরন্দাজদের তীর যুগিয়ে সাহায্য করব এবং প্রয়োজনে মুজাহিদদের ছাতু গুলিয়ে খাওয়াব।[১৮৫]

এভাবে নারীরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা দিয়ে সমাজ ও সংসার জীবনে পুরুষের পাশাপাশি জাতীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে। এক্ষেত্রে ইসলাম শুধু অনুমতিই দেয়নি বরং নারীকে তার জীবনের গতি ও অনুভূতি অনুযায়ী যে সব চাহিদা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় এগুলোকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য তাকে আহবান জানান হয়েছে এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে শরীয়াতের সীমা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দিয়েছে।

---

১৮২. **সহীহ বুখারী শরীফ,** কিতাবুল মাগাযী, গাযওয়াতু উহুদ, অনুচ্ছেদ ঃ ইযহাম্মাত তায়েফাতান; **মুসলিম শরীফ,** কিতাবুল জিহাদ ওয়াল খায়বর।

১৮৩. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ হামলুদ নিসায়ে লকিরাব।

১৮৪. **সীরাতে ইবনে হিশাম,** ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৯৫।

১৮৫. **আবু দাউদ শরীফ,** কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ ফিল মারআতে ওয়াল আবদে ইয়াখদিমান।

Dhaka University Institutional Repository

নারী সমাজের কর্মতৎপরতা কেবলমাত্র বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, ইসলাম এমন কথা বলেনি। বাস্তব কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্যও ইসলাম এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসায়ের কাজে অংশগ্রহণ করারও তারা সম্পূর্ণ অধিকারী। জীবিকার জন্য বিভিন্ন কাজ কারবার। শিল্প কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করার অধিকারও রয়েছে নারীদের। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীদের এসব কাজে অবশ্যই নেমে যেতে হবে।[১৮৬]

নারীর মত প্রকাশের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা

নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা

ইসলাম নারীকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তার ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। অনুরূপভাবে নিজ মালিকানায় যথেচ্ছ ব্যবহারের স্বাধীনতাও তাকে দিয়েছে। মুসলিম নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্খা নিয়ে নিজ নিজ অঙ্গনে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। নিজ অধিকারের প্রশ্নে তারা সোচ্চার হয়েছে। প্রিয়জনকে উপহার দিয়েছে। নিজ সম্পদ দান করেছে। নিজের জমিতে কাজ করতে বের হয়েছে। স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তারা এসব কাজ করেছে।[১৮৭]

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতি আস্থা পোষণ করা হয়েছে এবং পুরুষের পাশাপাশি কুর'আনে বার বার নারীকেও সম্বোধন করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন–

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى - وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى - وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثٰى - إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى -

রাত্রির শপথ যখন তা আচ্ছন্ন করে এবং দিনের শপথ যখন তা উদ্ভাসিত হয় আর শপথ সেই মহান সত্তার যিনি নারী ও পুরুষ উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন। রাত্রি ও দিনের মতই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টাও নিশ্চয়ই বিভিন্ন প্রকৃতির।[১৮৮]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضٰى اللهُ وَرَسُوْلُه أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا -

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোন মু'মিন নর নারীর পক্ষেই তার বিরুদ্ধাচারণ করার অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

১৮৬. আব্দুর রহীম মাওলানা, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭।

১৮৭. আবদুল হালীম আবু শুককাহ, **রাসূল (স) –এর যুগে নারী স্বাধীনতা** (ঢাকা ঃ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস লালমাটিয়া, ১ম খণ্ড, ১৯৯৫ খ্রিঃ), পৃ ৩৬১।

১৮৮. **আল কুর'আন,** সূরা আল লাইল, আয়াত ঃ ১-৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ফয়সালার বিরুদ্ধাচারণ করে ভিন্নমত পোষণ করলে সে নির্ঘাত পথভ্রষ্ট হবে।[১৮৯]

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ -

সেদিন যখন তোমরা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের দেখবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান পাশে ধাবিত হবে।[১৯০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুসলিম নারীরা তাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল ইসলামের বিধান তার স্বীকৃতি দিয়েছে। তারপর এ সচেতনতা থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে এর বিস্তৃতি ঘটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

إِنَّمَا النِّسَاءُ شُقَائِقُ الرِّجَال

নারী হল পুরুষদের সহোদরা।[১৯১]

মত প্রকাশ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা নিম্নলিখিত ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

হযরত মুয়াবিয়ার গভর্ণররা তাদের খুতবায় হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু ও তাঁর সহযোগীদের গালমন্দ করতেন। কুফার অধিবাসী এক সাহাবা হাজার ইবনে আমীর রাযী আল্লাহু 'আনহু তার এই আচরণের প্রকাশ্য সমালোচনা করতেন এবং সাথে সাথে হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু ও তার সাথীদের প্রশংসা ও তারীফ করতেন। এ কারণে হযরত মু'আবিয়া সাহাবী হযরত হাজার ইবনে আমীর ও তার সাতজন সাথীকে গ্রেফতার করেন ও শহীদ করে দেন।[১৯২]

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এতে নারাজ হলেন এবং কঠোরভাবে মু'আবিয়ার সমালোচনা করলেন। আবদুল মালেক ইবনে নাওফাল বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা একথা পর্যন্ত বলতেন যে-

لَوْلَا أَنَّا لَمْ تَغَيَّرَ شَيْئًا إِلاَّ الَتِ بِنَا الأُمُوْرِ إِلى اَشَدِّ مِمَّ كُنَّا فِنْهِ لَغَنَّرنَا قَتْلَ حَجْرِ -

আমরা নিজে কোন বিষয় পরিবর্তন করলে যদি বর্তমান পরিস্থিতির চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকত তাহলে আমরা হাজার ইবনে আমীর রাযী আল্লাহু 'আনহু হত্যার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দিতাম।[১৯৩]

---

১৮৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল আহযাব, আয়াত ঃ ৩৬।

১৯০. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল হাদীদ, আয়াত ঃ ১২।

১৯১. **সহীহ জামে আস সগীর,** হাদীস নং ২৩২৯; **রাসূলের (স) যুগে নারী স্বাধীনতা,** ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১।

১৯২. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯।

১৯৩. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্‌তাবারী, **তারীখুল উমান ওয়াল মূলক** (মিসর ঃ দারুল মু'আরিফ, ১৯৬৭ খ্রিঃ), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সমাজের লাভ-ক্ষতি ও ভালমন্দের ব্যাপারে মুসলিম নারী নীরব দর্শকের মত নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। কারণ সমাজের ভাঙ্গা গড়া এবং সংস্কার ও ধ্বংসের সাথে পুরুষের সাথে নারীও গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এছাড়াও নারীর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও যেমন, বিয়ে, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে শরীয়াত পরিস্কার ও স্পষ্ট ভাষায় নারীকে তার অধিকার দিয়েছে।

لاَ تُنْكَحُ إلاَّ تَحيمَ حتَّى تَسْتَأمُرُ وَلا تُنْكَحُ البِكْرِ حتى تَسْتَأْذَنَ ـ

বিবাহিত নারীদের বিয়ে (বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর) তার পরামর্শ না নেয়া পর্যন্ত দেয়া যাবে না। আর অনুমতি না নিয়ে কুমারী মেয়েদের বিয়ে দেয়া যাবে না।[১৯৪]

এছাড়া স্বামীর অপছন্দ হলে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারও নারীর রয়েছে। যদি স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি কোন অসদাচরণ না করা হয়, তাহলে স্বামীর স্বীকৃতির মাধ্যমে তা হতে পারে অথবা বিচারকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দেয়া যাবতীয় সম্পদ ফেরত দেয়া সাপেক্ষেও হতে পারে।[১৯৫]

হযরত খানসা বিনতে খাদ্দাম আনসারী রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। পূর্বের বিবাহ ছিন্ন হওয়ার পরে তার পিতা তাকে অন্যত্র বিবাহ দেন এবং তিনি ছিলেন প্রাপ্ত বয়স্কা। কিন্তু তিনি তা অপছন্দ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিবাহ বাতিল করে দেন।[১৯৬]

لاَ تُنْكِحُوْا اليَتَامى حَتّى تَسْتَأْ مُرُوْهُنَّ ـ

ইয়াতীম মেয়েদের সাথে পরামর্শ না করে এবং তাঁদের মতামত না নিয়ে তাদের বিয়ে দিও না।[১৯৭]

নারী যাতে সর্বাবস্থায় তার নিজের ইচ্ছায় চলতে পারে জুলুম অত্যাচারের শিকার না হয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লক্ষ্য রেখেছেন। তাই যখনই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পাল্টে দিয়েছেন। এ কারণে আরো অগ্রসর হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন–

---

১৯৪. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুন নিকাহ, ১১ খণ্ড, পৃ ৯৬; **সহীহ মুসলিম,** বিবাহ অধ্যায়; বিবাহের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্কার অনুমতি নেয়া এবং চুপ থাকা অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৪০।

১৯৫. হযরত সাবেত ইবন কায়েস রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমার স্বামী সাবেতের চরিত্র বা দীনদারী সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি তার সাথে থাকলে অবাধ্যতার আশঙ্কা করছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তা কি তুমি ফেরত দেবে? সে বলল ঃ জি হ্যাঁ এরপর সে বাগানটি ফেরত দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাবেত রাযী আল্লাহু 'আনহু–কে আদেশ করলেন এবং তার স্ত্রী বিচ্ছেদ করিয়ে দিলেন। (**সহীহ বুখারী,** তালাক অধ্যায়, খুলা অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ৩১৯)।

১৯৬. **সহীহ বুখারী,** বিবাহ অধ্যায়, ১১ খণ্ড, পৃ ১০০।

১৯৭. **দারকুতনী,** কিতাবুন নিকাহ, পৃ ৩৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের সাথে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ কর।[১৯৮]

হযরত হাসান বাসরী রাযী আল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর একটি সাধারণ কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ বর্ণনা করেছেন–

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। কোন কোন সময় মেয়েরা এমন মতামত পেশ করতো যা তিনি গ্রহণ করতেন।[১৯৯]

একথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায়।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তে মুসলমানরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। এতে সাহাবাদের মনের অবস্থা এতই পরিবর্তিত হয়েছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের ইহরাম খুলে কুরবানী করার আদেশ দিলেন কিন্তু সাহাবাদের সে নির্দেশ মেনে নিতে দেখা গেল না। তিনি হযরত উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা–এর কাছে আফসোস করে ঘটনাটি উল্লেখ করলে উম্মে সালামা অত্যন্ত বুদ্ধিমতির মত পরামর্শ দিলেন, আপনি কারো সাথে কথাবার্তা বলবেন না। বরং যে সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করা দরকার তা অন্যদের আগে নিজে করুন। তারপর দেখবেন সবাই তা না করে থাকতে পারবে না। সুতরাং তাঁকে এসব করতে দেখে তৎক্ষণাৎ সবাই তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করল।[২০০] এভাবে একটি সঠিক ও যথাযথ পরামর্শ মুহূর্তের মধ্যে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাল।

বুখারীর অপর বর্ণনা উল্লেখ আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রাযী আল্লাহু 'আনহু বলেছেন, আমি একদিন উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর নিকট গেলাম। সে সময় তার চুল হতে পানি ঝরছিল। আমি তাকে বললাম, আপনিতো দেখছেন, খেলাফতের বিষয়টি নিয়ে লোকজন কি কাণ্ড করছে। (হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু, হযরত আমীরে মুয়াবিয়াহ রাযী আল্লাহু 'আনহু–এর বিবাদের প্রতি ইঙ্গিত) শাসন কর্তৃত্ব ও ইমাতের কিছুই আমাকে দেয়া হয় নাই। হযরত হাফসা রাযী আল্লাহু 'আনহা বললেন, তুমি নিজেকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার কারণে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে বলে আমার আশঙ্কা হয়। হাফসা রাযী আল্লাহু 'আনহা বারবার বলায় আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর যেতে বাধ্য হলেন।[২০১]

---

১৯৮. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২।

১৯৯. উয়ূনুল আখবার, লি ইবনে কুতাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ ২৭; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২।

২০০. ওয়াল মাসালিহাতু মা'আ আহলিল হারব। **সহীহ বুখারী,** গুণাবলি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আইয়ামে জাহিলিয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৭৯-৩৮০।

২০১. **সহীহ বুখারী,** মাগাযী অধ্যায়, আহযাব যুদ্ধ। ৮ম খণ্ড, পৃ ৪০৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ ইবন হাজার আসাকালীন বলেন– হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফফীনে সংঘটিত যুদ্ধ, শাসন কর্তৃত্ব নিয়ে মতভেদ হওয়ার কারণে যেখানে উভয়ের সমর্থনে লোকজন সমাবিষ্ট হয়েছিল। এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য তারা সমবেত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু তার বোন হাফসা রাযী আল্লাহু 'আনহা–এর কাছে পরামর্শ চাইলে আবদুল্লাহ ইবন 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহুর সেখানে অনুপস্থিতি স্থায়ী ফেতানা সৃষ্টি করতে পারে; এই আশঙ্কায় তাকে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠকে উপস্থিত থাকবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[২০২]

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জানাযা পড়া হয় ইসলামের প্রথম দিকে তা মুসলমাদের মধ্যে চালু ছিল না। হযরত আসমা বিনতে উমাইস হাবশায় খিষ্টানদের মধ্যে এ নিয়ম দেখেছিলেন। তিনি এর পরামর্শ দিলে তা গৃহীত হয়।[২০৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্ম পদ্ধতিও তাঁর আদর্শের অনুসরণ করেছে।

ইবনে সিরীন হযরত উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন–

إِنْ كَانَ عُمَرُ لِيَسْتَشِيْرُ فِيْ الأَمْرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيَسْتَشِيْرُ الْمِراةَ فَرُبَّمَا أَبْصَرْنِــيْ قَوْلَـهَا أَوْ الشَّرَّ يَسْتَحْسِنُهُ فَيَأْخُذُهُ بِه -

উপস্থিত সমস্যা সম্পর্কে 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু (জ্ঞানী লোদের সাথে) পরামর্শ করতেন। এমনকি (সে সব বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারিণী) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। তাদের মতামত কল্যাণকর কোন দিক থাকলে বা কোন উত্তম বিষয় দেখলে তা গ্রহণ করতেন।[২০৪]

হযরত 'উসমানের পর কাকে খলীফা বানানো হবে এই মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে বসরার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং নিজ গোত্রের নেতা আহনাফ হযরত তালহা রাযী আল্লাহু 'আনহু ও যুবায়ের ছাড়াও হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর কাছেও যান। তিন জনই হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর হাতে বাইয়াত হন।[২০৫]

এভাবে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীদেরকে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ ইসলাম দিয়েছে। সাহাবীদের জীবন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর হাদীস তার প্রমাণ–

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনাহ রাযী আল্লাহু 'আনহা রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অজ্ঞাতে নিজ দাসীকে মুক্তি দিয়েছেন।

---

২০২. ইবন হাজার আল আসকালানী, **ফাতহুল বারী,** ৮ম খণ্ড, পৃ ৪০৬-৪০৭।

২০৩. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবকাতে ইবনে সা'দ**, ১ম খণ্ড, পৃ ২০৬।

২০৪. **আল– সুনানুল কুবরা,** বায়হাকী,

২০৫. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আর তাবারী, **তারিখুল উমাম ওয়াল মুলক,** প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ ১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

'ইবন আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর আযাদকৃত গোলাম কুরাইব রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মাইমুনাহ বিনতে হারিস তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি একটি দাসী কন্যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর অনুমতি না নিয়েই মুক্তি দিয়েছেন। এরপর যখন তার পালা এলো তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি জানতে পেরেছেন যে, আমি আমার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যদি তাকে তোমার মামাদেরকে দান করে দিতে, তাহলে তুমি অধিক প্রতিদানের অধিকারিণী হতে।[২০৬]

উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান রাযী আল্লাহু 'আনহা তাঁর বিয়ের দিন স্বনামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দিয়েছেন, স্বামীর নামে নয়।

উম্মে সুলাইম বলেন ঃ 'হে আনাস! এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর খেদমতে নিয়ে যাও এবং তাঁকে বল আমার মা এগুলো আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তুমি আরো বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য নগণ্য উপহার।[২০৭]

'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু আসমা রাযী আল্লাহু 'আনহা–কে বললেন ঃ আমরা তোমাদের আগে হিজরত করেছি। সুতরাং আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট তোমাদের চেয়ে অধিক অগ্রগণ্য। একথা শুনে আসমা রেগে গিয়ে বললেন, কখনোই না। আল্লাহর শপথ, তোমরা ছিলে রাসূলুল্লাহর সাথে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তকে অন্নদান করছিলেন। অজ্ঞদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। আর আমরা? আমরা হতভাগারা ছিলাম সুদূর আবিসিনিয়ায়। আর এটা ছিল আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। আল্লাহর শপথ, আপনার বক্তব্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছে না বলা পর্যন্ত আমি পানাহার করব না। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ আমার কাছে তোমাদের চেয়ে বেশি নিকটবর্তী আর কেউ নয়। 'উমর ও তার সঙ্গীদের হয়েছে এক হিজরত। আর তোমরা, তোমাদের হয়েছে দুই হিজরত। আসমা বলেন, এরপর আমি আবু মুসা ও অন্যান্য জাহাজ আরোহীদেরকে আমার কাছে দলে দলে আসতে এবং আমার কাছে এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।'[২০৮]

আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু তাঁর স্বামীর অজ্ঞাতসারে নিজের দাসীদের বিক্রয়মূল্য দান করে দেন।

---

২০৬. **সহীহ বুখারী,** দান, তার ফযীলত এবং দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা অধ্যায়, স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে স্ত্রীর দান অনুচ্ছেদ, ৬ খণ্ড, পৃ ১৪৬।

২০৭. **সহীহ মুসলিম,** বিবাহ অধ্যায়, যয়নব বিনতে জাহশের বিয়ে, পর্দা নাযিল হওয়া এবং নতুন অলীমা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৫০।

২০৮. **সহীহ বুখারী,** যুদ্ধ অধ্যায়, খয়বারের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৯ খণ্ড, পৃ ২৪; সহীহ মুসলিম ঃ সাহাবাদের অধ্যায়, জাফর বিন আবি তালিবের ফযীলত এবং আমা বিনতে উমাইস ও তাদের পরিবার অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আসমা রাযী আল্লাহু 'আনহা বলেন, আমি দাসীটি বিক্রয় করে ফেললাম। এমতাবস্থায় বিক্রয়মূল্য আমার কাছে থাকতেই যোবায়ের এসে বললেন, এগুলো আমাকে দান করে দাও। আমি তাকে বললাম, আমি তোমাকে এগুলে দান করে দিলাম।[২০৯]

হযরত খানাসা বিনতে খাদ্দাম আনসারী রাযী আল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত। পূর্বের বিয়ে ছিন্ন হওয়ার পরে তার পিতা তাকে অন্যত্র বিয়ে দেন এবং তিনি ছিলেন প্রাপ্ত বয়স্কা। কিন্তু তিনি তা অপছন্দ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিয়ে বাতিল করে দেন।[২১০]

হযরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার খালাকে তালাক দেয়া হল। তারপর তিনি নিজ গাছের খেজুর আহরণ করতে চাইলে জনৈক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে ধমক দিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম –এর কাছে এসে এ সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে তুমি খেজুর আহরণ করতে পার। কেননা, হয়ত বা তুমি তা দান করবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করবে।[২১১]

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। হিন্দা বিনতে উতবাহ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার এবং সন্তান-সন্ততির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ সে আমাকে দেয় না বলে আমি তার অগোচরে যা প্রয়োজন তা নিয়ে নেই। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার ও সন্তানদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিতে পার।[২১২]

হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা কোন একটা ব্যাপারে আমি চিন্তা করছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বললো, আপনি কাজটি এভাবে করলে ভাল হত। আমি তাকে বললাম, তুমি এখানে কি চাও? যে বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করছি, তাতে তোমার নাক গলাবার দরকার কি? সে বলল, ইবন খাত্তাব! তোমার আচরণে আমি বিস্মিত হলাম। তুমি চাও না তোমার সাথে কেউ বাদানুবাদ করুক। অথচ তোমার মেয়ে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ[২১৩]

---

২০৯. **সহীহ মুসলিম,** সালাম অধ্যায়, অপরিচিতা মহিলাদের সালাম দান জায়েয অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ ১২।

২১০. **সহীহ বুখারী,** তালাক অধ্যায়, আল্লাহর বাণী (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) ইদ্দতের ক্ষেত্রে এবং কিভাবে মহিলা তার পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে যখন তাকে এক অথবা দুই তালাক দেয়া হবে এবং আল্লাহর বাণী – (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ১০০।

২১১. **সহীহ মুসলিম,** তালাক অধ্যায়, তালাকে বায়েনার ইদ্দত প্রাপ্ত মহিলার বহির্গমন জায়েজ অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২০০।

২১২. **সহীহ বুখারী,** ব্যয় অধ্যায়, যখন কোন পুরুষ স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করবে না তখন স্ত্রী স্বামীর অজ্ঞাতে প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রহণ করতে পারবে এবং তার সন্তানদের প্রতি ভাল আচরণ করবে অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ৪৩৫; **সহীহ মুসলিম,** ফয়সালা অধ্যায়; হিন্দের ফায়সালা অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৯৪।

২১৩. **সহীহ বুখারী,** বিবাহ অধ্যায়; পিতার স্বীয় কন্যাকে তার স্বামীর বর্তমানে উপদেশ দান অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ১৯১; **সহীহ মুসলিম,** তালাক অধ্যায়, স্ত্রীর সাথে ইলা ও বিচ্ছিন্ন থাকা অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খন্ড, পৃ ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বললেন, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করব, এতে তোমার অপছন্দের কি আছে? আল্লাহর শপথ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে তর্ক-বিতর্ক করে। [২১৪]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে যে আচরণ–বিধি অবলম্বন করতেন, তার ভিত্তিতে 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু ন্যায়ের দিকে প্রত্যাবর্তিত হলেন ঃ

হযরত মিসওয়ার রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু আবু জেহেলের মেয়ের সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। এ কথা হযরত ফাতিমা রাযী আল্লাহু 'আনহা জানতে পেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছে এসে বললেন ঃ আলী আবু জাহেলের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহুকে লক্ষ্য করে বললেন, এই মেয়েটিকে আবুল আস ইবন রবী'র কাছে বিয়ে দেয়া হয়েছিল, সে আমার কাছে তার ব্যাপারে কিছু আপত্তিকর কথা বলেছে এবং সে তা সত্যই বলেছে। ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা। তাকে কেউ কষ্ট দিক, আমি তা পছন্দ করি না। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ আমি আশঙ্কা করছি যে, তার দীনের ব্যাপারে তাকে ফিতনায় নিপতিত করা হবে। [২১৫] আল্লাহর শপথ, আল্লাহর রাসূলের কন্যা ও আল্লাহর দুশমনের কন্যা এক ব্যক্তির অধীনে থাকতে পারে না। হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু তখন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন। [২১৬]

এখানে বিবি ফাতেমা রাযী আল্লাহু 'আনহা তার মত প্রকাশ করেছেন এবং আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে ফয়সালা চেয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিনা অনুমতিতে বিধবাকে বিয়ে দেয়া যাবে না এবং সম্মতি ব্যতিরেকে কুমারীকেও বিয়ে দেয়া যাবে না। [২১৭]

তাছাড়া স্বামী অপছন্দ হলে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারও নারীর রয়েছে। যদি স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি কোন অসদাচারণ না করা হয়, তাহলে স্বামীর স্বীকৃতির মাধ্যমে তা

---

২১৪. **সহীহ বুখারী,** তাফসীর অধ্যায়, তুমি 'তোমার স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা করবে' অনুচ্ছেদ ১০ খণ্ড, পৃ ২৮৩; **সহীহ মুসলিম,** তালাক অধ্যায়; ইলা ও মহিলাদের সাথে আযল এবং তাদেরকে স্বাধীন করে দেয়া অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৯০।

২১৫. **সহীহ বুখারী,** গণীমাতের এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়া অধ্যায়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর ঢালের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৭ খণ্ড, পৃ ২২; **সহীহ মুসিলম,** সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা ফাতিমার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খণ্ড, পৃ ১৪১।

২১৬. **সহীহ বুখারী,** মানাকিব অধ্যায়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জামাতাগণের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড পৃ ৮৭; **সহীহ মুসলিম,** সাহাবাদের ফযিলত অধ্যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কন্যা ফাতিমার অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ ১৪২।

২১৭. **সহীহ বুখারী,** কিতাবুন নিকাহ, পিতা তাঁর প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী কন্যাকে তার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেবে না অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ৯৬; **সহীহ মুসলিম,** বিবাহ অধ্যায়, বিবাহের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্কার অনুমতি নেয়া এবং চুপ থাকা অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে অথবা বিচারকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দেয়া যাবতীয় সম্পদ ফেরত দেয়া সাপেক্ষেও হতে পারে।

হযরত সাবেত ইবন কায়েস রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী সাবেতের চরিত্র বা দীনদারী সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি তার সাথে অবাধ্যতার আশংকা করছি। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তা কি তুমি ফেরত দেবে? সে বলল ঃ জি হ্যাঁ, এর পর সে বাগানটি ফেরত দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত রাযী আল্লাহু 'আনহু–কে আদেশ করলেন এবং তার স্ত্রী-বিচ্ছেদ করিয়ে দিলেন।[২১৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্যের বাই'আত গ্রহণ করলে পুরুষদের সাথে মেয়েদেরও অংশগ্রহণ করেছিল।

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ اَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَّلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَه بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ ـ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

হে নবী মহিলারা যদি তোমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য আসে এবং আল্লাহর সাথে কাউক শরীক না করায়। চুরি না করা, যিনা না করা, সন্তানদের হত্যা না করার এবং অন্য পুরুষদের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে স্বামীর নামে চালিয়ে না দেয়ার ও তোমার পক্ষ থেকে আরোপিত সমস্ত ভাল কাজের আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তাহলে তুমি তাদের বাই'আত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ এর দোয়া কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই দয়াবান ও ক্ষমাশীল।[২১৯]

মদীনায় হিজরতকালে মুসলিম পুরুষদের সাথে নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَالَكَ أَزْوَاجَكَ الّٰتِىٓ اٰتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمّٰتِكَ وبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ـ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ـ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ـ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

---

২১৮. **সহীহ বুখারী,** তালাক অধ্যায়, খুলা অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ৩১৯।

২১৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল মুমতাহিনা, আয়াত ঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

হে নবী আমি তোমার সেই স্ত্রীদের তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি যাদের মোহরানা তুমি পরিশোধ করে দিয়েছ এবং ঐ সব মহিলাদের মধ্য হতে যাদেরকে দাসী হিসেবে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার মালিকানাভূক্ত করে দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও এবং তোমার সেই সব চাচাত, মামাত, ফুফাত ও খালাত বোনদেরকেও তোমরা বিবাহের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে।

কোন মু'মিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল এটা বিশেষ করে আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মু'মিনের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[২২০]

শেষ কথা

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিষয়ে নারীর মতামত ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ইসলামী সমাজ যেভাবে উপকৃত হয়েছে প্রয়োজনে কোন কোন সময় সরকারও তাদের নিকট থেকে এ খেদমত গ্রহণ করেছে।[২২১]

আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা তাদের একজনকে অপরজন থেকে পৃথক রাখে। তাই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের দায়িত্ব সকল নারী ও পুরুষের। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে।[২২২]

---

২২০. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহযাব, আয়াত ঃ ৫০।

২২১. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬।

২২২. আবদুল হালীম আবু শুককাহ, **রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা,** ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

মানুষের অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে তার অর্থনৈতিক অধিকার। যা দ্বারা সমাজে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম[১] নারীকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে। হিন্দুধর্মে[২] পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর কোন অংশীদারিত্ব নেই। ইসলামই বিশ্বে সর্বপ্রথম নারীকে তার পিতা, স্বামী, সন্তানের এবং নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বানায়। উপরন্তু নারী স্বামীর নিকট থেকে 'মোহর' লাভ করে। এ সমস্ত উপায়ে নারী যে-সম্পদ লাভ করে, তার উপর নারীর পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তা খর্ব করার কোন অধিকার স্বামী; পিতা বা ভাই কারোরই নেই। উপরন্তু নারী ব্যবসায়ে মূলধন[৩] নিয়োগ করে বা শ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করলে তারও মালিক সেই হবে।[৪] এরপরও স্ত্রীর যত সম্পদ থাক তার ভরণ

---

১. যেমন– হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খিষ্ট ধর্ম, ইয়াহুদী ধর্ম ইত্যাদি। সকল ধর্মেই নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান আইনগতভাবে স্বীকৃত নয়। তবে বর্তমানে এ ব্যাপারে কিছু কিছু সংশোধন হচ্ছে।

২. **হিন্দু ধর্ম ঃ** হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক কে বা কারা এবং হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি কখন হয়েছিল এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত সঠিক কোন তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম হননি। হিন্দু শব্দটি হিন্দু শাস্ত্রেও উল্লেখ নেই। ইতিহাস থেকে যত দুর জানা যায়, প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়া মহাদেশ হতে একদল লোক ভারতবর্ষে এসে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সিন্ধু নদের উপকূলে বসতি স্থাপন করে। তারা নিজেদেরকে আর্য জাতি বলে পরিচয় দেয়। সিন্ধু নদকে আর্যরা পবিত্র নদ বলে মনে করত। সিন্ধু শব্দ থেকেই নদের উপকূলবাসীরা হিন্দু নামে পরিচিত। (মাও মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ,** ঢাকা ঃ আর, আই, এস, পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫ইং/১৪১৬ হিঃ) পৃ ১১৫)।

৩. **মূলধন ঃ** কোন ব্যবসায়ে খাটানো সঞ্চিত মূল অর্থকেই মূলধন বলে। অতীতে শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যয়েই মূলধনের সৃষ্টি। অর্থনীতিতে বর্ষ পরম্পরায় সঞ্চিত শ্রম ও সঞ্চিত ভূমির সমষ্টি হচ্ছে মূলধন। বিনিয়োগের উৎসাহ, ভবিষ্যতের স্বচ্ছলতা, উত্তর পুরুষদের নিরাপত্তা, সম্পদের সঞ্চয়ন, অপচয় পরিহার, কল্যাণকারী মানসিকতা ইত্যাদি নৈতিক ও ধর্মীয় বিধির মাধ্যমে ইসলাম মূলধন সৃষ্টির দুই প্রতিদ্বন্দ্বি উপাদান। বর্তমান ভোগ হ্রাস ও ভবিষ্যৎ ভোগের সম্প্রসারণ এর মধ্যে সঞ্চয় সাধন করেছে। (মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, এনায়েত উল্লাহ, সিরাজুল ইসলাম, **ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ,** ঢাকা ঃ হাসান বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, পৃ ৫৫৬-৫৫৮)।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর স্ত্রী খাদিজা রাযী আল্লাহু 'আনহা বিনতে খুয়াইলিদ তৎকালীন আরব বিশ্বের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন। এবং তার উপার্জিত সকল সম্পদেরও মালিক তিনিই ছিলেন। তিনি লোকজনকে নির্দিষ্ট বেতনে ও লভ্যাংশের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে নিয়োগ করতেন। কুরাইশদের মধ্যে খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা ছিলেন সর্বাপক্ষো অভিজাত বংশীয়া, সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত এবং অতিশয় ধনাঢ্য মহিলা। (**সীরাতে ইবনে হিশাম,** পৃ ৪৮)।

Dhaka University Institutional Repository

পোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বামীর। স্বামীও এ দায়িত্ব থেকে কখনোই মুক্ত হতে পারে না। নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আল কুরআনের ভাষ্য ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ـ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيًا مَرِيْئًا ـ

'এবং স্ত্রীদিগকে 'মোহরানা' মনের সন্তোষ সহকারে আদায় কর। অবশ্য তারা নিজেরা যদি নিজেদের খুশীতে 'মোহরানার' কোন অংশ তোমাদের মাফ করে দেয় তবে তা তোমরা সানন্দে খেতে পার।[৫]

উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার

এখানে উত্তরাধিকার আইনে[৬] নারীর অধিকার নিয়ে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরব, যাতে ইসলাম নারীকে কতটুকু অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে প্রারম্ভেই এ কথা জোরালোভাবে বলা যায় নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন যে যুক্তিসংগত এবং বিজ্ঞানসম্মত বিধান দিয়েছে, কোন ধর্ম বা মানব রচিত কোন মতবাদ[৭] আজ পর্যন্ত তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি।

হিন্দু ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার

হিন্দুধর্ম উত্তরাধিকার আইনে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১. মিতাক্ষরা আইনে[৮] মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা জীবিত থাকলে কন্যা মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পায় না। মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে

---

৫. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ৪।

৬. যে আইনের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হয় তাই উত্তরাধিকার আইন। ইসলামের পরিভাষায় উত্তরাধিকার আইনকে "ফারায়েয' বলে। উত্তরাধিকার আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

৭. পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, নারীবাদ। জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে মানব রচিত বিভিন্ন নীতি ও আদর্শকে মতবাদ বলা হয়। যেমন- পুঁজিবাদ সমাজবাদ, নারীবাদ, ইত্যাদি।

৮. **মিতাক্ষরা আইন ঃ** মিতাক্ষরা আইন স্মৃতিকার ঋষি যাজ্ঞবল্কের প্রচলিত নিবন্ধ। এই আইন একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত। এ আইন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমাংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। মিতাক্ষরা আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পারিবারিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে অংশীদার হয়। তাই এ আইনে পিতা, পুত্র ও পৌত্র একই সংগে উত্তরাধিকার হতে পারে। এ পদ্ধতিতে পিতা বর্তমান থাকা অবস্থায়ই পিতা পুত্র সম্পত্তির ভাগ বণ্টন দাবি করতে পারে। মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রক্তের নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্মিত হয়। এ আইনে তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী রয়েছে। যথা ঃ- ১) গোত্রজ, (২) সমানোদক ও (৩) বন্ধু।

Dhaka University Institutional Repository

কন্যার কোন অংশ না পাবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ না কেউ জীবিত থাকতেই পারে।

২. এমনিভাবে দায়ভাগ আইনে[৯] মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান উত্তরাধিকার হবে না। কন্যাকে যদিও সপিণ্ডের[১০] অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এমন অবস্থানে রাখা হয়েছে যে, তাদের অংশ পাবার তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই।

গোত্রজ সপিন্ডের উত্তরাধিকারিগণের সংখ্যা মোট ৫৭ জন। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের তালিকা দেয়া হল ঃ

১। পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি অধঃস্তন পুরুষ	– ৬জন
২। পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি উর্ধ্বতন পুরুষ	– ৬জন
৩। উপরোক্ত ৬টি উর্ধ্বতন পুরুষের পত্নীগণ	– ৬জন
৪। উপরোক্ত ৬টি উর্ধ্বতন পুরুষের প্রত্যেকের পুরুষ বংশ ধারায় ৬টি অর্ধঃস্তন পুরুষ	– ৩৬ জন
৫। বিধবা, কন্যা ও কন্যার পুত্র	– ৩ জন
মোট	**৫৭ জন।**

উল্লেখ্য যে, গোত্র সপিণ্ডের কেউ জীবিত থাকলে সমানোদক ও বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে না। গোত্র সপিণ্ডের কেউ জীবিত না থাকলে সমানোোদক শ্রেণী উত্তরাধিকারী হবে এবং সমানোদক শ্রেণীর কেউ জীবিত না থাকলে বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে। গোত্রজ সপিন্ডের যে কেউ জীবিত থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই ২ য় এবং ৩য় শ্রেণীর লোকের উত্তরাধিকার হবার সম্ভাবনা নেই বললেও হয়তো ভুল হবে না। মিতাক্ষরা আইনে ও উত্তরাধিকার তালিকায় ক্রমানুসারে উত্তরাধিকারিত্ব পায়। ফলে এ আইনে ও নারী জাতিকে যেভাবে অবহেলা করা হয়েছে তা হয়তো বলার আর অপেক্ষা রাখে না। (মাও. মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮)।

৯. এ আইন জীমুতবাহন কর্তৃক রচিত। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সমাজের মধ্যে দায়ভাগ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকারী হবার জন্য পিণ্ডদান শর্ত। হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান মতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এ শর্তে উত্তরাধিকার লাভ করবে যে, সে মতের উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে তার আত্মিক কল্যাণ কামনা করবে এবং মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে যারা শাস্ত্র মতে পিণ্ডদানের অধিকারী তারাই কেবল উত্তরাধিকারী হবে। দায়ভাগ আইন উত্তরজীবী সূত্র স্বীকার করে না। তাই এ আইনে পিতা, পুত্র ও পৌত্র একই সংগে উত্তরাধিকারী হতে পারে না। দায়ভাগ আইন অনুযায়ী তিন শ্রেণীর লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যথা ১) সপিণ্ড ২) সাকুল্য ও ৩) সমানোদক। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ সপিণ্ডের কেউ যদি জীবিত থাকে তাহলে সাকুল্য ও সমানোদকগণ কোন অংশ পাবে না। সপিণ্ডের কেউ জীবিত না থাকলে সাকুল্য এবং সাকুল্যের অবর্তানে সমানোদকগণ উত্তরাধিকারী হবে। (মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬)।

১০. যে সকল ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করে এবং মৃত ব্যক্তির জীবিতকালে যে সকল ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যেই পিন্ডদান কতে বাধ্য, তারা সকলেই পরস্পরের সপিণ্ড। সপিণ্ডগণ সকলেই মৃত ব্যক্তির সগোত্র নয়, ভিন্ন গোত্রের আত্মীয়ও হতে পারে। যেমন–দৌহিত্র। (মাও. ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬)।

Dhaka University Institutional Repository

৩. দায়ভাগ আইনে কন্যা অসতী হলে মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ জীবিত থাকলে কন্যাগণ কোন অংশ পায় না।[১১]

৫. মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রীগণের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কন্যা সন্তান তার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারে না।[১২]

৬. পূর্বে হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র জীবিত থাকলে বিধবা কোন অংশ পেত না।[১৩]

৭. স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী অসতী হলে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ উভয় আইনে সে তার মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে।

৮. বিধবা হবার পর যদি স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করে তবে সে তার মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে।[১৪]

৯. দায়ভাগ আইনে যে কোন হিন্দু ব্যক্তি শুধুমাত্র বিধবা রেখে মারা গেলে এবং অন্যকোন উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকলে, বিধবাই উত্তরাধিকারিণী হিসেবে সম্পত্তি পাবে।[১৫]

১০. হিন্দু আইনে পৌত্র এবং বোন কোন অবস্থাতেই অংশ পায় না।

১১. মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্র সন্তান জীবিত থাকলে মাতা উত্তরাধিকার পায় না। এছাড়া দায়ভাগ আইনে পিতা জীবিত থাকলে অথবা মাতা অসতী হলেও মাতা মৃত পুত্রের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়।

১২. কন্যা, মাতা, বিধবা স্ত্রী, পিতামহী প্রভৃতি হিন্দু মহিলাগণ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র জীবিতকালে ভোগ দখলের অধিকারিণী হয়। হিন্দু নারীগণ উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তি পায়, তা সীমিত অর্থাৎ জীবন স্বত্বে পায়।[১৬]

---

১১. অন্যান্য ওয়ারিশগণের অবর্তমানে কন্যাগণ উত্তরাধিকারী হবার অধিকারিণী হলেও, যে সকল কন্যা/কন্যাগণ বন্ধ্যা কিংবা শুধুমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবে না।

১২. এ ছাড়া যে সকল কন্যাগণ পুত্র জন্ম দিতে সক্ষম নয়, যে বন্ধ্যা, যে শুধু কন্যাবতী সে মৃত পিতার ওয়ারিশ হতে পারে না। যে সকল কন্যারা পিতার ওয়ারিশ হতে পারে তাদের মধ্যে অবিবাহিতা কন্যার দাবি প্রথম, এরপর বিবাহিতা বিত্তহীন এবং বিবাহিতা বিত্তশালী।

১৩. ১৯৩৭ সালে সম্পত্তির উপর বিধবা স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত আইন (১৯৩৭ সালের ১৮ নং আইন) পাস হবার পর মৃতের বিধবা, পুত্রের বিধবা এবং পৌত্রের বিধবা, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের সাথে উত্তরাধিকার পায়। উক্ত আইনটি ১৪-৪-১৯৩৭ ইং হতে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু কৃষি জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

১৪. বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করলে তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।

১৫. কিন্তু বিধবা একজন মহিলা বিধায় তিনি ঐ সম্পত্তি নিরংকুশভাবে পাবেন না। তিনি শুধু ঐ সম্পত্তির আয় ভোগ করার অধিকারিণী। ঐ সম্পত্তি দান কিংবা বিক্রি করার অধিকার তার নেই। তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তার নিকটবর্তী কোন উত্তরাধিকারী পাবে না বরং স্বামীর নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পুরুষত্বহীন ব্যক্তি, বর্ণভ্রষ্ঠ ব্যক্তি, জন্মান্ধ, বধির, পাগল মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পাদনে অযোগ্য বিধায় ওয়ারিশত্ব লাভ করা থেকে বঞ্চিত হবে।[১৭]

১৪. হিন্দু আইনে কোন বিবাহিতা হিন্দু মহিলা শুল্ক স্ত্রী ধন রেখে মারা গেলে, তারা বৈপিত্রেয় ভাই, পিতা, পিতার সপিন্ড ও অন্যান্য ওয়ারিশগণ পরিত্যক্ত শুল্ক স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু তার কন্যা, বোন, পুত্র অংশ পায়না। শুল্ক বিহীন স্ত্রী ধন রেখে গেলে ও মা, বোন পুত্র বঞ্চিত হয়।

১৫. মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ আইনে মাত্র ৫জন মহিলাকে সপিণ্ড বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।[১৮]

১৬. হিন্দু আইনে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী, পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পৌত্রের বিধবা স্ত্রী এরা উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে গণ্য।[১৯]

১৭. মিতাক্ষরা আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মিলেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়।[২০]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু আইনে নারীর অবস্থা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২১]

---

১৬. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তারা স্বীয় ইচ্ছামত কোন প্রকর দান, উইল বিক্রয় ও হস্তান্তর করতে পারে না। এ সকল মহিলাগণের মৃত্যুর পর, তারা যার নিকট থেকে সম্পত্তি পেয়েছিল তার নিকটবর্তী ভাবী উত্তরাধিকারীগণ উপরোক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে।

১৭. এ ব্যাপার মহামুনি মনু বলেন,

"অনংশৌ ক্লীব পতিজাত্যন্ধবাধরৌ তথা

উম্মত্ত জড় মুকাশ্চ যেচ কেচিন নিরিন্দিয়া"

এর দ্বারা এ কথা পরিষ্কার যে, হিন্দু আইনে নারী মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সাধারণত কোন অংশ পায় না। যে অবস্থায় কেবলমাত্র ভোগ দখলের জন্য কন্যার ভাগ্যে সামান্য জুটে থাকে, সে অবস্থায়ও উপরোক্ত বাধাগুলোর কারণে বঞ্চিত হয়ে যায়। হিন্দু আইনে এ সকল নারীদের ভাগ্যের কি পরিহাস তা সহজেই অনুমেয়।

১৮. মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ আইনে যে ৫জন মহিলাকে সপিণ্ড বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে তারা হলেন– বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী। এছাড়া মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ আইনে যথাক্রমে ৫২ জন এবং ৪৮ জনই হল পুরুষ।

১৯. এরা জীবিত থাকলে কন্যা ও মাতা বঞ্চিত হবে, এছাড়া পৌত্রী এবং বোনতো সম্পূর্ণভাবেই বঞ্চিত।

২০. পিতাজীবিত থাকলেই পুত্র তার অংশ দাবি করতে পারে। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মিলে উত্তরাধিকারী হয় না এবং সে সম্পত্তি ও দাবি করতে পারে না।

২১. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ**, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬-১২২।

উদাহরণ ঃ ১।

শ্রীকান্ত পুত্র স্ত্রী এবং কন্যা রেখে মারা গেল।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্ট ধর্ম ঃ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ঃ

In Roman law a woman ...... if married she and her property passed into the power of her husband..... The wife was the purchased property of her husband, and like a slave acquired only for his benefit. A woman could not exercise any civil or public office.... could not be a witness. surety, taton, or curator; she could not adopt or be adopted, or make will or contract.[২২]

According to the English common law :

..... all real property which a wife held at the time of a marriage became a possession of her husband. He was outfield to the rest from the

---

শ্রীকান্ত

পুত্র	স্ত্রী	কন্যা

এমতাবস্থায় পুত্র পাবে $^1/_2$ অংশ।

স্ত্রী পাবে দুই অংশের এক এবং কন্যা বঞ্চিত হবে। (১৯৩৭ সালের আইন পাশ হবার পূর্বে পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হত স্ত্রী কোন অংশ পেত না)।

উদাহরণ ঃ ২।

রমেশ ভাই, বোন এবং পৌত্র রেখে মারা গেল।

রমেশ

পৌত্র	বোন	ভাই
	বঞ্চিত	বঞ্চিত

এমতাবস্থায় পৌত্রই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। ভাই এবং বোন কোন অংশ পাবে না।

উদাহরণ ঃ ৩।

নিতাই পুত্র, বোন এবং মাতা রেখে মারা গেল।

নিতাই

মাতা	বোন	পুত্র
বঞ্চিত	বঞ্চিত	

এমতাবস্থায় পুত্র সমস্ত সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। মাতা ও বোন কোন অংশ পাবে না।

উদাহরণ ঃ ৪।

দেবেন্দ্রনাথ মাতা, বোন, কন্যা এবং পৌত্র রেখে মারা গেল

দেবেন্দ্রনাথ

পৌত্র	কন্যা	বোন	মাতা

দেবেন্দ্রনাথ পৌত্র সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু কন্যা, বোন ও মাতা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

২২. **The encyclopedia Britanica, 11th ed. 1911. Vo-28, P- 782.**

Dhaka University Institutional Repository

land and to any the joint life of the spouses. As time passed, the English courts devised means to forbid a husband's transferring real property without the consent of his wife, but he still retained the right to manage it and to receive the money which it produced. As to a wife's personal property, the husband power was complete. He has the right to spent it as he swift. [২৩]

Only by the late nineteenth century did the situation start to improve. By a Sirius of acts starting with the married woman's property Act in 1870, amended in 1882 and 1887, married women achieved the right to won property and to enter contracts one a par with spinsters, winders and divorcess.[২৪] As late as the ninetieth century an authority in ancient law, Six Henry Maine, wrote: No society which preserves any tincture of Christian institutions IX likely to restore to married women the personal liberty, confession on them by the Middle Roman law. [২৫]

অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মত খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরাও নারীর অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব করেছিল।[২৬]

বৌদ্ধ ধর্ম ঃ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ঃ

বৌদ্ধদের[২৭] জন্য পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বাংলাদেশের মারুয়া[২৮] বৌদ্ধগণ ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধগণ সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দায়ভাগ আইন[২৯] দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

---

২৩. **Encyclopedia American International** (Edition), Vol-29, P- 108.

২৪. **Encyclopedia Britannica,** 1968. Vo-23, P- 624.

২৫. Quatel in Mace, **Marriage East and West.**

২৬. তবে ১৮৭০ সালের The Married Noman's PropertyAct ১৮৭০ থেকে ১৮৮২ এবং ১৮৮৭ সালে সংশোধন করে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম নারীর সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার স্বীকার করা হয়। এর পূর্বে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। এই সর্বপ্রথম ইংরেজ নারী সম্পত্তির মালিক হতে পারল। সে অধিকার পেল তার সম্পত্তি পাওয়ার বা তার সম্পত্তি বা তার অংশ বিশেষ বিক্রয় করার বা হস্তান্তর করার। আর ফ্রান্সে ১৯৩৮ সালে আইনের সংশোধন ও পরিবর্তন করে নারীকে সম্পদের অংশীদার হওয়ার ও ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করার অধিকার দেয়া হয়। (শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই, **নারী অধিকার,** ঢাকা ঃ ২০০০ খ্রিঃ) পৃ ৩৩)।

২৭. বুদ্ধদেবের অনুসারীগণকে বৌদ্ধ বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। অহিংস মতবাদ ত্যাগ ও কৃচ্ছতা সাধনই বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা। তা সত্ত্বেও গৌতমবুদ্ধ নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছুই বলেনি।

২৮. বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে (১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন) শাসিত।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ভারতীয় হিন্দু আইনে শাসিত ও আওতাভুক্ত। বাংলা ভারত উপমহাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিজ নিজ প্রথা ব্যতীত ধর্মীয় মূলনীতিতে তেমন কোন পার্থক্য নেই[৩০] ডি. এফ মোল্লার Principal of Hindu law এর Operation of Hindu law এর অনুচ্ছেদে Persous governed by Hindu law তে বলা হয়েছে- Hindu law applies (iv) to Jaina, Buddhists in India, Sikhs except so far as such law is veried by Ceestour.[৩১]

বৌদ্ধ আইনে নারীর অবস্থা

বাংলাদেশ ও ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভূক্ত।[৩২] কাজেই উত্তরাধিকার আইনে বৌদ্ধ নারীদের ক্ষেত্রে ও হিন্দু নারীদের অবস্থাই বহাল থাকবে। কারণ বৌদ্ধরা হিন্দু আইনে শাসিত।

---

২৯. **দায়ভাগ আইন ঃ** এ আইন জামুতবাহন কর্তৃক রচিত। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুরু প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সমাজের মধ্যে দায়ভাগ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকারী হবার জন্য পিণ্ডদান শর্ত। (মাও. মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয,** ঢাকা ঃ ১৯৯৫ইং/১৪১৬ হিঃ, পৃ. ১১৬)।

৩০. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের নারীর অধিকার ও ফারায়েজ** (ঢাকা ঃ ১৯৯৫, ১৪১৬ হিঃ) পৃ ১৩৬।

৩১. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, **প্রাগুক্ত,** পৃ. ১৩৬।

৩২. ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন কেসের ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার সংশোধিত আইনের ২ ধারার (১) উপধারায় বলা হয়েছে ঃ

This act applis-

(a) to any person....

(b) to any person who is a Buddhist, jaina such by religion and

(c) to any other person...

Explanation : The following Persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion, as the case may be :

(a) any child legitimate on illegitimate both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jainas or sikhs by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to whice such parent belougs or belonged;

(b) any child legatee on illegitimate, one of whose parents is a Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to whice such parent belongs or belonged;

(c) any person who is convert of reconvert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion.

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধগণ Bunman Buddhist নামে পরিচিত। তারা স্থানীয় উত্তরাধিকার আইনে শাসিত।[৩৩]

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধগণের তালিকাতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে কেবল মাত্র পুরুষদেরই অধিকার রয়েছে। পুত্র থেকে শুরু করে কাজিনের প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রায় সবাই পুরুষ। বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীগণ তালিকায় প্রপৌত্র, সৎ মাতার পুত্র এমনকি কাজিনের প্রপৌত্রের নাম উল্লেখ রয়েছে অথচ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, কন্যা, বোন ও পৌত্রীয় নাম উল্লেখ নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ঐ সব আইনে নারীজাতিকে চরমভাবে অবহেলা করা হয়েছে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা বলতে কিছুই দেয়া হয়নি। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার অসহায় বিধবা স্ত্রী, কন্যাদের, একটু স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকার জন্য আর্থিক সুযোগ সুবিধাটুকু থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করা হয়েছে।[৩৪]

উপরোক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভুক্ত। (ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৬-১৩৭)।

৩৩. ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধগণের উত্তরাধিকারীগণের ক্রম নিম্নরূপ ঃ

মূলধনী (মৃতব্যক্তি)

১ম	ঃ	পুত্র সন্তান
২য়	ঃ	পৌত্র
৩য়	ঃ	প্রপৌত্র
৪র্থ	ঃ	দত্তক পুত্র
৫ম	ঃ	সৎমাতার পুত্র
৬ষ্ঠ	ঃ	অবৈধ সন্তান ও অবৈধ সৎ পত্নীর সন্তান
৭ম	ঃ	ভ্রাতা ও ভগ্নী
৮ম	ঃ	পিতামাতা
৯ম ঃ		পিতার পিতামাতা
১০ম	ঃ	দুরসম্পর্কীয় আত্মীয় (distant kindred)
১০ (ক)	ঃ	ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রী
১০ (খ)	ঃ	খুড়া ও খুড়ি
১০ (গ)	ঃ	ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীর সন্তানগণ
১০ (ঘ)	ঃ	কাজিন (causin)
১০ (ঙ)	ঃ	ভ্রাতুষ্পুত্রের ও পুত্রীর পৌত্র ও পৌত্রীগণ
১০ (চ)	ঃ	কাজিনের সন্তানগণ
১০ (ছ)	ঃ	কাজিনের পৌত্র সন্তানগণ
১০ (জ)	ঃ	কাজিনের প্রপৌত্র সন্তানগণ।

৩৪. ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ ـ وَلِلنِسَّاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَـرَكَ الْوَالِـدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضَا ـ

"পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে অনুরূপভাবে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নারীদের জন্যও রয়েছে অংশ। তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক এ নির্ধারিত অংশ।"[৩৫]

এর পরই আল্লাহ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কার কতটা অংশ হবে তা নির্ধারণ করে নির্দেশ দিয়েছেন–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ أَوْلأدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيَيْــنِ ـ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْــنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ـ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ـ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُـثُ ـ فَإِنْ كَانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعدِ وَصِيَةٍ يُّوْصِيْ بِهَا أَوْدَيْن ـ أَبَاءكُمْ وَأَبْنَاءكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ـ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ـ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

"আল্লাহ তোমদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন। এক পুত্রের অংশ দুই পুত্রের অংশের সমান কিন্তু কেবল কন্যা দু'য়ের অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তাদের জন্য অর্ধাংশ তার সন্তান থাকলে তার পিতা মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ। আর ভাই বোন থাকলে মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ এ সবই সে যা অসিয়ত[৩৬] করে তা দেয়ার এবং ঋণ[৩৭] পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের

---

৩৫. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ ৭।

৩৬. **অসিয়ত** – মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি পুণ্যফল (সওয়াব) লাভ করবে এই প্রত্যাশায় জীবিতাবস্থায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কোথাও কোথাও কোনভাবে দান করাকে শরী'আতের পরিভাষায় অসিয়ত বলে। আল-কুরআনে যেখানে মৃত্যু ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ বন্টন করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তার সাথে সাথে মৃতের ওসীয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। অসীয়ত পালন করা এবং ঋণ পরিশোধ করা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই ওয়াজিব। এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশি ওসীয়ত করা জায়েয নয়। অসীয়ত করে উত্তরাধিকারীদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা বৈধ নয়; বরং তাদেরকে ঋণী ও অভাবগ্রস্ত রেখে না যাওয়াই সমীচীন। এই মর্মে হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, "لا وَصَيَّةَ لِلْوَارِثِ" উত্তরাধিকারীদের জন্য ওসীয়ত করা জায়েয নেই, (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজা) (মালিক রাম, অনুবাদ মাহমুদা বেগম নেকু, **নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা,** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ ১৯৮৭ ইং/১৪০৭ হিঃ, পৃ. ১৫৮-১৬১)।

৩৭. **ঋণ ঃ** আল্লাহ মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ বণ্টন সম্পর্কিত বিধান ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন ঃ

' مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىَ بِهَا أَوْدَيْــن ' 'যা অসীয়ত কর তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১২)। অসীয়ত কার্যকর করে ঋণ আদায় করার পর বণ্টন কার্য

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতম তা তোমরা অবগত নও। এটি আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"[৩৮]

নারীর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ـ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا اَوْدَيْن ـ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ـ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْدَيْن ـ

"তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চর্তুাংশ অসিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের (তোমাদের স্ত্রী) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ। এ সবই তোমরা যা অসিয়ত করবে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর।"[৩৯]

নারীর উত্তরাধিকার প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ ـ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ـ اِن امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ـ وَهُوَ يُرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ـ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْن فَلَهُمَا الثُّلُثَن مِمَّا تَرَكَ ـ وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْثَيْن ـ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا ـ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ ـ

সমাধা করতে হবে। এখানে প্রথমে ওসীয়ত পূর্ণ করার কথা বলে পরে ঋণ আদায় করার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ প্রথমে ওসীয়ত পালন করা নয়; কেননা ওসীয়ত ত্যাজ্য সম্পদের আওতাভুক্ত হয়ে থাকে। যেমন ঃ

إِنْ تَرَكَ خَيْرَن الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْن وَالأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْف ـ

"মৃত ব্যক্তি যদি প্রচুর সম্পদ রেখে যায় তাহলে ন্যায়ভাবে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয় স্বজনের জন্য অসীয়ত করবে।" ঋণ আদায়ের পর অবশিষ্ট যা থাকে তাই মৃত্যুর ত্যাজ্য সম্পদ। মৃতের ওপর ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সমস্ত সম্পদ অংশীদারদের অধীকারভুক্ত হয় না। ঋণ পরিশোধ করার পর অসীয়ত কার্যকর করতে হবে। হুযূর (স) -এর নিয়ম ও তা-ই ছিল (ইবনে মাজা) ঋণের প্রকারভেদ সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

دَيْن غَيْرَ مُضَار এমন ঋণ, যদ্বারা অংশীদারের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে (নিসা ঃ ১২); [মালিক রাম, অনুবাদ ঃ মাহমূদা বেগম নেকু, **নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০।

৩৮. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ ১১।

৩৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নিসা, আয়াত ঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

"লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল! পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি[৪০] সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোন পুরুষ মারা গেল সে যদি সন্তানহীন হয় এবং এবং এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীন হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দুই ভগ্নি থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর যদি ভাই বোন উভয় থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয় সবিশেষ অভিজ্ঞ।"[৪১]

পবিত্র কুর'আনের উপরোক্ত ঘোষণার মাধ্যমে সম্পত্তি বণ্টনের জন্য ইসলামে এক সুসংহত বিধি প্রবর্তিত হয়েছে। কোন মু'মিন নারী পুরুষেরই অংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার কোনই অবকাশ নেই। প্রত্যেক অংশীদারকেই নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী সম্পদ ও সম্পত্তি দিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক এবং এটা ও একটি ফরয ইবাদত। এক্ষেত্রে নারী পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক যে অংশ ধার্য আছে সে অনুযায়ী সম্পদ বণ্টন করে দিতে হবে। কোন রকম পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবে না বা অংশীদারদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেসমূহ সম্পত্তি উইল বা দান[৪২] করে দেওয়া যাবে না।[৪৩]

সমগ্র বিশ্বে ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান যেখানে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ নির্ধারণ করে সম্পদের উত্তরাধিকারিণী ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম ব্যতীত বিশ্বের কোন ধর্মে বা রাষ্ট্রে সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিল না। ইসলাম মুসলমান নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ঘোষণা করে একাধারে যেমন নারী মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি আবার তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে করেছে সুনিশ্চিত ও স্থিতিশীল। কোন পিতার জন্যই তার কন্যাকে বঞ্চিত করা ইসলামী সংবিধান তথা শরী'আতে বৈধ নয়। এমনকি দান করে

---

৪০. **কালালাহ** ঃ যে মৃতের পিতা বা সন্তান নেই অর্থাৎ যার পূর্বসূরী বা উত্তরসূরী নেই। এটি মূল ধাতু الكل থেকে নির্গত, যার অর্থ দুর্বল। বলা كل الرجل যে ব্যক্তি দুর্বল ও রহিত শক্তি। আলিমগণ একমত হয়েছেন যে কালালাহ হল যে মৃতের সন্তান বা পিতা নেই। (মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, অনুবাদ, কাজী গিয়াস উদ্দিন আহমদ, **ইসলামে উত্তরাধিকার আইন,** ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৮ ইং, ১৪০৯ হিঃ, প্রথম প্রকাশ, পৃ ১৮)।

৪১. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১৭৬।

৪২. **উইল** ঃ কোন একজন ব্যক্তির সম্পত্তি তার জীবদ্দশায় অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দান করার লিখিত দলিলকে উইল বলা হয়। একজন ব্যক্তি অন্য আরেকজন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি দান করা।

৪৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ বিন ওয়াক্কাসকে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দান করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন এটাই যথেষ্ট তোমরা অংশীদারদের বঞ্চিত না করে তাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাই বিধেয় অতিরিক্ত দানের মানসিকতা যেন উত্তরাধিকারীদের জন্য দারিদ্র ও পরনির্ভরতার কারণ না হয়। [আল হাদীস] (সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা, **ইসলামে নারীর অধিকার,** কলকাতা ঃ ১৯৮৯ খ্রিঃ, পৃ ৮৮-৮৯)।

Dhaka University Institutional Repository

দিতে চাইলে ও পুত্র-কন্যাকে বঞ্চিত করা যাবে না।[৪৪] এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর একটি স্পষ্ট নির্দেশ সব বিতর্কের অবসান ঘটায়।

এই আইনের দ্বারা ইসলামী শরী'আত নারীদের জন্য এক অভাবনীয়, সুস্থির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করেছে। ইসলামী শরীয়াতের বিধানে কোন পিতা কন্যাকে বঞ্চিত করে পুত্রকে সমূহ সম্পত্তি দানপত্র করে দেয়ার অধিকারী নন। এটা করলে আল্লাহ ও আল্লাহর নবীর নির্দেশ অমান্যকারী বলে গণ্য হবেন। পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার কায়েম করে ইসলাম স্বামীর কাছে ও নারীকে বিশেষ সম্মানীয় করে তুলেছে।[৪৫] لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ -

'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ।'[৪৬]

অর্থাৎ পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পাবে। এখানে পুত্রের অংশকে কন্যার অংশের উপর ভিত্তি করা হয়েছে। কিন্তু কন্যার অংশকে পুত্রের অংশের উপর ভিত্তি করা হয়নি। একথা বলা হয়নি যে, কন্যা পুত্রের অর্ধেক পাবে। পুত্রের অংশ কমবেশি পাওয়া আর না পাওয়ার ব্যাপারে কন্যার অংশকেই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে পুত্রের চেয়ে কন্যার অধিকার ও মর্যাদাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

পুরুষের অংশ মহিলার দ্বিগুণ কেন?

কেউ যদি প্রশ্ন করে ঃ মহিলা দুর্বল ও সম্পদের অধিক মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সম্পদে পুরুষের অর্ধেক দেয়া হয় কেন?

---

৪৪. সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা, **ইসলামে নারীর অধিকার** (কলকাতা ঃ বাণী প্রকাশ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৮৯ খ্রিঃ), পৃ ৮৮-৮৯।

৪৫. সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯।

৪৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নিসা, আয়াত ঃ ১১।

আয়াতের শানে-নুযূল ঃ

সা'দের স্ত্রী সা'দের ঔরসজাত দুইটি মেয়ে সহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর নিকট এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল এরা দু'জন সা'দ ইবনে রাবীর মেয়ে। তাদের পিতা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এখন তাদের চাচা তাদের সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, এবং তাদের জন্য কিছুই রাখেনি। অর্থকড়ি ব্যতিরেকে তাদেরকে বিয়েও দেয়া যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ রায় দিবেন। এরপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সূরা নিসার ১১ নং আয়াত নাযিল হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের চাচাকে এ নির্দেশ পাঠালেন যে, তাদের মেয়েদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ ও তাদের মাকে এক অষ্টমাংশ দাও এবং অবশিষ্টাংশ তোমার জন্য রাখ। আরো বর্ণিত আছে যে, সাদের কবি হাসানের ভাই আব্দুর রহমান ইবন সাবিত সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী উম্মে কাহ্হাহ ও পাঁচবোন রেখে যান। পুরুষ ওয়ারিশগণ এসে সমস্ত সম্পদ অধিকার করলে– উম্মে কাহ্হাহ্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছে অভিযোগ করলেন। ফলে মিরাসের এ আয়াতটি নাযিল হল (ইবনে জারীর বর্ণিত) (মুহাম্মদ আলী আস্-সাবুনী, অনুবাদ কাজী গিয়াস উদ্দিন আহমদ, **ইসলামে উত্তরাধিকার আইন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২)।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরীয়ত মিরাছে উভয়ের মধ্যে বিবিধ যুক্তিসংগত কারণে পার্থক্য করেছেন।

প্রথমত ঃ মহিলার প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণে তার ব্যয়ভার ছেলে, পিতা, ভাই অথবা অন্যান্য আত্মীয়ের উপর ওয়াজিব।

দ্বিতীয়ত ঃ মহিলা কারো ব্যয় বহনে আদিষ্ট না । যা পুরুষের বিপরীত, কেননা পরিবার আত্মীয়-স্বজন ও যাদের দাবি তার উপর ন্যস্ত তাদের ভরণ-পোষণে সে আদিষ্ঠ।

তৃতীয়ত ঃ পুরুষের ব্যয় অপরিমেয় এবং সম্পদের আবশ্যকতা ব্যাপক। সেহেতু তার অর্থের প্রয়োজন মহিলার তুলনায় অধিক।

চতুর্থত ঃ পুরুষ তার স্ত্রীর মোহর প্রদান করে এবং সন্তানদের ও স্ত্রীর বাসস্থান এবং অন্ন-বস্ত্রের ব্যয়ভার ও তার উপর ন্যস্ত।

পঞ্চমত ঃ সন্তানদের পড়া লেখার খরচ এবং চিকিৎসা, ওষুধ-স্ত্রী ও সন্তানদের সকল ব্যয়ভার পুরুষের উপরই ন্যস্ত, মহিলার উপর নয়।

এ সব ভরণ-পোষণ ও খরচ পুরুষের কাঁধে ন্যস্ত, যা ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত। মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এ সম্পর্কে আদেশ করেন ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ ـ

সম্পদশালীদের উচিত যে, সে স্বীয় অবস্থানুসারে ব্যয় করে এবং যার আয় কম তার উচিত যে, আল্লাহ তাকে যতটুকু দান করেছেন, তা হতে ব্যয় করে।[৪৭]

এ সূক্ষ্ম আলোকপাত দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মাঝে অংশের পার্থক্য আল্লাহর মহা হিকমত উদ্ভাসিত হয়েছে পুরুষের উপর ব্যয়ভার অধিক তার সম্পদের আবশ্যকতা ব্যাপক ও অধিক তাই ন্যায় ও ইনসাফের যুক্তি প্রমাণে তাঁর অংশ অধিক ও ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এতদসত্ত্বেও ইসলাম পুরুষকে মহিলার দ্বিগুণ প্রদান করেছে, মহিলাদেরকে তাদের ধারণার উর্ধ্বে করুণা ও মর্যাদা দিয়েছে। এ ব্যবস্থায় সে পুরুষের চেয়ে অধিক নেয়ামত প্রাপ্ত। কেননা সে কোন প্রকার কষ্ট ব্যতিরেকে মিরাসে শরীক হয়। সে প্রদান না করে গ্রহণ করে। বিনা পরিশ্রমে ভোগ করে, জীবন সংগ্রামে পুরুষের সাথে শরীক না হয়ে ব্যয়ভার ব্যতীত সম্পদ জমা করে ও সুখী জীবনের অনুসন্ধিৎসু।[৪৮]

---

৪৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ তালাক, আয়াত ঃ ৭।

৪৮. প্রচুর ধনাঢ্য অবস্থায় স্বামীর উপস্থিতিতে নিজের বা সন্তানের জন্য ইসলামী শরীআতে মহিলা তার মাল হতে খরচ অপরিহার্য নয়। কেননা অন্ন-বস্ত্র বাসস্থান সহ যাবতীয় ব্যয়ভার স্ত্রী এবং সকল সন্তানের ব্যায়ভার স্বামীর উপর ন্যস্ত যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ
وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ "এবং সন্তানের খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ম মাফিক জন্মদাতার উভয়ই ন্যস্ত।"

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর উত্তরাধিকারী সম্পদের লাভের অংশ

স্বামী যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে স্বামীর পরিত্যক্ত স্থাবর, অস্থাবর সকল সম্পত্তিতে স্ত্রী উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করার ব্যাপারে স্ত্রীর দুই অবস্থা। যথা–

প্রথম অবস্থা ঃ মৃত স্বামীর যদি কোন সন্তান না থাকে তাহলে স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবে।[৪৯]

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ স্বামী যদি মৃত্যুকালে পুত্র, কন্যা অথবা অধঃস্তন কাউকে জীবিত রেখে যান, তাহলে স্ত্রী পাবে ১/৮ অংশ।[৫০]

কন্যার উত্তরাধিকার সম্পদ লাভের অংশ

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করার ব্যাপারে কন্যা সন্তানের তিন অবস্থা। যথা–

প্রথম অবস্থা ঃ কন্যা যদি একজন হয় এবং পুত্র না থাকে তাহলে কন্যা পিতার সকল সম্পত্তির ১/২ অংশ।[৫১]

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ কন্য যদি দুই বা ততোধিক হয় এবং পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে কন্যারা পাবে পিতার সকল সম্পত্তির ২/৩ অংশ। উক্ত অংশ সকল কন্যাদেরকে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে।[৫২]

---

৪৯. আল্লাহর বাণী– وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ "এবং তোমাদের যদি কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে, তবে তোমরা যা পরিত্যাগ করে যাবে তাদের জন্য তার এক চতুর্থাংশ। নিসা-১২) যেমন– খালেদ সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং পিতা রেখে গেছেন। এমতাবস্থায় স্ত্রী পাবে ১/৪ অংশ এবং পিতা পাবে ৩/৪ অংশ।

৫০. আল্লাহর বাণী– فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ـ কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততি থাকে তবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে তাদের জন্য এক অষ্টমাংশ। (আল কুর'আন, সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১২) যেমন খালেদ সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং এক পুত্র রেখে গেছেন এমতাবস্থায় স্ত্রী পাবে ১/৮ অংশ। এবং পুত্র পাবে ৭/৮ অংশ।

৫১. আল্লাহর বাণী– وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ 'আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তাদের জন্য অর্ধাংশ" (**আল কুরআন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১২) যেমন– কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে এক কন্যা এবং পিতা রেখে যান। তাঁর পুত্র সন্তান নেই। এমতাবস্থায় কন্যা পাবে ১/২ অংশ এবং পিতা পাবে ১/২ অংশ।

৫২. এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী–فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "অতএব, যদি কন্যা দুয়ের অধিক থাকে তবে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১১) যেমন– কোন ব্যক্তি দুই কন্যা ও পিতা রেখে মারা গেলেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান নেই। এমতাবস্থায় প্রত্যেক কন্যা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ এবং পিতা পাবেন তিন ভাগের এক ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অবস্থা ঃ কন্যার সাথে যদি পুত্র থাকে তাহলে প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাবে।[৫৩]

পৌত্রীর অধিকার ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পৌত্রীদের (পুত্রের কন্যাদের) উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভের ৬টি অবস্থা। যথা–

প্রথম অবস্থা ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার ঔরসজাত কোন কন্যা সন্তান যদি না থাকে এবং পৌত্রী যদি মাত্র একজন হয়, তাহলে সে মৃত ব্যক্তির সকল সম্পত্তির দুই ভাগের এক ভাগ পাবে।[৫৪]

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত কন্যাদের অবর্তমানে পৌত্রী যদি দুই বা ততোধিক থাকে, তাহলে তারা পাবে $^{২}/_{৩}$ অংশ এবং উক্ত অংশ পৌত্রীগণ নিজেদের মধ্যে সমান সমানভাবে ভাগ করে নিবে।[৫৫]

---

৫৩. আল্লাহর বাণী– فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ - যেমন– কেউ মৃত্যুকালে এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান তাহলে কন্যা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ পুত্র পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ।

৫৪. তিনটি শর্তে পৌত্রী (পুত্রের কন্যা) অর্ধেকের ওয়ারিশ হয়। শর্তগুলো হল

(ক) তার সাথে কোন সহোদর ভাই আছাবা না হওয়া। (খ) শুধু একা হওয়া। (গ) স্বীয় ছেলে বা মেয়ে না থাকা। মেয়ের ওয়ারিশ হবার দলিলই তার ওয়ারিশ হবার দলিল। কেননা মেয়ে না থাকলে ছেলের মেয়ে তার স্থান অধিকার করে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِى أَوْلَادِكُمْ "আল্লাহ তোমাদরে সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন।" এ আয়াতটি আলিমদের সর্বসম্মত মতে সন্তান ও ছেলের সন্তানগণ বুঝায়। (মুহাম্মদ আলী আস্-সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬-৩৭)। এ সম্পর্কিত উদাহরণ ঃ যেমন– করিম সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী, পৌত্রী এবং ভাই রেখে মারা গেলেন। এমতাবস্থায়, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী পাবে $^{১}/_{৮}$ অংশ। পৌত্রী পাবে $^{৪}/_{৮}$ অংশ এবং ভাই পাবে $^{৩}/_{৮}$ অংশ কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের আট নং অধ্যাদেশের বলে বর্তমানে স্ত্রী পাবে $^{১}/_{৮}$ অংশ পৌত্রী পাবে $^{৭}/_{৮}$ অংশএবং ভাই বঞ্চিত হবে। (মাও. ফজলুর রহমান, **প্রাগুক্ত,** পৃঃ ৫১)।

৫৫. ছেলের দুই বা ততোধিক মেয়ে নিম্ন বর্ণিত শর্তে দুই-তৃতীয়াংশের ওয়ারিশ হবে। (ক) মৃতের যদি আপন সন্তান অর্থাৎ ছেলে বা মেয়ে না থাকে। (খ) দুইজন আপন মেয়ে না থাকে। (গ) তাদের সাথে সমপর্যায়ের কোন ভাই (ছেলের ছেলে) আছাবা না থাকে। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে ছেলের ছেলের মেয়ে ও তার অধস্তনদের ক্ষেত্রেও। ছেলের জীবদ্দশায় ছেলের মেয়ে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা ফারায়েজ শাস্ত্রের বিধানমতে যারা কারো মধ্যবর্তীতায় অংশ লাভ করে সেই মাধ্যমের বর্তমানে তারা বঞ্চিত হয়। গ্রাহ্যমতে ছেলের অবর্তমানে তার ছেলে তার স্থানে অধিষ্ঠিত হবে। আল্লাহর বাণী– يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِى أَوْلَادِكُمْ "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। এর তাৎপর্য হল ছেলের সন্তান ও তদনিম্নবর্তীগণ ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। [ইসলামে উত্তরাধিকার আইন, পৃ ৫১] যেমন– কেউ মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পৌত্রী এবং চাচা রেখে যান। এমতাবস্থায়, ইসলামী আইন স্ত্রী পাবে $^{৩}/_{২৪}$ অংশ। প্রত্যেক পৌত্রী পাবে $^{৮}/_{২৪}$ অংশ এবং চাচা পাবে $^{৫}/_{২৪}$ অংশ। কিন্তু ১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের বলে এ ক্ষেত্রে বর্তমানে, স্ত্রী পাবে $^{২}/_{১৬}$ অংশ। প্রত্যেক পৌত্রী পাবে $^{৭}/_{১৬}$ অংশ এবং চাচা বঞ্চিত হবে। (মাও ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২)।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত একজন কন্যা যদি থাকে, তাহলে পৌত্রীগণ পাবে ১/৬ অংশ।[৫৬]

চতুর্থ অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক কন্যা সন্তান থাকে তাহলে পৌত্রী কোন অংশ পাবে না। দুই কন্যা বর্তমান থাকায় তারাই সর্বোচ্চ অংশ ২/৩ অংশ।[৫৭] মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে কন্যারা অধিক নিকটবর্তী। ফারায়েজ মতে নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হয়।

পঞ্চম অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক কন্যা বর্তমান থাকাবস্থায় যদি পৌত্রীদের সাথে তাদের সহোদর ভাই, চাচাত ভাই অথবা তাদের নিম্নশ্রেণীর এক বা একাধিক পুরুষ সন্তান অর্থাৎ পৌত্রীদের ভাইপো, ভাইপো পুত্র ইত্যাদি থাকে, তাহলে পৌত্রীরা আসাবা[৫৮] হয়ে যাবে।

---

৫৬. মৃতের মাত্র একজন মেয়ে থাকলে ছেলের মেয়ে (এক বা ততোধিক) এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবে। মেয়ে অর্ধেক ও ছেলের মেয়ে বা মেয়েরা দুই-তৃতীয়াংশের পরিপূরক হিসেবে এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবে। যেহেতু মেয়েদের প্রাপ্য দুই তৃতীয়াংশ। যখন মেয়ে অর্ধেক লাভ করবে তখন অবশিষ্ট এক ষষ্ঠাংশ ছেলের মেয়ে লাভ করবে। এর দলিল ঃ "আবূ মূসা আশআরী রাযী আল্লাহু আনহুকে মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও বোনের মিরাছ সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ মেয়ে অর্ধেক এবং বোন অর্ধেক পাবে। এখন তোমরা ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু আনহু–এর কাছে যাও। তিনিও আমার মতই বলবেন। ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু আনহু –কে জিজ্ঞেস করা হলে তিন বললেন ঃ তাঁদের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ফয়সালাই আমার ফয়সালা। তাহলো মেয়ে অর্ধাংশ এবং দুই তৃতীয়াংশের সম্পূরক হিসেবে ছেলের মেয়ে এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বোনের। পরে আমার আবু মুসা আশআরীর নিকটে গিয়ে বিষয়টি বললে তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ এই জ্ঞানী লোকটি তোমাদের মাঝে বর্তমান ততক্ষণ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না।" (**বুখারী**)।

৫৭. দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে তাদের অংশ হবে দুই-তৃতীয়াংশ যদি তাদের সাথে আছাবা হিসেবে (সহোদর) ভাই না থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَـرَكَ ـ (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১১)। যদি মহিলা দু'য়ের অধিক হয় তবে তাদরে জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ। উল্লেখিত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী মেয়েদের সংখ্যা দু'য়ের অধিক হলে তারা ২/৩ অংশ হকদার হবে। যখন দুয়ের অধিক অর্থাৎ তিন বা ততোধিক, এ রায় সর্বজনের রায়ের পরিপন্থী ও আগ্রাহ্য। (মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী, ইসলামে উত্তরাধিকার আইন, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০; মুহাম্মদ আলী আস্ সাবুনী, **ইসলামে উত্তরাধিকার আইন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪০)।

৫৮. **আসাবা** ঃ আভিধানিক অর্থে আসাবা হল কোন ব্যক্তি তাঁর পিতার কারণে আত্মীয় হওয়া। আসাবা নাম দেয়ার কারণ হল তারা তার সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট। মূল শব্দটি عَصَبَ الْقَوْمَ بِارَّجَلاً إِذَا جَتْمَعُوْا وَاحْطُواْ بِــهِ ـ অর্থাৎ যখন সে তাদেরকে নিজের চারিদিকে একত্রিক করে সাহায্য ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য। শক্তিশালী দলকে 'উছবা' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخٰسِرُوْنَ ـ "তারা বলল, *আমরা একটি শক্তিশালী দল থাকতে যদি তাঁকে (ইউসুফ (আ) বাঘে খেয়ে ফেলে তাহলে আমরাইতো ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।" (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ ইউসুফ, আয়াত ঃ ১৪)। নিকটবর্তী আত্মীয়দেরকে আছাবাত বলে। যেহেতু তারা আত্মীয় ব্যক্তিকে বিপদের মুহূর্তে সাহায্য করতে ও শত্রু আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পরিবেষ্টিত থাকে।* ফারায়েযের পরিভাষায় 'আসাবা' হল ঐ সকল ওয়ারিশ

Dhaka University Institutional Repository

মৃত ব্যক্তির কন্যাদ্বয়ের অংশ দেবার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পৌত্রীদের মধ্যে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ হারে বণ্টন করা হবে।[৫৯]

ষষ্ঠ অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির যদি কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকে তাহলে পৌত্রী কোন অংশ পাবে না। এ অবস্থায় পৌত্রীর সাথে পৌত্র থাকলেও অংশ পাবে না।[৬০]

সহোদর বোনের অধিকার ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সহোদর বোন পাঁচ অবস্থায় অংশ পেয়ে থাকে। যথা–

প্রথম অবস্থা ঃ সহোদর বোন একজন হলে $^{১}/_{২}$ অংশ পাবে।[৬১]

যাদের অংশ কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। যেমন ঃ ছেলে, ছেলের ছেলে, সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই প্রমুখ। তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ়। কেননা তারা পিতার মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। মায়ের মাধ্যমে নয়। যেহেতু তার মাধ্যমে সম্পৃক্ত আত্মীয়তা ক্ষীণ ও দুর্বল, যেমন বৈপিত্রেয় ভাই। সে আত্মীয় হয়েছে মাতৃগর্ভের মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়ের মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি অন্য গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। আছাবার একটি সংক্ষিপ্ত পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণিত আছে। তা হলো ঃ 'প্রত্যেক এমন ব্যক্তি আসাবা সে একাবস্থায় সব সম্পদের ওয়ারিশ হয়। আর নির্ধারিত অংশের হকদারগণ তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের সবটাই লাভ করে থাকে।" এ সংজ্ঞাটি ফারায়েজ বিশারদদের নিকট সবিশেষ প্রসিদ্ধ। (মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী, **ইসলামী উত্তরাধিকার আইন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫০)।

৫৯. যেমন– কোন ব্যক্তি দুই কন্যা, পৌত্র ও পৌত্রী রেখে মারা গেলেন। এমতাবস্থায় ইসলামী আইনে প্রত্যেক কন্যা পাবে $^{৩}/_{৯}$ অংশ হারে, পৌত্র পাবে $^{২}/_{৯}$ অংশ এবং পৌত্রী পাবে $^{১}/_{৯}$ অংশ । কিন্তু ১৯৬১ সালের ৮ম সংশোধনীর ফলে এক্ষেত্রে বর্তমানে প্রত্যেক কন্যা পাবে $^{৩}/_{১২}$ অংশ হারে, পৌত্র পাবে $^{৪}/_{১২}$ অংশ এবং পৌত্রী পাবে $^{২}/_{১২}$ অংশ। (মাও. ফজলুর রহমান, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৫৪)।

৬০. যেমন–কোন ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র এবং পৌত্রী রেখে মারা গেলেন–এমতাবস্থায়, ইসলামী আইনে স্ত্রী পাবে $^{১}/_{৮}$ অংশ এবং পুত্র পাবে $^{৭}/_{৮}$ অংশ। পৌত্র এবং পৌত্রী বঞ্চিত হবে। কিন্তু ১৯৬১ সালের ৮ম সংশোধনীর ফলে এ ক্ষেত্রে বর্তমান স্ত্রী পাবে $^{৬}/_{৪৮}$ অংশ, পুত্র পাবে $^{২১}/_{৪৮}$ অংশ, পৌত্র পাবে $^{১৪}/_{৪৮}$ অংশ এবং পৌত্রী পাবে $^{৭}/_{৪৮}$ অংশ। ইসলামে উপরোক্ত আইন, বিশেষ করে পৌত্রীদের ৬ষ্ঠ অবস্থার প্রেক্ষাপটই ১৯৬১ সালের মুসিলম পারিবারিক আইনের ৮ম অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইসলামী আইনকে বাতিল করে পৌত্র এবং পৌত্রীদেরকে মৃত ব্যক্তির পুত্রের বর্তমানে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্বে প্রদান করা হয়। আল্লাহর তৈরি আইনকে উপেক্ষা করে ৮নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে পৌত্র ও পৌত্রী অর্থাৎ পুত্রের সন্তানদেরকে যদিও উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এর ফলে বহু জায়গায় তাদের অংশের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে এবং কোন কোন ওয়ারিশ গণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে আবার কাউকে আশিংকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। (**উত্তরাধিকার আইন,** পৃ ৫৫-৫৬)

৬১. তিনটি শর্তে সহোদরা বোন অর্ধেক সম্পদের হকদার হবে। শর্তগুলো হল ঃ (ক) তার সাথে কোন সহোদর ভাই আসাবা না হওয়া। (খ) শুধু একজন হওয়া। (গ) মৃতের উর্ধতন বা অধস্তন কোন ওয়ারিশ না থাকা। উর্ধ্বতন দ্বারা পুরুষ যেমন পিতা, দাদা এবং অধস্তন দ্বারা পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। এর দলিল আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণী– يَسْتَفْتُوْنَكَ ـ قل الله يُفتِيْكمْ فِى الكللة ـ أن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ "তারা তোমার নিকট ব্যবস্থা কামনা করছে। তুমি বল আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ সহোদর বোন দুই বা ততোধিক হলে, তারা সবাই মিলে পাবে ২/৩ অংশ এবং উক্ত অংশ প্রত্যেক সমান সমানভাবে ভাগ করে নিবে।[৬২]

তৃতীয় অবস্থা ঃ বোনের সাথে ভাই থাকলে বোন আসাবা হয়ে যাবে। এ অবস্থায় বোনের দ্বিগুণ পাবে ভাই।

চতুর্থ অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রীগণ বর্তমান থাকলে বোন আসাবা হবে। অর্থাৎ কন্যা বা পৌত্রীগণের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বোন পাবে।[৬৩]

পঞ্চম অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্র বা তদনিম্নের কেউ অথবা পিতা জীবিত থাকলে ইসলামী আইন বিদগণের সর্বসম্মত মতে বোন ওয়ারিশ হবে না।[৬৪]

বৈমাত্রেয়া বোনের অধিকার

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাবার ব্যাপারে বৈমাত্রেয়া[৬৫] বোনের ৭ অবস্থা।

এবং তার একজন মাত্র বোন থাকে তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধাংশ লাভ করবে।" (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নিসা, আয়াত ঃ ১৭৭; **উত্তরাধিকার আইন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭)।

৬২. দুই বা ততোধিক সহোদরা বোন নিম্ন বর্ণিত শর্তে দুই-তৃতীয়াংশের ওয়ারিশ হবে। (ক) ছেলে, মেয়ে, পিতা, দাদা না থাকা (অর্থাৎ পূর্বগণ উত্তরসূরী কেউ না থাকা)। (খ) আসাবা ভাই (সহোদর) না থাকা। (গ) মেয়ে বা ছেলের মেয়ে না থাকা (এক বা একাধিক) এর দলিল আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণী– فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ "যদি দুইজন বোন থাকে তবে তাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ।" (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ ১৭৬; **উত্তরাধিকার আইন,** পৃ ৪১।

৬৩. সহোদরা বা বৈমাত্রেয় বোন মেয়ে বা ছেলের মেয়ে ও তৎনিম্নবর্তীদের সাথে আসাবা হয়, এ অবস্থায় তাদেরকে আসাবা মা'আল গায়ের বলে। এ শ্রেণীর আসাবা মেয়ের সাথে বোনদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। ফারায়েজ বিশারদগণের উক্তি– اجْعَلُوْا الا خَوَاتَ مَعَ النبَاتِ عُصْبَـةً "মেয়েদের সাথে বোনদেরকে আসাবা বানাও।" এর তাৎপর্য এটিই। ফারায়েজ বিশারদগণের উক্ত হাদীস নয়। এ বিষয়ে আল্লামা আল বাজুরী এটি স্বীয় গ্রন্থ "শান-শূরীতে সাবধান করেছেন। রাহবিয়া কবিতায় বলা হয়েছে বোনগণ মেয়েদের সাথে আসাবা হয়। মেয়েদের সাথে বোন আসাবা হবার ফলে মেয়েদের অংশ সঙ্কুচিত না হয়ে বোনদের অংশ সঙ্কুচিত হয়। বোনদের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত হলে মাস'আলায় আওল হবে এবং মেয়েদের অংশ সংকুচিত হবে। বোনদেরকে বঞ্চিত করা অসম্ভব তাই তাদেরকে আসাবা করাতে বিশেষভাবে তাদের অংশ সংকুচিত করা হয়েছে। (**উত্তরাধিকার আইন,** পৃ ৫৭-৫৮)।

৬৪. ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে দাদার বর্তমানে ও বোন ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) এবং ইমাম মোহাম্মদের (র) মতে দাদার বর্তমানে বোনগণ ওয়ারিশ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অবস্থা ঃ বৈমাত্রেয় বোন মাত্র একজন হলে পাবে $^1/_2$ অংশ।[৬৬]

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ বৈমাত্রেয় বোন দুই বা ততোধিক হলে এবং মৃত ব্যক্তির কোন সহোদর বোন না থাকলে, বৈমাত্রেয়া বোনগণ সবাই মিলে $^2/_3$ অংশ পাবে এবং প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ সমান হবে।[৬৭]

তৃতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির একজন সহোদর বোন থাকলে এবং সেই সাথে বৈমাত্রেয়া বোন এক বা ততোধিক থাকলে, বৈমাত্রেয় বোনগণ পাবে $^1/_6$ অংশ।[৬৮]

চতুর্থ অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক সহোদর বোন থাকলে, বৈমাত্রেয় বোনগণ কোন অংশ পাবে না। কারণ সহোদর বোন আত্মীয়তার দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী।[৬৯]

পঞ্চম অবস্থা ঃ দুই বা ততোধিক সহোদর বোনের বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোনের সংগে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে, তাহলে সে বোনদেরকে আসাবা করে দিবে।[৭০] অর্থাৎ সহোদর বোনগণ

---

৬৫. মা একাধিক কিন্তু পিতা একজন হলে অর্থাৎ পিতার অন্য স্ত্রী গর্ভের কন্যা সন্তানকে বৈমাত্রেয়া বোন বলা হয়।

৬৬. বৈমাত্রেয় বোন চারটি শর্তে অর্ধেকসম্পদ লাভ করবে। শর্তগুলো হল ঃ (ক) তর সাথে বৈমাত্রীয় ভাই আসাবা না হওয়া। (খ) শুধু একজন হওয়া। (গ) মৃতের উর্ধতন ও অধঃস্তন কোন ওয়ারিশ না থাকা। (ঘ) সহোদরা বোন না থাকা। সর্বসম্মত মতে ঃ সহোদরা বোনের উত্তরাধিকারিত্বের দলিলই এ ক্ষেত্রে দলিল। আল্লাহর বাণী ঃ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ "তার যদি বোন থাকে তবে সে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধাংশ পাবে" (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১৭৬; **উত্তরাধিকারী আইন,** পৃ ৩৭-৩৮।

৬৭. দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন থাকলে তারা নিম্নবর্ণিত শর্তে দুই তৃতীয়াংশের ওয়ারিশ হবে। (ক) ছেলে, পিতা বা দাদা (উর্ধতন বা অধস্তন) না থাকা। (খ) বৈমাত্রেয় আসাবা ভাই না থাকা। (গ) মেয়ে, ছেলের মেয়ে বা সহোদর ভাই-বোন না থাকা। যে সব শর্ত সহোদর বোনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। তাদের ওয়ারিশ হবার দলিল হলো ইজমা। কারণ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত বোনদের অর্থ সহোদরা ও বৈমাত্রেয় বোন উভয়ই। বৈপিত্রেয় বোন এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (**ইসলামে উত্তরাধিকার আইন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪১)।

৬৮. মৃতের বৈমাত্রেয় বোন (এক বা একাধিক) সহোদরা বোনের সাথে এক-ষষ্ঠাংশ লাভ করবে। এটি মেয়ের সাথে ছেলের মেয়ে থাকলে সেই অবস্থার সাথে তুলনীয়। মৃতের একজন সহোদরা বোনের সাথে এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন থাকলে বৈমাত্রেয় (এক বা একাধিক বোন দুই-তৃতীয়াংশের পরিপূরক হিসেবে এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবে। কারণ এ ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ বোনদের হক। তাই যখন আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধনের কারণে সহোদরা অর্ধেক লাভ করল তখন দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হতে আর এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকবে এই অবশিষ্ট অংশটুকু বৈমাত্রেয় বোন বা বোনেরা লাভ করবে। (**ইসলামে উত্তরাধিকার আইন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮)।

৬৯. যেমন কেউ দুইজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয় বোন এবং চাচা রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায় প্রত্যেক সহোদর বোন পাবে $^1/_3$ অংশ হারে চাচা পাবে $^1/_3$ অংশ বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের $^{2}/_{3}$ অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা বৈমাত্রেয় ভাই বোনগণ পাবে এবং বোনের দ্বিগুণ হিসেবে ভাই পাবে।

ষষ্ঠ অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রী বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয় বোনগণ আসাবা হবে।[৭১] অর্থাৎ কন্যা বা পৌত্রীগণ তাদের অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বৈমাত্রেয় বোনগণ পাবে।

সপ্তম অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র বা তাদের অধঃস্তন, পিতা এবং দাদা জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয় বোনগণ কোন অংশ পাবে না। এ বিধান শুধুমাত্র বৈমাত্রেয় বোনের ক্ষেত্রেই নয় বরং সহোদর বোনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এছাড়া সহোদর বোন যখন কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে আসাবা হয়, তখনও বৈমাত্রেয় বোনগণ কোন অংশ পাবে না। কারণ তারা আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী।

বৈপিত্রেয় বোনের[৭২] অধিকার

বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ন্যায় বোনের তিন অবস্থা ঃ যথা–

প্রথম অবস্থা ঃ বৈপিত্রেয়া বোন যদি মাত্র একজন হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির $^{1}/_{6}$ অংশ পাবে।[৭৩]

---

৭০. ওয়ারিশদের চারজন মাত্র আসাবা বিগাইরিহি হতে পারে। আর তারাসবাই মহিলা। তারা হল ঃ (ক) আপন মেয়ে তার ভাইয়ের সাথে আসাবা হতে পারে, অর্থাৎ ছেলে। (খ) ছেলের মেয়ে সে তার ভাই বা চাচার ছেলের (মৃতের ছেলের ছেলে) সাথে আসাবা হয় তার সমশ্রেণী বা তৎনিম্নবর্তীদের সাথে। যদি অন্য কেউ ওয়ারিশ না হয়। (গ) সহোদর বোন আপন ভাইয়ের (সহোদর ভাই) সাথে আসাবা হয়। (ঘ) বৈমাত্রেয় বোন স্বীয় ভাইয়ের (বৈমাত্রেয় ভাই) সাথে আসাবা হয়। এ চারশ্রেণীর সবাই তাদর ভাইয়ের সাথে আসাবা হয় পরিত্যক্ত সম্পদ পুরুষ মেয়েদের দ্বিগুণ লাভ করবে নীতির ভিত্তিতে পাবে। (**ইসলামে উত্তরাধিকার আইনে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬)।

৭১. সহোদরা বা বৈমাত্রেয় বোন মেয়ে বা ছেলের মেয়ে ও তৎনিম্নবর্তীদের সাথে আসাবা হয়। এ অবস্থায় তাদেরকে আসাবা মাআল গায়ের বলে। আসাবা মা'আল গায়েরের ওয়ারিশ হওয়ার দলীল, ইমাম বুখারী (রহ) ও অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেছেন যে, "আবু মূসা আশআরীকে রাযী আল্লাহু 'আনহু বললেন, মেয়ের জন্য অর্ধেক এবং বোনের জন্য অর্ধেক। এরপর তিনি প্রশ্ন কর্তাকে বললেন, ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর নিকট যাও। তিনি আমার সাথে একমত হবেন। অতঃপর ইবনে মাসউদ রাযী আল্লাহু 'আনহু–কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি রাসূলের মত করে ফয়সালা করব। মেয়ের জন্য অর্ধেক এবং দুই তৃতীয়াংশের পরিপূরক হিসেবে ছেলের মেয়ের জন্য এক ষষ্ঠাংশ এবং অবশিষ্টাংশ বোনের। অতঃপর আমরা আবু মুসার রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর নিকট গিয়ে তাকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, এ জ্ঞানী লোকটি তোমাদের মধ্যে থাকাবস্থায় আমাকে জিজ্ঞেস করো না।" (বুখারী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যাদের বর্তমানে আপন বোনকে তাদের অবশিষ্টাংশ দিয়েছেন বলে সে আসাবা মা'ল গায়ের হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। (**ইসলামে উত্তরাধিকার আইনে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬)।

৭২. পিতা দুইজন কিন্তু মাতা একজন হলে অর্থাৎ মাতার অন্য স্বামীর কন্যা সন্তানকে বৈপিত্রেয় বোন বলে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ বৈপিত্রেয় বোন দুই বা ততোধিক হলে কিংবা বৈপিত্রেয় বোনের সাথে বৈপিত্রেয় ভাই থাকলে সবাই মিলে $^1/_3$ অংশ পাবে[৭৪] এবং উক্ত অংশ ভাই বোন সকলেই নিজেদের মধ্যে সমান সমানভাবে ভাগ করে নিবে। বৈপিত্রেয় ভাই বোনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলের অংশই সমান।

তৃতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী এবং তদনিম্নের কেউ জীবিত থাকলে কিংবা পিতা বা দাদা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয় বোন কোন অংশ পাবে না।

মাতার অধিকার

মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার ব্যাপারে মাতার তিন অবস্থা। যথা –

প্রথম অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তি যদি কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান বা তদনিম্নের কেউ জীবিত থাকবে অবথা যে কোন প্রকারের (সহোদর, বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রেয়) দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকে, তাহলে মাতা $^1/_6$ অংশ পাবে।[৭৫]

---

৭৩. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أو امْرَأَةٌ وَّلَهُ أخٌ أَوْ أخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "যদি কোন পিতা ও পুত্র কন্যাহীন ব্যক্তি মাত্র এক ভাই বা এক বোন রেখে মারা যায়, তাহলে তাদের প্রত্যেকে তার সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ লাভ করবে।" (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১২) ভাই দ্বারা এ ক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাই বোনকে বুঝানো হয়েছে। সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে বুঝানো হয়নি।"

৭৪. বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন (দুই বা ততোধিক) নিম্নবর্ণিত শর্তে এক-তৃতীয়াংশের ওয়ারিশ হবে। (ক) উর্ধতন বা অধস্তন কেউ না থাকা। (খ) তাদের সংখ্যা দুই বা ততোধিক হওয়া, পুরুষ কিংবা মহিলা অথবা নারী পুরুষ উভয়ই। আল্লাহ বলেন– وَانْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً او امْرَاةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ـ فَاِنْ كَانُوْا أكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ـ "মা বাপ ও পুত্র কন্যাহীন কোন পুরুষ বা নারী যদি মারা যায় আর তার এক ভাই ও একবোন থাকে তাহলে তারা প্রত্যেকে (পরিত্যক্ত সম্পদের) এক ষষ্ঠাংশ পাবে। তবে তাদের সংখ্যা এর (দুইয়ের) অধিক হলে সবাই মিলে এক তৃতীয়াংশের হকদার হবে। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াতঃ ১২)

৭৫. মা দুইটি শর্তে এক-ষষ্ঠাংশের ওয়ারিশ্ হবে। (ক) মৃতের সন্তান বা ছেলের সন্তান থাকলে। যেমন আল্লাহর বাণী ঃ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ـ "তার পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য (সম্পদের) এক ষষ্ঠাংশ।" (খ) মৃতের দুই বা ততোধিক ভাই-বোন সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় যাই হোক না কেন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র; কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী বা তদনিম্নের কেউই না থাকে কিংবা তিন প্রকার ভাইবোনের মধ্য হতে কমপক্ষে দুইজন না থাকে, তাহলে মাতা ১/৩ অংশ পাবেন।[৭৬]

তৃতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী বা তদনিম্নের কেউ যদি না থাকে কিংবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বোনও না থাকে, কিন্তু পিতামাতা জীবিত থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর এবং মৃত ব্যক্তি নারী হলে স্বামীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবেন মাতা।[৭৭]

দাদীর অবস্থা ঃ দাদীর দুই অবস্থা। যথা–

প্রথম অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা মাতা যদি বর্তমান না থাকে, তাহলে দাদী ১/৬ অংশ পাবেন।[৭৮]

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির পিতা বা মাতা কেউ জীবিত থাকলে দাদী কোন অংশ পাবে না।

ইসলাম ও হিন্দু আইনে নারীর তুলনা

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর যে অধিকার দেয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে হিন্দু আইনে নারীর যে করুণ অবস্থা, তা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু তুলনামূলক আলোচনা করা হল ঃ

জীবিত থাকলে। মহান আল্লাহ বলেন– فَإِنْ كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَلَهُمَا السُّدُسُ " যদি তার ভাই থাকে তবে তার মা এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবে।" (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১১)

৭৬. দুইটি শর্তে মা এক-তৃতীয়াংশের ওয়ারিশ। (ক) মৃতের সন্তান বা ছেলের সন্তান না থাকা। (খ) মৃতের দুই বা ততোধিক ভাই-বোন না থাকা। এ সব ভাই বোন সহোদর, বা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয়, পুরুষ কিংবা মহিলা এবং ওয়ারিশ বা মাহযুব যাই হোক না কেন। দলীল আল্লাহর বাণী– فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُثُ "যদি তার কোন সন্তান না থাকে, এবং পিতা মাতাই ওয়ারিশ হয় তবে মায়ের জন্য হক এক তৃতীয়াংশ।" (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১১)।

৭৭. মৃত ব্যক্তির পিতার স্থলে যদি দাদা জীবিত থাকেন তাহলে ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতে মাতা সকল সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবেন। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এ অবস্থায়ও মাতা অবশিষ্ট সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবেন।

৭৮. মায়ের অবর্তমানে এক বা একাধিক আপন দাদী এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবে। সুন্নাহ ও সাহাবাদের ইজমার ভিত্তিতে দাদীর হক এক ষষ্ঠাংশ প্রমাণিত। এ দলিলই যথেষ্ট যে, সুনান রচয়িতাগণ রেওয়ায়াত করেছেন যে, দাদী হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর কাছে তার অংশ দাবি করলে তিনি তাঁকে বললেন ঃ আল্লাহর কিতাবে তোমার জন্য কিছুই নির্ধারিত নেই। তুমি ফিরে যাও। আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখি। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলে হযরত মুগীরা ইবন শু'বা বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করেছেন। আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু এ বিধানই জারি করলেন। (আল হাদীস) (**ইসলামে উত্তরাধিকার আইন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮)।

Dhaka University Institutional Repository

১. **ইসলামী আইন** ঃ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তান সর্বাবস্থায় মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিশ থাকুক বা না থাকুক, কন্যা তার অংশ পাবেই।

হিন্দু আইন ঃ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তান সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারিণী হতে পারে না। মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয় আইনেই মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী, পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পৌত্রের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। উপরোক্ত ৬জনের কেউ জীবিত না থাকলে কন্যা উত্তরাধিকারিণী হবে।

২ **ইসলামী আইন** ঃ মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা পুত্র জীবিত থাকলেও কন্যা উত্তরাধিকারিণী হয়ে থাকে। পিতা জীবিত থাকলে কন্যা প্রায় দুই ভাগের এক অংশ আর পুত্র জীবিত থাকলে কন্যা পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি পেয়ে থাকে।

হিন্দু আইন ঃ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান কোন অংশ পাবে না।

৩. **ইসলামী আইন** ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হবার জন্য মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনা শর্ত নয়। অর্থাৎ কোন উত্তরাধিকারী যদি মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক শান্তির জন্য দোয়া নাও করে তথাপি ওয়ারিশী স্বত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না। তবে মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাতের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করা ওয়্যারিশগণের কর্তব্য।

হিন্দু আইন ঃ দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকারী হবার জন্য পিণ্ডদান করা শর্ত। যারা শাস্ত্র অনুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার পার্বণ শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করবে এবং পিণ্ডদানের অধিকারী তারাই সপিণ্ড। সপিণ্ডই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী।

৪. **ইসলামী আইন** ঃ মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা যে অংশ পেয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ত্বে লাভ করে। অর্থাৎ কন্যা তার প্রাপ্য অংশ স্বীয় ইচ্ছামত ব্যবহার, দান ও বিক্রয় করতে পারবে। তার এ অধিকারের উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কন্যার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি তার অর্থাৎ কন্যার উত্তরাধিকারী পাবে।

হিন্দু আইন ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা যে অংশ পায় তা কেবলমাত্র জীবন স্বত্ত্বে লাভ করে। কন্যার প্রাপ্য অংশের উপর তার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ কন্যা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন কেবলমাত্র ভোগ দখল করবে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য অংশ কন্যা স্বীয় ইচ্ছামত ব্যবহার, দান, বিক্রয়, উইল কিংবা সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। কন্যার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি কন্যার কোন উত্তরাধিকারীও পাবে না, বরং যার নিকট থেকে সম্পত্তি পেয়েছিল তার নিকটাত্মীয়দের নিকট সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।

৫. **ইসলামী আইন** ঃ কন্যা যদি চরিত্রাহীনা এবং অসতীও হয়, তথাপি কন্যা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে অসতীর কারণে কেউ তাকে তার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত করতে পারবে না। অবশ্য চরিত্রহীনা এবং অসতীর কারণে সে গুণাহগার হবে। কিন্তু উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু আইন ঃ দায়ভাগ আইনে অসতীত্বের কারণে কন্যা সন্তান মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীত্ব হতে বঞ্চিত হবে।

৬. ইসলামী আইন ঃ সকল কন্যার সমান অধিকার। কন্যা সন্তান অবিবাহিতা হোক কিংবা বিবাহিতা, পুত্র সন্তানের মা হোক কিংবা কন্যা সন্তানের মা হোক, অথবা বন্ধ্যা হোক ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সকল কন্যারই সমান অধিকার। অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যাই মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সমান হারে অংশ পাবে।

হিন্দু আইন ঃ হিন্দু আইনে সকল কন্যার সমান অধিকার নেই। বন্ধ্যা কিংবা যে কন্যা কেবলমাত্র কন্যা সন্তানের মা হয়েছে, সে মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবে না। হিন্দু আইনে কুমারী কন্যার দাবি অগ্রগণ্য। অতঃপর পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভবা কন্যাদের দাবি। কুমারী কন্যা জীবিত থাকলে বিবাহিতা কন্যারা বঞ্চিত হবে। যে কন্যা কেবলমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে বা বন্ধ্যা সেও বঞ্চিত হবে।

৭. ইসলামী আইন ঃ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জীবিত থাকলেও কন্যা তার নির্ধারিত অংশ পাবে। যেহেতু কন্যা যাবিল ফরুজ, সেহেতু সকল অবস্থায়ই কন্যা উত্তরাধিকারিণী হবে। কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইন ঃ মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কন্যার তার মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না।

৮. ইসলামী আইন ঃ কন্যা যদি অন্ধ, বোবা, বধির কিংবা দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তথাপি সে উত্তরাধিকারীত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না। তার নির্ধারিত অংশ সে পাবেই।

হিন্দু আইন ঃ কন্যা অন্ধ, বোবা, বধির কিংবা দূরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত হলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

৯. ইসলামী আইন ঃ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সহোদর বোন, বৈপিত্রেয়া বোন, বৈমাত্রেয়া বোন সকলেই উত্তরাধিকারিণী। তারা যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ বোনদের জন্য অংশ নির্ধারিত আছে।

হিন্দু আইন ঃ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কোন প্রকার বোনই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিণী নয়। অর্থাৎ বোনগণ বঞ্চিত হবে।

১০. ইসলামী আইন ঃ নারী হিসেবে পৌত্রীও উত্তরাধিকারিণী। যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভূক্ত করে তাদের জন্যও অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

হিন্দু আইন ঃ পৌত্রীগণ উত্তরাধিকারিণী নয়।

১১. ইসলামী আইন ঃ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সকল অবস্থায়ই স্ত্রী মৃত ব্যীক্তর অর্থাৎ স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে। মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিশ জীবিত থাকুক বা না-ই থাকুক, কোন অবস্থাতেই স্ত্রী বঞ্চিত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু আইন ঃ পূর্বে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র জীবিত থাকলে বিধবাগণ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারত না।

১৯৩৭ সালে বিধবা স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত আইন পাশ হবার পর বর্তমানে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের সাথে বিধবা উত্তরাধিকারিণী হতে পারে।

১২. ইসলামী আইন ঃ স্ত্রী যদি অসতী হয়, তথাপি স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে। অবশ্য স্ত্রী অসতী হলে গুনাহগার হবে এবং এর শাস্তির বিধানও ইসলাম দিয়েছে। কিন্তু স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হওয়া থেকে কোন অবস্থায়ই বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইন ঃ স্ত্রী অসতী হলে মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হতে বঞ্চিত হবে।

১৩. ইসলামী আইন ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ইচ্ছে করলে দ্বিতীয় বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ইসলাম নারীকে সে স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে। দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার কারণে স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হবে না। তার প্রাপ্য সে পাবেই।

হিন্দু আইন ঃ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে, তাহলে সে পূর্ব মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে এবং ধরে নেয়া হবে যে, সেই হিন্দু মহিলা তার মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসেবে আর বেঁচে নেই বরং তার মৃত্যু হয়েছে। (1923) 50 Cal 527।

১৪. ইসলামী আইন ঃ মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রী যে অংশ পায়, তা সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ত্বে লাভ করে। অর্থাৎ এ সম্পত্তি স্ত্রী স্বীয় ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে দান, উইল এবং বিক্রয় করতে পারবে। এতে কারোর বাধা দেবার অধিকার নেই।

হিন্দু আইন ঃ মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রী যে অংশটুকু পায়, তা কেবলমাত্র জীবন স্বত্ত্বে লাভ করে। এ সম্পত্তির উপর বিধবা স্ত্রীর পরিপূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তিনি কেবলমাত্র ভোগ দখলকারিণী। তিনি এ সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবেন না। অর্থাৎ এ সম্পত্তি তিনি স্বীয় ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে দান, উইল ও বিক্রয় করতে পারবেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি স্ত্রীর উত্তরাধিকারীগণ পাবে না বরং যার নিকট থেকে সম্পত্তি লাভ করেছিল তার নিকটবর্তী আত্মীয়দের নিকট সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৫. ইসলামী আইন ঃ মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ মৃত সন্তানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে মাতা সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারিণী হবে। যাবিল ফুরুজ হিসেবে মাতার অংশ নির্ধারিত আছে। কোন অবস্থাতেই মাতা বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইন ঃ হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা, কন্যা এবং পিতা জীবিত থাকলে মাতা কোন অংশ পায় না। এছাড়া মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্র সন্তান জীবিত থাকলেও মাতা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

১৬. ইসলামী আইন ঃ মাতা যদি অসতী হয়, তাহলে মাতা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু আইন ঃ দায়ভাগ আইনে মাতা যদি অসতী হয়, তাহলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

১৭. ইসলামী আইন ঃ মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে মাতা যে অংশ পায়, তার উপর মাতার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ মাতা তার প্রাপ্য সম্পত্তি স্বীয় ইচ্ছামত ব্যয় দান, উইল এবং বিক্রয় করতে পারবে। মাতার মৃত্যুর পর তার এ সম্পত্তি মাতার উত্তরাধিকারিগণ পাবে।

হিন্দু আইন ঃ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মাতা মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে যে অংশ পায় তার উপর মাতার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মাতা এ সম্পত্তি কেবলমাত্র জীবন স্বত্বে ভোগ দখল পায় অর্থাৎ মাতা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন মাতা এ সম্পত্তি কেবলমাত্র ভোগ করতে পারবে। এ সম্পত্তির কোন ক্ষতি অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছামত ব্যয়, বিক্রি, দান বা উইল করতে পারবে না। মাতার মৃত্যুর পর মাতা যার নিকট থেকে সম্পত্তি পেয়েছিল তার নিকটাত্মীয়দের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৮. ইসলামী আইন ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মৃতের কন্যা এবং মাতা একই সাথে উত্তরাধিকারিণী হয়। কন্যা তার নির্ধারিত অংশ পাবে এবং মাতা তার নির্ধারিত অংশ পাবে। একজনের কারণে অন্যজন বঞ্চিত হবে না। ইসলাম নারী হিসেবে মা ও কন্যা উভয়েরই অধিকার নিশ্চিত করেছে।

হিন্দু আইন ঃ হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির কন্যা জীবিত থাকলে মাতা উত্তরাধিকারিণী হতে পারে না। কারণ কন্যা হল ৭নং ক্রমিকে আর মাতা হল ১০ নং ক্রমিকে। হিন্দু আইনে মাতার চেয়ে কন্যাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

১৯. ইসলামী আইন ঃ পরিবারে কোন ব্যক্তির পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই উত্তরাধিকারী হতে পারে না, বরং পিতার মৃত্যুর পর মৃত পিতার পুত্র, কন্যা এবং অন্যান্য ওয়ারিশগণ একই সাথে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। পিতার জীবিতাবস্থায় পুত্র কোন উত্তরাধিকার দাবি করতে পারবে না।

হিন্দু আইন ঃ মিতাক্ষরা আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। ফলে পিতার জীবিতাবস্থায়ই পুত্র তার অংশ দাবি করতে পারে কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই উত্তরাধিকারিণী হতে পারে না।

২০. ইসলামী আইন ঃ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে ১২ জন যাবিল ফুরুজের মধ্যে ৮ জনই হল নারী। যথা– স্ত্রী, কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন, বৈপিত্রেয়া বোন, বৌমত্রেয়া বোন, মাতা ও দাদী। আর পুরুষ হল মাত্র ৪ জন। এদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকবে। এতে দেখা যাচ্ছে, নারীর সংখ্যাই পুরুষের তুলনায় বেশি। অর্থাৎ নারীর অীধকারকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

হিন্দু আইন ঃ মিতাক্ষরা আইনে ৫৭ জন স্বপিণ্ডের মধ্যে মাত্র ৫ জন হল নারী, আর বাকী ৫২ জনই হল পুরুষ। দায়ভাগ আইনে ৫৩ জন সপিণ্ডের মধ্যে মাত্র ৫জন হল নারী। যথা–

Dhaka University Institutional Repository

বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী। আর বাকি ৪৮ জনই হল পুরুষ। উপরন্তু ৫জন নারীকে সপিণ্ডের এমন অবস্থানেই রাখা হয়েছে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ করা তাদের জন্য দুর্লভ ব্যাপার।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম কোন অবস্থাতেই নারী জাতিকে অবহেলা করেনি কিংবা অংশ প্রাপ্যের দিক দিয়েও ঠকায়নি। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীকে যেখানে অবহেলা করেছে এবং করুণ অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে, সেখানে ইসলাম নারী জাতিকে শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করেছে।

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ঃ

মোহর

নারীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার হল মোহর। বিয়ের সাথে সর্বপ্রথম যে সব বস্তু সম্পর্কিত, তা হচ্ছে 'মোহর'।[৭৯] নারী আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কৌশলের বিস্ময়কর নিদর্শন এবং তাকে ছাড়া তার বিরাট সৃষ্টি কারখানা অচল হয়ে পড়ে। অপরদিকে সে না হলে পুরুষের জীবন হয় নিতান্ত নীরস ও একেবারে আনন্দহীন। নারী-পুরুষের মিলনেই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি কারখানা চালু থাকে। নারী তার দেহ ও মান-সম্ভ্রম পুরুষের নিকট অকাতরে সমর্পণ করে। এই আত্মদান ও প্রেম-প্রীতির সম্যক আর্থিক বিনিময় ও প্রতিদান সম্ভব নহে। তবে নারীর মর্যাদার খাতিরে যথাসাধ্য এর প্রতিদান দেয়া পুরুষের অবশ্য কর্তব্য। সদাচার এবং সৌজন্য ইহাই দাবি করে স্ত্রীর জন্য স্বামীর এ দানকেই ইসলামের পরিভাষায় 'মোহর' বলে।[৮০]

পবিত্র কুর'আনে نِحْلَةً শব্দ ব্যবহার করে এর মূল তত্ত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছে, এটা স্বামীর পক্ষ থেকে বিনিময় বিহীন দান। এটা নারীর মূল্য নয় যে, তার পিতা জাহিলিয়া যুগের ন্যায় উসূল করে নেবে। অভিভাবক এ মূল্য কোন কিছুর মাধ্যমে বা মাধ্যম ছাড়া কোন অবস্থাতেই নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারবে না।[৮১]

আল কুর'আনে অর্থের বিনিময়ে নারীদেরকে বিবাহ করা বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং মোহর দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহপাক বলেন ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

---

৭৯. যে টাকা বা বস্তু বিবাহিতা নারীকে কোন বিনিময় ব্যতীত স্বামীর পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করা হয় উহাই 'মোহর'। 'মোহর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ـ " আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও।' (আল কুর'আন, সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ৪)। (মালিক রাম, **নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা,** অনুবাদ ঃ মাহমূদা বেগম নেকু, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪)।

৮০. **নারী,** আবদুল খালেক, **প্রাগুক্ত,** পৃ ২০১।

৮১. মালিক রাম, **নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

হুজুর (সা) এক সাহাবীর সাথে এক নারীকে এই শর্তে বিয়ে দিয়েছিলেন যে, পবিত্র কুর'আনের যে আয়াতগুলো তার মুখস্থ আছে তা সে উক্ত নারীকে শিক্ষা দেবে। এ শিক্ষাদান মোহরের বিকল্প বলে গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬]

মোহর স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ। এর মালিকানা স্বত্ব একমাত্র তারই। এটা মাফ করে দেয়া বা আংশিক মাফ করার অধিকার তার ছাড়া আর কারো নেই। মোহর আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীর সাথে সহবাস, তার আদেশ পালন ও তার সাথে এক গৃহে অবস্থান করতে অস্বীকার করার অধিকার তার আছে। মোহর পরিশোধের পূর্বে স্বামী মরে গেলে স্ত্রী মোহর আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার মৃত স্বামীর সম্পত্তি দখল করে রাখতে পারে।[৮৭]

মোহর স্ত্রীর প্রাপ্য এবং স্বামী তার উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের সময়ই ইহা আদায় করে দেয়া উচিত। কিন্তু স্বামী অক্ষম হলে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রী স্বামীকে অবকাশ দিতে পাবে। আল্লাহ বলেন–

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ـ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا

"আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। পরে তারা খুশিমনে এর কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা সানন্দে ভোগ করতে পার।[৮৮]

উপরোক্ত আলোচনা হতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, মোহর অবশ্যই দিতে হবে। কারণ এর বিনিময়েই ইসলামী শরী'আত স্ত্রীকে স্বামীরজন্য হালাল করে দিয়াছে এটি স্ত্রীর একটি অন্যতম অর্থনৈতিক অধিকার।

মোহরের পরিমাণ

মোহর স্ত্রীকে হালাল কারার অপরিহার্য বিনিময় এবং এটি পরিশোধ করা স্বামীর উপর ফরয। কিন্তু শরী'আত এর কোন পরিমাণ নির্ধারিত করে দেয় নাই। উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে এই পরিমাণ মোহর নির্ধারিত করতে হবে যা আদায় করা স্বামীর জন্য কষ্টকর না হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন–

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيضَةً ـ وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْاسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه ـ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ـ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

---

৮৬. **সহীহ আল বুখারী,** ৫ম খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং- ৪৭৬৯; মালিক রাম, **নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫।

৮৭. **তানযীলুর রহমান, মাজমুআহ কাওয়ানীনে ইসলাম,** ১ম খণ্ড, পৃ ৪৮; Asif Fyzee, **out lines of Muhammadan Law,** 2nd Edition, Oxford, 1995; Sir Ronald K. Wilsow, **Anglo Muhammadan Law,** 4thed. London, 1912, P- 167-168.

৮৮. **আল কুর'আন,** সূরা নিসা ঃ আয়াত নং ৪; তবে মোহর মাফ করিয়ে নেয়া বা কম করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিয়ের রাত্রে নববধূর আবেগকে কাজে লাগিয়ে কৌশলের আশ্রয় নেয়া যাবে না। অথবা জোর করা যাবে না। কেননা এটা বিয়ে হালাল হওয়ার অন্যতম শর্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা উপভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর দিবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর সম্মত হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।[৮২]

'মোহর' আদায় করা প্রসংগে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحَقُّ مَا اُوْفِيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَا اَسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفَرْجُ -

"উকবা রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সব শর্তের মধ্যে যে শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য তা হল– যে শর্ত দ্বারা তোমরা (নারীদের) বিশেষ অংগ উপভোগ করা হালাল করে থাক।[৮৩]

স্বামী স্ত্রীকে মোহর প্রদান করবে। কেননা স্বামী হিসাবে স্ত্রীর ওপর তার যে অধিকার সৃষ্টি হয়েছে তা মোহরের বিনিময়েই। সুতরাং বিয়ের সময় নারী ও পুরুষের মধ্যে মোহরের যে চুক্তি হয়ে থাকে তা পূর্ণ করা পুরুষের জন্য অপরিহার্য। সে যদি চুক্তি মোতাবেক মোহর আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী তার থেকে নিজেকে আলাদা রাখার অধিকার রাখে।[৮৪]

কেউ যদি স্ত্রীর মোহর আদায় করবে না বলে নিয়্যত করে, তবে তাকে হাদীসে যিনাকারী (ব্যভিচারী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِصَدَاقٍ وَنَوى اِنْ لاَ نُوَدِّيَهُ فَهُوْزَانٍ -

"যে ব্যক্তি কোন নারীকে মোহর দানের শর্তে বিবাহ করিয়াছে অথচ মোহর আদায়ের নিয়্যত তাহার নেই। তবে সে যিনাকার (ব্যাভিচারী)।[৮৫]

মোহর 'নগদ' আদায় করার বাধ্য-বাধকতা নেই। তবে শরীয়ত প্রবর্তক মোহরের আবশ্যকতা সর্ম্পকে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। এর দ্বারাই একজন পুরুষ নারীর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। পুরুষ বিত্তহীন হলে সে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করে কিংবা মোহর স্বল্প পরিমাণ ধার্য করে হলেও তা পরিশোধ করতে হবে। যেমন দাসী আযাদ করে সে বিয়ে করতে পারে। এমতাবস্থায় দাসী আযাদ করা মোহরের বিনিময় হবে।

---

৮২. **আল-কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ২৪। এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয়, মোহরের বিনিময়েই স্ত্রীর ওপর পুরুষের স্ত্রীত্বের অধিকার লাভ হয়ে থাকে এবং মোহর পরিশোধ করা স্বামীর উপর ফরয।

৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, অনুবাদ ঃ অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য, **সহীহ আল বুখারী** (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯ ইং, ১৪২০ হিঃ) ৫ম খণ্ড, পৃ ৬৫।

৮৪. আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার** (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী ৪র্থ সংস্করণ, জুলাই– ১৯৯৬, সফর–১৪১৭, ঢাকা, পৃ ৩০-৩১)।

৮৫. আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

"যদি তোমরা সহবাস বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না। কিন্তু তাদেরকে যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিবে; সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সমস্যানুযায়ী নিয়মিত খরচ পত্র দানের ব্যবস্থা করবে। এটি সত্য পরায়ণ লোকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"[৮৯]

স্বামী সম্পদশালী হলে স্ত্রীর দাবি অনুসারে বেশি পরিমাণে মোহর দেয়াকে কোন দোষ নেই।[৯০]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ـ

" আর তোমরা যদি এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক। তবে তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে থাকলে ও তার নিকট হতে কিছুই ফিরিয়ে নিবে না।"[৯১]

মোহরের পরিমাণ স্বীমার অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এক নিঃসম্বল সাহাবী (রা) এক নারীকে বিবাহ করতে চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ قَالَ اَذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُوْرَةٌ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ انكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

" তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাও এবং খুঁজে দেখ, কিছু যোগাড় করতে পার কিনা, তা লোহার একটি আংটি হলেও। লোকটি গেল, খোঁজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না। এমনকি ১টি লৌহ আঙ্গুরীও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি কুর'আনের কিছু মুখস্থ জান? সে উত্তর দিল ঃ আমি অমুক অমুক সূরা মুখস্থ জানি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাও তুমি যে পরিমাণ কুর'আন মুখস্ত জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।"[৯২]

---

৮৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃআল বাকারা আয়াত ঃ ২৩৬।

৯০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহরানা হিসেবে হযরত খাদীজাকে ২০টি উট দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর প্রথম স্ত্রী এবং তার জীবদ্দশায় তিনি আর কোন বিয়ে করেননি। (**সীরাতে ইবনে হিশাম,** পৃ ৪৮)। বিবি খাদিজা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর মৃত্যুর পর চারশত দিরহাম মোহরানায় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সাথে সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। হিজরতের তৃতীয় সালে নবুওতের ১০ম সনের শাওয়াল মাসের ২৫ তারিখ মুতাবিক ৬০০ খ্রিঃ মে মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সাথে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর বিয়ের তারিখ ধার্য হয়। এরপর ৫০০ দিরহামের দেনমোহর আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর সাথে বিয়ে সম্পন্ন হয়। (**হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযী আল্লাহু 'আনহা,** এ. এফ. এম. আবদুল মজিদ রাশদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ–১৯৮৭, পৃ ১৯)।

৯১. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ২০।

৯২. **সহীহ আল বুখারী** (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯ ইং/১৪২০ হিঃ) ৫ম খণ্ড, পৃ ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ اَنَس اَنَّ عَبْدُ الرَّحْمن بْن عَوْفٍ تَزَوَّج إمْرَأةً عَلى وَزَن نَوَاةٍ فَرَأ النَّبِيِّ صَلَّــى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاشَةً الْعَرُس فَالَهُ فَقَال اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأةً عَلى وَزْن نَوَاةٍ -

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযী আল্লাহু 'আনহু এক মহিলাকে বিবাহ করলেন এবং তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার মুখমণ্ডলে) বিবাহের খুশীর ঔজ্জল্য দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে খেজুরের আটির পরিমাণ (স্বর্ণ) দিয়ে বিবাহ করেছি।[৯৩]

عَنْ سَحْل بْنِ سَعَادٍ اَنَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُل تَـزَوَّجِ وَلَـوْ حَـاتِمِ مِنْهُ حَدِيْدٍ

সাহল ইবনে সাদ রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি বিবাহ কর, (মোহরানা হিসেবে) একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।[৯৪]

মোটকথা, মোহরের কোন উর্ধ্বসীমা নির্ধারিত নাই। স্বামীর সামর্থ্য ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এটি নির্ধারিত হবে। তবে স্বামীর পক্ষে যা আদায় করা সহজ হয়, তাই উত্তম।

---

৯৩. **সহীহ বুখারী,** কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪। হাদীস নং ৪৭৬৮।

৯৪. **সহীহ বুখারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নারীর রাজনৈতিক অধিকার

নবী আলাইহিস্ সাল্লামগণ মানব জীবনের জন্য যে বিধি-ব্যবস্থা তৈরি করে দিয়েছেন তার কেন্দ্রবিন্দু, ভিত্তি ও তার মূল প্রাণশক্তি এবং সার নির্যাসই হচ্ছে কুর'আন ও সুন্নাহর এই আকিদা ও বিশ্বাস এবং ইসলামী রাজনীতির গোড়ার কথাই হচ্ছে এই যে, আদেশ প্রদান ও আইন রচনার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর আর কারো নয়। তাই আল্লাহ পাক কুর'আনে বলেন–

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ ـ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ ـ ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ـ

আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো শাসন চলবে না, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব কর না। এটাই সঠিক জীবন ব্যবস্থা।[১]

يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَئٍ ـ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ ـ

তারা জিজ্ঞাসা করে; ক্ষমতায় আমাদের কিছু অংশ আছে কি? তুমি বলে দাও, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর।[২]

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ـ هٰذَا حَلاَلٌ وَهٰذَا حَرَامٌ ـ

নিজ নিজ মুখ দিয়ে ভ্রান্তভাবে একথা বলোনা যে এটা হালাল আর এটা হারাম।[৩]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

আল্লাহর নাযিল করা শরীয়া মোতাবেক যারা ফয়সালা করে না তারাই কাফের।[৪]

আল্লাহর এই নির্দেশ মোতাবেক সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার। আইন রচনাকারী আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়। কোন মানুষ, চাই সে নবীই হোক না কেন, স্বতন্ত্রভাবে হুকুম দেয়া ও নিষেধ করার অধিকার নয়। নবী নিজেও আল্লাহর আদেশেরই অনুগত।[৫] এ বিষয়ে আল্লাহ নিজেই বলেন–

---

১. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ ইউসুফ, আয়াত ঃ ৪০।

২. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল ইমরান, আয়াত ঃ ১৫৪।

৩. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নাহল, আয়াত ঃ ১১৬।

৪. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ মায়েদা, আয়াত ঃ ৪৪। **হালাল–** আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছু বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন তাকেই হালাল বলা হয়। **হারাম–** আল্লাহপাক মানুষের জীবনের জন্য যা কিছু অবৈধ বলে ঘোষণা করেন শরীয়াতের পরিভাষায় তাকেই হারাম বলা হয়।

৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান** (ঢাকা ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১ম সংস্করণ, জুন– ১৯৯৭ খ্রিঃ), পৃ ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

إِنْ يَتَّبِعُوْا إِلاَّ مَا يُوْحِىْ إِلَىَّ -

আমি শুধু ওহীযোগে প্রাপ্ত নির্দেশই মেনে চলি।[৬]

সাধারণ মানুষকে নবীর আনুগত্য করার নির্দেশ শুধু এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, তিনি নিজের হুকুম নয় বরং আল্লাহর হুকুম জারি করেন। কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়্যত দান করবেন আর সে জনগণকে বলবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস[৭] হয়ে যাও।

يَقُوْلُ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللهِ -

বরং সে শুধু একথাই বলবে যে, তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে যাও।[৮] সুতরাং উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের যে কয়টি প্রাথমিক ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

(১) কোন ব্যক্তি পরিবার শ্রেণী বা গোষ্ঠি এমনকি রাষ্ট্রের সমগ্র জনগোষ্ঠি মিলিত হয়েও সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক শুধু আল্লাহ তায়ালা। বাকি সবাই নিছক প্রজার মর্যাদা রাখে। (২) মৌলিক আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।[৯] (৩) আল্লাহর নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আইন দিয়েছেন তার ভিত্তিতেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকার শুধুমাত্র আল্লাহর আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকারী সরকার হিসেবেই থাকবে এবং এই সরকার যতক্ষণ আল্লাহর আইন প্রয়োগ করতে থাকবে ততক্ষণই আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হবে।[১০]

সুতরাং আজ পৃথিবীর যেখানেই এরকম ইসলামী রাষ্ট্র[১১] প্রতিষ্ঠার এবং তার ধরন ও কর্মপন্থা নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালানো হবে সেখানেই কয়েকটি বিশেষ উৎসের দিকে রুজু হতে হবে। সেগুলো হচ্ছে কুর'আন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, খিলাফতে রাশিদার কার্যক্রম এবং উম্মাতের মুজতাহিদ আলেমগণের সিদ্ধান্ত। ইসলামের অলিখিত রাষ্ট্রীয়

---

৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আনয়াম, আয়াত ঃ ৫০।

৭. **দাস** ঃ দাস বা গোলাম আমরা এই অর্থেই বুঝে থাকি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এনেছে সে আল্লাহর দাস বা গোলাম হয়ে যায়। তখন সে শুধু তার মনিবেরই আনুগত্য করে। মানবের হুকুম মেনে চলে আর কারো নয়।

৮. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল ইমরান, আয়াত ঃ ৭৯।

৯. শরীয়তের মৌলিক বিধি বিধান, নীতিমালা কুর'আন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হবে অবশ্যই। তবে প্রয়োজনে সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুর'আন সুন্নাহর বিপরীত নয় এমন আইন ইজমার মাধ্যমে প্রণয়ন করা যাবে।

১০. আবুল আ'লা মওদূদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫।

১১. যে রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং নবুয়্যতের পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থাকে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ প্রতিষ্ঠিত করে তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের উৎস এই চারটি এবং এগুলো অধ্যয়ন করলে ইসলামী সংবিধানের আনুষাঙ্গিক নীতিমালা ও ধারাসমূহ তা থেকে বের করা যাবে।[১২]

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে একথা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম যে ধরনের রাষ্ট্র গঠন করে তাতে একটি আইনসভা থাকা জরুরি। এ আইনসভা মুসলিম জনগণের আস্থা সম্পন্ন প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে এবং তার সর্বসম্মত রায় অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের রায় ইসলামী রাষ্ট্রে আইনরূপে চালু হবে। এই আইনসভার গঠন তার কার্যপরিচালনা বিধি এবং তার সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি।[১৩] প্রত্যেক যুগের পরিস্থিতি পরিবেশ ও প্রয়োজনের দাবি অনুসারে এর আলাদা আলাদা ধরন ও রূপ অবলম্বন করা যেতে পারে।[১৪]

ইসলামী রাষ্ট্র সরকার সার্বভৌমত্ব আইন সভা কুর'আন সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা অনুসারে ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে যে কোন নিরপেক্ষ গবেষণা প্রমাণ করে যে নারীর রাজনৈতিক ব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে।[১৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ـ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ

---

১২. আবুল আ'লা মওদূদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬; **ইজমা ঃ** একই যুগে উম্মাতে মুহাম্মদীর পুণ্যবান মুজতাহীদগণের বক্তব্যমূলক বিষয় বা কার্যমূলক বিষয়ে একমত হওয়াকে ইজমা বলা হয়।

১৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩২০।

১৪. রাষ্ট্রের ব্যাপারে নীতিগতভাবে কতগুলি বিষয় স্থির করে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছেঃ (১) রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরামর্শের ভিত্তিতে চালাতে হবে। (২) সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। (৩) কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবেও গ্রহণ করা যাবে না। (৪) কুর'আন ও সুন্নাতে যে ব্যাখ্যা সর্বসম্মতভাবে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় মুতাবিক গৃহীত হবে, তা রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হবে। (৫) যে সব ব্যাপারে কুর'আন ও সুন্নাহর কোন নির্দেশ থাকবে না সে সব ব্যাপারে মুসলিম জনপ্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন করতে পারেন এবং তাদের সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। (৬) নাগরিকদের মধ্যে সরকার ও জনগণের মধ্যে আইন সভা ও জনগণের মধ্যে অথবা সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশের মধ্যে যে কোন বিবাদ ঘটলে তার নিষ্পত্তি যাতে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে করা যায়, সেজন্য একটা যুগসই ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩২০-৩২২)।

১৫. মুহাম্মদ আব্দুল হাই শেখ, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলা একে অপরের সহায়ক। ইহারা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে।[১৬]

অর্থাৎ নারী ও পুরুষ একে অপরের সহায়ক সমর্থক ও সাহায্যকারী। সহায়ক শুধু সামাজিকভাবেই নয়, রাজনৈতিক ভাবেও। রাজনৈতিকভাবেও তারা একে অপরের সহায়ক এবং তাদের অধিকার আছে পুরুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করার।[১৭]

ভোটাধিকার

ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বে নারী জাতিকে ভোটাধিকার দিয়েছে। অথচ বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকেও ইংল্যান্ডের মতো সুসভ্য দেশে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। ইসলাম নারীকে ভোটাধিকার প্রদানে বাধা দেয় না। নির্বাচন হচ্ছে জনগণ কর্তৃক এমন কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নিযুক্ত করার নাম, যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন ও সরকারের তত্ত্বাবধানের কাজ সম্পন্ন করে। সুতরাং নির্বাচন বা ভোট দান মূলত, প্রতিনিধি নিয়োগ করার নাম। ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজের পছন্দসই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের পক্ষে রায় প্রদান করে। এই প্রতিনিধিরা আইন পরিষদে গিয়ে তাদের ভোটাধিকার পক্ষে কথা বলে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে। নারী যদি কোন ব্যক্তির ওপর তার অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চায় এবং সমাজের একজন সদস্যা হিসেবে তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা প্রদান করতে চায় তবে নারীর এ কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়।[১৮] এক্ষেত্রে পরিবেশের শর্ত পূরণ করতে হবে।[১৯]

---

১৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত্ তাওবা, আয়াত ঃ ৭১।

১৭. সভ্যতা সংস্কৃতির সব উত্থান উন্নতিই নারী-পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টার ফসল। তাদের একজনকে সভ্যতার অঙ্গন থেকে বহিস্কৃত করে শুধুমাত্র অন্য একজনের কাঁধে সবকিছু চাপিয়ে দিয়ে সভ্যতা সংস্কৃতিকে অগ্রসর করে নিতে চাওয়া কি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কোন ব্যক্তি নিজ দেহের এক অংশকে অক্ষম অকমর্ণ্য বানিয়ে রেখে কেবলমাত্র একটি অংশ নিয়ে জীবন সংগ্রামে নিজে দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

১৮. মুসতাফা আস সিবায়ী ডঃ, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজের নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪।

১৯. ভোটাদানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, মেয়েদের ভোটদানের স্থান পুরুষদের থেকে যেন আলাদা হয়। পরিবেশ যেন অনুকূল হয়। অন্যথায় নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে শরীয়াতের সীমা লংঘন হবার আশংকা দেখা দেয়। যেসব মুসলিম দেশে নারীর ভোটাধিকার চালু রয়েছে সেখানে মহিলা ভোটারদের জন্য আলাদা ভোট কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এই শর্ত পূরণের ব্যবস্থা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ভোট দিতে পারে ভোট পেয়ে নির্বাচিত হতে পারে এবং আইন প্রণয়নে অংশ নিতে পারে। জনসাধারণের কাজ কর্মে অংশগ্রহণ করার অধিকারও তার আছে।[২০]

ইসলাম নারীকে ঘরের কাজে প্রাধান্য দিয়েছে বলে কেবল ঘরের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে ঘরের বাইরের কোন কাজে কিছুমাত্র উৎসুক থাকবে না এবং প্রয়োজনের সময়ও তাতে কিছুমাত্র অংশগ্রহণ করতে পারবে না, ইসলামী সমাজ বিধানে এমন কথা বলা হয়নি।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ

ইসলামের আগমনের পূর্বে তদানিন্তন আরব জনগণ সামাজিক বন্ধন ও নিয়ম শৃঙ্খলামুক্ত জীবন যাপন করত। কোন নৈতিক বিধি বিধান তারা জানত না। এই অবস্থায় ইসলাম তাদের সামনে আধ্যাত্মিক ও আদর্শভিত্তিক জীবনের এক সুস্পষ্ট চিত্র ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা উপস্থিত করে।[২১]

আরবের লোকেরা যখন ধীরে ধীরে ইসলামের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন ইসলামের ভিত্তিতে একটা সমাজ গড়ে উঠে। এই সময় কুর'আন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত ঘোষণাটি নাযিল হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় কোন নারী যদি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছা করে তাহলে তাকে কতকগুলো বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গীকার বা শপথ করতে হবে।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَّلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ واسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللهَ - إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"হে নবী মু'মিন স্ত্রীলোকেরা যখন তোমার নিকট বায়'আত গ্রহনের জন্য আসে এসব বিষয়ে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে একবিন্দু শরিক করবে না। চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না। ভাল কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তখন তুমি তাদের বায়'আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[২২]

এ আয়াতে দ্বীনের যে কটি মৌলিক বিষয়ে শপথ নেয়ার জন্যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কেবল নারীদের ব্যাপার নয়; তা পুরাপুরি

---

২০. মুহাম্মদ আব্দুল হাই শেখ, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৫।

২১. আব্দুর রহীম মাওলানা মুহাম্মদ, **নারী** (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, রবিউল আউয়াল– ১৪১৫, আগস্ট– ১৯৯৪ খ্রিঃ), তৃতীয় প্রকাশ, পৃ ৪৪।

২২. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল মুমতাহিনা, আয়াত ঃ ১২। এ আয়াতে ঈমান গ্রহণের সাথে মু'মীন নারীদের আল্লাহর রসূলকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তার আনুগত্যের শপথ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষদের জন্যও প্রযোজ্য। কেননা দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি পরিপূরণের দায়িত্ব যতটা পুরুষের, স্ত্রীলোকদের দায়িত্ব তার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়।[২৩]

এই অঙ্গীকার মানুষকে দায়িত্বশীল বানিয়ে রাখে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে রাসূলের প্রবর্তিত আদর্শের পরিপন্থী যে কোন কাজের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে এটি মানুষকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কৃত সংকল্প বানিয়ে দেয়।[২৪] ফলে নারী সমাজকে দ্বীনের সংরক্ষণ ও দ্বীন ভিত্তিক সমাজ শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সংগ্রামী করে তোলে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর জীবদ্দশায়ই এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটে।[২৫] ইসলামী শরীয়াত নারী সমাজকে মানবতার খেদমত ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত দেখতে চায়। কিন্তু তাতে যেন কখনই সীমা লংঘিত না হয়, সেদিকে আল্লাহ বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় নারী সমাজের বিরাট অবদান রয়েছে। এজন্য তারা বহু দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ, ও কুরবাণী স্বীকার করেছেন।[২৬]

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীরা বিভিন্ন পর্যায়ে নানারকম দায়িত্ব পালন করেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে যখন যা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন।[২৭]

---

২৩. আব্দুর রহীম মাওলানা মুহাম্মদ, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪-৪৫। বায়'আতের এই সকল শর্ত ব্যক্তির সাথে সামাজিক সংশোধনের আওতায় পড়ে একজন নারীকে সমাজ সংশোধন এবং দ্বীন কায়েমের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করাকে ফরয বা বাধ্যতামূলক করে দেয়।

২৪. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম মাওলানা, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫।

২৫. মক্কার প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব ভাগ্যবতী মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদের নির্যাতন ভোগ করার রক্তাক্ত কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা, আপন ঘরবাড়ি ত্যাগ করা কিংবা সমাজ থেকে বহিস্কৃত হতেও নারীরা কিছুমাত্র দুর্বলতা প্রদর্শন করেননি। মোটকথা এ পথে যত বাঁধাই এসেছে, সবকিছু তাঁরা দুপায়ে দলে গেছেন।

২৬. হযরত আম্মার রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর জননী ছিলেন একজন ঈমানদার মহিলা। তিনি ছিলেন আবু হুযাইফা ইব্ন মুগিরার ক্রীতদাসী। দ্বীন ইসলাম থেকে তাঁকে বিরত রাখা ও আল্লাহর দ্বীন ত্যাগে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। নর পিশাচ আবু জেহেল বল্লমের আঘাতে আঘাতে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এই ছিল ইতিহাসের প্রথম আত্মদান প্রথম শাহাদাত বরণ।

২৭. মক্কার জীবনে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের উপর যখন অত্যাচার নির্যাতন চরম আকর ধারণ করেছিল। কুরাইশরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে আবূ সাইফীর রাযী আল্লাহু 'আনহা কন্যা রকীফা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনের সংগ্রামে মহিলাদের বক্তৃতা, উপদেশ, মত প্রকাশের মাধ্যমে অংশগ্রহণঃ

দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠাও প্রতিরক্ষার কাজে মুসলিম মহিলারা একদিকে যেমন তীর ও তরবারির সাহায্যে কাজ করেছেন, তেমনি এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সাহিত্য ও বক্তৃতা উপদেশ ও নানারকম মূল্যবান পরামর্শ এভাবে সত্য দ্বীনের ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধিতে তাঁদের বস্তুগত শক্তি ও সাংস্কৃতিক শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়েছে। এই সকল মহিলাদের উৎসাহ ব্যঞ্জক বক্তৃতা ভাষণে বহুসংখ্যক লোক আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের জন্যে জানমাল ও যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিতে উৎসাহিত হয়েছেন।[২৮]

ইবনে আবদুল বার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ফুফু আব্দুল মুত্তালিব দুহিতা আরওয়া সম্পর্কে লিখেছেন– ঈমান গ্রহণের পর তিনি সর্বশক্তি দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাহায্য সহায়তা করতেন এবং তাঁর পূত্রকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তাঁর লক্ষ্যকে নিজের জীবন লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য বারবার উৎসাহিত করেছিলেন।[২৯]

হযরত খানাসা রাযী আল্লাহু 'আনহু[৩০] তার চারটি সন্তান নিয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। রাতের শুরুতেই (যুদ্ধ শুরুর আগের রাতে) তিনি তাঁর চার পুত্রকে একত্রিত করে যে নসীহত করেছিলেন তা এক ঈমান ও মুজাহিদ জননীর মুজাহিদ সন্তানের জন্য নসীহত হিসেবে ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তিনি বলেছিলেন, আমার প্রাণ প্রিয় পুত্ররা তোমরা নিজেদের আগ্রহ উৎসাহে ঈমান গ্রহণ করেছ। কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ ব্যতীতই তোমরা হিজরত করে মদীনায় এসেছ। খোদার শপথ, তোমাদের মা এক, পিতাও তোমাদের এক। তোমাদের মা

---

২৮. আব্দুর রহীম মাওলানা মুহাম্মদ, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

২৯. আব্দুর রহীম মাওলানা মুহাম্মদ, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮। আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, রুফাইদা সম্পর্কে আলোচনা, ইমাম বুখারী তাঁর আল আদাবুল গ্রন্থের ২১৩ ও ২১৪ পৃষ্ঠায় "কায়ফা আশসযাহাত" অনুচ্ছেদে বিষয়টির আলোচনা করেছেন। তাবাকাতে ইব্ন সা'দ গ্রন্থে রুফাইদার স্থলে কুআইবার নাম উল্লেখিত হয়েছে। (৮ম খণ্ড, পৃ ২১৩)।

৩০. **হযরত খানসা রাযী আল্লাহু 'আনহা** ঃ তামাদর ছিল তাঁর নাম আর উপাধি হচ্ছে খানসা। তিনি ছিলেন কায়েস গোত্রের সুলায়ম শাখার মেয়ে। তার পিতার নাম ছিল আমর ইবনুস সরিদ। প্রথমে সুলায়ম গোত্রের রাওয়াহা বিন আব্দুল উজ্জার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় তার মৃত্যুর পর মরওয়ান ইব্ন আবু আমেরের সঙ্গে দাম্পত্য সূত্রে সম্পর্কিত হন। হযরত খানসা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর বার্ধক্যের কালে রিসালাতের ও ইসলামের দাওয়াত পান। তখন তিনি হিজরত করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে তাঁর চারটি ছেলে শহীদ হলে এর দশবছর পর ২৪ হিজরী সনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। হযরত খানসা রাযী আল্লাহু 'আনহার চারটি পুত্রকে একই সাথে যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করে ঈমানের যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন তা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা রয়েছে। (**তাবাকাতুল শোয়াবা,** ইবনে কুতাইবা পৃ ১৯৭)।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তোমাদের নানার বংশ মর্যাদাও কলঙ্কিত করেননি। তোমরা এক শরীফ ও পবিত্র নারীর সন্তান। তোমরা জান, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার বদলে আল্লাহ তা'আলা বিপুল ও বিরাট সওয়াব রেখেছেন।

আল্লাহ যদি মঞ্জুর করেন এবং নিরাপদে সকাল হয়, তাহলে সজাগ অন্তদৃষ্টি সহকারে খোদার সাহায্য চাওয়া ও পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। যুদ্ধ ভয়াবহ হলে নির্ভিকচিত্তে ও অকুণ্ঠ মনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাফির শত্রুবাহিনী যখন প্রবল বিক্রমে ও অন্ধ আবেগে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন তাদের সেনাধ্যক্ষই হবে তোমাদের আক্রমণের লক্ষ্য বিন্দু। এইভাবে যুদ্ধ কার তোমরা ইহকালে বিজয় ও পরকালে জান্নাত লাভে ধন্য হওয়ার অধিকার নিয়ে ফিরে আসবে।[৩১] মহীয়সী জননীর নিকট থেকে সন্তানরা এই আবেগময়ী উপদেশ পেয়ে তরবারি হাতে যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন। এরপর তাদের দেহ রক্ত রঞ্জিত অবস্থায়ই কেবল পাওয়া গিয়েছিল।[৩২]

স্বর্ণযুগে মুসলিম নারী সমাজ যে দিকেই তাঁরা কোনরূপ বিপর্যয়, বা অসংলগ্নতা দেখতে পেতেন তা দূর করতে এবং গোটা সমাজকে সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণমুখী করে গড়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করে দিতেন। ঐতিহাসিক ইবনে আব্দুল বার রাযী আল্লাহু 'আনহু লিখেছেন ঃ

মহিলা সাহাবী সামুরা বিনতে নুহাইক রাযী আল্লাহু 'আনহা হাটে বাজারে ঘুরে ফিরে ভাল ও কল্যাণময় কাজের আদেশ করতেন এবং খারাপ ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁর হাতে একটা চাবুক থাকত। কাউকে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখলেই তিনি তা দিয়ে তাকে প্রহার করতেন।[৩৩]

অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী সমাজ অতীতে কখনো শাসকের রুক্তচক্ষু, রাজদণ্ড, কোন ব্যক্তির প্রতাপ প্রতিপত্তিকে ভয় করেনি। তাদের ঈমানী আবেগ যেভাবে প্রকাশ্য দুশমনের মোকাবিলা করেছে তেমনি ইসলামের অনুসারীদের বা তৎকালীন শাসকের যে কোন চিন্তা ও কর্মের বিপর্যয় কোন অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ইতিহাস প্রখ্যাত স্বৈরাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জুবাইর রাযী আল্লাহু 'আনহুকে শূলে

---

৩১. আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাত খানসা বিনতু আমর ইব্‌ন শাদীদ। (জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮; মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯)।

৩২. হযরত খানাস রাযী আল্লাহু 'আনহু চারজন ছেলে ছিল এরা সবাই কাদেসিয়ার যুদ্ধে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শাহাদাত বরণ করেন। তাদের নাম হলো আব্দুল্লাহ, আবু দাজরা (প্রথম স্বামীর) জায়েদ মুযাবিয়া (দ্বিতীয় স্বামীর)। হযরত খানসা রাযী আল্লাহু 'আনহা তার পুত্রদের জেহাদের ময়দানে সাহসিকতার সাথে লড়াই করার জন্য এক আবেগময়ী বক্তব্য রেখেছিলেন যা তাদের জেহাদে যেতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

৩৩. আব্দুর রহীম মাওলানা মুহাম্মদ, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬০। আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব, তায়কিরাতু সামরা বিনতু নাহীক (রা), জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

চড়িয়ে শহীদ করে দেয়ার পর তার জননী হযরত আসমা[৩৪] গিয়ে বলে যে, আপনার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) আল্লাহর ঘরে বেদ্বীনী ও নাস্তিকতার প্রচার করছিলেন বলেই আল্লাহ তাঁকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আসমা (রা) তাকে ভর্ৎসনা করে বলে উঠলেন ঃ

كَذِبْتَ كَانَ بِرًّا بِالْوَالِدَيْنِ صَوَّامًا قَوَّامًا وَاللهِ لَقَدْ أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ أَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ثَقِيْفٍ كَذَّابَانِ الْأٰخِرِ مِنْهُمَا شَرٌّمِنَ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُبِيرٌ -

তুমি মিথ্যা বলছ। আব্দুল্লাহ আদৌ কোন বে-দ্বীন ছিলেন না। তিনি তো তাঁর পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণকারী ছিলেন। রোযাদার ও তাহাজ্জুদ গুজারী ছিলেন। আসলে তুমিই তাঁর ওপর অমানুষিক জুলুম করেছ। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, সকীফ গোত্রের দুজন মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ করবে। দ্বিতীয়জন প্রথমজনের তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট হবে। কেননা, সেই অধিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। (এই গোত্রের প্রথম মিথ্যাবাদী হল মুসাইলিমা আর দ্বিতীয়জন হল তুমি)।[৩৫]

এখানে একজন মহিলা সাহাবীর অন্যায়ের প্রতিবাদে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য আর এক বর্ণনায় জানা যায় হযরত মু'আবিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহু হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহুকে লিখেছিলেন যে, আমাকে অল্প কথায় এমন কিছু উপদেশ দিন, যা আমি সব সময় সামনে রাখতে পারি। তাই হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা তাঁকে নীচে উদ্ধৃত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অত্যন্ত কার্যকর এই বাণীটি লিখে পাঠান যা শাসন দণ্ডের অধিকারীদের পথ নির্দেশনা দিতে সক্ষম।

---

৩৪. আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহুকে যাতুন নেতাকাইন নামে ডাকা হত। নেতাক অর্থ কোমরবন্দ। তাঁকে "দুই কোমর বন্ধ বিশিষ্ট নারী" এই জন্য বলা হত যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনার পথে রওনা হচ্ছিলেন, তখন হযরত আসমা নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খানাকে দুই টুকরা করে একখণ্ড দ্বারা তাঁদের খাদ্য দ্রব্য এবং অপরখণ্ড দ্বারা পানির মশকটি বেঁধে দিয়েছিলেন। আবার কারো কারো মতে ২য় খণ্ডটি নিজের কোমরেই বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম রাযী আল্লাহু 'আনহু এর স্ত্রী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র রাযী আল্লাহু 'আনহু এর মাতা। বর্ণিত আছে যে, মাত্র ১৭ জন লোকের ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বয়সে তিনি তাঁর বোন হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা অপেক্ষা দশ বছরে বড় ছিলেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ কর্তৃক তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র রাযী আল্লাহু 'আনহুকে শহীদ করে দেয়ার পর যখন শূলি কাঠ হতে লাশ নামিয়ে দাফন করা হল, এর দশ দিন মতান্তরে ২০ দিন পর একশত বছর বয়সে ৭৩ হিজরীতে ইন্তে কাল করেন। তার নিকট থেকে বহু লোকই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

৩৫. **সহীহ মুসলিম,** সাহাবীদের গুণাবলি অধ্যায়, মিথ্যাবাদী ছাকিফ ও তার ঘাতক অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ ১৯০; **মুসনাদে আহমদ,** ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩১৫; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০; মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ الشَّمْسُ رَضِيَ اللّٰهُ بِسَخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَـةَ النَّـسِ وَمَـنْ اِلْتَمَـسَ رَضِـى النَّـاسِ بِسَخْطِ اللّٰهِ كَلُّهُ اللّٰهِ إِلَى النَّاسِ ـ

যে ব্যক্তি মানুষকে অসুন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (মানুষ তার কোন ক্ষতিই করতে পারে না। কারণ) আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দেন। (আর সেক্ষেত্রে মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে সে সরকার পরিচালনা করে)।[৩৬]

হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু যখন আমীরুল মু'মিনীন সেই সময় খাওলা বিনতে সা'লাবা নাম্মী এক মহিলা সাহাবী 'উমর ফারুক রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর সাথে সাথে দেখা হলে তাঁকে উপদেশ দিতে থাকলেন–

হে 'উমর আমি তোমাকে 'উকাজের মেলায়' দেখেছি, তুমি ডান্ডা দিয়ে ছোট ছেলে মেয়েদের ভয় দেখিয়ে বেড়াতে। তখন তুমি ছোট ছিলে। সে সময় লোকেরা তোমাকে 'উমাইর' বলে ডাকত, পরে তুমি যখন যুবক হলে, তখন থেকেই লোকেরা তোমাকে 'উমর বলে ডাকতে শুরু করে। তারপর খুব বেশিদিন অতিবাহিত হতে না হতেই তুমি আমীরুল মু'মিনীন হয়ে গেলে। এখন তোমাকে আমীরুল মুমিনীন বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। চিন্তা করে দেখো, মহান আল্লাহ তোমাকে কোথায় থেকে কোথায় পৌছেছেন। তাই জনসাধারণের সাথে তোমার স্বভাবগত কঠোর আচরণ কর না।[৩৭] বরং জনসাধারণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। মনে রেখো। যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর আযাবের ভয় থাকে সে নিয়ামতকে দূরে মনে করতে পারে না। আর যার মনে মৃত্যুর ভয় আছে সে বেপরোয়া ও লাগামহীন জীবন যাপন করতে পারে না। সে বরং সব সময় নেকী করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত থাকে। 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর সঙ্গী কাওরা রাযী আল্লাহু 'আনহু তাঁকে বাধা দিলে। হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ তাঁকে বলতে দাও। তুমি কি জান না তিনি হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা।[৩৮]

---

৩৬. **তিরমিযী শরীফ,** আবওয়াবুয্ যুহ্‌দ অনুচ্ছেদ; জালালুদ্দীন আনসার উমরী; **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫২; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬১।

৩৭. আল-ইসতিআব, ইব্‌ন আব্দুল বার, তাযকিরাতুল খাওলা বিনতু সা'লাবা (রা) জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬২।

৩৮. খোলাফায়ে রাশেদার চার খলিফার মধ্যে হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু ছিলেন সর্বাপেক্ষা কড়া মেজাজের। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে বলেছেন– স্বয়ং ইবলিশ 'ওমরকে এত ভয় পায় যে রাস্তায় 'ওমর হাটে সে রাস্তায় ইবলিশও হাটে না। অর্ধেক পৃথিবীর শাসক হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু । যিনি আশারায়ে মোবাশশারাদের একজন এবং যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম এমন একজন ব্যক্তিকেও তাঁর শাসন নীতির ক্ষেত্রে মহিলা সাহাবী খাওলা বিনতে সালাবা পরামর্শ প্রদান করেন। জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩-১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের যে সব ব্যাপারে স্ত্রীলোকেরা অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী, তুলনামূলকভাবে ভাল ও বেশি জানে সে ব্যাপারে তাদের সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে সমাজকে উপকৃত হতে হবে। নারী সমাজের সাথেও পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত জানা ছিল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর একটা স্থায়ী রীতি।[৩৯]

হযরত হাসান বাসরী রাযী আল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর একটি সাধারণ কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ বর্ণনা করেছেন ঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيْرُ حَتَّى الْمَرْأَةُ فَتَشِيْرُ عَلَيْهِ بِالَّتِيْ فَيَأْخُذُ بِهِ -

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। কোন কোন সময় মেয়েরা এমন মতামত পেশ করত যা তিনি গ্রহণ করতেন।[৪০]

এই পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে কোন বিষয় নির্দিষ্ট ছিল না। হুদাইবিয়ার সন্ধির[৪১] একটি শর্ত ছিল, এই বছর মুসলমানরা ওমরা না করেই ফিরে যাবে তাই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযী আল্লাহু 'আনহুকে হুদাইবিয়াতেই ইহরাম খুলে ফেলা ও সঙ্গে করে নিয়ে আসা পশুগুলো জবাই করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু এইসন্ধি ও সন্ধির শর্তসমূহ দেখে বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন সে কারণে তারা কেউ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর এই নির্দেশ পালনে কোন তৎপরতাই দেখালেন না। এ অবস্থা দেখে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালমা রাযী আল্লাহু 'আনহা[৪২] এর নিকট দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি সাহাবাদের মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা

---

৩৯. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২; মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪।

৪০. **উয়ূমুল আখবাব, লি ইবনে কুতাইবা,** ১ম খণ্ড, পৃ ২৭।

৪১. **হুদাবিয়ার সন্ধি** ঃ মক্কা হতে এক মনযিল দূরে অবস্থিত একটি কূপের নাম হুদায়বিয়া। উক্ত কূপের সংলগ্ন স্থান সমূহ ও হুদায়বিয়া নামে পরিচিত। এখানেই কুরায়শদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর চুক্তি হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই চুক্তিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।

৪২. হযরত উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহু ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ষষ্ঠ স্ত্রী। মহিলাদের মধ্যে উম্মে সালমাই রাযী আল্লাহু 'আনহা সর্বপ্রথম হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–কে চরম সংকটময় মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে মুসলিম জাতির ইতিহাসে চির অক্ষয় হয়ে আছেন। ইমামুল হারামাইন বলেন, মহিলা জগতের ইতিহাসে সঠিক সিদ্ধান্ত দানের এত বড় নযীর আর নেই (**যুরকানী,** ৩য় খণ্ড, পৃ ২৭২)। জ্ঞানের দিক থেকে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর পরই ছিল উম্মে সালামার স্থান। ইসাবা গ্রন্থে উম্মে সালামা সম্পর্কে বলা হয়েছে– Umma Salamah (R) prossessed physical charms, and was endowed with a high degree of brain power, perception, insight and adjudication. তিনি সুন্দর করে কুর'আন তেলাওয়াত করতে পারতেন। উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে ৩৭৮ টি হাদীস বর্ণিত আছে। উম্মে সালাবা

Dhaka University Institutional Repository

সহকারে পরামর্শ দিলেন– আপনি এরপর কাউকে আর কিছুই না বলে যা কিছু করার আপনি নিজেই অগ্রসর হয়ে করে ফেলুন। দেখবেন, সকলেই আপনার দেখাদেখি সব কাজ করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং যখনই তিনি করণীয় সব কাজ করলেন, সাহাবায়ে কিরাম রাযী আল্লাহু 'আনহু ও তাঁর অনুসরণ শুরু করে দিলেন।[৪৩]

এভাবে হযরত উম্মে সালমা রাযী আল্লাহু 'আনহা সঠিক ও যথাযথ পরামর্শে উপস্থিত অচলাবস্থা দূর করতে সক্ষম হল এবং প্রমাণ করে দিল তাদের পরামর্শ জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জানাযা পড়া হয় ইসলামের প্রথম দিকে তা মুসলমানদের মধ্যে চালু ছিল না। হযরত আসমা বিনতে উমাইস হাবশায় খ্রিষ্টানদের মধ্যে এ নিয়ম দেখেছিলেন। তিনি এর পরামর্শ দিলে তা গৃহীত হয়।[৪৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁর কর্ম পদ্ধতির আদর্শের অনুসরণ করেছে। ইবনে সিরীন হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন–

إِنْ كَانَ عُمَرَ لِيَسْتَشِيْرُ فِيْ الأَمْرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيَسْتَشِيْرُ الْمِرأة فَرُبَّمَا اَبْصَرْنِــيْ قَوْلَـهَا اَوْ الشَّئِ يَسْتَحْسَنَهُ فَيَا خُذُ بِهٖ -

উপস্থিত সমস্যা সম্পর্কে 'উমর (জ্ঞানী লোকদের সাথে) পরামর্শ করতেন। এমনকি (সে সব বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারিণী) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। তাদের মতামতে কল্যাণকর কোন দিক থাকলে বা কোন উত্তম বিষয় দেখলে তিনি তা গ্রহণ করতেন।[৪৫]

হযরত শিফা রাযী আল্লাহু 'আনহু হিজরাতের পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট বায়'আতেও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধি বিবেচনায় খুবই মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। জীবনীকার ইবনে আব্দুল বার লিখেছেন–

وَكَانَ عُمَرُ يَقْدِمُهَا فِيْ الرَّاى يَرْضى وَيَفْضُلُهَا -

পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের ব্যাপারে হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু তাঁর অগ্রাধিকার প্রদান করতেন তাঁকে তিনি সন্তুষ্ট রাখতেন এবং এর অন্যদের তুলনায় বেশি মর্যাদা দিতেন।[৪৬]

রাযী আল্লাহু 'আনহা ৮৪ বছর বয়সে হিজরী ৬৩ সনে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহীত করা হয়।

৪৩. **সহীহ বুখারী,** কিতাবুত শুরুত অনুচ্ছেদ, আশ্ শুরুত ফিল জিহাদ' ওয়াল মাসালিহাতু মা'আ আহলিল হারব।

৪৪. মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, **তাবকাতে ইব্‌ন সা'দ,** ১ম খণ্ড, পৃ ২০৬।

৪৫. **আল সুনানুল কুবরা,** বায়হাকী।

৪৬. **আল ইসতিবাব ফী আসমাইল আসবাব,** তাযকিরাতু শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু তার খিলাফতের যুগে বিরোধীদের সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মদীনার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আব্দুল্লাহ ইবনে উমায়ের কামীল নাখয়ীকে তাঁর পক্ষে কাজ করতে আহবান জানালেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে শরীক না হয়ে উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর কন্যা উম্মে কুলসুম এর কাছে অক্ষমতা এবং গন্তব্য স্থানের কথা জানালেন। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, তিনি সিরিয়া রওনা হয়ে গেছেন। এ খবর শুনে হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু সিরিয়া পৌঁছার আগেই আবদুল্লাহ ইবনে উমায়েরকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নিলেন।[৪৭] যে মুহূর্তে তিনি যোদ্ধাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে উম্মে কুলসুম এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন– আব্দুল্লাহর ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। আপনাকে তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে বাস্তবে অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি তাঁর জামিন হচ্ছি। তিনি আপনার বিরুদ্ধে কোন পাদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু উম্মে কুলসুমের দেয়া এই খবর এবং আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর মতামতের ওপর আস্থা স্থাপন করে, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং যোদ্ধাদের অভিযান বাতিল করলেন।[৪৮]

যে সময় আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা হযরত উসমানের হন্তাদের থেকে কিসাস নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, সে সময়ের একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ

লোকজন উসমান এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে ও তাঁর গভর্ণরদের দোষ বর্ণনা করে, তারা মদীনায় এসে আমাদের কাছে গভর্ণরদের বিরুদ্ধে যা বলে আমরা তা নিয়ে পরামর্শ ও চিন্তা ভাবনা করি। আমরা দেখতে পাই হযরত উসমান রাযী আল্লাহু 'আনহু প্রতিটি অভিযোগের ব্যাপারে নির্দোষ, খোদাভীরু এবং নিজের দায়িত্ব পালনে পূর্ণরূপে সচেতন, আর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা পাপী, অপরাধী, প্রতারক এবং মিথ্যাবাদী। আর যা প্রকাশ করছে তার সম্পূর্ণ উল্টোটা করার জন্য চেষ্টা সাধনা ও কর্ম তৎপরতা চালাচ্ছে।[৪৯]

এই বক্তব্য থেকে জানা যায় হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহু সরকার এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাজকর্মের অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করতেন। অপরদিকে এই বক্তব্য থেকে প্রকাশ পায় যে, সাধারণ মানুষের সমস্যা ও বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তাঁর গভীর ও নিকট সম্পর্ক ছিল এবং জনগণ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্যও তাঁর কাছে আসত। তিনি এ সব ব্যাপারে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করতেন।[৫০]

---

৪৭. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪।

৪৮. **তারীখুর রাসূল ও ওয়াল মুলুক,** তাবারী ৫ম খণ্ড, পৃ ১৬৪-১৯৭।

৪৯. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৫।

৫০. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উসমানের পর কাকে খলীফা বানানো হবে এই মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে বসরার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং নিজ গোত্রের নেতা আহনাফ হযরত তালহা রাযী আল্লাহু 'আনহু ও যুবায়ের ছাড়াও হযরত আয়েশার কাছেও যান। তিন জনই হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু–এর হাতে বাইয়াত হন।[৫১]

হযরত 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু–এর শাসন আমলে, আরবদের প্রথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানরা বিয়েতে মোটা মোটা অংকের মহর ধার্য করতে শুরু করে দেয়। 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু বিষয়টির প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিআকর্ষণ করলেন। তিনি চাচ্ছিলেন মহরের সর্বোচ্চ একটা সীমা নির্ধারণ করে দিবেন।[৫২]

'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু একদিন মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন–

হে মুসলমানরা বিয়েতে মোটা অংকের মহর ধার্য কর না। কেননা, এই দুনিয়া সামান্যতম সম্মান ও গৌরবের বিষয় হলে এবং আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এর কোন গুরুত্ব থাকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের চাইতে বেশি এরূপ করার অধিকারী ছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা মোটা অংকের মহর ধার্য করতে পারতেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি, তিনি নিজের বিয়েতে বার ওকিয়ার বেশি মহর ধার্য করেননি।"

'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর এই বক্তব্য শুনে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পিছনের আসন থেকে দাঁড়িয়ে গেল। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। মহিলাটি বললেনঃ আল্লাহ কুরআন শরীফে মহরের কোন সীমা নির্দিষ্ট করে দেননি। 'ওমর সীমা নির্ধারণ করার কে?[৫৩] ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু উপস্থিত লোকদের সামনে বলতে বাধ্য হলেন, যে একজন নারীর দাবীই সত্য, ওমরের প্রস্তাব ভুল। এরপর তিনি এ বিষয়ে কড়াকড়ি করা থেকে বিরত রইলেন।[৫৪]

হাজ্জাজ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরকে অবরোধ করে রাখার সময় আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র রাযী আল্লাহু 'আনহু–এর দশ হাজার সঙ্গী তাঁকে ছেড়ে হাজ্জাজের সাথে চলে যায়। এমনকি তাঁর দুই ছেলে হামযা এবং যুবায়েরও আশ্রয়প্রার্থী হয়ে হাজ্জাজের কাছে চলে যায়। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন

---

৫১. **তারিখুর রসুল ওয়াল মুলুক,** তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ ১৯৭।

৫২. মুহাম্মদ আব্দুল হাই শেখ, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭।

৫৩. এই মহিলা ছিলেন একজন সাধারণ নারী। তিনি একজন বিখ্যাত মহিলা হলে নিশ্চয়ই তার নাম হাদীসে উল্লেখ থাকত। একজন সাধারণ মহিলা একজন রাষ্ট্র প্রধানের প্রস্তাবের উপর অনাস্থা আনতে পারে। ঐ মহিলা একটি কুরআনের আয়াত পড়ে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল–

"আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করিয়াই থাক তবে তাহাকে এক স্তূপ সম্পদ দিয়া থাকিলেও তাহা হইতে কিছুই ফিরাইয়া লইবে না। তোমরা কি দোষারোপ করিয়া সুস্পষ্ট যুলুম করিয়া তাহা ফেরত লইবে।" (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ২০)

৫৪. মুহাম্মদ আব্দুল হাই শেখ, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

যুবায়ের রাযী আল্লাহু 'আনহুর তাঁর মা আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহা এর কাছে গিয়ে নিজের অসহায় অবস্থা বর্ণনা করে পরামর্শ চাইলেন।[৫৫] জবাবে তাঁর মা বললেন–

"বেটা, তুমি নিজেকে সবার চেয়ে ভাল করে জান। তুমি নিজেকে যদি সত্যিই হকের অনুসারী বলে মনে কর এবং হকের প্রতি মানুষকে আহবান করে থাকো তাহলে ধৈর্য অবলম্বন কর। দেখ তোমার বহু সঙ্গী সাথী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে, তাই নিজেকে খেলনা বানিয়ে বনী উমাইয়ার ছোকরাদের হাতে তুলে দিও না। যা নিয়ে এরা খেলতে থাকবে। তবে তুমি যদি মনে কর, এসব কিছুই তুমি দুনিয়ার স্বার্থের জন্য করেছ। তাহলে তুমি দুনিয়ার নিকৃষ্টতম মানুষ। এ জীবন যখন একদিন নিঃশেষ হবেই তাহলে তা আল্লাহর পথে হবে না না কেন? দ্বীনকে দুর্বল করে তুমি চিরস্থায়ী তো হতে পারবে না।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের রাযী আল্লাহু 'আনহুর মায়ের এই ইচ্ছা ও আগেবকে সমর্থন করলেন এবং লড়তে লড়তে শাহাদাত লাভ করলেন।[৫৬] এভাবে সত্যের পক্ষে মহিলা সাহাবীরা প্রাণ উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করেছেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা উহুদ যুদ্ধের শহীদদের বিরুদ্ধে কবিতা পাঠ করে কুৎসা রটালে হিন্দা বিনতে আসমা তৎক্ষণাৎ কবিতার মাধ্যমেই তার কঠোর জবাব দেন।[৫৭]

জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার

ইসলামের নীতিমালায় নারীর ভোটাধিকারের সাথে সাথে জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকারও স্বীকৃত বলে আমরা মনে করি। জনপ্রতিনিধিদের সাধারণত দুটো কাজ করতে হয় (১) আইন ও বিধিমালা রচনা করা (২) সরকারের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের তত্ত্বাবধান করা।

আইন রচনার কাজ থেকে নারীকে নিবৃত্ত করার কোন কারণ ইসলামে নেই। কেননা আইন রচনায় যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো জ্ঞান। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান এবং সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞান, এই উভয়বিধ জ্ঞানই এর আওতাভুক্ত। ইসলামে জ্ঞানার্জনে নারী ও পুরুষকে শুধু সমান অধিকার দেয় না। বরং জ্ঞানার্জনকে উভয়ের জন্য ফরজ বলে ঘোষণা করে। ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু বিদূষী মহিলা রয়েছেন, যারা হাদীস, ফেকাহ ও সাহিত্যে অগাধ পন্ডিত্যের অধিকারী।[৫৮]

---

৫৫. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮।

৫৬. **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া,** ৮ম খণ্ড, পৃ ৩০; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯।

৫৭. ইবন হিশাম, **সীরাতে ইবনে হিশাম,** ৩য় খণ্ড, পৃ ৪১-৫৯।

৫৮ মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪।

কুর'আন শরীফ হল মুসলমান জাতির সংবিধান বা শাসনতন্ত্র। সকলের মতামত নিয়ে কুর'আন-হাদীসের আলোকে ফেকাহবিদরা নুতন নতুন আইন প্রণয়ন করতেন। হযরত 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু

Dhaka University Institutional Repository

এরপর আসে সরকারের নির্বাহী তৎপরতার তত্ত্বাবধান প্রসংগ। এ কাজটি দুই প্রকারের হতে পারে, সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এই কাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান।[৫৯]

সুতরাং আইন রচনা বা নির্বাহী তৎপরতার তত্ত্বাবধান এই দুই কাজের ক্ষেত্রে নারীকে জন প্রতিনিধি হওয়ার অযোগ্য সাব্যস্ত করে, এমন কোন উক্তি ইসলামে নেই।[৬০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে বহু সংখ্যক মহিলা একত্রিত হয়ে সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেত্রীপদে বাছাই করে তার মাধ্যমেই কথা বলেছেন। সেই মহিলা প্রতিনিধি যা কিছু বলেছেন তাতে তিনি নিশ্চয়ই সকলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বর্তমানে যেমন কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে যে কেউ প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।[৬১] একবারের ঘটনায় হযরত জায়েদ রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর কন্যা হযরত আসমা রাযী আল্লাহু 'আনহা প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন-

اِنِّىْ رَسُوْلُ مِنْ وَرَائِىْ مِنْ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ كُلُّهُنَّ يَقُلْنَ بِقَوْلِىْ وَلِىْ مَثَلَ رَأى -

আমার পশ্চাতে মুসলিম মহিলাদের যে দল রয়েছে আমি তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছি, তাঁদের সকলেই আমার কথা বলেছেন এবং আমি যে মত পোষণ করি তারাও সেই মতই পোষণ করেছেন।[৬২]

মহিলা প্রতিনিধিত্বের এরকম আরো ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যেমন- আবু সাঈদ রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- বেশ কিছু সংখ্যক মহিলার পক্ষ থেকে জনৈক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে হাজির হয়ে বলেছিলেন- আপনার খিদমতে

-এর খেলাফত কালে জনৈক মহিলা কুর'আনের সূরা নিসার ২০ নং আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর আনীত মোহরানার নির্ধারণ সম্পর্কিত আনীত প্রস্তাব বা বিলের উপর অনীহা জ্ঞাপন করেন। ফলে ঐ আইনটি বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে প্রমাণ হয় যে, ইসলাম নারীকে আইন প্রণয়নেও অংশ নেয়ার অধিকার দিয়েছে। উল্লেখ্য উক্ত মহিলা মসজিদে 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু-এর মহর সম্পর্কিত আইনটি মুসলমানদের সামনে পেশ করার সময় উপস্থিত ছিলেন। এবং তিনি মসজিদের পিছনের সারি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হযরত 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। (মুহাম্মদ আব্দুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭-২৫৮।

৫৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত তওবা, আয়াত ঃ ৭১।

৬০. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫; মুহাম্মদ আব্দুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৮।

৬১. বর্তমানের সংগঠন, নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধিত্ব এই প্রক্রিয়ায়ই হয়ে থাকে।

৬২. **আল ইসতিআব ফী আসমাইল আসহাব,** তাযকিরাতু আসমা বিনতু যায়েদ ইবনু সাকাম। হাফেয মুনযিরী বায্যার ও তাবারানী থেকে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করেছেন। আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অধিক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন। যেদিন আমরা সবাই আপনার খিদমতে হাজির হব।

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা সমবেত হবে। তারা সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে তাদেরকে শিক্ষা দান করলেন।[৬৩]

নানাবিধ আদর্শিক ও জাতীয় প্রয়োজনে নারীরা সমবেত হতো এবং কোন কোন সময় তাদের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের মধ্য থেকেই প্রতিনিধি নিযুক্তির মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খিলাফতের যুগে তার সমাধান করত।

নারীদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ

কোন নারী রাষ্ট্রপ্রধান বা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে না এরকম কোন আয়াত আজ পর্যন্ত আমরা কুরআনে পাইনি। তবে হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً –

যে জাতি নিজেদের বিষয় সমূহ সৌপর্দ করে তাদের নারীদের ওপর, সে জাতি কখনও কল্যাণ লাভ করতে পারে না। অথবা যে জাতি নারীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে সে জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না।[৬৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর এই হাদীসটি। একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে এবং একটি বিধর্মী সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে।[৬৫]

---

৬৩. সহীহ বুখারী কুরআন সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধরা সংক্রান্ত অধ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর সমগ্র উম্মতকে ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ তাঁকে যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই কোন কাটছাট না করেই বা অতিরঞ্জিত করা ছাড়াই শিক্ষা দিয়েছেন। ১৭ খণ্ড, পৃ ৫৫; (**সহীহ মুসলিম,** শিষ্টাচার ও আত্মীয়দের সাথে সদাচার অধ্যায়, মেয়েদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন অনুচ্ছেদ ৮ম খণ্ড, পৃ ৩৯)।

৬৪. **বুখারী শরীফ,** কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ কিতাবুন নাবী (স) ইলা কিসরা ওয়া কায়সার, তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতাম নাসায়ী কিতাবু আদাবিল কুদাহ।

৬৫. আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারেন যে, পারস্যবাসীরা তাদের মৃত শাসনকর্তা কেছরার কন্যাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে তখন তিনি এ কথা বলেছিলেন। সাধারণভাবে সব অবস্থায় এই নির্দেশ প্রযোজ্য কিনা তা গবেষণা করে দেখা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর হাদীসটির সাথে সাথে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার আয়াতটিকে নারীর রাষ্ট্রের দায়িত্বায়র্ণ পদ অথবা মন্ত্রীত্বকে অথবা সংসদ সদস্য পদের নিয়োগের বিপক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করা হয়।

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

অর্থাৎ– পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব সম্পন্ন

অথবা পুরুষরা নারীদের কর্তা

অথবা পুরুষ নারীদের জন্য ব্যবস্থাপক

অথবা পুরুষরা নারীদের পরিচালক।[৬৬]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই নির্দেশ পরিবারকে জীবনের সাথে জড়িত। যেহেতু পুরুষ স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করে। তবে বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে ইসলামের নীতিমালা ও আইনের ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পালন আপতঃদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়। তবে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থান এবং সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে কি কি অন্তরায় রয়েছে তা আলোচনা করে দেখা উচিত। আল্লাহ পাক নারীকে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজ নিজ গৃহে সসম্মানে অবস্থান কর এবং অতীত জাহিলিয়াতের ন্যায় সেজেগুজে বাইরে বের হয়ো না।[৬৭]

এক্ষেত্রে অবশ্যই একজন মহিলাকে আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়াতের সীমা রক্ষা করতেই হবে।[৬৮] এছাড়া একজন নারী জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনকালে অনেক পুরুষের সাথে মেলামেশা করতে হতে পারে বিশেষত নিভৃতে মেলামেশা ইসলামে নিষিদ্ধ।[৬৯]

---

৬৬. পবিত্র কুর'আনুল কারীমের সূরা নিসার ৩৪ নং এই আয়াতটি বিভিন্ন তাফসীরকারক বিভিন্নভাবে অনুবাদ করেছেন। বিভিন্ন তাফসীরে শব্দগত পার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসীরই এই আয়াতটিকে পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। মাওলানা মওদূদী (র) তাফহীমুল কুর'আনে এরকম ব্যাখ্যাই করেছেন কিন্তু তিনি তাঁর ইসলামী রিয়াসাত নামক গ্রন্থে ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। যদি পুরুষের এই কর্তৃত্ব গোটা সামাজিক ব্যবস্থার জন্যই হয়ে থাকে তাহলে যেসব পরিবারে মেয়েরা উপার্জন ও ব্যয় করে সেখানে قوام হবে কে?

৬৭. এখানে নিজের গৃহে অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে নিষেধ করা হয়েছে বর্বর জাতির মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু আমরা দেখেছি নারীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর জীবদ্দশায় বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঘরের বাইরে কাজ করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর অনুমতি সাপেক্ষে। তাই এর দ্বারা বাইরের কর্মক্ষেত্র নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না।

৬৮. মহিলাদের ঘরের বাইরে বের হতে আল্লাহর নির্ধারিত পোশাক এবং শরীয়াতের সীমা সচেতনভাবে মেনে চলা বাইরের কাজের অন্যতম শর্ত। তোমরা নিজেদের গৃহ মধ্যে অবস্থান কর। এ আয়াতের পূর্বাপর আয়াতগুলোই সমস্ত আয়াতই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছ। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাজার বলেন ঃ এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই জন্যই উম্মে সালামাহ বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সংগে ছাড়া আমি কখনো উটের পিঠে চড়ে রওয়ানা হইনি। (**ফাতহুল বারী,** ৮ম খণ্ড,

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনের প্রয়োজনে এবং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে কেউ এই দায়িত্ব পালন করলে তিনি এই নিষেধাজ্ঞা যথাবিহিত পালন করেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই করবেন। যাতে করে হাদীসের এই নির্দেশ লংঘিত না হয়।[৭০]

নারী যদি বর্তমান যুগে কোন আধুনিক রাষ্ট্রের প্রধান হন তবে অনেক সময় তাঁকে অন্য দেশের পুরুষ রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সভা সম্মেলনে বসতে হয় অনেক সময় রুদ্ধদ্বার বৈঠক করতে হয়। এই রকম প্রয়োজনে অবশ্যই তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে হবে। নারীর প্রতিনিধিত্বের তৃতীয় যে সমস্যা হয়ে থাকে ইসলাম মুহাররম আত্মীয়ের সাথে ছাড়া নারীদের জন্য সফর নিষিদ্ধ করেছে।[৭১]

পৃ ১০৮)। যদি আমরা ধরে নেই যে, আয়াতে সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তাহলে সুন্নাত কি এক্ষেত্রে কুর'আনের ব্যাখ্যায় পরিণত হবে না? ইতোপূর্বে আমরা পুরুষের সাথে মেয়েদের কাজ করা ও দেখা সাক্ষাত সম্পর্কিত সুন্নাতের মৌলিক বিধান পেশ করেছি। এগুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর যুগের মু'মিন মেয়েরা গৃহ মধ্যে অবস্থানের নির্দেশ কার্যকর করেছিল। এবং কিভাবে তাদের গৃহমধ্যে অবস্থান করা তাদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। (আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, **রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা,** প্রাগুক্ত, পৃ ২২-২৩)।

৬৯. إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ يَـا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْـتَ الحَمُـوْ؟ قَـالَ الْحَمُـوْ الْمَوْتَ ـ

মেয়েদের কাছে (একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাকো। আনসারদের একজন বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল দেবরের ব্যাপারে কি বলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দেবরাতো মৃত্যু। বুখারী শরীফ, অধ্যায়। বিবাহ অনুচ্ছেদ। মাহরামের সংগে ছাড়া কোন পুরুষ কোন মেয়ের কাছে যাবে না এবং স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর কাছে যাওয়া। ১১ খণ্ড, পৃ ১৪৬। **মুসলিম অধ্যায়,** সালাম, অনুচ্ছেদঃ অপরিচিতার সাথে নিরিবিলিতে বসা এবং তার কাছে যাওয়া হারাম, ৭ম খণ্ড, পৃ ৭। মেয়েদের সাথে নিরিবিলিতে বসা, এই বসা যদি নিরিবিলি ও একাকী হয় তবেই নিষিদ্ধ অন্যথায় নিষিদ্ধ নয়। ইমাম বুখারী এই অধ্যায়ের ভিত্তিতে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ঃ মুহাররম (যার সাথে বিয়ে হারাম) ছাড়া কোন পুরুষ কোন মেয়ের কাছে একাকী যাবে না এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মেয়ের কাছে কোন পুরুষ যাবে না।

৭০. কেননা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বর্তমান অবস্থায় ইসলামের আইন, ইসলামী বিধান দ্বীনের হুকুম আহকামের বিপক্ষে জাহেলী নারীরা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় কর্মতৎপর। তাই দ্বীনের উপর অনুসারী নারীদেরকেই এই দ্বীন বিরোধি ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসতে হবে। হাফেজ ইবনে হাজার (র) আল্লামা তাবারী (র) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি নারীর নেতৃত্ব ও বিচার কার্যকে জায়েজ মনে করতেন (**ফাতহুল বারী,** ৮ম খণ্ড, পৃ ৯৭)।

৭১. لاَ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِىْ مُحَرَّمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مُحَـرَّمٌ ـ কোন মুহাররমের সংগে ছাড়া কোন নারী সফর করবে না এবং কোনো মুহাররমকে সংগে না নিয়ে কোনো পুরুষ কোন মেয়ের কাছে যাবে না। (**সহীহ আল বুখারী,** অধ্যায়, হজ্জ অনুচ্ছেদ, মেয়েদের হজ্জ করা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ

Dhaka University Institutional Repository

তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বিভিন্ন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা সাহাবীদের ঘরে যাতায়াতের প্রমান বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন–

সদাচার ঃ আনাস ইব্‌ন মালেক রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই উম্মে সুলাইমের বাড়ির আশপাশ দিয়ে গেছেন তখনই তাঁর কাছে গেছেন।[৭২]

আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইমের কাছে গেলেন। উম্মে সুলাইম তাঁর সামনে খেজুর ও ঘি পেশ করলেন।[৭৩]

হাফেজ ইব্‌ন হাজার বলেন, এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় সামনে এসেছে– যেমন একটি হচ্ছে, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে প্রবেশ করা কারণ এ কথা বলার সময় এভাবে বলা হয়নি যে, আবু তালহা (উম্মে সুলাইমের স্বামী) তখন সেখানে ছিলেন।[৭৪]

রোগীর তত্ত্বানুসন্ধান

আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইরের মেয়ে দুবা'আহর কাছে গেলেন। তাকে বললেন, তুমি বোধ হয় হজ্জ করতে চাচ্ছ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমার রোগ অত্যন্ত প্রবল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তবুও তুমি হজ্জ কর তবে শর্ত লাগিয়ে নাও। বল, হে আল্লাহ! আমি হালাল হয়ে যাবো যখন তুমি আমাকে (রোগের কারণে) আটকে দেবে।" এ সময় দুবা'আহ রাযী আল্লাহু 'আনহু মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের স্ত্রী ছিলেন।[৭৫]

---

৪৪৬)। জনপ্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনে সফর অবশ্যম্ভাবী হল মুহাররম আত্মীয়ের সাথে নিয়েই সফর করা সম্ভব। এটা এমন কোন শর্ত নয়। যা বস্তাবে পূরণ করা অসম্ভব।

৭২. **সহীহ আল বুখারী,** অধ্যায়, বিবাহ, অনুচ্ছেদ বিয়ের কনের জন্য উপহার, ১১ খণ্ড, পৃ ১৩৪।

৭৩. **সহীহ আল বুখারী,** অধ্যায় রোযা, যে ব্যক্তি কোন গোষ্ঠির সাথে সাক্ষাত করল কিন্তু তাদের সাথে ইফতার করল না। ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৩১।

৭৪. ইবন হাজার আল আসকালানী, **ফাতহুল বারী,** ৫ম খণ্ড, পৃ ১৩৩।

৭৫. **সহীহ আল বুখারী,** অধ্যায় বিবাহ, অনুচ্ছেদ– দ্বীনের ক্ষেত্রে কুফু বা সমমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া। ১১ খণ্ড, পৃ ৩৫। **মুসলিম শরীফ,** অধ্যায়, হজ্জ অনুচ্ছেদ ঃ যে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছে রোগ ও অনুরূপ কোন ওযরের ভিত্তিতে তার হালাল হওয়ার শর্ত আরোপ করা ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সহানুভূতি ও সমবেদনা

উম্মুল 'আলা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন। আমি বললাম ঃ হে আবুস সায়েব। তোমার প্রতি রহমত বর্ষিত হোক।[৭৬]

রাবী বিনতে মুআওবিয ইবনে আফরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমাকে যখন বাসর শয্যায় দেয়া হল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। তিনি আমার বিছানায় বসলেন ঠিক অমনিভাবে যেমন তুমি এখন আমার বিছানায় বসে আছ। তারপর আমাদের এখানকার কয়েকটি মেয়ে দফ বাজাতে লাগল।[৭৭]

প্রয়োজন পূর্ণ করা ঃ জ্ঞানার্জন

আসমা বিনতে উমাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু মূসা ও আসহাবুস সাফীনাদেরকে দেখেছি দলে দলে আমার কাছে এসেছে এবং এ হাদীসটি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে।[৭৮]

পরিদর্শন

আবু হুজাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবু দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সালমান আবু দারদাকে দেখতে গেলেন। তিনি উম্মে দারদাকে অসুন্দর সাদামাটা বস্ত্র পরিহিত দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার আপনার কি হয়েছে?[৭৯]

প্রজার অবস্থা অনুসন্ধান করা ঃ কায়েস ইব্‌ন আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু আহমুস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলেন। তার নাম যয়নাব বিনতে মুহাজির।[৮০]

---

৭৬. **সহীহ আল বুখারী,** ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ২২৩।

৭৭. **সহীহ আল বুখারী,** অধ্যায়– বিবাহ, অনুচ্ছেদ– বিয়ে ও ওলীমার দফ বাজানো, ১১ খণ্ড, পৃ ১০৮।

৭৮. **সহীহ আল বুখারী,** অধ্যায়, যুদ্ধ বিগ্রহ অনুচ্ছেদ, খয়বরের যুদ্ধ, ৯ম খণ্ড, পৃ ২৪। **মুসলিম শরীফ,** অধ্যায় সাহাবাগণের ফযীলত, ৭ম খণ্ড, পৃ ১৭৩। (অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবু তালিব, আসমা বিনতে উমাইর ও তাদের নৌকার সাথীদের ফযীলত)।

৭৯. **সহীহ আল বুখারী,** অধ্যায়– রোফ অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নফল রোযা ভাঙ্গার জন্য তার ভাইকে কসম দিল। ৫ম খণ্ড, পৃ ১১৩।

৮০. **সহীহ আল বুখারী,** অধ্যায়– মর্যাদা, অনুচ্ছেদ– আইয়ামে জাহেলিয়াত, ৮ম খণ্ড, পৃ ১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত হাদীস থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু বিভিন্ন প্রয়োজনে মাহিলা সাহাবীদের ঘরে গিয়েছেন।

চতুর্থ সমস্যা ঃ পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নারীকে এই কাজে সার্বক্ষণিক আত্মনিয়োগের দাবি জানায় এবং একাজ থেকে তার মনোযোগ ছিন্ন করে এমন কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে বাঁধা দেয়। তাই কারো কারো মতে নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ পারিবারিক ও সাংসরিক জীবন বিনাশ করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সময়কালীন মহিলা সাহাবীদের কর্মতৎপরতা এবং আসহাবে রাসূলের জীবনী তা প্রমাণ করে না।[৮১]

---

৮১. আমরা ইতোপূর্বে মহিলা সাহাবীদের সংগ্রামী জীবন, ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগ, কুরবানী, হিজরত, জীবন দান, উল্লেখ করেছি। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগের নারীরা যদি ঈমানের পক্ষে লড়াই করতে করতে শহীদ হতে পারে, দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজত করার জন্য বাপ-মায়ের ভিটামাটি ছেড়ে হিজরত করতে পারে। ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধাদের উৎসাহিত করে থাকে সেবা শুশ্রূষা করতে পারে, আক্রান্ত হলে কাফের সৈন্যদের মোকাবেলা করতে পারে, রাজনৈতিক তথ্য আদন প্রদানে রাজনৈতিক দূতের ভূমিকা পালন করতে পারে, যে কোন বিপদ মোকাবিলায় উপযুক্তি পরামর্শ দিয়ে জাতীয় সংকট থেকে উত্তরণে সহযোগিতা করে থাকে তাহলে, বিংশ শতাব্দীর এই যুগে দ্বীন ইসলামের হেফাজতের এই লড়াইয়ে নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে যারা এই কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং যারা নেপথ্যে থেকে এই কাজে আঞ্জাম দিয়েছন তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই রাজনৈতিক গতিধারার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত থেকেছেন, প্রস্তুতি নিয়েছেন। প্রভাব খাঁটিয়েছেন, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। একাজ তৎক্ষণিক কোন ঘটনা নয় বরং নিরবিচ্ছিন্ন ঘটনা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার নিরলস প্রচেষ্টাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ইতিহাস প্রমাণ করে এই সকল ত্যাগী মায়েদের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই সকল মায়েদের তত্ত্বাবধানে তাঁদেরই আদর্শে লালিত পালিত হয়েছিলেন ইতিহাস বিখ্যাত মুজাহিদগণ। যা তাদের পারিবারিক জীবনকে বিনাশ করেনি। হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাযী আল্লাহু 'আনহা যিনি ৪০ বছর বয়সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিয়ে করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাযী আল্লাহু 'আনহা একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ৪০ বছর বয়সে নবুয়াত পেলেন তাঁর আগ পর্যন্ত প্রতিবছর একমাস তিনি লোকালয় থেকে দূরে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে ইবাদত করে কাটাতেন। (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, **সহীহুল বুখারী,** (দেওবন্দ ঃ আল মাতাবাতুর রুহীমিয়া, ১৩৮৭ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃ ২। হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর গর্ভে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এরপরও রাসূল (স) এর নবুয়াতের পর চরম নির্যাতনের দশ বছর এবং নবুয়াতের পূর্বের পনের বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হেরা পবর্তে খাবার পৌছান, ব্যবসা পরিচালনা করা, ছয়টি সন্তান গর্ভে ধারণ করা, লালন করা এবং সার্বক্ষনিকভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় সহযোগী ছিলেন হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ কাজে এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তিনি

Dhaka University Institutional Repository

উম্মে আম্মার রাযী আল্লাহু 'আনহা যিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে করতে শহীদ হয়ে যান। আবু সাইফী রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর কন্যা রকীকা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর কাছে সংবাদ আদান প্রদান করেন। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহা মাত্র ১৭ জন লোকের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি দীর্ঘ হায়াতে ইসলামের জন্য সার্বক্ষণিক সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর মত পুত্র তৈরি করেছিলেন।

হযরত খানসা রাযী আল্লাহু 'আনহা নিজে চারটি পুত্র সন্তান নিয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই সন্তানদের এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলেছেন যে, চারটি সন্তানই কাদেসিয়ার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এরকম আরো অনেক মহিলা সাহাবী দ্বীনের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

পঞ্চম সমস্যা ঃ জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে জনগণের সুখ শান্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল কাজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে হয়। বিশেষ করে সংকটময় মুহূর্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে সদা সর্বদায় নিযুক্ত থাকতে হয়। অথচ নারীর শারীরিক গঠন, তার জৈবিক উপাদান ও মানসিক অবস্থা সাধারণত এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মোটেই উপযোগী নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৮২]

বলেন– আল্লাহর কসম। তিনি আমাকে খাদিজা রাযী আল্লাহু 'আনহু চাইতে উত্তম স্ত্রী দেননি। যখন জনগণ আমাকে অস্বীকার করল তখন সেই খাদিজাই সর্বপ্রথম আমার নবুয়াতের উপর ঈমান এনেছিল। যখন মক্কার লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন সে আমাকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সে নিজের ধন সম্পদ আমার জন্য কুরবানী করে দিয়েছেন। একমাত্র তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহপাক আমাকে সন্তান-সন্ততি দান করেন।

৮২. ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরাই পুরুষের চেয়ে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে জাতীয় সংকট নিরসনে দৃষ্টান্তমুলক ভূমিকা রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত সাফিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহু খন্দক যুদ্ধের সময় সকল মহিলাদের সহ "কারা' নামক কেল্লায় অবস্থান করছিলেন বনু কোরায়যার এই কেল্লার মালিক ছিল হাসসান রাযী আল্লাহু 'আনহা। তাকে এই কেল্লার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। ইহুদীদের দ্বারা এই কেল্লা আক্রান্ত হলে হযরত হাসসান রাযী আল্লাহু 'আনহা মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে তখন হযরত সাফিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা তাৎক্ষণিকভাবে ঐ ইহুদীকে আঘাত করেন এবং শত্রু পক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ঐ ইহুদীর গলা কেটে কেল্লার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। ইহুদীরা এই খণ্ডিত মস্তক দেখে ভিতরে শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে মনে করে ভয়ে সবাই পালিয়ে যায়। (**উসওয়ায়ে সাহাবিয়াত,** পৃ ২৮)। উম্মে আম্মার রাযী আল্লাহু 'আনহা ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করে পুরুষের মতই অতুলনীয় বীরত্ব, দুর্দমনীয়, সাহসিকতা ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু পরে তাদের মধ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সময়ে পুরুষ সাহাবীদের অবর্তমানে উম্মে আম্মার দ্রুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তীর ও তরবারি চালাতে শুরু করে দিলেন। এই সময় শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

অথচ নারীরা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে তাদের দৈহিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের অসংখ্য দায়িত্ব পালন করেছেন একথা ইতিহাস প্রমাণ করে।[৮৩]

ষষ্ঠ সমস্যা ঃ রাষ্ট্র প্রধান অথবা জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন একজন নারীর গর্ভধারণের জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারে বলে কারো কারো মত।[৮৪]

আমরা জানি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও সংঘর্ষকালে সকল মু'মীন মুসলমানদের জীবনের লক্ষ্যই ছিল দ্বীনের বিজয়, তাই নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এ কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে আমরা দ্বীন ও ঈমান নিয়ে স্বদেশ ও বিদেশে এক সংকটকাল অতিক্রম করছি, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সময়কাল থেকে আরো কঠিন সময়।

এখন মুসলিম নারী ঈমান ও ইজ্জত নিয়ে নিরাপদ নয় কোথাও। একের পর এক মুসলিম রাষ্ট্র আক্রান্ত হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী শক্তি দ্বারা। ফলে অগণিত পুরুষ ভাইদের সাথে

তীর বল্লমের আঘাতে উম্মে আম্মারার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমি ডানে ও বামে তাকিয়ে দেখেছি উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু 'আনহা আমাকে রক্ষা করার জন্য প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেছে। তাঁর পুত্রকে আহত করেছিল যে ব্যক্তি, তাকে সামনে পেলে তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করে, করে , তাকে হত্যা করে স্বীয় পুত্রের ওপর আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। একজন অশ্বারোহী সৈন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালালে তিনি ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষা করেন এবং ফিরে যাওয়ার সময় ঐ সৈন্যের অশ্বের পা কেটে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠলেন। আজ উম্মে আম্মারা তুলনাহীন সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। ওহুদ ছাড়াও খায়বর, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি যোগদান করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তার হাতখানা শহীদ হয়ে যায় (তাবকাতে ইবন সায়াদ) মহিলা সাহাবীদের এরকম অসংখ্য নজীর রয়েছে যারা সংকটে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শারিরীক গঠন, মানসিক অবস্থা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। (মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪-৫৫)।

৮৩. আজনাদিন এর যুদ্ধে হযরত ইকরামা শহীদ হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর হযরত খালিদ ইবনে সায়ীদের সাথে ইকরামা (রা) উম্মে হুকাইম রাযী আল্লাহু 'আনহুর পুনর্বিবাহ হয়। কিন্তু বাসর রাতেই রোমানদের আক্রমণ শুরু হওয়ায় উম্মে হুকাইম রাযী আল্লাহু 'আনহু প্রতিরক্ষা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাতজন সৈন্যকে খতম করতে সক্ষম হন। এখানে নারীর স্বভাবসুলভ আবেগকে তিনি কোরবানী করছেন। (আল ইস্তিয়াব) ইয়ারমুকের যুদ্ধে আসমা বিনতে ইয়াজীদ নাম্মী মহিলা সাহাবীর হাতে নয়জন রোমান সৈন্য নিহত হয় (আল ইসাবা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫)।

৮৪. নারীর গর্ভধারণের এই প্রকৃতিগত দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালন করেছিলেন বিবি খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা, উম্মে আম্মারা, উম্মে হুকাইম রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর মত সাহাবীরা এবং সাথে সাথে হিজরত, জেহাদ, দাওয়াত দান, জ্ঞানার্জন, সহ সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়া অথবা রাষ্ট্রীয় কোন দায়িত্ব পালন করা, নির্দিষ্ট এবং খুবই সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বরং এই প্রতিনিধি নির্বাচন ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ, ইসলাম সম্পর্কে সমাজের ভুল ধারণা অপনোদন এবং সাথে সাথে ইসলামের সঠিক ধারণাকে তুলে ধরার দায়িত্ব সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরজ। যা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না।

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ হচ্ছেন ও নির্যাতিত হচ্ছেন মুসলিম মা, বোন শিশুরা। তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংকটকালের মতই মুসলিম মা বোনদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।[৮৫]

বর্তমান অবস্থানে নারী জাতিকে সংকট মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৪৮ সালে বলেন– মুসলিম মহিলাদের প্রয়োজনীয় সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবো। ইসলাম প্রবর্তিত বিধি-নিষেধ লংঘন করার প্রয়োজন হবে না ইনশাআল্লাহ। আমরা এমন সব যালেম শক্তির মুখোমুখি হয়েছি যারা মানবতার মুখে পদাঘাত করতে একটুও ইতস্তত করে না। আল্লাহ না করুন আগামীতে যদি কোন যুদ্ধের মধ্যে আমরা নিক্ষিপ্ত হই, তাহলে আমাদেরকে যে চরম বর্বরতার সম্মুখীন হতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের, ঘোড়া সওয়ারী, মটর সাইকেল চালানো, ফাস্ট এইড সম্পর্কে ট্রেনিং নিলেই চলবে না প্রয়োজন হলে যুদ্ধে পুরুষদেরকে সাহায্য করার মতো ট্রেনিং গ্রহণ করা উচিত।[৮৬]

মুসলমানদের অবস্থা বর্তমানে আরো কঠিন হয়েছে। সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা ডুবে যাচ্ছে। মুসলিম জাতিসত্তাকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে। সুতরাং আমাদের সমাজে যেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই বরং একে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র চলছে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন কৌশলে। আর এ ক্ষেত্রে মেয়েরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইসলাম বিরোধী নারী এবং পুরুষ বাতিলের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে। কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রিয় মহিলারা বিভিন্ন অজুহাতে পিছিয়ে থাকছে। অথচ আমাদের মূল লক্ষ্য পৃথিবীর বুকে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই মহিলাদের এ সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন সংসারে, সমাজে তেমনি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও।[৮৭]

তাই নারী নেতৃত্বকে কোন বিতর্কের বা সমর্থন অথবা বিরোধিতার বিষয়বস্তু না বানিয়ে কেবল বাস্তবতার দৃষ্টিতে একজন নারীর নেতৃত্বের উত্থানের পটভূমি এবং একজন পুরুষ নেতৃত্বের ব্যর্থতার পর্যালোচনা করা উচিত। বরং এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ইসলামী নেতৃত্ব বনাম অনৈসলামিক নেতৃত্ব আংশিক হলেও।

---

৮৫. ইসলামের এই ঘোর বিপদের দিনে ভারতের মুসলমানরা নির্যাতিত, বসনিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, আমেরিকা, রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে মুসলিম নিধন চলছে। তাই পুরুষ ভাইদের পাশাপাশি নারী সমাজকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যখন ভাই থাকবে জেলে স্বামী সন্তান হবে শহীদ। তখন মুসলিম নারী যাতে বীরদর্পে মোকাবেলা করতে পারে ইসলামের দূর্গকে। সে কারণেই মুসলিম নারীকে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

৮৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী** (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, জমাদিউল আউয়াল– ১৪২১, আগস্ট– ২০০০খ্রিঃ), পৃ ২১-২২।

৮৭. শামসুন্নাহার নিজামী, **দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব** (ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, জিলহজ্জ– ১৪১৪, জুন– ১৯৯৪)।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাসুল (স)-এর যুগে উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহাবী ও তাঁদের অবদান

উম্মুল মু'মীনিন হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাযী আল্লাহু 'আনহা।

যখন হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর সাথে বিবাহ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স ছিল ২৫ বছর। আর হযরত খাদীজার বয়স ছিল ৪০ বছর। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বপ্রথম বিবাহ। খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা জীবিত থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন বিবাহ করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন পঞ্চাশ বছর তখন হযরত খাদীজা ৬৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।[১] ইতোপূর্বে হযরত খাদীজার আরো দুই বিবাহ হয়েছিল।[২] হযরত খাদীজার গর্ভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয় শৈশবেই পরলোক গমন করেন। কন্যাদের নাম হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা, হযরত যয়নব, হযরত রুকাইয়্যা ও হযরত উম্মে কুলসুম।[৩]

হযরত খাদীজাই ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুসলমান। কাফিরদের যুলুম অত্যাচারের অবাধ বন্যা যখন বয়ে চলেছিল তখন তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সহায় ও পরামর্শ দাতা। শত্রুতার চৌমুখী ঝঞ্ঝা বায়ু যখন তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলত তখন হযরত খাদীজাই তাঁকে সান্তনা দিতেন। হযরত খাদীজা স্বীয় গুণ-গরিমা ও ভালবাসা দ্বারা রাসূলের অন্তর রাজ্য দখল করে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ও এই ভালবাসায় ভাটা দেখা দেয়নি।[৪]

---

১. ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা; **যাদুল মা'আদ** (মিসর ঃ মাত্‌বা 'আ মুস্‌তফাল বাবিল হলবী, ১৯০৫ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃ ২৬।

২. আবু হালা ইবন যরারার সাথে তার প্রথম বিবাহ হয়। আবু হালার ঔরসে হিন্দ নামক এক পুত্র ও যয়নব নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। আবু হালার মৃত্যুর পর 'উতায়্যিক ইবন 'আবিদ এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। উতায়্যিক্যের ঔরসে হিন্দ নামক তাঁর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। উতায়্যিকের মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে তাঁর তৃতীয় বিবাহ হয়। (শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, ড. এইচ এম মুজতবা হোছাইন; **হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন,** ঢাকা ঃ ১৯৯৮ খ্রিঃ/১৪১৯ হিঃ, ঢাকা ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, পৃ ৯৬১)।

৩. শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী** (আযমগড় ঃ মাতবা মা'আরিফ, ১৩৬৯ হিঃ) ২য় খণ্ড, পৃ ১৮৪-১৮৫।

৪. **এ প্রসংগে একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য–** হযরত খাদীজার মৃত্যুর পর একদিন তাঁর ভগ্নি 'হালা' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহার সাথে তাঁর কণ্ঠস্বরের কিছু সামঞ্জস্য ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর কথা স্মরণ করতঃ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলে উঠলেন–

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খাদীজার (রা) শ্রেষ্ঠত্ব

عَنْ عَلى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نَسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةَ ـ

"আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মারয়াম ছিলেন (পূর্ববর্তী) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর খাদীজা (বর্তমান উম্মতের মধ্যে) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[৫]

عَنْ أبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أتَى جِبْرِيْلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِه خَدِيْجَةُ قَدْ أتَتْ مَعَهَا اَنَاءٌ فِيْهِ أدَامٌ أوْ طَعَامٌ أوْ شَرَابٌ فَإذاَ هِىَ أتَتْكَ فَاقْرَأ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّى وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِىْ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ ـ

"আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জিবরাইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে খাদীজা একটা পাত্র নিয়ে আসছেন তাতে তরকারী কিংবা (বলেন) খাবার অথবা কোন পানীয় দ্রব্য রয়েছে, (বলেন) যখন তিনি আপনার নিকট আসবেন তখন আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মণিমুক্তা খচিত এমন একটা প্রাসাদের সুসংবাদ দিন– যেখানে না কোন শোরগোল হবে এবং না কোন কষ্ট-ক্লান্তি থাকবে।[৬]

উপরোক্ত হাদীস থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদান সুস্পষ্টভাবে উপলব্দি করা যায়। খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা মহানবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর শুধু সহধর্মিনীই নন, তিনি তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম কর্মীও। খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা ওফাতের

সম্ভবত 'হালা' এসেছে। হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহার এটা ভাল লাগল না। তাই তিনি বললেন– আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বহু ভাল স্ত্রী দান করেছেন এখনও কি আপনি সেই মৃত বৃদ্ধার কথা ভুলতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– ভুলতে পারিনি এবং কখনো পারব না। যখন লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করতে তখন খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল– যখন সমস্ত লোক কাফির ছিল তখন খাদীজা ছিল মুসলমান– যখন আমি নিঃসহায় ছিলাম তখন একমাত্র খাদীজাই ছিল আমার সহায়। তাঁর গর্ভ থেকেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন। আল্লাহর শপথ আমি খাদিজার চেয়ে উত্তম স্ত্রী পাইনি। (ইবন 'আবদুল রব, **আল্ ইস্তীআব,** বৈরুত ঃ দারুল জেল, ১৯৫৩ খ্রিঃ, ২য় খণ্ড, পৃ ৭৪০-৭৪১)।

৫. **অনুবাদ** ঃ মাওলানা আফলাতুন কায়সার ও অন্যান্য, ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদ ঃ খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিয়ে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে। (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০০ খ্রিঃ / রমযান ১৪২১ হিঃ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৫৮৮)।

৬. **সহীহ আল বুখারী,** প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ ৫৯০।

Dhaka University Institutional Repository

পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যতটুকু স্ত্রী হিসেবে স্মরণ করতেন তার চেয়েও বেশি স্মরণ করতেন প্রথম মুসলমান ও শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসেবে।[৭]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা।

উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা সিদ্দিকা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাযী আল্লহু 'আনহা। তাঁর মায়ের নাম উম্মে রোমান বিনতে আমের ইবনে ওয়াইসির। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির চতুর্থ সনে তাঁর জন্ম হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই নবী ছিলেন। সকলের নিকটেই আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। হায়য্, নিফাস, প্রসব ও স্বামী সহবাস সম্পর্কীয় শরী'আতের বহু মাস্'আলা এরূপ আছে যা একমাত্র নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো নিকট খুলে বলা যায় না। মোটকথা নারী বিষয়ক মাসআলাসমূহ প্রচারের জন্য হযরত 'আয়িশার ন্যায় ধীশক্তিমান, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী নারীরই প্রয়োজন ছিল।[৮]

সুতরাং আল্লাহর তরফ হতে এই ব্যবস্থারই নির্দেশ আসল। দু'বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন।[৯]

---

৭. খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে শিবে আবিতালিবে অন্তরীণের সময় সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করেছেন, সর্ববিধ সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতকে শক্তিশালী করেছেন। সংকটকালে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন। অঢেল সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন হুকুমাতে এলাহিয়া কায়েম করার কাজে। কাফেরদের দেয়া সকল আঘাত তিনি ভুলে যেতেন খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর সান্নিধ্যে এলে। সুতরাং বিবি খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মায়া মমতা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে, অর্থ-সম্পদ দিয়ে, তাকে দুঃখে সান্ত্বনা দিয়ে, অভিভাবকের মত ছায়া দিয়ে রেখেছেন। এই আপনজন হিজরতের তিন সাল পূর্বে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহর তাঁর এই প্রিয় সাথীর ইন্তিকালে ঐ বছরকে "শোকের বছর" হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁর মৃত্যুতে মুসলমানদের এক বিরাট শক্তিশালী আশ্রয়স্থল এবং আপনজনকে হারান। ইসলামের ইতিহাসে এই মহিয়সী নারীর অবদান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। (মুহাম্মদ নূরুয্যামান, **সংগ্রামী নারী,** ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিঃ, শাবান–১৪১৭, পৃ ২৪-২৫)।

৮. ড. মুজতাবা, **হযরত মুহাম্মদ (সা) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬৫।

৯. **সহীহ বুখারী,** ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩১।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اُرِيْتُكَ فِىْ الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اَرى اَنَّكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ وَيَقُوْلُ هَذِه اِمْرَأتُكَ فَاكْشِفُ عَنْهَا فَاِذَا هِىَ أنْتِ فَاقُوْلُ اِنْ يَّكَ هَذا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ ـ

"আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মাঝে দু'বার তোমাকে আমায় দেখান হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তুমি এক খণ্ড রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতা। আমাকে বলা হল ঃ ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখাবরণ উন্মোচন করে দেখি যে,

Dhaka University Institutional Repository

যখন নবুওয়াতের দশম বর্ষ তখন হযরত 'আয়িশার বয়স মাত্র ছয় বছর। এই বছরেই হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা ইন্তিকাল করেন। হযরত খাদীজার মৃত্যুর পর হযরত খাওলা বিনতে হাকীম[১০] রাসূলের সম্মতিক্রমে হযরত আয়েশার মাতা উম্মে রোমানের[১১] নিকট তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করলেন। তিনি স্বামীকে এই সংবাদ পৌঁছলেন। একথা শুনে হযরত আবূ বকর হযরত খাওলার মধ্যস্থতায় রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সাথে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এ প্রসংগে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর বর্ণনা–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا بِنْتُ سِتُّ سِنِيْنَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِيْ بَنِيْ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِىْ فَوَفَى جُمَيْمَةً فَاَتَتْنِيْ اُمِّيْ اُمُّ رُوْمَانَ وَاِنِّى لَفِيْ اُرْجُوْحَةٍ وَمَعِيْ صَوَاحِبُ لِيْ فَصَرَخَتْ بِيْ فِاتَيْتُهَا لاَ أدْرِىْ مَا تُرِيْدُبِيْ فَاخَذَتْ بِيَدِىْ حَتَّى أوْ فَقَتَنِيْ عَلى بَابِ الدَّار وَانِّيْ لاَ نْهِجُ حَتّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِيْ ثُمَّ أخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ به وَجْهِيْ وَرَأسِيْ ثُمَّ اَدْخَلَتْنِيْ الدَّارَ فَاِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرْكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَاَسْلَمَتْنِيْ إلَيْهِنَّ فَأصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِيْ فَلَمْ يَرُعْنِيْ الاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَاَسْلَمَتْنِيْ اِلَيْهِ وَأنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করেন। তারপর আমরা মদীনায় আসলাম এবং বনী হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রে অবতরণ করলাম। তারপর আমি এমন মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হলাম যে, আমার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল এবং সামান্যই মাত্র রয়ে গেল। অতঃপর আমার চুল নতুনভাবে গজিয়ে যখন তা কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছল তখন একদিন আমি আমার সঙ্গিনীদের সাথে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার মা উম্মে রুমান আমার কাছে এসে আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকটে আসলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিয়ে কি করতে চাচ্ছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। তারপর তিনি আমার হাত ধরে চলতে চলতে একটা ঘরের দরজায় এনে আমাকে দাঁড় করালেন। আমি তখন হাঁপাচ্ছিলাম। অতঃপর আমার

সে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই।"

১০. মাওলানা শিবলী নু'মানী, **সীরতুন্নবী** (আযমগড় ঃ মাতবা মা'আরিফ, ১৩৬৯ হিঃ) ২য় খণ্ড, পৃ ৪০৬।

১১. ইতঃপূর্বে হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু হযরত আয়েশাকে যুবায়র ইবনে মুত্‌আমের পুত্রের নিকট বিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্ত্রীর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর প্রস্তাবের কথা শুনে তিনি বললেন– আমি যুবায়রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এখন কি করা যায়? আমিতো জীবনে কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ কখনও লজ্জিত হয় না। হঠাৎ একদিন যুবায়র বলে উঠল– আমার পুত্রের জন্য আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা -কে আনলে আমার ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে। সুতরাং এই বিবাহের প্রয়োজন নেই।

Dhaka University Institutional Repository

শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে কয়েকজন আনসার মহিলা রয়েছেন। তাঁরা বললেন ঃ আগমন কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ হোক এবং ভবিষ্যৎ শুভ হোক। মা আমাকে তাদের হাতে সোপার্দ করলেন। তাঁরা আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করলেন। তারপর পূর্বাহ্ন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগমনই আমাকে চকিত করে তুলল। যখন তাঁরা (আনসার মহিলারা) আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ঐ সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।[১২]

হযরত 'আয়েশা বলেন– শুধু আমার ঘরে আমার লেহাফের নিচে থাকাকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে, অন্য কোন পত্নীর ঘরে এরূপ হয়নি। একপাত্র হতে পানি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে গোসল করেছেন, অন্য কোন পত্নীর সাথে এরূপ করেননি। আমার ঘরে আমার বুকের উপর মাথা রেখে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেছেন।[১৩]

কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ফত্ওয়া মোটকথা ইসলামী শিক্ষার সকল বিভাগেই তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা কর্তৃক সংশোধিত বিষয়সমূহ সংগ্রহ করে 'আল্লামা সুয়ূতী একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন।[১৪] শরী'আত সংক্রান্ত কোন সূক্ষ্মও জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে তদানিন্তন বড় বড় 'আলিমগণ মীমাংসার জন্য হযরত 'আয়িশার খিদমতে উপস্থিত হতেন। হযরত আবু মূসা রাযী আল্লাহু 'আনহু বলেন– কোন জটিল সমস্যা নিয়ে আলিমগণ হযরত 'আয়িশার নিকট উপস্থিত হলে এর সমাধানের যথোপযুক্ত জ্ঞান তাঁর নিকট পেতেন।[১৫]

হাদীস গ্রন্থ সমূহে হযরত 'আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা কর্তৃক ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন 'আলিমের মতে শরঈ বিধানাবলির এক চতুর্থাংশ হযরত 'আয়িশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যারা শরঈ-বিধানাবলি বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা সহস্র সহস্র। যদি একা

---

১২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, অনুবাদ- মাওলানা আফলাতুন কায়সার ও অন্যান্য, **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর বিয়ে, আয়েশার মদীনায় আগমন এবং স্বামী গৃহে গমন। (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০ খ্রিঃ/ ১৪২১ হিঃ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৬৩০।

১৩. ইবন সায়্যিদুন্নাস, **'উয়ূনুল আসর** (বৈরুত ঃ দারুল জেল, ১৯৭৪) ২য় খণ্ড, পৃ ৩০২; জালালুদ্দীন সুয়ূতী, **আল কানযুল মদফুন** (মিসর ঃ মুসতাফাল বাবিল হালবী, ১৯৩৯ খ্রিঃ) ৫ম খণ্ড, পৃ ৭।

১৪. শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী** (আযমগড় ঃ মাতবা মা'আরিফ, ১৩৬৯ হিঃ) ২য় খণ্ড, পৃ ৪০৭। হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু, হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু ও হযরত 'উস্মানের খিলাফতকালে তিনি ফত্ওয়া দিতেন। নামযাদা সাহাবীগণ যাঁরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহচর্যে থেকে জ্ঞানার্জন করেছিলেন, তাঁরা কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি করলে হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা তা সংশোধন করতেন।

১৫. মাওলানা 'আব্দুর রউফ দানাপুরী, **আসাহ্হুস্ সিয়ার** (ঢাকা ঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৯০ খ্রিঃ) পৃ ৫৭১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত 'আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা কর্তৃক এক চতুর্থাংশ বর্ণিত হয়ে থাকে তবে এর দ্বারা তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও প্রাচুর্য উপলব্ধি করা যায়।[১৬]

সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস এবং বংশ তালিকার সূত্র পরম্পরা সম্পর্কেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। অন্ধযুগের কবিদের সুদীর্ঘ কবিতাসমূহ তিনি কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন। মোটকথা বিশ্বজগতে নারীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদূষী।[১৭] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর ইন্তি কালের পর তিনি ৪৮ বছর জীবিত থাকেন। এই সময় তিনি দ্বীন প্রচার এবং বিদ্যা চর্চায় অতিবাহিত করেছেন।

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা–এর মর্যাদা

عَنْ أَبِيْ مُوْسى ألأشْعَرِىّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِـيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ أمْرَأةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَىَ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلى سَائِرِ الطَّعَامِ -

আবু মুসা আশাআরী রাযী আল্লাহু 'আনহু[১৮] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে কামালিয়াত অর্জন করেছেন কেবল ফিরআউনের স্ত্রী আসীয়া ও ইমরানের কন্যা মারয়াম। আর যাবতীয় খাদ্যের ওপর 'সরীদ' –এর মর্যাদা যেমন, সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপর আয়েশার মর্যাদা ও তেমন।[১৯]

১৬. শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৭।

১৭. শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৭-৪০৮।

১৮. **আবু মুসা আশআরী রাযী আল্লাহু 'আনহু ঃ** হযরত আবু মুসা ইসলামের পরিচয় লাভ করে ইয়ামেন থেকে মক্কায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতে বাইয়াত হন। আবু মুসা রাযী আল্লাহু 'আনহু ছিলেন অত্যন্ত সরল ও সাধাসিধে প্রকৃতির। ধোঁকা ও কূটনীতি কি জিনিস তা তিনি জানতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিশেষ নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল হযরত আবু মূসা রাযী আল্লাহু 'আনহু সেই সব বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় যে ছয় ব্যক্তি ফাতওয়া দানের অনুমতি পেয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু বলতেন– মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবু মুসা ইলমের রঙে রঞ্জিত। আবু মূসা আশআরী রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর তেলাওয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই পছন্দ করতেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৬০। তন্মধ্যে ৫০টি মুত্তাফাক আলাইহি, ৪৫টি বুখারী এবং ২৫টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

১৯. **সহীহ বুখারী,** প্রাগুক্ত, ৩য়খণ্ড, পৃ. ৫৬৮ - ৫৬৯। আমাদের দেশে চাল ও গোশত একত্রে যেমন বিরয়ানী পাক করা হয়, আরবে তেমনি রুটি টুকরা টুকরা করে গোশতের সাথে একত্রে পাক করা হয়। এ রুটি গোশতের সংমিশ্রণে প্রস্তুত খাদ্যকে সারীদ বলা হয়। সারীদ সুস্বাদু রুচিকর বলে আরবদের নিকট সর্বাধিক সমাদৃত। (**সহীহ বুখারী,** ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬৯)।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِى طَلَبِهَا فَادْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذٰلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ أٰيَةُ التَّيَمُّمُ فَقَالَ أَسَيْدُبْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرُقَطْ اِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً ـ

'আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তার বোন আসমার নিকট থেকে একটা হার ধার নেন। তারপর সেটি (যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে) পড়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের কয়েকজনকে ঐ হারের তালাশে পাঠান। পথিমধ্যে নামাযের সময় হলে সাহাবীরা (পানি না পেয়ে) বিনা অযূতেই নামাজ পড়েন। তারপর তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট ফিরে আসেন তখন ব্যাপারটা তাঁর নিকট পেশ করেন। ঐ সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হুযাইর বলেন ঃ হে আয়েশা! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম! যখনই আপনি কোন সংকটে পড়েছেন তখনই আল্লাহ আপনার জন্য তার সমাধানের একটা পথ খুলে দিয়েছেন এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য তার মধ্যে বরকত দান করেছেন।[২০]

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِىْ إِلى أُمِّ سَلْمَةَ فَقُلْنَ يَا أُمَّ سَلْمَةَ وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَانَّا نُرِيْدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيْدُه عَائِشَةُ فَبُرِىْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوْا إِلَيْهِ حَيْثُ مَا كَانَ أَوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذَالِكَ أَمَّ سَلْمَةَ لِلنَّبِىِّ صلعم قَالَتْ فَاعْرَضَ عَنِّى

---

২০. **সহীহ বুখারী,** অধ্যায় ঃ মানাকির, অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর মর্যাদা, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ ৫৭০। এই ঘটনার সময় পানি না পাওয়া গেলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে করণীয় কর্তব্য বলে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহ পাক বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ـ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ ـ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাক তখন নামাযের কাছেও যেয়ো না। নামায তখন পড়বে যখন তোমরা কি বলছ, তা সঠিকরূপে জানতে পারবে। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও নামাজের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল করে নিবে; কিন্তু যদি প অতিক্রমকারী অবস্থায় থাক তবে অবশ্য অন্যরূপ হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় াক, অবা তোমদের মধ্যে কেউ যদি পায়খানা করে আসে, কিংবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাক, আর তারপর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ কর এবং উহা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল ও হাত 'মসেহ' কর। আল্লাহ নিঃসন্দেহে কোমলতার সাথে কাজ নিয়ে থাকেন ও তিনি ক্ষমাশীল। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ৪৩)। এভাবে আল্লাহ সুবহানুতায়ালা সমগ্র জাতির জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান দিয়েছেন শরীয়াতের বিধান নাযিল করেছেন। হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর সম্মান এ কারণেই তিনি অন্যদের তুলনায় মর্যাদাবান।

Dhaka University Institutional Repository

فَلَمَّا عَادَ اِلَىَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَاعْرَضَ عَنِّيْ فَلَمَّا كَانَ فِيْ الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَـهُ فَقَـالَ يَـا اُمَّ سَـلْمَةَ لاَ تُؤْذِيْنِيْ فِيْ عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا نَزَلَ عَلَىَّ الْوَحْىُ وَاَنَا فِى لِحَافِ إمْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا ـ

"আবু হিশাম রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা তাদের যাবতীয় হাদীয়া উপঢৌকন যে দিন রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার গৃহে অবস্থান করতেন সেদিন প্রেরণ করত। আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা বলেন ঃ একদিন আমার সঙ্গিনীরা উম্মে সালামার নিকট একত্রিত হয়ে বলল ঃ হে উম্মে সালামা! আল্লাহর কসম! লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের হাদীয়া আয়েশার জন্য নির্দিষ্ট দিন পাঠিয়ে থাকে। অথচ আয়েশার মতো আমাদেরও কল্যাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে। কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন, তিনি যেন লোকদেরকে বলেদেন যে, তিনি যখন যেখানে থাকবেন কিংবা যে ঘরে থাকবেন তারা যেন সেখানেই হাদীয়া পাঠিয়ে দেয়। আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা বলেন ঃ উম্মে সালামা এ ব্যাপারটা রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বললেন। উম্মে সালামা বলেন ঃ নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। তারপর পুনরায় যখন আমার নিকট এলেন তখন আমি ব্যাপারটা পুনরুল্লেখ করলাম। এবারও তিনি আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। অতঃপর তৃতীয়বার যখন আমি তাঁকে বললাম, তখন তিনি বললেন ঃ হে উম্মে সালামা! আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা, আল্লাহর কসম! আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে অন্যকোন স্ত্রীর বিছানায় আমার নিকট ওহী আসেনি।[২১]

উম্মুল মু'মিন হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর জীবন খুব ঘটনা বহুল। আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনকালে এবং তাঁর তিরোধানের পরও তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইফকের ঘটনা।[২২]

---

২১. **সহীহ বুখারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭০। এই হাদীসে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য স্ত্রীদের চাইতে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন।

২২. **'ইফক'** শব্দের অর্থ মূল কথাকে উল্টিয়ে দেওয়া, প্রকৃত সূত্রের বিপরীত যা ইচ্ছা বলে দেওয়া। এই অর্থের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া কথা অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুনাফেকগণ আল্লাহ ও তার রাসূলের দুশমন। তারা কখনও ইসলামের বুলন্দ মরতবা কামনা করে না। মদীনার মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইসলামের উত্তরোত্তর সফলতার জন্য খুবই নাখোশ ছিল। মুসলিম সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করার জন্য এরা বিভিন্ন কুটিলপন্থা অবলম্বন করে। আব্দুল্লাহ বিন উবাই ফেতনা সৃষ্টি করার জন্য উম্মুল মু'মিন হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের মারাত্মক প্রচারণা শুরু করে। ফলে আল্লাহর রাসূল মানসিক অশান্তি ভোগ করতে থাকেন। কিছু সংখ্যক মুসলমান এই জঘন্য প্রচারণায় বিভ্রান্ত হন। অবশিষ্ট মুসলমানরা উত্তেজিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন।

Dhaka University Institutional Repository

বনি মুসতালিকের যুদ্ধের সময় হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সফর সঙ্গী ছিলেন। এই সফরের সময় হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা গলার হার হারিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ইফকের ঘটনা ঘটে।[২৩]

এই মিথ্যা অপবাদ সারা শহরের মধ্যে প্রচারিত হতে লাগল। বিবি আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা প্রায় একমাস অসুস্থ্য হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন, নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব চিন্তিত ও পেরেশানীতে ছিলেন। হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু ব্যথিত শোকাভিভূত এবং পেরেশান। সমগ্র মুসলিমের মধ্যে এ বিষয়টি একটি যন্ত্রদায়ক ও কষ্টকর বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এমনি একদিন দীর্ঘ একমাস পর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর কাছে এসে বসলেন। হযরত আবু বকর এবং উম্মে রুমান তাঁর নিকটে এসে বসলেন।

---

২৩. বনি মুসতালিকের যুদ্ধের সময় হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সফর সঙ্গী ছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার অদূরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি যাপনের জন্য মনযিল স্থির করলেন। পরবর্তী মনযিলে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা তাঁবু থেকে দূরে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন তার গলার হার হারিয়ে গেছে। হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা হার তালাশ করতে গেলেন। কাফেলা প্রস্তুতি নিয়ে রওয়ানা হল। উম্মুল মু'মীনিনকে নিয়ম অনুযায়ী সৈন্য মার্চ করার সময় উট এসে তাঁবুর সামনে বসে হাওদা পালকী বসান হয় হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা তার মধ্যে বসে যেতেন। তিনি এত পাতলা ছিলেন লোকজন অনুভব করতে পারেনি যে, হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা হাওদার মধ্যে নেই। তারা অজান্তে খালি হাওদা উটের উপর চড়িয়ে দিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা হার নিয়ে ফিরে এসে দেখতে পান যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে চলে গিয়েছে। তিনি চাদর গায়ে শুয়ে পড়লেন। ভোরবেলা সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল আমাকে দেখে অবাক হলেন এবং তাঁর উটটি আমার সামনে বসিয়ে দিলেন এবং তিনি রশি ধরে রওয়ানা হলেন। দুপুর নাগাদ তারা কাফেলার সাথে মিলিত হতে পারলেন। হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহাকে দেখামাত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলে উঠল– দেখ তোমাদের নবীর বিবি অন্য লোকের সাথে রাত্রি যাপন করেছে এবং এখন তাকে নিয়ে প্রকাশ্যে আসছে। পবিত্র কুর'আনে এই ঘটনাকে ইফকের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা বলেন– এই কথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। আমার বাবা মা কোনই উত্তর দিলেন না। তখন আমি বললাম ঃ আপনাদের কানে একটি কথা এসেছে, অমনিতা মনের মধ্যে বসে গেছে। এখন আমি যদি বলি; আমি নির্দোষ আল্লাহ সাক্ষী আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি শুধু শুধুই এমন একটা স্বীকার করে নেই যা আমি আদৌ করিনি– আল্লাহ জানেন যে, আমি কোন দোষের কাজ করিনি– তবে আপনারাও তা সত্য বলে মেনে নিবেন। আমি তখন হযরত ইয়াকুব (আ) এর নামটি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা স্মরণে এলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম এমন অবস্থায় আমি সেই কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না, যা হযরত ইউসুফ (আ) এর পিতা বলেছেন– فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَّاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ - (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ ইউসুফ, আয়াত ঃ ১৮) এই কথা বলে আমি অপরদিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই প্রকৃত ব্যাপার লোকদের সামনে উন্মোচিত করে দিবেন। তবে আমার স্বপক্ষে ওহী নাযিল হবে আর তা কিয়ামত পর্যন্ত পড়া হবে। এমন ধারণা আমার মনে কখনো আসেনি। (মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, **আসহাবে রাসূলের জীবন কথা,** বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কাঁটাবন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রিঃ, রমাদান– ১৪২০, পৃ ৯০০)।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আয়িশা! তোমার সম্পর্কে এই সব কথা আমার কানে পৌঁছেছে। তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দিবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোন প্রকার গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর ক্ষমা চাও। বান্দাহ যখন গুনাহ স্বীকার করে, তাওবা করে, তখন আল্লাহ মাফ করে দেন।

এরই মধ্যে আল্লাহ পক্ষ থেকে আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করে 'ওহী' নাযিল হল। আল্লাহপাক সত্যকে সবার সামনে প্রকাশ করে দিলেন।[২৪] ওহী কালীন অবস্থা পেশ হয়ে গেলে রাসূলে কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুবই উৎফুল্লা দেখা গেল তিনি হাসি সহকারে প্রথম যে কথাটি বললেন তা ছিল এই ঃ "আয়িশা তোমাকে সুসংবাদ। আল্লাহর তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে ওহী নাযিল করেছেন।" অতঃপর তিনি কুর'আনের আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন।[২৫] এভাবে কুরআনের আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ পাক হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা কে সম্মানিত করলেন।

---

২৪. হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর নির্দোষের কথা উল্লেখ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল কুর'আনের সূরা আন নূরের আয়াত নাযিল হয়।

إِنَّ الذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ـ لاَ تَحْسَبُوْهُ شَرَّ الَّكُمْ بَـلْ هُـوَ خَـيْرٌ لَّكُـمْ ـ لِكُـلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّااكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ ـ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَه مِنْهُمْ له عَذَابٌ عَظِيْم ـ لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ إِفْكٌ مُّبِيْنٌ ـ

অর্থাৎ– "যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে কর না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছ তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করিনি এবং বলনি যে, এতো নির্জলা অপবাদ।" **(আল-কুর'আন,** সূরা ঃ আন্ নূর, আয়াত ঃ ১১-১২)।

২৫. কুর'আনের এই ঘোষণার পর হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর মা বিবি আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহাকে বললেন ঃ ওঠো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শুকরিয়া আদায় কর। আমি বললাম ঃ আমি না উনার শুকরিয়া আদায় করব, আর না আপনাদের দুইজনের। আমিতো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে কুর'আনের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এই মিথ্যা অভিযোগকে অসত্য বলেও ঘোষণা করেননি। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানা যায় নিম্নোক্ত সূত্র থেকে। (**সহীহ বুখারী,** কিতাবুশ শাহাদাত ৫/১৯৮, ২০১, কিতাবুল জিহাদ ৭/৩৩৩-৩৩৫, কিতাবুত তাফসীর ৮/৩৪৩, ৩৬৭; **সহীহ মুসিলম,** (২৭৭০) কিতাবুত তাওবাহ্, ইবন হিশাম ২/২৯৭, ৩০৭, আনসাবুল আশরাফ, ১ম খণ্ড; **তাফহীমুল কুর'আন**, সূরা আন নূর; **তিরমিযী** (৩১৭৯); **আল বিদায়া** ৩১৬০; **তাফসীরে ইবন কাসীর**– ৩/২৬৮, ২৭২, আস্ সীরাহ– ২/৫১-৫৪; **সিয়ারু আ'লাম,** আন নুবালা– ২/১৫৩-১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ঈলা বা তাখঈর -এর ঘটনা

রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বিবিগণ প্রতিনিয়ত অভাব অনটন ও মিতব্যয়িতার মধ্যে দিয়ে জীবন-যাপন করতেন। ইসলামের জীবনকালে তাঁরা তাঁদের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দাবী জানান। রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় প্রতিজ্ঞা করেন তিনি কোন স্ত্রীর কাছেই এক মাস যাবেন না ২৯ দিন পর তিনি সর্বপ্রথম আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহার ঘরে যান। যেহেতু নবী পত্নীগণ জীবন যাপনের মান বৃদ্ধির দাবিদার ছিলেন। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাখঈর এর আয়াত নাযিল করেন।[২৬] এই আয়াত যখন নাযিল হলো তখন নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু-এর সাথে কথা বললেন। তোমাকে একটি কথা বলছি, খুব তাড়াতাড়ি করে জবাব দিও না। তোমার পিতা মাতার মতামত জেনে নাও। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সূরা আল আহযাবের ২৯ নং আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। সাথে সাথে হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা বললেন ঃ এই বিষয়ে আমার বাবা-মায়ের নিকট কি জিজ্ঞেস করব? আমি তো আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং পরকালের সাফল্যই চাই।[২৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইন্তেকাল

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর বয়স যখন আঠারো বছর তখন স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় শেষের দিকে পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর ঘরে অবস্থান করেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ সময়। আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সুস্থতার জন্য দু'আ করে চলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার তো বড় কষ্ট হচ্ছে। বললেন ঃ কষ্ট অনুপাতে প্রতিদানও আছে। আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা হযরত রাসূলে কারীমকে সামনে নিয়ে

---

২৬. তাখঈর অর্থ এখতিয়ার ও স্বাধীনতা দান করা অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে যাঁর ইচ্ছা দরিদ্র ও অভাব অনটন মেনে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সাথে সংসার ধর্ম পালন করতে পারেন। আর যাঁর ইচ্ছা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন। এই দুইটির যে কোন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার স্ত্রীকে অর্পণ করা। আয়াতটি হল–

وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه وَالدَّارَ الأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا -

অর্থাৎ– "পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (**আল-কুর'আন,** সূরা ঃ আহযাব, আয়াত ঃ ২৯)।

২৭. আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর এমন জবাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুণ খুশি হলেন। এখানেও স্ত্রীদের মধ্যে ত্যাগ ও কুরবানীর ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। (**তাবাকাত,** ৮/৬৯; **সহীহ বুখারী**, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল আহযাব)।

Dhaka University Institutional Repository

বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর দেহের ভার অনুভব করলেন। চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, তিনি আর নেই। আস্তে করে পবিত্র মাথাটি বালিশের উপর রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।[২৮]

হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা সবচেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদা এই যে, তাঁরই ঘরের মধ্যে, এক পাশে রাসূলে পাকের পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়।[২৯]

৬৬ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। এই সময় মারওয়ানের পক্ষ হতে হযরত আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু 'আনহু মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর জানাযা পড়ান। অতপর হযরত আয়িশার অসিয়্যত অনুযায়ী তাঁকে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে রাত্রিকালে দাফন করা হয়।

কাশিম ইবন মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান, আব্দুল্লাহ ইবন আবূ আতীক, উরওয়া ইবন যুবায়র এবং আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র রাযী আল্লাহু 'আনহু তাঁকে কবরে নামান। প্রথমোক্ত দুইজন ছিলেন হযরত 'আয়িশার ভ্রাতুস্পুত্র, আর শেষোক্ত দু'জন ছিলেন তাঁর বোনের ছেলে। আর আব্দুল্লাহ ইবন আবূ আতীক ছিলেন তাঁর ভ্রাতার পৌত্র।[৩০]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদাহ বিনতে যামআহ

উম্মুল মু'মিনীন সাওদা বিনতে যামআহ ইবনে কায়েস ইবনে আবদে শামস। কুরাইশ বংশের বনু আমের গোত্রীয়া। প্রথমে স্বীয় চাচাত ভাই সকরান ইবনে আমেরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগেই তাঁরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবশায় দ্বিতীয় হিজরীতে তাঁরা উভয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হাবশা হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর হযরত সওদা ও তাঁর গর্ভজাতপুত্র 'আব্দুর রহমানকে জীবিত রেখে সকরান পরলোক গমন করেন।[৩১]

হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহার মৃত্যুর পর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েন। বাড়ি-ঘর এবং শিশু ছেলে-মেয়েদের যত্ন এবং

---

২৮. **মুসনাদ আহমদ**– ৬/২৭৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর ঘরে তার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন এবং এ অবস্থায় জীবনের আরো আটচল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেন। যতদিন জীবিত ছিলেন কবরের পাশেই ছিলেন। প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পাশেই ঘুমাতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখার পর সেখানে ঘুমানো ছেড়ে দেন। (মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, **আসহাবে রাসূলের জীবন কথা,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯)।

২৯. **সহীহ আল বুখারী,** বুব ওফাত, আন-নাবিয়্যি।

৩০. মাও. শিবলী নু'মানী, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৪০৭।

৩১. শিবলী নু'মানী, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৪০৩; মুহাম্মদ ইবন সা'আদ, **তাবাকাত** (কায়রো; মাতবা 'আতুস শরকিল ইসলামিয়া, ১৯৬৫ খ্রিঃ), ৮ম খণ্ড, পৃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধান করারও বিশেষ অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় হযরত খাওলা বিনতে হাকীম[৩২] রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন– এই অবস্থায় আপনার একজন সহানুভূতিশীল জীবন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন। অনুমতি পেলে আমি তার জন্য চেষ্টা করতে পারি।

রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মতি পেয়ে খাওলা হযরত সওদার পিতার নিকট গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বিয়ে দিতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং সব বিষয়ের মীমাংসা হয়ে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বররূপে বিবাহ মজলিসে উপস্থিত হলেন। হযরত সওদার পিতা চারশত দিরহাম মোহর নির্ধারণ করে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন।[৩৩]

নবী পত্নীদের বাইরে যাওয়া ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু পছন্দ করতে না। তিনি প্রায়ই পর্দার ব্যবস্থা করার জন্য রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট প্রস্তাব করতেন। একদিন রাত্রিকালে হযরত সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা মলমূত্র ত্যাগের জন্য যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় ও হৃষ্টপুষ্ট। হযরত 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু দূর হতে দেখে বললেন–হে সওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি এই কথা শুনে হযরত সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। গৃহে ফিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি একথা জানালেন। এরপর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল।[৩৪]

দানশীলতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি বিশেষ গুণ ছিল সংসর্গের কারণে স্ত্রীগণের মধ্যে এই গুণটি বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু হযরত 'আয়িশাকে বাদ দিয়ে তাঁদের মধ্যে হযরত সাওদা ছিলেন এই গুণে সেরা। একবার হযরত ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু এক থলি দিরহাম তাঁর জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন– থলির ভিতরে কি আছে? বাহক বলল, দিরহাম। তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, খেজুরের ন্যায় টাকা-পয়সাও কি থলি ভরে প্রেরণ করা হয়? অতঃপর তিনি উক্ত থলির সমস্ত দিরহাম গরিব দুঃখীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। নিজের জন্য এক কপর্দকও রাখলেন না।[৩৫] স্বামী ভক্তি ও তার একটি বিশেষ্ট গুণ ছিল।

---

৩২. খাওলা বিনতে হাকিম, হযরত ওসমান বিন মাযউন রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর পত্নী ছিলেন তাঁর নিকট হতে অনেকেই হাদীস রিওয়াত করেছেন। আল্লামা শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আবু আবুদল্লাহ আল খতীব, অনুবাদ, এম আফলাতুন কায়সার, **আসমাউর রিজাল** (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, জুলাই, ১৯৯৫), পৃ ৩৫।

৩৩. শিবলী নু'মানী, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৪০৩; 'আব্দুল বাকী আয্‌যরকানী, **শরহুল মাওয়াবিহিল লাদুন্নিয়্যা** (মিসর ঃ তাব 'আতুল আযহারিয়া, ১৩২৮ হিঃ) ৩য় খণ্ড, পৃ ২৬০।

৩৪. তদানিন্তন 'আরবগণ গৃহাভ্যন্তরে পায়খানার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দূষণীয় কাজ বলে মনে করত। নারীরা দু'চারজন একত্রিত হয়ে মলমূত্র ত্যাগের জন্য রাত্রিকালে লোকালয়ের বাইরে চলে যেত। এই প্রথানুসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পত্নীরাও এরূপ করতেন; কিন্তু হযরত 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু তা পছন্দ করতেন না। (**সহীহ বুখারী,** ১ম খণ্ড, পৃ ২৬)।

৩৫. শিবলী নু'মানী, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৪০৫; ইবন সা'আদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

এই গুণে উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনুপম। তিনি মাত্র পাঁচটি হাদীস রিওয়াত করেছেন। তন্মধ্যে মাত্র একটি হাদীস সহীহ বুখারীতে আছে।[৩৬]

হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু এর খিলাফতকালে হযরত সাওদা পরলোক গমন করেন। এটা ইমাম বুখারীর রিওয়ায়ত। ইমাম যাহাবী 'আত্‌তারীখুল কবীর' –এ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমরের খিলাফতের শেষ সময়ে তাঁর ইনতিকাল হয়। দিয়ারবকরী তারীখুল খমীস গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এটাই তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ।[৩৭]

২৩ হিজরীতে হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু শহীদ হন। সম্ভবত ২২ হজিরীতে হযরত সওদার মৃত্যু হয়েছিল। হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর অবর্তমানে যে প্রয়োজনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সওদাকে বিয়ে করেছিলেন, বাস্তবিক তিনি সে-প্রয়োজন মিটাবার উপযুক্ত পাত্রীই ছিলেন। এই গুণবতী বিধবা মহিলা হযরত খাদীজার স্থলাভিষিক্ত হয়ে শিশু ছেলে-মেয়েদেরকে উপযুক্ত আদর-যত্ন এবং ঘরকন্নার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম হয়েছিলেন।[৩৮]

উম্মুল মু'মিন হযরত হাফসা রাযী আল্লাহু 'আনহা

হযরত হাফসা ছিলেন হযরত 'উমরের কন্যা। বংশক্রম নিম্নরূপ ঃ

হাফসা বিনত উমর ইবন খাত্তাব বিন নোফায়েল বিন আবদুল উজ্জা বিন বিরাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুরাত বিন রিযাহ বিন আদি বিন লুই বিন ফিহর বিন মালিক। মায়ের নাম ঃ যয়নব বিনতে মজউন। যিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী উসমান বিন মজউনের[৩৯] বোন, আর নিজেও তিনি

---

৩৬. শিবলী, নু'মানী, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৪০৫।

৩৭. ইবন সায়্যিদুন্নাস, **'উয়নুল আসর** (বৈরুত ঃ দাররুল জেল, ১৯৭৪ খ্রিঃ) ২য় খণ্ড, পৃ ৩০০; জালালুদ্দীন সুয়ূতী, **আল কানযুল মাদফুন,** (মিসর ঃ মুসতাজাল বাবিল হালবী ১৩৩৯ খ্রীঃ) ৫ম খণ্ড, পৃ ৭। তবে ওয়াকিদীর মতে হযরত সাওদা রাযী আল্লাহু 'আনহু আমীর মু'আবিয়ার খিলাফত যুগে ৫৪ হিঃ মৃত্যুবরণ করেন। ইবন হাজার ও তাঁর মৃত্যুসন ৫৫ হিঃ উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই তারিখদ্বয় ঠিক বলে মনে হয় না।

৩৮. ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, **হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬৫।

৩৯. **উসমান ইবন মাযউন ঃ** ওসমান ইবন মায্‌উন জুমাহী, কুরাইশী। কুনিয়ত আবু সায়েব। তের জনের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হাবশা ও মদীনার উভয় হিজরতই করেছেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি জাহেলী যুগ হতেই নিজেকে শরাব পান হতে বিরত রেখেছিলেন। হিজরতের পূর্ণ ৩০ মাস অতিবাহিত হওয়ার শা'বান মাসে তার মৃত্যু হয়। তিনি মুহাজেরীনদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি মর্মাহত হয়েছিলেন এবং তাঁর কপালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বন করেন এবং তাঁকে দাফন করার পর বলেন, ওসমান ইবনে মাযউন আমাদের মধ্যে একজন উত্তম লোক ছিলেন। যিনি আমাদের পূর্বেই বিদায় নিলেন। জান্নাতুল

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। প্রথমে হযরত খুনায়স ইবন হুযাফার[৪০] সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত হাফসা স্বামীর সাথে হিজরত করে মদীনায় যান। হযরত খুনায়স বদর যুদ্ধে আহত হয়ে শহীদ হন।[৪১] হযরত হাফসার গর্ভে হযরত কুনায়সের কোন সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করেনি।

হযরত হাফসা পিতার ন্যায় তেজস্বী ও অসীম সাহসিকতার অধিকারিণী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'উমরকে দেখলে শয়তান পালিয়ে যায়। হযরত হাফসা সম্পর্কে হযরত 'আয়িশা বলেন ঃ اَنَّهَا اِبْنَةُ اَبِيْهَا 'হাফসা বাপেরই বেটী।' অর্থাৎ হযরত হাফসা ও তাঁর পিতার ন্যায় তেজস্বী ও উগ্র স্বভাব সম্পন্ন। এই উগ্র স্বভাবের দরুন একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তালাক দিতে মনস্থ করেছিলেন। তখন হযরত জিবরীল (আ) হাযির হয়ে বললেন– لاَ تُطَلِّقْهَا إِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ —

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! 'আপনি তাঁকে তালাক দিবেন না। কারণ তিনি খুব রোযা রাখেন এবং রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহ তাআলার 'ইবাদত বন্দেগী করেন।[৪২]

হযরত মু'আবিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর খিলাফতকালে ৪৫ হিঃ শাবান মাসে তিনি তেষট্টি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কিছু সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন এবং কিছু টাকা পয়সাও আল্লাহর নামে সদকা করে যান। তখন মারওয়ান মদীনার গভর্নর ছিলেন। তিনিই তাঁর জানাযা পড়ান। জানাজার পর মারওয়ান তার খাট কাঁধে করে বনু হাযমের বাসস্থান হতে হযরত মুগীরার বাসস্থান পর্যন্ত নিয়ে যান। অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা কাঁধে নিয়ে কবর পর্যন্ত পৌছান। তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ও 'আসিম এবং ভ্রাতুস্পুত্র সালিম, আব্দুল্লাহ ও হামযা তাঁকে কবরে রাখেন।[৪৩]

বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন বড় আবেদ এবং শীর্ষস্থানীয় মর্যাদাবান সাধক সাহাবীদের অন্যতম। স্বীয় পুত্র সায়েব ও ভ্রাতা কোদামা ইবনে মাযউন তাঁর নিকট হতে রিওয়াত করেছেন। (এম, আফলাতুল কায়সার অনূদিত, **আসমাউর রিজাল** (ঢাকা ঃ জুলাই ১৯৯৫ খ্রিঃ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পৃ ৭৫)।

৪০. **খোনাইস ইবনে হোযাফা ঃ** খোনাইস ইবন হোযাফা সাহসী কুরায়শী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে বিয়ের পূর্বে হযরত হাফসা বিনতে ওমর ইবনুল খাত্তাবের স্বামী ছিলেন। তিনি প্রথমে বদর যুদ্ধে শরীক হন, পরে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মদীনায় পৌছে ইনতিকাল করেন। তিনি কোন সন্তান রেখে যাননি। খোনাইস শব্দ তাসগীররূপে ব্যবহৃত। (এম, আফলাতুন কায়সার অনূদিত, **আসমাউর রিজাল,** ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, জুলাই ১৯৯৫ খ্রিঃ, পৃ ৩৩)।

৪১. যরকানী, **শরহু মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া** (মিসর ঃ তাব্ 'আতুল আযহারিয়্যা, ১৩২৮ হিঃ) ২য় খণ্ড, পৃ ২৭০।

৪২. আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দুর রহমান আদ্ দারিমী, **সুনানুদ দারিমী,** ২য় খণ্ড, পৃ ১৬১।

৪৩. ইবন সায়্যিদুন্নাস, **'উয়ূনুল আসর** (বৈরুত ঃ দারুল জেল, ১৯৭৪ খ্রিঃ) ২য় খণ্ড, পৃ ৩০২-৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মুল মাসাকীন যয়নব রাযী আল্লাহু 'আনহা

যয়নব তাঁর নাম। বংশক্রম নিম্নরূপ ঃ যয়নব বিন্‌ত খুযায়মা বিন্ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন আবদে মনাফ বিন হিলাল বিন আমের বিন সাঅসাআ। তিনি দরিদ্রদের খুবই উদারতা ও দয়ার্দ্রতার সঙ্গে খাওয়াতেন, সেজন্য "উম্মুল মাসাকিন" বা "দারিদ্র-মাতা" উপনামে বিখ্যাত হন। মহানবীর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের[৪৪] স্ত্রী ছিলেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ শহীদ হওয়া পর তৃতীয় হিজরীতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিবাহের দুই তিন মাস পরেই চতুর্থ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে প্রথমে হযরত খাদীজা অতঃপর হযরত যয়নব ইন্তিকাল করেন। এছাড়া আর কোন পত্নীই তার জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর জানাযা পড়ান এবং জান্নাতুল বাকী কবর স্থানে তাঁকে দাফন করেন।[৪৫]

হযরত উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামার রাযী আল্লাহু 'আনহা আসল নাম 'হিন্দা'। 'উম্মু সালামা' ডাক নাম এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।[৪৬] অনেকে তাঁর নাম 'রাসালা' বলেছেন, কিন্তু মুহাদ্দিসগণ একে ভিত্তিহীন মনে করেছেন।[৪৭] মূলত 'রামালা' উম্মুল মু'মিমীন হযরত উম্মে হাবীবা রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর নাম। উম্মে সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর পিতা আবু উমাইয়্যা ইবন আল-মুগীরা ইবন আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-মাখযুম।[৪৮]

---

৪৪. **আব্দুল্লাহ ইবন জাহাশ ঃ** আব্দুল্লাহ ইবন জাহাশ আসাদী। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাহোদর ভাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দারে আরকামে' অবস্থান করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি ঐ সকল সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা প্রথমে হাবশা এবং পরে মদীনায় হিজরত করেছেন। তিনি তাঁর দু'আ কবুল হওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। কাফিররা নাক, কান প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তাঁর মৃত দেহকে বিকলাঙ্গ করেছিল। হযরত হামযাকে ও তাঁকে একই কবরে দাফন করা হয়েছে। তাঁর নিকট হতে সা'দ ইবন আবু ওয়াককাস প্রমুখ রিওয়াত করেন। (এম. আফলাতুন' কায়সার অনূদিত, **আসমাউর রিজাল,** ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫ খ্রিঃ, পৃ ৭৯-৮০)।

৪৫. ইব্‌ন কাসীর, **আস্‌সীরাতুন নববিয়্যা** (মিসর ঃ ইসাল বাবিল হালবী, ১৯৬৪ খ্রিঃ) ৩য় খণ্ড, পৃ ১৭৩।

৪৬. আল-বালাজুরী, **আনসাবুল আশরাফ** (মিসর ঃ দারুল মা'আরিফ, তারিখ বিহীন) ১ম খণ্ড, পৃ ২০৭, ৪২৯।

৪৭. ইবন হাজার, **আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা** (বৈরুত দার-আলফিকর ১৯৭৮ খ্রিঃ) ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৪৫৮; আল-ইমাম আজ-জাহাবী, **সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা** (বৈরুত ঃ আল-মুওয়াস্‌সাসাতু রিসালা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রিঃ) ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২০২।

৪৮. আবু উমাইয়্যার আসল নাম 'হুজাইফা' তবে তিন 'আবু উমাইয়্যা নামেই খ্যাত। তাঁর উপাধি ছিল 'যাদুর রাকব'। 'যাদুর রাকাব' অর্থ কাফেলার পাথেয়। মক্কার দানশীল ও অতিথি সেবকদের মধ্যে তার এক বিশেষ স্থান ছিল। তিনি যখন কোন কাফেলার সাথে কোথাও বের হতেন তখন গোটা কাফেলার খাওয়া-দাওয়াসহ

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর মাতার নাম 'আতিকা বিনত' আমির ইবন রাবি 'আ ইবন মালিক আল-কিনানিয়্যা।[৪৯] কোন কোন গ্রন্থকার মনে করেছেন উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর মা 'আতিকা' ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। সুতরাং উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ফুফাতো বোন। আসলে উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর পিতার সাথে এই আতিকার বিয়ে হয়েছিল এবং তাঁর গর্ভে আব্দুল্লাহ, উম্মু যুহাইর ও কারীবা নামের তিনটি সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু এ 'আতিকা উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর মা নন। তাঁর মা আমির ইবন রাবী 'আর কন্যা আতিকা।[৫০]

হযরত উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর প্রথম বিয়ে হয় আব্দুল্লাহ ইবন আবদিল আসাদ আল-মাখযুমীর সাথে।[৫১] অন্যদিকে আবু সালাম ছিলেন রাসূলের দুধভাই।[৫২]

তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ছিলেন ঐ সকল লোকদের অন্তর্গত যাঁদেরকে বলা হয় 'কাদীমুল ইসলাম' বা প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী।[৫৩] হযরত আব্দুল্লাহ সর্বপ্রথম সস্ত্রীক হাবশায় হিজরত করেন। সেখানেই তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর নাম ছিল সালামা। তাঁর বয়স অনুসারেই হযরত আব্দুল্লাহ আবু সালাম এবং হযরত হিন্দকে উম্মু সালামা বলা হত। হাবশা হতে

যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। তাঁর এমন উদারতা ও মহানুভবতায় তুষ্ট হয়ে সমকালীন আরববাসী তাঁকে এ উপাধি দান করে। উল্লেখ্য যে, সেকালে কুরাইশদের মধ্যে 'যাদুর রাকব' উপাধি ধারণকারী ব্যক্তি ছিলেন মোট তিনজন আবু উমাইয়্যা ইবন আল-মুগীরা, আল-আসওয়াদ ইবন আব্দুল মুত্তালিব। মুসাফির ইবন আবী আমর। (মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, **আসহাবে রাসূলের জীবন কথা,** ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯ খ্রিঃ, রমাদান– ১৪২০, ৫ম খণ্ড, পৃ ২১৩)।

৪৯. আল-বালাজুরী, **আনসাবুল আশরাফ,** প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৪২৯।

৫০. আবদুর রউফ দানাপুরী; **আসাহুস সিয়ার** (করাচী তারিখ বিহীন) পৃ ৬২১।

৫১. যার ডাক নাম আবু সালামা এবং এ নামেই প্রসিদ্ধ। আবু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর পিতামহ হিলাল এবং উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর পিতামহ মুগীরা দুই ভাই। আবু সালামার পিতা আব্দুল্লাহ ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ফুফা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু বুররাকে তিনি বিয়ে করেন। তারই ছেলে আবু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা। হযরত আবু তালিব হযরত হামযা রাযী আল্লাহু 'আনহু ও হযরত আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু আবু সালামার সম্মানিত মা। (আবদুর রউফ দানাপুরী; **আসাহুস সিয়ার,** করাচী, পৃ ৬২১)।

৫২. আল-ইমাম আজ-জাহাবী, **সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা** (বৈরুত ঃ আল মুওয়াস্‌সিসাতুর রিসালা) ৭ম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রিঃ) ২য় খণ্ড, পৃ ২০২।

৫৩. **কাদীমুল ইসলাম ঃ** ইসলামের সুচনা পর্বে যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে কি করবে না এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং যখন সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল একটি দুরুহ কাজ তখন এই দম্পত্তি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ইবনুল আসীর লিখেছেন, আবু সালামা ইবন আবদুল আসাদ, আবু উবায়দা ইবনুল হারিস, আরকাম ইবন আবী আরকাম, উসমান ইবন মাজউন – এঁরা সকলে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁদের পরে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, সাঈদ ইবন যায়িদ ও অন্যরা মুসলিম হন। (মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, **আসহাবে রাসূলের জীবন,** ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯ খ্রিঃ, ৫ম খণ্ড, পৃ ১২৪)।

Dhaka University Institutional Repository

ফিরে এসে তাঁরা মক্কায় আসেন। পুনরায় মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন। নারীদের মধ্যে হযরত উম্মু সালামাই সর্বপ্রথম হিজরত করে মদীনা যান।[৫৪]

হযরত উম্মু সালামা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, ধৈর্যশীলা, মেধাবী, বিদ্যানুরাগিনী, প্রত্যুৎপন্নমতি ও সূক্ষ্মদর্শী নারী। ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইনতিকালের পর বড় বড় সাহাবী ও তাবেঈগণ তাঁর নিকট এসে জটিল মাসআলাসমূহের মীমাংসা করতেন।[৫৫] জ্ঞান-গরিমা ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে হযরত আয়েশার পরেই হযরত উম্মু সালামার স্থান।[৫৬]

হযরত আবূ সালামা অল্প বয়স্ক তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই ছয়টি সন্তানের লালন-পালনের ভারও উম্মু সালামার উপর ন্যস্ত হয়। হযরত আবূ সালামার মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মু সালামাকে বিয়ের প্রস্তাব জানালেন। তিনি কয়েকটি কারণ দেখিয়ে এ প্রস্তাবে আপত্তি জানালেন। হযরত উম্মু সালামা যখন বুঝতে পারলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বেচ্ছায় সমস্ত ঝঞ্ঝাট গ্রহণ করেছেন তখন তিনি সম্মতি প্রদান করলেন এবং বিয়ে হয়ে গেল।[৫৭]

যে হুজরাতে হযরত উম্মুল মাসাকীন বাস করতেন। হযরত উম্মু সালামাকে সেই হুজুরায় দেয়া হল। তিনি প্রথম দিন স্বামীর গৃহে এসে যব ও চর্বি দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করতঃ রাসূলের সম্মুখে হাজির করলেন। এই ছিল তাঁর বিবাহের ওলীমা।[৫৮]

উম্মুহাতুল মু'মিনের মধ্যে সকলের শেষে হযরত উম্মু সালামা পরলোক গমন করেন। ইহাই ঐতিহাসিকগণের সর্বাধিক সম্মত মত।[৫৯]

---

৫৪. শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪১১-৪১২।

৫৫. মাওলানা আবুল বারাকাত, **'আবদুর রউফ দানাপুরী** (ঢাকা ঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৯০ খ্রিঃ) পৃ ৫৮০।

৫৬. মাওলানা আবুল বারাকাত, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৫৮০।

৫৭. উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা নিম্নলিখিত কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে বিয়েতে আপত্তি জানান ঃ ১. আমি বহু সন্তানের মাতা। ২. আমার বয়স খুব বেশি। ৩. আমার গায়রত অত্যন্ত বেশি অর্থাৎ আমার প্রিয়ের প্রতি অন্যের হস্তক্ষেপ আমার জন্য অসহনীয় হয়ে থাকে। সুতরাং আমার অন্তরে আপনার অন্যান্য পত্নীদের প্রতি ঈর্ষাভাব উদয় হওয়ার এবং তাদের সাথে মনোমালিন্য হওয়ার আশঙ্কা আছে। ৪. এখানে আমার কোন অভিভাবক নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তোমার মনে ঈর্ষাভাব না হওয়ার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে দু'আ করব। তোমার শিশু সন্তানগণ আমার সন্তানে পরিগণিত হবে। সুতরাং তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ন্যস্ত থাকবে। তোমার বয়স অপেক্ষা আমার বয়স বেশি। আর এই বিবাহে তোমার কোন অভিভাবকই অসম্মত হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আপত্তির জবাব দিলে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। (শিবলী নু'মানী, **সীরাতুন্নবী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪১২)।

৫৮. আব্দুর রউফ দানাপুরী, **আসাহুস্ সিয়ার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮০-৫৮১।

৫৯. উম্মু সালামার কোন সনে ইনতিকাল হয়, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। সুনানুত তিরমিযীর একটি রিওয়াত আছে, হযরত ইমাম হুসাইন শহীদ হওয়ার পর হযরত উম্মু সালামা স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, ধূলি ধূসরিত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত যায়নাব বিনত জাহাশ রাযী আল্লাহু 'আনহা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যাযনাব –এর ডাকনাম ছিল উম্মু হাকাম। তাঁর পিতা ছিলেন বনু আসাদ ইবন খুযায়মা গোত্রের জাহাশ ইবন রাবার আল-আসাদী এবং মাতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ফুফু আব্দুল মুত্তালিব। সুতরাং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আপন ফুফাতো বোন।[৬০] হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা ইসলামের আদি-পর্বেই মুসলমান হন। ইবনুল আসীর বলেন ঃ كَانَتْ قَدِيْمَةُ الإِسْلَامِ তিনি ছিলেন আদি পর্বের মুসলমান।[৬১]

বিয়ে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আযাদকৃত দাস ও পালিত পুত্র যায়িদ ইবন হারিসার সাথে তাঁর বিয়ে দেন। এত সৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন দাস। আর জয়নাব ছিলেন কুরাইশ বংশের। তিনি কিছুতেই যায়েদকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।[৬২]

মস্তক ও অশ্রু নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন–এই মাত্র আমি হুসাইনের মাশহাদে (কারবালায়) ছিলাম। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, ৬১ জিরীতে হযরত উম্মু সালামা জীবিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "একদল সৈন্য 'বয়দা' নামক স্থানে মাটি ধ্বসে ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।" পবিত্র মদীনা ধ্বংস করার জন্য যালিম য়্যাযীদ যখন সৈন্য প্রেরণ করে তখন হারিস ইবন আব্দুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ ইবন সকওয়ান হযরত উম্মু সালামার খিদমতে হাযির হয়ে 'বয়দা'য় যে সৈন্যদল ধ্বংস হবে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করেন। যারা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ৬৩ হিজরীতে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ৬৩ হিজরীতে হযরত উম্মু সালামা জীবিত ছিলেন। সুতরাং ৬৩ হিজরীর পরে উম্মু সালামা চুরাশি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। হযরত উম্মু সালামা অসিয়াত করে ছিলেন যে, সা'ঈদ ইবন যায়দ আমার জানাযা পড়াবেন। কিন্তু সা'ঈদ তার পূর্বে পরলোক গমন করেন। সুতরাং আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু 'আনহু তার জানাযা পড়ান। তাঁকেও জান্নাতুল বাকী কবর স্থানে দাফন করা হয়।

৬০. **ইবনুল আসীর উস্‌দুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা** (বৈরুত ঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাম আল-আরাবী, তারিখ বিহীন) ৫ম খণ্ড, পৃ ৪৬৩।

৬১. **ইবনুল আসীর উস্‌দুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা,** প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ ৪৬৩। কিন্তু এ বিয়েতে যায়নাবের মত ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি বলে দিয়েছিলেন– لَا أَرْضَاهُ لِنَفْسِي " তাকে নিজের জন্য পছন্দ করি না।"

৬২. যায়িদ ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রীতিভাজন ব্যক্তি। হযরত খাদীজা রাযী আল্লাহু 'আনহা ও হযরত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু যে সময়ে মুসলমান হন, যায়িদও সে সময় মুসলমান হন। অধিকাংশ অভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ নেতাদের উপর তাঁকে পরিচালক নিয়োগ করতেন। যায়িদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এত কাছের মানুষ হয়ে যান যে, তিনি যায়িদ ইবন মুহাম্মাদ হিসেবে প্রসিদ্ধি পান। তাঁর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। (মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, **আসহাবে রাসূলের জীবন কথা,** ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৫)।

Dhaka University Institutional Repository

جَاءَ زَيْدٌ مِنْ حَارِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ زَيْنَبَ أَشْتَدَّ عَلِيَّ لِسَانَهَا وَأَنَا إِرِيْدُ أَنْ أُطَلِّقَهَا ـ

যায়িদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব তাঁর কঠোর বাক্যবানে আমাকে বিদ্ধ করে। আমি তাঁকে তালাক দিতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়িদকে তালাক দান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কুর'আন পাকে সে চেষ্টা এভাবে বিধৃত হয়েছে।

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ ـ

যখন আপনি সেই ব্যক্তিকে যার প্রতি আল্লাহ ও আপনি অনুগ্রহ করেছেন, বলেছিলেন যে, তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।[৬৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত চেষ্টা সত্ত্বেও হযরত যায়নাব ও হযরত যায়িদ রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর বিয়ে টিকল না। হযরত যায়িদ তাকে তালাক দিয়েই ছাড়লেন।[৬৪]

যায়নাবের ছিল বংশ কৌলিন্য। প্রথম থেকেই এ বিয়েতে হযরত যায়নাবের মত ছিল না। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সরাসরি বলে দিয়েছিলেন-- " لاَ أَرْضَاهُ لِنَفْسِىْ তাকে নিজের জন্য পছন্দ করি না।"[৬৫] কিন্তু সবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশে রাজি হন। তখন সূরা আল আহযাবের এ আয়াত নাযিল হয়–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُه أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ـ

অর্থাৎ– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান করেন তখন কোন মু'মিন নারী পুরুষের কোন প্রকার ইখতিয়ার থাকে না।[৬৬]

বিয়ের পর এক বছর দুইজন একসাথে থাকেন কিন্তু প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল না। দিন দিন সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠল। হযরত যায়িদ রাযী আল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে অভিযোগ করলেন এবং তালাক দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।[৬৭]

---

৬৩. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল-আহযাব, আয়াত ঃ ৩৭।

৬৪. ইবন আবদিল বার, **আল-ইসতী'য়াব** ('আল-ইসাবা' গ্রন্থের পার্শ্ব টীকা) ২য় খণ্ড, পৃ ৭৫৪; আল-বালাজুরী, **আনসাবুল আশরাফ** (মিসর ঃ দারুল মা'আরিফ) ১ম খণ্ড, পৃ ৪৩৪।

৬৫. ইবন সা'দ, **আত-তাবাকাত আল-কুবরা** (বৈরুত ঃ দারু সাদির, তারিখ বিহীন), ৮ম খণ্ড, পৃ ১০৮।

৬৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল-আহযাব, আয়াত ঃ ৩৬।

৬৭. ইবন হাজার, **ফাতহুল বারী,** (মিসর ঃ ১৩১৯ হিঃ) তাফসীর সূরা আল-আহযাব।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত যায়িদ রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর সাথে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর বিয়েটি হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছায়। এ বিয়েতে যায়নাবের মোটেই মত ছিলনা। যায়নাব ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বোন। বোধ-বুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লালন পালন করেন। তাই যখন তাদের ছাড়া ছাড়ি হয়ে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুশি করার জন্য নিজেই বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলেন।[৬৮] কিন্তু যেহেতু পালিত পুত্রের বিচ্ছেদ প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে না করার প্রথাটি ছিল একটি জাহিলী সংস্কার মাত্র, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছা ছিল তার মুলোৎপাটন করা, এ কারণে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সে সময়ের মনের ইচ্ছাটি প্রকাশ করে দেন এভাবে ঃ

وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ ما اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَ النَّاسَ - وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاه

"আপনি আপনার অন্তরে এমন কথা গোপন করে রাখছেন যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আর আপনি মানুষকে ভয় করেছেন, অথচ আল্লাহর অধিকার সব চাইতে বেশি যে, আপনি তাকেই ভয় করবেন।[৬৯]

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওহীর কোন কিছু গোপন করতেন তাহলে এ আয়াতটি করতেন। কারণ আল্লাহ এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর 'ইদ্দত' কাল শেষ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়িদকেই তাঁর কাছে এই বলে পাঠালেন যে, তুমি তার কাছে আমার বিয়ের পয়গাম নিয়ে যাও।[৭০]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়িদ রাযী আল্লাহু 'আনহু যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর ঘরের দরজায় দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, যায়নাব! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম নিয়ে এসেছি। হযরত যায়নাব জবাব দিলেন, "এখন আমি

---

৬৮. কিন্তু যেহেতু তখনও পর্যন্ত মুসলিমদের মন-মানসে জাহিলী যুগের প্রথা ও সংস্কারের প্রভাব কিছুটা বিদ্যমান ছিল। এ কারণে তিনি নিজের মনের ইচ্ছা চেপে রাখেন। কারণ, যায়িদ ছিলেন তাঁর পালিত পুত্র। আর জাহিলী সমাজ আপন ঔরসজাত পুত্র ও পালিত পুত্র যায়িদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী। তাঁকে বিয়ে করলে মুনাফিক ও কাফিররা হৈ চৈ বাধিয়ে দিতে পারে এমন আশঙ্কা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। (মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, **আসহাবে রাসূলের জীবন কথা,** ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৬)।

৬৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল-আহযাব, আয়াত ঃ ৩৭।

৭০. আল-ইমাম আজ-জাহাবী, **সিয়ারু আ'লা আন-নুবালা,** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২১১। যায়িদ রাযী আল্লাহু 'আনহু গিয়ে দেখেন যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহু আটা চটকাচ্ছেন। যায়িদ বলেছেন, তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই আমার অন্তরে তাঁর সম্পর্কে এক বড় ধরনের সম্ভ্রম বোধ সৃষ্টি হয়। আমি তাঁর প্রতি চোখ তুলে তাকানোর হিম্মত হারিয়ে ফেলি। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন। আমি একটু পেছনে সরে আসি।

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করছি। আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা ব্যতীত কিছু বলতে পারি না। একথা বলে তিনি মসজিদের দিকে যেতে শুরু করেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এ আয়াত নাযিল করেন।[৭১]

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لاَ يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا - وكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُوْلاً -

অর্থাৎ, "অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কাজে পরিণত হয়েই থাকে।"[৭২]

ইবন ইসহাক বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর বিয়ের কাজটি আঞ্জাম দেন হযরত আবু আহমাদ ইবন জাহাশ রাযী আল্লাহু 'আনহু[৭৩] হতে পারে পরে সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল এবং সেই কাজটি করেন আবু আহমদ ইবন জাহাশ। কিন্তু সহীহ মুসলিমে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে উপরোক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পূর্ব অনুমতি ছাড়াই যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর নিকট উপস্থিত হন।[৭৪]

সহীহহাইনের একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা তাঁর সতীনদের নিকট এই বলে গর্ব করতেন যে, আপনাদের বিয়ে আপনাদের অভিভাবকগণ দিয়েছেন, আর আমার বিয়ে দিয়েছেন খোদ আল্লাহ তা'আলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এ বিয়ের কাজটি সম্পন্ন হয় ৫ম হিজরীর জিলকাদ মাসে।[৭৫]

সূরা আল আহযাবের ৩৭তম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "আমরা তাকে (তালাক প্রাপ্ত মহিলা যায়নাবকে) তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।' এ কথাগুলোও ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিয়ে নিজের ইচ্ছা ও কামনার ভিত্তিতে নয়। বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই করেন।[৭৬]

---

৭১. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, **সহীহ মুসলিম,** (দিল্লী ঃ আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হিঃ) অধ্যায় ঃ কিতাবুন নিকাহ।

৭২. এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, যায়নাবের সাথে তোমার বিয়ের কাজটি আমিই সমাধা করে দিলাম। এ কারণে যায়নাব রাসূলের স্ত্রী হয়ে যান। এ ব্যাপারে যায়নাবের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রয়োজন ছিল না। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহযাব, আয়াত ঃ ৩৭)।

৭৩. আবদুর রউফ দানাপুরী, **আসাহ্হুস সিয়ার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬২৮।

৭৪. আল-ইমাম আজ-জাহাবী, **সিয়ারু আ-লাম আন-নু'বানা,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১৭।

৭৫. আল-ইমাম আজ-জাহাবী, **সিয়ারু আ-লাম আন-নু'বানা,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১৭।

৭৬. উক্ত আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর দ্বারা এ কাজটি করিয়েছেন একটি বিশেষ প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। যা এ পন্থা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অর্জিত হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

আরবে মুখ-ডাকা আত্মীয়দের সম্পর্কে অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের ভুল প্রথা প্রচলিত হয়েছিল এবং যুগ যুগ ধরে অব্যাহতভাবে তা চলে আসছিল পূর্ণ দাপটের সাথে। তা উৎখাত করার একটি মাত্র উপায় কার্যকর ও সফল হতে পারত। আর তা হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই অগ্রসর হয়ে তা শিকড়সহ উপড়ে ফেলবেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাঁর স্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এই বিয়ে করাননি। একটি অত্যন্ত বড় ও অতিশয় প্রয়োজনীয় কাজের লক্ষ্যেই তিনি তা করেছিলেন।[৭৭]

বিয়ের পর ইসলামের দুশমনরা সারাদেশে সমালোচনার ঝড় তুলল।[৭৮] এর জবাবে আল্লাহ বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ـ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا ـ

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী মাত্র। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।[৭৯]

'মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়।' অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরিত্যক্ত স্ত্রীকে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছেন সে-তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্রই ছিল না। কাজেই তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা রাসূলের জন্য কখনও হারাম ছিল না। তোমরা নিজেরাই জান যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদপেই কোন পুত্র সন্তান নেই।

রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -কে স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনার পর ওলীমার আয়োজন করেন। ইবন সা'দ এই ওলীমার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে–

সম্ভবপর ছিল না। (সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, **তাফহীমুল কুর'আন,** আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ঃ জুলাই–১৯৯৩, সফর– ১৪১৪, ১২শ খণ্ড, টীকা নং, ৭২, পৃ ৬৩)।

৭৭. সয়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, **তাফহীমুল কুর'আন,** ১২ শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, টীকা নং– ৭২, পৃ ৬৩।

৭৮. বিয়ের পর ইসলামের দুশমনরা বড় হৈ চৈ করে বাজার গরম করে তুলল এই বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন, অথচ তাঁর নিজের উপস্থাপিত শরীআ'তের আইনেও পুত্রবধূকে বিয়ে করা পিতার জন্য হারাম করা হয়েছে। (আবদুল মা'বুদ, **আসহাবে রাসূলের জীবন কথা,** ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৯)।

৭৯. **আল-কুর'আন,** সূরা ঃ আল-আহযাব, আয়াত ঃ ৪০। আয়াতাংশ 'মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়।' অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরিত্যক্ত স্ত্রীকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছেন সেতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্রই ছিল না। কাজেই তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কখনও হারাম ছিল না। তোমরা নিজেরাই জান যেন নবী কারীমের আদপেই কোন পুত্র সন্তান বর্তমান নেই। (আবদুল মা'বুদ, **আসহাবে রাসূলের জীবন কথা,** ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৯)।

Dhaka University Institutional Repository

مَا أَوْلَمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمْ بِشَاةٍ –

"রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমা সেভাবে করেনি যেভাবে যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর ওলীমা করেছিলেন। তিনি যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর ওলীমা করেন ছাগলের গোশত দিয়ে।' হযরত আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু বলেন, এতো ভাল ও এত বেশি খাবারের আয়োজন তিনি অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমাতে করেননি।[৮০]

হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর বিয়ের মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

১. পালিত ও ধর্মপুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের সমান জ্ঞান করা হতো, সেই ভ্রান্তি দূর হয়।

২. দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে যে পর্বত পরিমাণ ব্যবধান ছিল তা দূর করে ইসলামী সাম্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত এ বিয়েতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাস যায়িদকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক অভিজাত নারীর সাথে বিয়ে দেয়া হয়।

৩. এ বিয়েকে কেন্দ্র করে হিজাবের হুকুম নাযিল হয় অথবা বলা চলে এ বিয়ে ছিল হিজাবের হুকুম নাযিলের পটভূমি।

৪. এ বিয়ের জন্য ওহী নাযিল হয়।

৫. এ বিয়ের ওলীমা হয় জাঁকজমকপূর্ণভাবে।[৮১]

এ সবের কারণেই হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা তাঁর অন্য সতীনদের সামনে গর্ব করতেন। একদিন তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেই বসলেন ঃ

ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনার অন্য কোন বিবির মত নই। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার বিয়ে তাঁর পিতা, ভাই অথবা খান্দানের কোন অভিভাবক দেননি। একমাত্র আমি যার বিয়ে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে আপনার সাথে সম্পন্ন করেছেন। আপনার ও আমার দাদা একই ব্যক্তি, আর আমার ব্যাপারে জিবরাঈল (আ) হলেন দূত।[৮২]

فَزَوَّجَهَا اللهُ بِنَبِيِّهِ بِلاَ وَلِيٍّ وَلاَ شَاهِدٍ –

---

৮০. আব্দুর রউফ দানাপুরী, **'আসাহ্হুস সিয়ার'**, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২২।

৮১. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, **আসহাবে রাসূলের জীবন কথা** (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর, ১৯৯৯, রামাদান– ১৪২০) ৫ম খণ্ড, পৃ ২৪৩।

৮২. ইবন সাদ, **তাবাকাত,** প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ যায়নাবকে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে কোন অভিভাবক ও সাক্ষী ছাড়াই বিয়ে দেন।[৮৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণের মধ্যে যাঁরা হযরত 'আয়িশার সমকক্ষতা দাবি করতে পারতেন তাঁদের মধ্যে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা অন্যতম। এ ব্যাপারে খোদ 'আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর মন্তব্য ছিল এ রকম–

هِيَ الَّتِيْ تَسَاوَر مِنِّيْ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই আমার সমকক্ষতার দাবিদার ছিলেন।[৮৪]

ইফক[৮৫] এর ঘটনায় হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা–এর বোন হযরত হামনা বিনতে জাহাশ ও জড়িয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন, এই সুযোগে বোন যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর সতীন ও প্রতিদ্বন্দ্বী আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা-কে কাবু করতে পারলে বোন যায়নাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবেন। বোনের শুভ চিন্তায় তিনি এই নোংরা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন।

এখানে দেখার বিষয় হলো, এ সময় হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর ভূমিকা কি ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী সতীনকে ঘায়েল করার, এবং পথের কাঁটা দূর করার চমৎকার একটা সুযোগ। এমন মোক্ষম সুযোগ জগতের কোন সতীন হাত ছাড়া করেছে বলে জানা যায় না। কিন্তু হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উপনীত হয়েছিলেন তাতে তাঁর মত লোকের পক্ষে এমন নোংরা ষড়যন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন এমন কল্পনা করা যায় কেমন করে। তাই হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহার সে দুর্যোগের দিনে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা সম্পর্কে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর মতামত জানতে চাইলেন। হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا আমি তাঁর মধ্যে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না।[৮৬]

---

৮৩. আল-ইমাম আজ-জাহাবী, **সিয়ারু আ'লাম আন-নুবানা,** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২১১।

৮৪. **মুসলিম**। (আল-ইমাম আজ-জাহাবী, **সিয়ারু আ'লাম আন-নুবানা,** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২১১-২১২)।

৮৫. হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা পুতঃপবিত্র চারিত্রের উপর মুনাফিকদের কলংক আরোপের ঘটনা হলো 'ইফক'। এর ঘটনা যা পবিত্র কুরআনের সূরা আন নূরে উল্লেখিত হয়েছে। ইফক এর ঘটনায় হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর বোন হযরত হামসা বিনতে জাহাশ ও জড়িয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন, এই সুযোগে বোন যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর সতীন ও প্রতিদ্বন্দ্বী আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহু-কে কাবু করতে পারলে বোন যায়নাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবেন। বোনের শুভ চিন্তায় তিনি এই নোংরা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন।

৮৬. পরে হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর পবিত্রতা ঘোষণা করে আল-কুরআনের দশটি আয়াত নাযিল হয়। আবার সেই সাথে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর সত্যবাদিতা ও উন্নত নৈতিকতাও প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা আজীবন হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর এ ঋণ মনে রেখেছেন। সারা জীবন তিনি মানুষের কাছে সে কথা বলেছেন। যায়নাবের মধ্যে যত গুণাবলি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, অকপটে তা মানুষকে জানিয়েছেন।[৮৭]

হাদীসের গ্রন্থাবলিতে হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর যে সব উক্তি ছড়িয়ে আছে তাতেই হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর প্রকৃত মর্যাদা ফুটে উঠেছে। হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা বলেন,

لَمْ اَرْقَطُ خَيْرًا فِىْ الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبٍ وَاتَّقِىْ اللهَ وَاصْدَقَ حَدِيْثًا وَاَوْصَلَ لِلرحَّمِ وَاَعْظَمَ صَدَقَةً وَاَشَدُّ اِبْتِذِ اِلاَّ لِنَفْسِهَا فِىْ الْعَمَلِ الَّذِىْ تَصَدَّقَ بِه وَتَقَرَّبُ بِه إلى اللهِ مَا عَدا سُوْرَةَ مِنْ حَدَّةٍ كَانَتَ فِيْهَا تَسْرَعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ ۔

"আমি যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা এর চেয়ে কোন মহিলাকে বেশি দীনদার, বেশি পরহেযগার, বেশী সত্যভাষী, বেশী উদার, দানশীল, সৎকর্মশীল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বেশী তৎপর দেখিনি। শুধু তাঁর মেজাজে একটু তীক্ষ্ণতা ছিল। তবে তার জন্য তিনি খুব তাড়াতাড়ি লজ্জিত হতেন।[৮৮]

আল্লামা ইবন 'আবদিল বার হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা সম্পর্কে হযরত আয়িশার রাযী আল্লাহু 'আনহা নিম্নোক্ত বর্ণনা করেছেন।

مَا رَأَيْتُ إمْرَاةً قَطُّ فِىْ الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبٍ

দ্বীনের ব্যাপারে আমি যাযনাব রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর চেয়ে ভাল কোন মহিলা কখনো দেখিনি। ইবন সা'দ হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি সংকলন করেছেন।[৮৯]

يَرْحَمُ اللهُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحَش لَقَدْ ثَالَتْ فِى هذِهِ الدُّنْيَا ـ الشَّرَفْ لاَ يَبْلُغُهُ شَــرْفُ ـ إنَّ اللهَ زَوَّجَهَا بِنَبَةٍ فِىْ الدُّنْيَا ـ وَنَطَقَ بِه الْقُرْاٰنْ ـ

---

৮৭. ইবন হাজার আল-আসকীলানী (র) লিখেছেন–

وَقَدْ وَصَفَتْ عَائِشَةَ زَيْنَبُ بِالْوَصْفِ الْجَمِيْلِ فِىْ قِصَّةِ الإفْكِ

হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা 'ইফক' এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। (ইবন হাজার আসকালনী, **আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা,** বৈরুত ঃ দার আল-ফিকর ১৯৭৮ খ্রিঃ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩১৩)।

৮৮. **মুসলিম** فضائل زينب হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা–এর জবানীতে যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর প্রশংসা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির উল্লেখের মাধ্যমে হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর সম্মান ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। এবং তিনি মহিলা সাহাবীর মধ্যে দ্বীনদারী, সৎকর্মে, সত্যবাদিতায় দানশীলতায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন।

৮৯. ইবন আবদিল বার, **আল ইসতীয়াব আল-ইসাবা** গ্রন্থের পার্শ্ব টীকা , ২য় খণ্ড, পৃ ৭৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ যায়নাব বিনতে জাহাশের প্রতি সদয় হোন। সত্যিই দুনিয়াতে অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নবীর সাথে তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর উপলক্ষ্যে আল কুরআনের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে।[৯০]

হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা আরও বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরকালে তাঁর সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হওয়ার এবং জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হওয়ার সুসংবাদ দান করে গেছেন।[৯১]

হযরত উম্মু সালামা রাযী আল্লাহু 'আনহা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন[৯২] ঃ

كَانَتْ صَالِحَةً صَوَّامَةً قَوَّامَةً -

অর্থাৎ তিনি ছিলেন খুব বেশি সৎকর্মশীলা, বেশি সাওম পালনকারিনী ও বেশি সালাত আদায়কারিনী।

ইনতিকাল

খলীফা হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা ইনতিকাল করেন।[৯৩]

হযরত জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিস

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা আরবের খুযা'আ গোত্রের মুসতালিক[৯৪] শাখার কন্যা। পিতা হারিস ইবন দিরার ছিলেন বানূ মুসতালিকের নেতা।[৯৫]

---

৯০. ইমাম আজ-জাহাবী, **সিয়ারু আ'লাম আন নুবানা,** ২য় খণ্ড, পৃ ২১৫।

৯১. **আনসাবুল আশরাফ,** ১ম খণ্ড, পৃ ৪৩৫।

৯২. **সিয়াম আলাম আন-নূবালা,** ২য় খণ্ড, পৃ ২১৭।

৯৩. যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা যে বছর ইনতিকাল করেন সে বছরই মিসর বিজয় হয়। হাফেজ ইবন হাজারের মতে তিনি তিপ্পান্ন বছর জীবন পেয়েছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসের মত এটাই। কিন্তু ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মতে হযরত যায়নাব রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর মোট জীবনকাল পঞ্চাশ বছর। আর যা অধিকাংশের মতের পরিপন্থী। আল ওয়াকিদী আরও বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। পক্ষান্তরে অন্যদের মতে আটত্রিশ বছর। (ইবন হাজার আল-আসকালানী, **আল ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা**, বৈরুত ঃ দারআল-ফিকর ১৯৭৮ খ্রিঃ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩১৫।

৯৪. **মুসতালিক** ঃ 'মুসতালিক' হলো বনু খুযা'আ গোত্রের জুজায়মা ইবন সা'দ নামের এক ব্যক্তির উপাধি। (মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, **আসহাবে রাসূলের জীবন কথা,** ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর- ১৯৯৯ রামাদান-১৪২০, ৫ম খণ্ড, পৃ ২৫২)।

৯৫. আয যাহাবী, **সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

বনূ আল-মুসতালিক[৯৬] –এর যুদ্ধে হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা মুসলমানদের হাতে বন্দী হন।[৯৭]

বনু আল-মুসতালিক –এর যুদ্ধের গণীমতের মাল বণ্টন শেষ করার পর হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা তার সামনে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করে এসেছি। — أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُـوْلُه আমি আমার গোত্রপতি হারিস

---

৯৬. **বনু আল-মুসতালিক যুদ্ধ** ঃ হিজরী ৫ম সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পেলেন যে, বনু আল-মুসতালিক-এর নেতা হারিস ইবন দিরার মক্কার কুরাইশদের প্ররোচনায় নিজের ও অন্য আরব গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবরটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুরায়দা বিন আল-হুসাইব আল-আসলামীকে রাযী আল্লাহু 'আনহু পাঠালেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সরাসরি হারিসের সাথে কথা বলে বুঝলেন, ঘটনা সত্য। তিনি সাথে সাথে ফিরে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–কে প্রকৃত অবস্থা জানালেন। কাল বিলম্ব না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

বাহিনী প্রস্তুত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়িদ ইবন হারিসা রাযী আল্লাহু 'আনহু, মতান্তরে আবু জার আল গিফারীকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে নিজেই বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। কোন কোন বর্ণনায় নুমাইলা ইবন আবদিল্লাহ আল-লাইসীকে মদীনায় খলিফা হিসেবে রেখে যাওয়ার কথা এসেছে। যাই হোক, তিনি পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসের ২য় তারিখ মদীনা থেকে বের হন এবং মদীনা থেকে নয় মনযিল দূরে 'মুরাইসী' পৌঁছে যাত্রা বিরতি করেন। (বনু মুসতালিক অভিযানে হযরত রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনী সহ এই কূপের ধারে অবস্থান করেন তাই ইতিহাসে এই অভিযান বনু মুসতালিক অথবা আল-মুরাইসীর যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।) হারিসের নেতৃত্বে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট সংবাদ পৌঁছে গেল। তারা ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়ল। অন্যান্য আরব গোত্র প্রতিরোধের ইচ্ছা ত্যাগ করে যার যার মত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। হারিসের সঙ্গে থাকল শুধু তার গোত্রের লোকেরা। তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল এবং দীর্ঘক্ষণ তীর কার্য ছুঁড়ে মুসলিম বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখল। অবশেষে মুসলিম বাহিনী হঠাৎ করে একসাথে আক্রমণ করে বসে এবং শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে। নেতা আল-হারিস পালিয়ে যায়। এগারোজন কাফির সৈন্য মারা যায় এবং অন্যরা সকলে বন্দী হয়। মুসলিম বাহিনীর কোন সৈন্য শাহাদাত বরণ করেনি। তবে ভুলক্রমে হযরত 'উবাদা ইবন সামিতের রাযী আল্লাহু 'আনহু হাতে হিশাম ইবন সাবাবা নামে এক ব্যক্তি শহীদ হন। শত্রুপক্ষের পুরুষ, নারী, শিশু মিলে প্রায় ৬০০ জন বন্দী হয় এবং তাদের দুই হাজার উট পাঁচ হাজার ছাগল-ভেড়া গণীমত (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ) হিসেবে মুসলিম বাহিনী লাভ করে। (আব্দুর রউফ দানাপুরী, **আসাহুস সিয়ার,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭)।

৯৭. যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হযরত জুওয়াইরিয়া ও রাযী আল্লাহু 'আনহা ছিলেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের কোন কোন গ্রন্থেও তাঁর বর্ণনাটি সংকলিত হয়েছে। সকল যুদ্ধবন্দীকে দাস-দাসী ঘোষণা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা পড়েন হযরত সাবিত ইবন কায়েসের রাযী আল্লাহু 'আনহু মতান্তরে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের ভাগে। তিনি ছিলেন গোত্রীয় নেতার কন্যা। তদুপরি তাঁর ছিল প্রবল আত্মসম্মানবোধ, কোমল স্বভাব, রূপ ও সৌন্দর্য। দাসীর জীবন মেনে নিতে পারলেন না। তিনি হযরত সাবিত ইবন কায়েস রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর নিকট 'মুকাতাবা'–এর আবেদন জানালেন। সাবিত রাযী আল্লাহু 'আনহু নয় উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তিদানের 'মুকাতাবা' বা চুক্তি করলেন। কিন্তু হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহু এ পরিমাণ অর্থ কোথায় পাবেন? তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মানুষের কাছে সাহায্যের হাত পেতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইবন দিরারের কন্যা। মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে এসেছি এবং সাবিত ইবন কায়েসের ভাগে পড়েছি। সাবিত আমার সাথে 'মুকাতাবা' করেছেন। কিন্তু আমি অর্থ পরিশোধ করতে পারছি না। আমি আপনার নিকট এই প্রত্যাশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি আমার চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এর চেয়ে ভাল কিছু আশা কর না? বললেন, তা কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার চুক্তিকৃত সকল অর্থ পরিশোধ করে দিই এবং তোমাকে বিয়ে করি। এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা দারুণ খুশি হন এবং সম্মতি প্রকাশ করেন। অতঃপর হযরত রাসূলে করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিতকে ডেকে পাঠান এবং চুক্তির অর্থ তাঁকে দান করে জুওয়াইরয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা-কে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। অতঃপর তাঁকে বিয়ে করে স্বাধীন স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। ইবন ইসহাক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।[৯৮]

বিয়ের খবর যখন মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাঁরা বললেন, বনু আল-মুসতালিক তো এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সম্মানিত শ্বশুরকুল। যে খান্দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছেন। তাঁরা কখনো দাস-দাসী হতে পারে না। এরপর তাঁরা পরামর্শ করলেন এবং একজোট হয়ে এক সাথে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন।[৯৯]

ইবনুল আসীর লিখেছেন, এই উপলক্ষে বনু মুসতালিকের একশো বাড়ির সকল বন্দী মুক্তি পায়। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আহমাদ হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ [১০০]

مَا رَأَيْتُ إِمْرَأَةً أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْهَا عَلَىٰ قَوْمِهَا

---

৯৮. ইবন সাদ, **আ-তাবাকাত আল-কুবরা** (বৈরুত ঃ দারু সাদির) ৮ম খণ্ড, পৃ ১১৬; ইবন হিশাম, **সীরাতু ইবন হিশাম** (বৈরুত) ২য় খণ্ড, পৃ ২৯৪-২৯৫। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহার পিতা হারিস ছিলেন আরবের একজন অন্যতম নেতা। মুসলিম বাহিনীর হাতে তাঁর কন্যা বন্দী হলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট এসে বলেন, আমার কন্যা দাসী হতে পারে না। আমার মর্যাদা দাসত্বের অনেক উর্ধ্বে। আপনি তাঁকে মুক্ত করে দিন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন বিষয়টি জুওয়াইরিয়ার মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হোক– সেটাই কি ভাল হবে না? হারিস কন্যা জুওয়াইরিয়ার নিকট গিয়ে বললেন, মুহাম্মদ তোমার মর্জির উপর তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। দেখ, তুমি যেন আমাকে লজ্জায় ফেল না। জুওয়াইরিয়া পিতাকে বললেন, 'আমি রাসূলের কাছে থাকতে পছন্দ করছি।' অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন। (**আলাম আন-নুবালা**, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২৬৩)।

৯৯. ইবন সাদ, **আত-তাবাকত,** প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ ১১৬।

১০০. ইবনুল আসীর, **উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা** (বৈরুত ঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল আরাবী, তারিখ বিহীন) ৫ম খণ্ড, পৃ ৪২০।

Dhaka University Institutional Repository

'আমি কোন নারীকে তার সম্প্রদায়ের জন্য জুওয়াইরিয়া থেকে অধিকতর কল্যাণময়ী দেখিনি। ইবন সা'দ হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর দেনমোহর সম্পর্কে বলেছেন ঃ[১০১]

وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقُ كُلِّ مَمْلُوْكٍ مِنْ بنى الْمُصطَلِقْ ـ

বনু আল-মুসতালিক–এর প্রতিটি বন্দীর মুক্তি তার মোহর হিসেবে ধার্য হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা এর যে সময় বিয়ে হয় তখন তিনি মাত্র বিশ বছর বয়সের এক তরুণী। হযরত আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা প্রথম দর্শনেই তাঁকে যথেষ্ট রূপবতী এবং তাঁর চাল-চালন খুবই মিষ্টি-মধুর বলে মনে করেছেন। হযরত 'আয়িশা রাযী আল্লাহু 'আনহা তাঁর রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন।[১০২]

كَانَتْ جُوَيْرِيَةَ إِمْرَأَةً حَلْوَةً وَمَلَاحَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلاَّ وَقَعَتْ فِيْ نَفْسِه ـ

"জুওয়াইরিয়ার মধ্যে মধুরতা ও ছলা কলা উভয় রকমের গুণ বিদ্যমান ছিল। কেউ তাঁকে দেখলেই তাঁর অন্তরে স্থান করে নিতেন। ইমাম আজ জাহাবী বলেন[১০৩]

وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ "তিনি ছিলেন সেরা রূপবতী মহিলাদের একজন।"

তিনি ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। তাঁর মধ্যে ছিল সীমাহীন আত্মসম্মান বোধ।[১০৪] হাদীসের একাধিক বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে তাঁকে তাসবীহ ও তাহলীলে মশগুল দেখতে পেয়েছেন।

খলিফা 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু যখন ভাতা প্রচলন করলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মধ্যে সাফিয়্যা রাযী আল্লাহু 'আনহা ও জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা ব্যতীত অন্য সকলের জন্য বারো হাজার করে নির্ধারণ করলেন। তাঁদের দুই জনের জন্য করলেন ছয় হাজার করে। তাদের দুইজনের জীবনের এক পর্যায় দাসত্ব থাকার কারণে তিনি এমন করেন। কিন্তু তারা 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর আচরণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

---

১০১. ইমাম আজ-জাহাবী, **সিয়ারু আলামু আন-নুবালা,** ২য় খণ্ড, পৃ ২৬২।

১০২. ইবনুল আসীর, **উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহবা** (বৈরুত ঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী) ৫ম খণ্ড, পৃ ২২০।

১০৩. ইমাম আজ-জাহাবী, **সিয়ারু আরামু আন-নুবালা,** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২৬১।

১০৪. তার মধ্যে সীমাহীন আত্মসম্মানবোধ ছিল তার প্রমাণ হলো, দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য তাঁর অস্থিরতা ও চেষ্টা সাধনা পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি ছিলেন নির্মোহ এবং আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ছিলেন একাগ্রচিত্ত। আত্মসম্মানবোদের কারণেই খলিফা 'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু যখন স্ত্রীগণের মধ্যে সাফিয়া ও জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা ব্যতীত অন্য সকলের জন্য বারো হাজার করে ভাতা নির্ধারণ করলেন এবং তাঁদেই দুইজনের জন্য করলেন ছয় হাজার। কারণ তাঁদের জীবনের এক পর্যায়ে দাসত্ব ছিল। তখন হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এবং ভাতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু সমতার দাবি মেনে নিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্ত করলেন এবং ভাতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁরা সমতার দাবি জানালেন। 'উমর তাঁদের দাবি মানতে বাধ্য হলেন। অন্য একটি বর্ণনায় মায়মূনার রাযী আল্লাহু 'আনহার কথাও এসেছে এবং বারো হাজারের স্থলে দশ হাজার এসেছে।[১০৫]

হাদীস বর্ণনা ঃ হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা রাসূলের ৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী একটি ও মুসলিম দুইটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১০৬]

হিজরী ৫ম সনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিয়ের সময় হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর বয়স ছিল বিশ বছর। সঠিক মতানুযায়ী হিজরী ৫০ সনের রবিউল আওয়াল মাসে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ৬৫ বছর। তৎকালীন মদীনার গভর্ণর মারওয়ান জানাযার নামাজ পড়ান। তাঁর কবর মদীনার আল-বাকী গোরস্থানে। মুহাম্মদ ইবন উমারের বর্ণনামতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ৫৬ সালে।[১০৭]

অতঃপর বাদশাহ নাজ্জাশী শুরাহবীল ইবন হাসনার সাথে তাঁকে রাসূলের খিদমতে প্রেরণ করলেন। হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে হযরত উম্মু হাবীবা রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর ৬৫ টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে দু'টি হাদীস مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ এবং দুটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে যে সকল রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ

হাবীবার (কন্যা) মু'আবিয়া, উৎবা (আবু সুফইয়ানের দুই ছেলে) আব্দুল্লাহ ইবন উতবা, আবু সুফিয়ান ইবন সাঈদ সাকাদী, সালিম ইবন সাওয়ার, আবুল জাররাহ। সাফিয়া বিনত শায়াবা, যায়নাব বিনত উম্মু সালামা, উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু সালিহ আস-সাম্মান, শাহর ইবন হাওশাব, আনবাসা, শুতাইর ইবন শাকাল, আবুল মালীহ, আমির আল-হুজালী প্রমুখ।[১০৮]

সপ্তম হিজরীতে তাঁর বিয়ে হয়। ৪৪ হিঃ তিনি মদীনা পরলোকগমন করেন। মদীনাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১০৯]

---

১০৫. ইউসুফ আল-কানধালুবী, **হায়াতুস সাহাবা** (দিমাশক, দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিঃ) ২য় খণ্ড, পৃ ২১৬।

১০৬. আল-ইসাবা, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৬৬। হযরত জুওয়াইরিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর কাছে যাঁরা হাদীস শুনেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হবেন ঃ ইবন 'আব্বাস, জাবির, ইবন 'উমার উবাইদ ইবন আস-সাবাক, তুফাইল, আবু আইউব মুরাগী, মুজাহিদ কুরাইব, কুলসুম ইবন মুসাতলিক, আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবন আল-হাদ প্রমুখ। (**সিয়ারু আলাম আন-নুবালা,** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২৬৩।)

১০৭. **সিয়ারু আলাম আন-নুবালা,** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২৭০।

১০৮. **সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,** প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২১৯; আল-ইসাবা, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩৬০।

১০৯. **ইবন কায়্যিক আল জওরিয়্যা,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯-১১২; শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৬-৪১৮; সুলায়মান সালমান মনসূরপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮-১৮১; ইবনু সায়্যিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৬-৩০৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু হাবীবা রাযী আল্লাহু 'আনহা

হযরত উম্মু হাবীবা রাযী আল্লাহু 'আনহা মক্কার প্রসিদ্ধ সরদার আবু সুফাইয়ানের কন্যা ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল রমলা।[১১০]

হাবশায় যাওয়ার পর উবায়দুল্লাহ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং উম্মু হাবীবাকে পরিত্যাগ করে। এই নিরাশ্রয় অবলা মহিলার বিপদ সংবাদ জানতে পেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে আমর যমরীকে হাবশার রাজা নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেন। নাজ্জাশী আবরাহা নামক তাঁর এক দাসীকে পাঠিয়ে দিয়ে হযরত উম্মু হাবীবাকে এ সংবাদ জানালেন। সংবাদ পেয়ে আনন্দের অতিশয্যে হযরত উম্মু হাবীবা তাঁর সকল অলংকার আবরাহকে পুরস্কার দিলেন এবং তার মামাতো ভাই খালিদ ইবন সাঈদকে বিয়ের উকিল বানিয়ে নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করলেন।

সন্ধ্যার পর নাজ্জাশী হযরত জা'ফর ও অন্যান্য মুসলমানগণকে সমবেত করে তাদের সম্মুখে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। তিনি নিজেই বিবাহের খুতবা পাঠ করলেন। এই বিবাহে তিনি চারশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) মহর নির্ধারিত করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তরফ হতে তিনি নিজে বিবাহ মজলিশে উক্ত মহর আদায় করে দেন। অতঃপর উপস্থিত লোকদেরকে ওলীমা ভোজনে আপ্যায়িত করেন।[১১১]

হযরত সাফিয়্যা রাযী আল্লাহু 'আনহা

হযরত সাফিয়্যা হযরত হারুন (আ) এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হাযায ইবন আখতাব। প্রথমে সাল্লাম ইবন মিশ্‌কামের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[১১২] তারপর দ্বিতীয়বার কিনানার সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক দিন পর খায়বার যুদ্ধে তাঁর স্বামী, পিতা, ভ্রাতা সব নিহত হয় এবং তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন।[১১৩]

---

১১০. উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাবের ভাই উবায়দুল্লাহর সাথে রমলার বিবাহ হয়। এই দম্পতি-যুগল ও ইসলাম গ্রহণ করে হাবশায় হিজরত করেন। সেখানেই হাবীবা নামক তাঁদের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাঁর নাম অনুসারেই তাঁকে উম্মু হাবীবা বলা হয়।

১১১. আহম্মদ ইবন হাম্বল, **আল মুসনাদ,** ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৪২৭।

১১২. বনু কুরাইজার সালাম ইবন মাশকাম ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি ও নেতা। তাঁর সাথে হযরত সাফিয়্যার রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর প্রথম বিয়ে হয়। এ বিয়ে টেকেনি। পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

১১৩. হিজাযের বিখ্যাত সওদাগর ও খায়বারের অন্যতম নেতা আবু রাফে এর ভাতিজা কিনানা ইবন আবিল হুকাইক এর সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। সম্মান ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কিনানা সালামের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি খায়বারের অতি প্রসিদ্ধ দুর্গ "আল কামুসের নেতা এবং বড় কবি ছিলেন। এবং পরিবার সহ এই দুর্গেই বসবাস করতেন। (**সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা**– ২/২৩১)।

Dhaka University Institutional Repository

যখন সমস্ত কয়েদী একত্রিত করা হল তখন হযরত দিহয়াতুল কলবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি দাসী চাইলেন। তিনি বললেন– আচ্ছা, তুমি দেখে একজন দাসী নিয়ে যাও। হযরত দিহইয়া হযরত সফিয়্যাকে পছন্দ করলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল– হুযুর, যে মেয়েটি নবীবংশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং নবীর ও কুলায়যা গোত্রের সরদারের কন্যা সে মেয়েটি আপনি দিহইয়াতুল কলবীকে দান করেছেন?[১১৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দিহইয়াতুল কলবী এবং হযরত সাফিয়্যাকে ডেকে আনলেন এবং হযরত সাফিয়্যার পরিবর্তে তাঁকে অন্য একটি দাসী দান করলেন। তৎপর তিনি হযরত সাফিয়্যাকে দাসত্ব হতে মুক্তি প্রদানপূর্বক বিয়ে করলেন।[১১৫]

খায়বার হতে ফিরার পথে 'সাহবা' নামক স্থানে এসে বিয়ের ওলীমা করলেন। অতঃপর তথা হতে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করার সময় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা করে উটের উপর আরোহণ করালেন। এতে লোকেরা বুঝতে পারল যে, হযরত সাফিয়্যা দাসী নয়; বরং রাসূলের পত্নী এবং উম্মুল মু'মিনীন।[১১৬]

৫০ হিজরীতে হযরত সাফিয়্যার ইন্তিকাল হয় এবং জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১১৭]

হযরত মায়মূনা রাযী আল্লাহু 'আনহা

হযরত ময়মুনা রাযী আল্লাহু 'আনহা সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। তাঁর পিতার নাম হারিস এবং মাতার নাম হিন্দ। বড় 'লুবাবা' নামক তাঁর এক ভগ্নি হযরত 'আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর স্ত্রী ছিলেন। ছোট 'লুবাবা' নামক আর এক ভগ্নি হযরত খালিদ ইবন ওলীদের মাতা ছিলেন। আসমা' বিনতে 'উমায়স নামক তাঁর এক বৈপিত্রেয় ভগ্নি হযরত জা'ফরের স্ত্রী ছিলেন। হযরত জাফর শহীদ হওয়ার পর হযররত আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু তাকে বিবাহ করেন। হযরত আবু বকরের মৃত্যুর পর হযরত 'আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু তাঁকে বিয়ে করেন। সালমা বিনুমায়স নামক তাঁর আরেক বৈপিত্রেয় ভগ্নি হযরত হামযার স্ত্রী ছিলেন।

---

১১৪. সায়্যিদ 'আব্দুল্লাহ হাশিম, **জম'উল ফাওয়াহিদ** (মিসর ঃ দারুত তালীফ, ১৯৬১ খ্রিঃ), ২য় খণ্ড, পৃ ১৩৪।

১১৫. মুহাম্মদ ইবন সা'আদ, **আত-তাবাকাত,** ৫ম খণ্ড, পৃ ৯০। সহীহ বুখারীতে এসেছে দাসত্ব থেকে মুক্তিই তার মেহার ধার্য হয়– عِتْقَهَا صَدَاقَهَا — **বুখারী** ৭/৩৬০, বাবু ওসওয়াতু কায়বার; ৯/১১১ আন নিকাহ ঃ বাবু মান জা'আলা ইতকাল আমাতি সুদাকাহা; ৯/২০৫ বাবুল ওয়ালীমা' মুসলিমা– (১৩৬৫,৮৫) আন নিকাহ, **আবু দাউদ,** (২০৫৪); **তিরমিযী**, (১১১৫); **নাসাঈ,** ৬/১১৪।

১১৬. সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪।

১১৭. সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫-১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে মাস'উদ সকফীর সাথে হযরত মায়মুনা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর বিবাহ হয়। অতঃপর আবু রুহম তাকে বিবাহ করে। আবু রুহমের মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ইহাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শেষ বিবাহ। হযরত আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহা ও বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং তিনিই বিয়ে পড়ান।[১১৮]

কাযা 'উমরার সময় 'সরফ' নামক স্থানে বিয়ে হয়। এখানে স্ত্রীর সাথে তাঁর মিলন হয়। ৫১ হিজরীতে উক্ত সরফেই তাঁর মৃত্যু হয়। এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস তাঁর জানাযা পড়ান এবং তাঁকে কবরে রাখেন। হযরত আব্দুল্লাহ তাঁর ভাগনে ছিলেন।[১১৯]

হযরত ফাতিমাতুয্ যাহ্‌রা রাযী আল্লাহু 'আনহা

তাঁর নাম ফাতিমা এবং 'যাহ্‌রা' তাঁর উপাধি। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। এক বর্ণনা মতে নবুয়তের প্রথম বছর, অপর রিওয়ায়েত নবুওয়াতের পাঁচ বৎসর পূর্বে, আরেক রিওয়ায়েত এক বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[১২০]

শৈশবে ঃ "আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর কুরায়েশের একটি দল মজলিশ জমিয়ে বসেছিল। এমন সময় তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কি এই রিয়াকারীকে দেখনি? তোমাদের এমন কে আছে যে অমুক গোত্রের উট জবাই করার স্থান পর্যন্ত যেতে রাজি? সেখান থেকে গোবর, রক্ত ও নাড়িভূঁড়ি নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে। যখন সে সিজ্‌দায় যাবে, তখনই এগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। এ কাজের জন্য তাদের চরম হতভাগ্য ব্যক্তি (উক্‌বা ইব্‌ন আবু মু'আইত) উঠে দাঁড়াল এবং (তা নিয়ে এলো)। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গেলেন, সে তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় স্থির রয়ে গেলেন। এতে তারা হাসাহাসি করতে লাগল। এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। (এ অবস্থা দেখে) এক ব্যক্তি ফাতিমা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর কাছে গেল। তখন তিনি ছোট বালিকা মাত্র ছিলেন। তিনি দৌড়ে চলে এলেন। তখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'আদ, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৯৪।

১১৯. ইবন কায়্যিম আল-জওয়িয়্যা, **প্রাগুক্ত,** পৃ ১১৩; দানাপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬০৩-৬০৫; ইবন সায়্যিদুন্নাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৮-৩০৯।

১২০. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, **হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন**, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াসাল্লাম সিজদারত ছিলেন। ফাতিমা রাযী আল্লাহু 'আনহা সেগুলো তাঁর উপর থেকে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে গালমন্দ দিতে লাগলেন।[১২১] (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় হিজরীতে আঠার বছর বয়সে 'আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[১২২] হযরত আলী তাঁর বর্মটি হযরত উসমান রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর নিকট চারশত আশি দিরহামে বিক্রয় করলেন এবং সকল দিরহাম রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর হাতে সমর্পণ করলেন। অতঃপর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের আয়োজন করলেন এবং যথাসময়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।[১২৩]

যৌবনে ঃ সাহল রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের দিনের যখম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখমণ্ডলে আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণ ও ভেঙ্গে গিয়েছিল। হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন, আর ফাতিমা রাযী আল্লাহু 'আনহা রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করেছিলেন। রক্তক্ষরণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তিনি (ফাতিমা) একটি চাটাই জ্বালিয়ে ছাই বানালেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। এরপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল।[১২৪] (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ফাতিমা জীবিত থাকতে হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু অন্য কোন বিয়ে করেননি। হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত মুহসিন, হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত যয়নব, এই পাঁচ সন্তান হযরত ফাতিমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুহসিন শিশুকালেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। চারজন ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত। রাসূলের সন্তানগণের মধ্যে একমাত্র হযরত ফাতিমা রাযী আল্লাহু 'আনহা-এর সন্তান-সন্ততি বংশ পরম্পরাই বিদ্যমান আছে। এই বংশে বহু নামজাদা ওলী, বুযুর্গ ও ইমাম জন্মগ্রহণ করেছেন।[১২৫]

---

১২১. **সহীহ বুখারী,** সালাত অধ্যায়; নারী নামাযের মুসাল্লা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস উঠিয়ে ফেলে দেবে অনুচ্ছেদ; ২য় খণ্ড, পৃ ১৪১। **সহীহ মুসলিম,** জিহাদ ও ভ্রমণ অধ্যায়; মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ হতে মুহাম্মদ যে নির্যাতনের মুকাবিলা করেছেন অনুচ্ছেদ, ৫ম খণ্ড, পৃ ১৭৯।

১২২. সর্বপ্রথম হযরত অবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু অতঃপর হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উত্তর দেননি। তৎপর হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু বিয়ের প্রস্তাব করলে তিনি বললেন, ফাতিমার মোহরের জন্য তোমার নিকট কি আছে? তিনি বললেন, একটি ঘোড়া আর লৌহ-বর্ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘোড়াটিত যুদ্ধের জন্য রাখা কর্তব্য। আচ্ছা, বর্মটি বিক্রয় করতে পার। (মুহাম্মদ নূরুয্যামান, **সংগ্রামী নারী, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী,** প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি- ১৯৯৭, শাবান- ১৪১৭, পৃ ১১৯)।

১২৩. শায়খুল হাদীস মাও. তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ এইচ এম মুজতাবা হোছাইন, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৯৯১।

১২৪. **সহীহ্ বুখারী**, জিহাদ অধ্যায়, সাদা পোশাক পরিধান অনুচ্ছেদ, ৬ খণ্ড, পৃ ৪৩৭; **সহীহ্ মুসলিম**, জিহাদ অধ্যায়, ওহোদ যুদ্ধ অনুচ্ছেদ , ৫ম খণ্ড, পৃ ১৭৮।

১২৫. ড. এ. এইচ এম মুজতাবা হোছাইন, **প্রাগুক্ত,** পৃ ৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

সহনশীলতা ও গৃহ পরিচর্যা

"আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, ফতিমা হাত দিয়ে যাঁতা ঘুরানোর ফলে হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন। ফাতিমা জানতে পেরেছিলেন তাঁর কাছে কিছু গোলাম এসেছে। কিন্তু তার সাথে ফাতিমার দেখা হলো না। তিনি আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহাকে ঘটনা বলে চলে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে এলে আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করলেন। আলী বলেন, তিনি আমাদের কাছে এমন সময় এলেন যখন আমরা ঘুমের জন্য শুয়ে পড়েছি। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন ঃ নিজের জায়গায় থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। আমি আমার পেটে তাঁর পায়ের স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছ তার চেয়েও কল্যাণকর জিনিসের কথা কি তোমাদের বলে দেব? যখন তোমরা বিছানায় যাও, তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" এবং চৌত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" পড়বে"। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চেয়েও উত্তম।[১২৬]

ফাতেমা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর মর্যাদা

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَــى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ـ قَـالَ فَاطِمَـةُ بَضْعَـةُ مِنِّـى فَمَـنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِىْ ـ

অর্থাৎ– "মিসওয়ার ইবন মাখরামা রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফাতিমা রাযী আল্লাহু 'আনহা আমার দেহের একটি টুকরা। যে তাকে রাগান্বিত করল সে নিশ্চয়ই আমাকে রাগান্বিত করল।"[১২৭]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِىُّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ إِبْنَتَهُ فِىْ شِـكْوَاهُ الَّتِـىْ قُبِـضَ فِيْهَا فَسَارَّهَا بِشَيْئٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَالِكَ فَقَـالَتْ سَـارَّنِى النَّبِىُّ صعلم فَأَخْبَرَنِىْ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِىْ فَجْعه الذِىْ تُوْفِىْ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِىْ فَـأَخْبرَنِىْ إِنِّـى أَوَّلُ أَهْلِ بَيْته أَتْبَعُهُ فَضَحِكَتْ ـ

অর্থাৎ– আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত হন তখন একদিন তাঁর কন্যা ফাতেমা রাযী আল্লাহু 'আনহা কে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কিছু বলেন। তখন ফাতেমা রাযী আল্লাহু 'আনহা কেঁদে ফেললেন। তার পর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কিছু বলেন। তখন তিনি

---

১২৬. **সহীহ্ বুখারী,** ব্যয় এবং পরিবারের জন্য ব্যয়ের ফযীলত অধ্যায়; আমার গৃহে স্ত্রীর কর্তব্য অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ৪৩৩; **সহীহ্ মুসলিম,** যিকর, দু' আততওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায়; দিনে প্রারম্ভে এবং ঘুমের পূর্বে তাসবীহ পাঠ অনুচ্ছেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ ৮৪।

১২৭. **সহীহ্ বুখারী,** অধ্যায় ঃ কিতাবুল মানাকিব অনুচ্ছেদ ঃ ফাতেমা রাযী আল্লাহু 'আনহা এর মর্যাদা (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৪২১ হিঃ/ ২০০০ খ্রি), ৩য় খণ্ড, পৃ ৫৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

হেসে ফেলেন। আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (প্রথমবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিচুপি আমাকে এ খরবটি দিলেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইন্তেকাল করবেন, যে অসুখে তিনি ওফাত পেয়েছেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর (দ্বিতীয়বার) তিনি চুপিচুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, তার পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পশ্চাৎগামী হব। তখন আমি হেসে ফেললাম।[১২৮]

ওফাত

হযরত ফাতিমা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়মাস পরে একাদশ হিজরীতে ইহলোক পরিত্যাগ করত জান্নাতবাসী পিতার সাথে মিলিত হন। তাঁর অসিয়্যত অনুযায়ী হযরত আবু বকরের রাযী আল্লাহু 'আনহু স্ত্রী হযরত আসমা বিনত্ 'উমায়স এবং হযরত 'আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু তাঁকে গোসল দেন। হযরত আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু মতান্তরে হযরত 'আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু তাঁর জানাযা পড়ান।[১২৯]

উম্মে আম্মার বিনতে কা'ব

উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু 'আনহা–এর আসল নাম নুসাইবা। তাঁর পিতার নাম কা'ব বিন আমর। বংশ পরম্পরা হল নুসাইবা বিনতে কা'ব বিন আমর বিন আওফ বিন মারযুল বিন আমর বিন গানম বিন মাযান বিন নাজ্জার। তিনি সপীনার মশহুর খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।[১৩০]

---

১২৮. **প্রাগুক্ত,** পৃ ৫৮৬।

১২৯. শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৬-৪২৮। কারো কারো মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মৃত্যুর মাত্র দু'মাস পর হযরত ফাতিমা রাযী আল্লাহু 'আনহা ঊনত্রিশ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। (মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান, **সংগ্রামী নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫)।

১৩০. মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান, **সংগামী নারী** (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, শাবান ১৪১৭, জানুয়ারি– ১৯৯৭) পৃ ১১৭; বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে আব্দুল মুত্তালিবের পিতা হাশেম বিন আবদে মানাফের বৈবাহিক সম্পর্ক থাকার কারণে গোত্রের দিক থেকে তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর গোত্র কোরাইশের খুব নিকটবর্তী ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশবের অনেক স্মৃতি বনুনাজ্জার গোত্রের সাথে জড়িত রয়েছে। বনু নাজ্জারের মাঠে ময়দানে তিনি খেলাধুলা করেছেন। তাদের পুকুরে সাঁতার শিখেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাজ্জার গোত্রের লোকদের খুব সম্মান করতেন। তিনি তাদরেকে খুব ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, যদি আমি আনসারদের কোন খান্দানে জন্মগ্রহণ করতাম তাহলে বনু নাজ্জার গোত্রে জন্মগ্রহণ করতাম। বানু নাজ্জার গোত্রের লোকজন ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব ভালবাসতেন। (মুহাম্মদ নুরুয্‌যামান, **প্রাগুক্ত,** পৃ ১৭৭-১৭৮)।

Dhaka University Institutional Repository

নিকাহ

যায়েদ বিন আসিসের সঙ্গে তার প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিবাহ হয় আরবা বিন আমরের সঙ্গে। তিনি মোট চারটা সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন। এদের দু'জন প্রথম স্বামীর ঔরসজাত। সন্তানদের নাম হাবীব, আব্দুল্লাহ, তাসিম ও খাওয়াসা।

ইসলাম কবুল

উম্মে আম্মার ও তাঁর খান্দানের লোকেরা রাসূলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম কবুল করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হজ্জের মওসুমে উম্মে আম্মার রাযী আল্লাহু 'আনহা ও তাঁর স্বামী আরবা বিন আমরও রওয়ানা হলেন ৭২ জন নও মুসলমানের সঙ্গে মক্কায় যিয়ারতের জন্য। তের নববী সনে ১২ই জিলহজ্জ গভীর রাত্রে আকাবার পাদদেশে গোপন কেন্দ্রে আল্লাহর রাসূলের সাক্ষাত পেলেন। মদীনার মুসলমানরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বাইয়াত করলেন।[১৩১]

ওহুদের যুদ্ধ

মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম হলো ওহুদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ পর্বতের পাদদেশে ৫০ জন তিরন্দাজ মুসলমানদের একটি দল নিয়োগ করলেন। পশ্চাৎ দিক থেকে শত্রুপক্ষ আক্রমণের জন্য ধাবিত হলো তাদের প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। দ্বিতীয় হুকুম না দেয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করতে তাদের বারণ করলেন।

যুদ্ধ শুরু হল। আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী মুসলিম বাহিনীরই জয় হল প্রথমে। বিজয় সংকেত আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে তীর নিক্ষেপকারী গণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে নিজেদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে তারা যুদ্ধের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহে লেগে গেলেন। অরক্ষিত মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাফিররা। এ যুদ্ধে বহু সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এদিকে মুসলিম বাহিনীর বিশৃঙ্খলার সুযোগে পেছনের পথ অরক্ষিত পেয়ে খালিদ তার সৈন্য নিয়ে অপ্রস্তুত মুসলমানদের উপর হামলা করে বসলেন। শুরু হল, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, এবার সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। বীর হানযালা, আনাস রাযী আল্লাহু 'আনহু, আমীর হামযা রাযী আল্লাহু 'আনহু প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবীগণ শহীদ

---

১৩১. মনের নিভৃত কোণে যে আকাঙ্ক্ষাটি একটি বছর ধরে প্রতিপালিত হচ্ছে তা হল বিশ্বনবীর দর্শন লাভ। তাদের মনের গোপনতম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল তের নববী সনের ১২ই জিলহজ্জ। ৭২ জন মুসলমানসহ তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন আপনি মদীনায় চলুন, আমরা আপনার জন্য আমাদের জানমাল ও আওলাদদের কোরবান করে দেব। (মুহাম্মদ নূরুয্ যামান, **প্রাগুক্ত**, পৃ ১৭৮)।

Dhaka University Institutional Repository

হলেন। কাফেররা চতুর্দিক থেকে মহানবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। তারা হুংকার ছাড়তে লাগল ঃ কোথায় মুহাম্মদ, তার সন্ধান কেউ বলে দেবে । সে বেঁচে থাকলে আমাদের নিস্তার নেই।[১৩২]

যুদ্ধের ময়দানে এ ধরনের মারাত্মক পরিস্থিতি আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকালে এ ঘটনার পূর্বে বা পরে কখনও উদ্ভব হয়নি। অদূরে উম্মে আম্মার রাযী আল্লাহু 'আনহা আহত সৈনিকদের শুশ্রুষা করছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শক্রবেষ্টিত দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না সেখানে। এ ধরনের মারাত্মক ও নাজুক পরিস্থিতিতে উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু 'আনহা অতুলনীয় বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। যাতে কাফিররা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হামলা করতে না পারে তার জন্য তিনি প্রাচীর হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাই তাকে খতম করার জন্য বার বার কাফের সৈন্য তাকে হামলা করতে লাগল। একজন অশ্বারোহী কাফের সৈন্য এসে তাকে আক্রমণ করল, তিনি ঢালের সাহায্যে তা প্রতিহত করলেন। সৈন্যটি অপরদিকে মুক ফিরালে তিনি তার ঘোড়ার পা কেটে দিলেন। ঘোড়া আরোহীসহ মাটিতে পড়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর ছেলে দুটোকে তার সাহচার্যে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এসে শত্রু সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।[১৩৩]

ওহুদের যুদ্ধে উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর পুত্র আব্দুল্লাহ আহত হন। তাঁর বাহু থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ব্যান্ডেজ করার জন্য উম্মে আম্মারকে আদেশ করলেন। ব্যান্ডেজ করার পর উম্মে আম্মার নির্ভীকভাবে আদেশ দিলেন ঃ যাও কাফিরদের সাথে লড়।[১৩৪]

---

১৩২. ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী, **যাদুল মা'আদ** (মিসর ঃ মাতবা 'আ মুসতফাল বাবিল হলবী, ১৯৫০) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৩-৯৬।

১৩৩. ওহুদের প্রান্তরে উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু 'আনহু আহত সৈনকিদের সেবা শুশ্রুষা করছিলেন, মুসলমানদের বিশৃঙ্খল অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শক্রবেষ্টিত দেখে তিনি পানির মশক ফেলে দিলেন হাত থেকে। হাতের কাছে যা সামান্য অস্ত্র পেলেন তা তুলে নিলেন। ঝড়ের গতিতে দৌড়ে এলেন নবী করীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর উপর আক্রমণ করার জন্য যারা ছুটে আসল তিনি তাদের বীর বিক্রমে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। প্রথমে তার হাতে কোন ঢাল ছিল না। অনেক সন্ধান করে কোনক্রমে ১টি ঢাল যোগাড় করে তিনি কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। কাফেরদের আক্রমণের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, অনেক বীর সৈনিক ও নিজেদেরকে দৃঢ়পদ রাখতে পারেনি। (মুহাম্মদ নূরুযযামান, **সংগ্রামী নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০-১৮১)।

১৩৪. আহতদের ব্যান্ডেজ করার জন্য উম্মে আম্মারার কোমরে কিছু সাদা কাপড়ের টুকরো থাকত। একটা নেকড়া খুলে তিনি পুত্রের আহত হাত উত্তমরূপে বেঁধে দিলেন। পুত্রের মারাত্মক জখম দেখে তিনি একটু ও আক্ষেপ করলেন না। তাকে কোনরূপ সান্ত্বনা দিলেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আদর্শনিষ্ঠা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। কয়েকবার উম্মে আম্মারার জন্য দোয়া করলেন তিনি। তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন এমন সাহস কার আছে? (মুহাম্মদ নূরুযযামান, **সংগ্রামী নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০-১৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আদর্শ দেখে খুব প্রীত হয়েছিলেন। কয়েকবার আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন তিনি। তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ এমন সাহস কার আছে? উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহা 'আনহা একটু পরেই পুত্রের আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন এবং পুত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। আঘাত কারীকে তলোয়ারের আঘাতে দু টুকরো করে দিলেন।[১৩৫]

ইবনে কামিয়ার সাথে যুদ্ধ

আরবের মাশহুর অশ্বারোহী ইবনে কামিয়ার সাথে ওহুদ প্রান্তরে উম্মে আম্মারার যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দূর থেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে এক হতভাগা পাথর নিক্ষেপ করে। তাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি দাঁত শহীদ হয়। এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেফাযতকারী সাহাবী সৈনিকগণ সম্ভবতঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ইবনে কামিয়া এ সুযোগ গ্রহণ করে খুব ক্ষিপ্রগতিতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুব সন্নিকটে পৌছে তাকে আক্রমণ করে। এ হামলাতে আল্লাহর রাসূলের চেহারা মোবারক আহত হয় এবং তা থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়। যা দেখে সাহাবায়ে কেরাম খুব পেরেশান হন। এ দুর্যোগ লগ্নে উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু 'আনহা ইবনে কামিয়াকে হত্যা করার সংকল্প নেন। আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন এবং তার গতি প্রতিরোধ করেন। ক্ষিপ্র গতিতে তিনি তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করেন। কিন্তু আল্লাহর দুশমন সুদৃঢ় বর্ম পরিহিত থাকার কারণে উম্মে আম্মারার তলোয়ার ভেংগে যায়। সে উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু 'আনহাকে পাল্টা আক্রমণ করে। সে তাঁর কাঁধে মারাত্মকভাবে জখম করে। উম্মে আম্মারা ভাংগা তলোয়ার দিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করলেন। বেশিক্ষণ ইবনে কামিয়া দৃঢ়পদ থাকতে পারল না। আল্লাহ তার অন্তরে ভয় ঢেলে দিলেন। সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল।

যুদ্ধের পরও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আম্মারার বীরত্বের কথা সাহাবায়ে কিরামকে বলতেন; উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু আনহা –এর শরীরে ওহুদের যুদ্ধে কমপক্ষে বারটি আঘাতের চিহ্ন ছিল।

---

১৩৫. পুত্রকে আঘাতকারী শত্রু তাকে আক্রমণ করতে, উদ্যত হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আম্মারকে সতর্ক করে বললেন ঃ হে উম্মে আম্মারা সাবধান! এ হতভাগা আব্দুল্লাহকে জখম করেছে। তিনি পুত্রের আঘাতকারীর উপর প্রবল হামলা করেন এবং তার প্রতি আক্রমণে আক্রমণকারী শত্রু দু টুকুরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। উম্মে আম্মারার রাযী আল্লাহু 'আনহা এ দৃশ্য দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে বললেন হে উম্মে আম্মারাঃ পুত্রের উত্তম প্রতিশোধ নিয়েছ। (মুহাম্মদ নূরুযযামান, **সংগামী নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০-১৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

উম্মে আম্মারা বর্ণনা করেন ঃ আমি ওহুদের দিন লোকজন কি করছে তা দেখার জন্য বের হলাম। আমি আহতদেরকে পানি পান করাচ্ছিলাম। আমি আখেরী নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট পৌছলাম, তখন তিনি তার সাহাবাদের ভীড়ের মধ্যে ছিলেন। সে সময় পর্যন্ত মুসলমানদের পাল্লা ভারী ছিল। কিন্তু যখন মুসলমানগণ পরাজিত হলেন তখন আমি তার চারদিকে যুদ্ধ করতে লাগলাম।[১৩৬]

আমার তলোয়ার দ্বারা তাকে রক্ষা করতে লাগলাম। শত্রুগণ তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। একটি তীর আমাকে আঘাত করলে আমি আহত হলাম । ইবনে কামিয়া আমার ওপর তীর নিক্ষেপ করেছিল। ঘটনা এভাবে ঘটেছিল, লোকজন পেছনে ছিল। ইবনে কামিয়া সামনে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মদ কোথায়? তিনি যদি বেঁচে যান তা হলে আমার নিস্তার নেই। তখন মাসআব বিন আসির এবং আমি তার মুকাবিলা করতে থাকি। সে তীর নিক্ষেপ করতে আমাকে আহত করে, আমিও প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য বারবার তাকে আক্রমণ করি। কিন্তু আল্লাহর দুশমনের শরীরে দুটো বর্ম ছিল।

অসীম সাহসিকতা, অতুলনীয় খেদমত এবং অনুপম নিষ্ঠার জন্য উম্মে আম্মারা রাযী আল্লাহু 'আনহা সর্বযুগের ও সর্বকালের সচেতন ও সংগ্রামী মানুষের আদর্শ হয়ে থাকবেন।[১৩৭]

খাওলা বিনতে সা'লাবা

বনি আওস গোত্রে খাওলা বিনতে সা'লাবার জন্ম। তিনি রিসালাতে মুহাম্মদীতে বিশ্বাস স্থাপন করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাইয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। খাওলা রাযী আল্লাহু 'আনহা–এর স্বামী আওস বিন সামিতের আচরণে একটু কঠোরতা ছিল, মেজাজ ছিল কর্কশ। একদিন স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন। "তোমার পৃষ্ঠদেশ আমার মা'র মত।"

---

১৩৬. এই যুদ্ধে উম্মে আম্মারার জখম এত গভীর ছিল যে, পূর্ণ এক বছর চিকিৎসা করেও তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেনি। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর এ সিংহী মোটেই দমিত হলেন না। ভাংগা তলোয়ার দিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করেন। যুদ্ধ শেষেও উম্মে আম্মারার রাযী আল্লাহু 'আনহা–এর জখম থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার হাতে পট্টি বেঁধে দিলেন। কথিত আছে তিনি বাহাদুর সাহাবীদের নাম উল্লেখ করে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ আজ উম্মে আম্মার তাদের চেয়ে বেশি বিক্রম প্রদর্শন করেছে। উমর বিন খাত্তাব রাযী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ওহুদ যুদ্ধের পর আমি আল্লাহর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, ওহুদের দিন আমি সর্বদা তাকে আমার ডানে এবং বামে যুদ্ধ করতে দেখিছি। মুহাম্মাদ নূরুযযামান, **সংগ্রামী নারী,** প্রাগুক্ত পৃ. ১৮১

১৩৭. শেখ মুহাম্মদ রেজা, **মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ** (মিসর ঃ তারিখ বিহীন) পৃ ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

খাওলা রাসূলের দরবারে এ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে গেলেন তিনি বলেন "হে আল্লাহর রাসূল! আউস ইবন সামিত আমার স্বামী। আমার সারাটা যৌবন তার কাছেই কেটেছে এবং আমি গর্ভবর্তী ও হয়েছি। বর্তমানে যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, আমার শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, এমন পরিস্থিতিতে তিনি আমার সাথে "যিহার"[১৩৮] করেছেন।

হে আল্লাহর রাসূল! তার ঔরসে আমার গর্ভজাত কয়েকজন সন্তান রয়েছে। তাদেরকে তার কাছে দিলে যত্নের অভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তাদেরকে আমার কাছে রাখলে তারা অনাহারে কাটাবে। এরপর খাউলা রাযী আল্লাহু 'আনহা মাথা তুলে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করতে থাকলেন। এরই সাথে আল্লাহ তা'আলা সূরা মুজাদালা অবতীর্ণ করেন।[১৩৯]

উমর রাযী আল্লাহু আনহু–এর খিলাফাতকালে একদিন তিনি একদল লোকের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে খাওলা রাযী আল্লাহু 'আনহা সামনে এসে 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহুকে থামিয়ে উপদেশের স্বরে বললেন ঃ "উমর! তুমি এক সময় ছোট্ট শিশু ছিল, এরপর পূর্ণবয়স্ক। 'উমরে রূপান্তরিত হলে, আর বর্তমানে আমীরুল মু'মিনিন হিসেবে অধিষ্ঠিত। তাই যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বিশ্বাস করে, সে কোন বিষয় যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকে। আর যে ব্যক্তি হিসাব দিবসকে বিশ্বাস করে, সে শাস্তিকে ভয় করে।" এ সময় উপস্থিত কেউ কেউ খাওলা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে এই বলে বাধা দিতে চাইলেন যে, আপনি শুধু শুধু দেরী করাচ্ছেন, তিনি প্রশাসনিক কাজে খুবই ব্যস্ত আছেন। 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু তাদেরকে বললেন ঃ আপনারা চুপ করুন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি যদি আজকে সারাদিন আমাকে আগলে রাখেন, তবু আমি ফরয সালাতের

---

১৩৮. যিহার (ظـهار)। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে যিহার বলা হয়। যিহার শব্দটি ظـهار থেকে নির্গত। যার অর্থ পিঠ। **যিহারের পদ্ধতি ঃ** স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে ঃ তুমি আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মত হারাম। তাহলে সে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। জাহিলী যুগে এ যিহার পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ হত। কিন্তু ইসলামে তা দিয়ে বিচ্ছেদ হয় না। তবে তার জন্য জরিমানা দিতে হয়। তার কিছু নীতিমালা রয়েছে। যথা ঃ (ক) যিহার একটি পাপাচার ও অবৈধ পন্থা। (খ) স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদে বৈধ পন্থা হল তালাক। (গ) উক্ত বাক্য বলার পর স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক অস্থায়ীভাবে ছিনিয়ে নেয়া হবে। (ঘ) তাকে জরিমানা স্বরূপ কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে হবে। (ঙ) কাফ্ফারা আদায় ছাড়া স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে পারবে না। **যিহারের কাফফারা ঃ** স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইলে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। এতে অপরাগ হলে দু'মাস একাধারে রোযা রাখতে হবে। তাতেও অপরাগ হলে ষাট জন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করাতে হবে। আহারের পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে, জন প্রতি একজনের ফিতরা পরিমাণ গম, (চাল) বা এর মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওযনে ফিতরার পরিমাণ পৌনে দুসের। (মুহাম্মদ সায়্যিদ সায়্যিদ আস-সাফাতী, অনুবাদ মাহমুদুল হাসান ইউসুফ, **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ,** ঢাকা ঃ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, মে, ২০০০ খ্রিঃ, পৃ ৮১)।

১৩৯. قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا - إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ - অর্থ ঃ "আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করেছে। আল্লাহ আপনাদের কথোপকথন শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (**আল কুর'আন,** সূরা মুজাদালা, আয়াত ঃ ১)।

Dhaka University Institutional Repository

সময়টুকু ছাড়া সবটুকু সময় তাকে দিতে বাধ্য। আপনারা কি এ বৃদ্ধাকে চেনেন? তিনি তো খাওলা বিনত সালাবা যার কথা আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপর থেকে শুনেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর কথা শুনেছেন, আর উমর তাঁর কথা শুনবে না?[১৪০]

সুমাইয়া বিনতে খাবাত

হযরত সুমাইয়ার রাযী আল্লাহু 'আনহা–এর পিতার নাম ছিল খাবাত। তিনি ছিলেন আবু হুযায়ফা বিন মুগীরা মখজুমীর কৃতদাসী। চিন্তা ও বিবেক বুদ্ধির দিক থেকে তিনি আরবের যে কোন শরীফ খান্দানের মহিলার চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাহাবী হযরত আম্মার রাযী আল্লাহু আনহু[১৪১] এর মাতা। আম্মার জন্মগ্রহণ করলে আবু হোযায়ফা সুমাইয়া রাযী আল্লাহু 'আনহাকে আযাদ করে দেন।

আম্মার বিন ইয়াসীরের মাতা সুমাইয়া মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর রিসালাতে আস্থা স্থাপন করে মুসলমানদের সংখ্যা সাত এ উন্নিত করেন। তিনি ইসলামী সমাজের গোড়া পত্তনের সংগ্রামে যেভাবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সংগে নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তার নজির দুনিয়ায় বিরল।

তিনি স্বামী পুত্রসহ ইসলাম কবুল করলে শত্রুদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। নির্যাতন ভোগ করে স্বামী ইয়াসির ইনতিকাল করলেন। কিন্তু এতে ও সুমাইয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা বিন্দুমাত্র দমিত হলেন না। মক্কার নরপিশাচ দল সুমইয়া রাযী আল্লাহু 'আনহাকে তপ্ত বালুরাশির উপর শুইয়ে রাখত। মাথার উপর প্রদীপ্ত সূর্য এবং নিচে তপ্ত বালুরাশির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। সন্ধ্যা বেলা তাকে গৃহে ফিরে আনা হত। নতুন আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টি

---

১৪০. **তাফসীর কুরতুবী**, ১৭/২৬৯; **তাফসীর ইবন কাছীর,** ৮/৬০-৬১।

১৪১. **আম্মার ইবন ইয়াসির** ঃ আম্মার ইবন ইয়াসির আ'নাসী। বনী মাখযুমের আযাদকৃত গোলাম ও তাদের মিত্র। এই প্রসঙ্গ ঘটনা হল ঃ আম্মারের পিতা ইয়াসির তাঁর অপর দুই ভাই হারেস ও মালেকসহ তাদের চতুর্থ ভাইয়ের খোঁজে মক্কায় আসল। অতঃপর হারেস ও মালে (স্বদেশ) ইয়ামনে চলে গেল, কিন্তু ইয়াসির মক্কায় রয়ে গেলেন। এখানে আবু হোযাযফা ইব্‌ন মুগীরার সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। অতঃপর আবূ হুযায়ফা আম্মারকে আযাদ করে দিলেন। সুতরাং আম্মার হলেন আযাদকৃত গোলাম আর তাঁর পিতা আবু হুযায়ফার মিত্র। আম্মার প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইনি সেই সকল অসহায় দুর্বল মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে যাদের উপর কাফিররা অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছেন যাতে তিনি ইসলাম হতে ফিরে আসেন। একবার মুশরিকরা তাঁকে আগুনে জ্বালাচ্ছিল, এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পথে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আম্মারের গায়ের ওপরে নিজের পবিত্র হাত বুলিয়ে আগুনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে আগুন! তুই আম্মারের জন্য তেমনিভাবে শীতল হয়ে যা, যেমনিভাবে ইবরাহীম (আ)–এর জন্য শীতল হয়েছিল। আম্মার ছিলেন প্রথম সারির মুহাজিরদের অন্যতম। বদরসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। সেই সকল যুদ্ধেও তিনি অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রেখেছিলেন ঃ اَلطَّيِّبُ الْمُطَيَّبُ সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর সমর্থনে লড়াইরত অবস্থায় হিজরী ৩৭ সালে শহীদ হন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। (**আসমাউর রিজাল,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

আরও চিন্তা ভাবনা করে দেখার জন্য রাতের বেলা তাকে ফুরসত দেয়া হত। পরদিন তার কাছে এসে তাদের আশা ভংগ হত। ক্রোধে ফেটে পড়ত অবিশ্বাসীর দল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্যাতন দেখে খুব কষ্ট পেতেন। বেহেশতের সুসংবাদ তাকে প্রদান করতেন। হে ইয়াসির পরিবার এর বদলে তোমাদের জন্য বেহেশত রয়েছে।[১৪২]

দিনান্তে নির্যাতন ভোগ করে সুমাইয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা তাঁর পর্ণ কুটিরে ফিরেছেন। আবু জেহেল তার ঘরে এসে অকট্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে দিল। কিন্তু এতেও তার রাগ প্রশমিত না হওয়ায় একটা বর্শা হাতে নিয়ে তাকে আঘাত করল। সুমাইয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা -এর বুকের তাজা খুন ঝড়ে পড়ল মাটিতে দুশমনের খঞ্জরের আঘাতে।[১৪৩] হিজরতের পূর্বেই এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং সুমাইয়া রাযী আল্লাহু 'আনহা আল্লাহর রাসূলের অনুসারীদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন।[১৪৪]

আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহা

আসমা রাযী আল্লাহু আনহা প্রথম খলিফা আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর কন্যা। তাঁর মায়ের নাম কাতিলা বিনতে আবদুল উযযা, যিনি কুরায়শদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার রাযী আল্লাহু আনহার সৎবোন ছিলেন। যুবায়ার বিন আওয়ারেম[১৪৫] সাথে তার বিবাহ সম্পাদিত হয়।[১৪৬]

---

১৪২. একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মখযুম গোত্রের মহল্লা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় ক্রোধান্ধ কাফিরগণ বৃদ্ধা সুমাইয়া রাযী আল্লাহু 'আনহাকে বেহদ নির্যাতন করছিল। এতদুর করেও তারা যেন তৃপ্তি পাচ্ছিল না, পৈশাচিক হাসি ঠাট্টা ও কথার বান দিয়ে এ নির্দয় পশুর দল তাকে আঘাত হানছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর দুশমনগণ বলছিল ঃ মহাম্মদের দ্বীন কবুল করার স্বাদ একটু দেখে নাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নারকীয় দৃশ্য দেখে খুব ব্যথিত হলেন। তার পবিত্র চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি মহান আল্লাহর নিকট ইয়াসির পরিবারের জন্য দু'আ করলেন। (মুহাম্মদ নূরুয্যামান, **সংগ্রামী নারী,** ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, শাবান ১৪১৭/জানুয়ারি ১৯৯৭ খ্রিঃ, পৃ ৩৫৩)।

১৪৩. মুহাম্মদ নূরুয্যামান, **সংগ্রামী নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৩।

১৪৪. বদরের যুদ্ধে আবু জেহেল নিহত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মারকে বলেন ঃ আল্লাহ তোমার মাতার হন্তাকে হত্যা করেছেন। (মুহাম্মদ নূরুয্যামান, **সংগ্রামী নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৩)।

১৪৫. **যুবায়র ইবনুল আওয়াম** ঃ যুবায়র ইবন আওয়াম ইব্ন খুয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাম কুরায়শী। কুনিয়ত আবু আবদুল্লাহ। তাঁর মাতা হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু। তিনি এবং তাঁর মাতা সাফিয়্যাহ ইসলামের শুরুতেই ঈমান এনেছেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল বছর। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর চাচা তাঁকে নাকে-মুখে ধুঁয়া ঢুকিয়ে শাস্তি দিত, যাতে তিনি ইসলাম ত্যাগ করে ফেলেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। হযরত যুবায়র সকল যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শরীক ছিলেন। ইনি সে যুবায়র যিনি আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তলোয়ার উত্তোলন করেন। ওহুদ যুদ্ধে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অবিচল রয়েছিলেন। হযরত যুবায়র ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন। বসরার সাফাওয়ান নামক স্থানে হিজরী ৩৬ সলে আমর ইবন জারমূয তাঁকে শহীদ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি উত্তমভাবে গৃহ পরিচর্যা করতেন।[১৪৭] তিনি স্বামীর নিবিড় সংস্পর্শে থাকতেন।[১৪৮] আল্লাহর পথে তিনি অকাতরে অর্থ দান করতেন।[১৪৯]

তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। প্রথমে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল سباع নামক উপত্যকায়। পরবর্তীতে তাঁর লাশকে বসরায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং তথায় তাঁর কবর প্রসিদ্ধ রয়েছে। তাঁর দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ও ওরওয়া এবং অন্যান্যরা তাঁর নিকট হতে হাদীস রেওয়াত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ "প্রত্যেক নবীরই একজন হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে। আমার حواری সাহায্যকারী হল যুবায়র।" (শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ আল-খতীব (র), অনুবাদ ঃ এম, আফলাতুন কায়সার, **"আসমাউর রিজাল"** ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পৃ ৪২)।

১৪৬. হযরত আসমা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যুবাইর রাযী আল্লাহু 'আনহু আমাকে বিবাহ করেছিলেন।" (**সহীহ বুখারী,** বিবাহ অধ্যায়; আত্মমর্যাদা অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ২৩৪; **সহীহ মুসলিম,** সালাম অধ্যায়; রাস্তায় অপরিচিত মহিলাদের সাথে কথোপকথন জায়েয অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ ১)।

১৪৭. আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যুবায়র রাযী আল্লাহু 'আনহা যখন আমাকে বিবাহ করেছিলেন, তখন একটি ঘোড়া ও উট ছাড়া এ পৃথিবীতে তাঁর না ছিল আর কোন সম্পদ, না দাস-দাসী, না অন্য কোন বস্তু। আমি তাঁর ঘোড়াটিকে ঘাস-পানি খেতে দিতাম। চামড়ার বালতি সেলাই করতাম। আটার মন্ড তৈরি করতাম। কিন্তু আমি ভাল রুটি বানাতে পারতাম না। আনসারী মেয়েরা আমার রুটি তৈরি করে দিত। তারা অত্যন্ত সত্যবাদিনী ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়রকে যে একখণ্ড জমি দিয়েছিলেন সেখান থেকে আমি খেজুরের ছড়া মাথায় করে নিয়ে আসতাম। সে ক্ষেতটি ছিল আমার গৃহ থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। (**সহীহ বুখারী,** বিবাহ অধ্যায়, আত্মমর্যাদা অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ২৩৪; **সহীহ মুসলিম,** সালাম অধ্যায়; রাস্তায় অপরিচিত। মহিলার সাথে কথোপকথন বৈধ অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ ১১)।

১৪৮. আসমা বিনতে আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি খেজুরের ছড়া মাথায় করে নিয়ে আসছিলাম, পথিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা হল। এ সময় তাঁর সাথে একদল আনসার ছিলেন। তিনি আমাকে ডাক দিলেন এবং আমাকে তাঁর বাহনের পিছনে আরোহণ করতে আমি লজ্জাবোধ করলাম। আমি মনে মনে যুবাইর ও তাঁর আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করলাম। আর তিনি ছিলেন সর্বাধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, আমি (তাঁর বাহনের পিছনে আরোহণ করতে) লজ্জাবোধ করছি। তাই তিনি চলে গেলেন। এরপর আমি যুবায়রের কাছে এসে বললাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার দেখা হয়েছিল, তখন আমার মাথায় ছিল খেজুরের ছড়া এবং তার সাথে ছিল একদল সাহাবী। তিনি আমাকে আরোহণ করানোর জন্য উট বসালেন, কিন্তু আমি তাতে লজ্জাবোধ করলাম এবং তোমার আত্মমর্যাদার কথা ভাবলাম। একথা শুনে যুবায়র রাযী আল্লাহু 'আনহু বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! তোমার খেজুরের ছাড়া বহন করার চেয়ে তাঁর সাথে আরোহণ করাটা আমার জন্য অধিক পীড়াদায়ক হত। আসমা রাযী আল্লাহু 'আনহা বলেন ঃ পরিশেষে ঘোড়া দেখাশুনায় আমার সহযোগিতা করার জন্য আবু বকর রাযী আল্লাহু 'আনহু একজন খাদেম পাঠালেন। আমার মনে হল যেন তিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। (**সহীহ বুখারী,** বিবাহ অধ্যায়, আত্মমর্যাদা অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, পৃ ২৩৪; **সহীহ মুসলিম,** সালাম অধ্যায়; রাস্তায় অপরিচিতা মহিলার সাথে কথোপকথন বৈধ অনুচ্ছেদ, ৭ খণ্ড, পৃ ১১)।

Dhaka University Institutional Repository

নবুওয়াতের নবারুনকে যাঁরা গোড়াতেই সমর্থন জানিয়ে ছিলেন আবু বকর তনয়া আসমা রাযী আল্লাহু আনহা তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। সমকালীন আরব সমাজের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে আবু বকরের কন্যা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপ্লবী দলে যোগদান করেন, তখন মুসলমানদের সংখ্যা ঊনিশের কোটা পার হয়নি। দীর্ঘদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর বিশ্বস্ত সহচরের তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি যে নিখুঁত চরিত্র গঠন করেছিলেন। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে ও তাঁর মনে শক্তি, সাহস এবং বিশ্বাসের অনির্বাণ দ্বীপ-শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

ইবাদাত ও জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিল। তিনি ছিলেন অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী।[১৫০] তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র রাযী আল্লাহু 'আনহু আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর মাতা।

---

১৪৯. আসমা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন তারপর আমার কাছে এক লোক এসে বলল ঃ হে উম্মে আব্দুল্লাহ! আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি আপনার বাড়ির ছায়ায় বসে কিছু বেচা কেনা করতে চাই। সে ব্যক্তি সেখানে বসে বেচা কেনা করে উপার্জন করতো। আমি তার কাছে একটি দাসী বিক্রি করলাম। এমন সময় যুবাইর আমার কাছে এলেন। বিক্রির অর্থ তখন আমার কাছে ছিল। তিনি বললেন ঃ এ অর্থ আমাকে দান কর। তিনি বললেন ঃ আমি তা সাদকা করে দিলাম। (**সহীহ মুসলিম,** সালাম অধ্যায়, রাস্তায় অপরিচিতা মহিলার সাথে কথোপথন বৈধ অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ ১২)।

১৫০. "মুসলিম আল কুররী রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি অনুমতি দিলেন। কিন্তু ইবন যুবায়র রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর ব্যাপারে নিষেধ করতেন। ইবনে আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু –বললেন ঃ ইব্ন বাইর রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর মা আসমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন। তাই তোমরা তাঁর সঙ্গে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পার। তারপর আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি একজন মোটা অন্ধ মহিলা। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। (**সহীহ মুসলিম,** হজ্জ অধ্যায়; হজ্জের উপকারিতা অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৫৫)।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও অবদানের সুযোগ

ইসলামে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নারীকে প্রথম মর্যাদা দেয়া হয়েছে 'কন্যা' রূপে। নারীকে দ্বিতীয় মর্যাদা দেয়া হয়েছে 'বধূ' রূপে, তৃতীয় মর্যাদা 'মা' রূপে এবং চতুর্থ মর্যাদা সমাজ সংস্থার সমান গুরুত্বপূর্ণ একজন 'সদস্য' রূপে।[১]

মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ সাম্যের কথা এবং সব রকমের ভেদাভেদ ও বৈষম্য প্রত্যাখ্যানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ইসলামে। আল কুর'আন মহান আল্লাহ বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْس وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً - وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِه وَالْأَرْحَامَ - إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -

হে মানব জাতি! তোমাদের সেই প্রভুকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন।[২]

অন্যান্য ধর্মে নারীকে একটা অভিশাপ স্বরূপ এবং সকল পাপের উৎস ও সমাজের গলগ্রহরূপে চিহ্নিত করত। সেই মানসিকতাকে ইসলাম প্রতিহত করল। ইসলাম আদম আলাইহিস সাল্লামকে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার শাস্তির জন্য এককভাবে হওয়াকে দায়ী করেনি বরং উভয়কে সমানভাবে দায়ী করেছে।[৩] এ ঘটনার বর্ণনাকালে আল্লাহ বলেন –

فَاَزَّلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ -

শয়তান তাদের দু'জনেরই সেই বৃক্ষের ব্যাপারে পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যে স্থানে ছিল সেখান থেকে বহিষ্কার করল।[৪]

---

১. মাওলানা আব্দুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯।

২. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১।

৩. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

৪. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ৩৬। আল্লাহ পাক পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করে পাঠাবার আগে মানসিক প্রবণতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তাদের দুজন পরীক্ষা করার জন্য জান্নাতে রাখা হয়। তাদেরকে এভাবে পরীক্ষা করার জন্য একটি গাছ বাছাই করা হয়। হুকুম দেয়া হয় ঐ গাছটির কাছে যেয়ো না। গাছটির কাছে গেলে তার পরিমাণ কি হবে তাও বলে দেয়া হয়। বলে দেয়া হয় এমনটি করলে তোমরা যালেম বলে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন–তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে থাক এবং এখানে যা চাও পূর্ণ স্বাচ্ছন্দের সাথে খেতে থাক; কিন্তু এই গাছটির নিকটও যেও না, অন্যথায় যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। (**তাফহীমুল কুর'আন,** ১ম খণ্ড, সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ৩৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি লগ্ন থেকেই আল্লাহপাক নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ব্যবধান করেননি কোন ক্ষেত্রে। সুতরাং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণেও ইসলাম নারীকে সুযোগ ও সম্মান দিয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاِنْهَارُ ـ

"হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আপনি তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দিন। যার নিম্নদেশে নহর প্রবাহিত।[৫]

يٰا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ـ اُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ـ

যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দা হয়েছিল, তাদের আজ কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের স্ত্রীরও। তোমাদের সন্তুষ্ট করা হবে।[৬]

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ـ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ـ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِى ـ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ـ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ ـ

আমি তোমাদের মধ্যে কারো কাজকে বিনষ্ট করে দিব না। পুরুষ হোক কি স্ত্রী তোমরা সকলেই সমজাতের লোক। কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করেছে।[৭] আমারই পথে নিজেদের ঘরবাড়ি হতে বহিস্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই জন্য লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে।[৮] তাদেরকে সকল অপরাধই আমি মাফ করে দিব।[৯] এবং তাদেরকে আমি এমন বাগীচায় স্থান দিব যার নিচ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। খোদার নিকট হতে এটাই তাদের প্রতিফল।[১০]

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ـ اُوْلٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللهِ ـ وَاللهُ غَفُوْرٌ الرَّحِيْم ـ

---

৫. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২৫।

৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ যুখরোফ, আয়াত ঃ ৬৮-৭১।

৭. **হিজরত করা** ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর নির্দেশে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ঘরবাড়ি ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে একদেশ থেকে অন্যদেশে যাওয়াকে হিজরত বলে।

৮. যারা ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিহত হন তাদেরকে শরীয়াতের পরিভাষায় শহীদ বলা হয়।

৯. যারা আল্লাহর জন্য লড়াই করে চেষ্টা সাধনাকারী। যিনি ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত তাকে মোজাহিদ বলে।

১০. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল ইমরান, আয়াত ঃ ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে আর সংগ্রাম করেছে আল্লাহর পথে শুধুমাত্র তারাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করতে পারে। আল্লাহ তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন এবং নিজের অনুগ্রহে ধন্য করবেন।[১১]

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَـهُمْ وَاَمْوَالَـهُمْ بِـاَنَّ لَـهُمُ الْجَنَّـةَ ـ يُقَـاتِلُوْنَ فِـىْ سَـبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ـ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْراةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ـ

আল্লাহ তায়ালা মু'মীনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের জন্য তাওরাত ইঞ্জিল ও কুর'আনে পাকাপোক্ত ওয়াদা রয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে।[১২]

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بَالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ـ

তোমরা পরিবার পরিজনকে নামাজ শিক্ষা দাও আর তুমি নিজেও উহা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক।[১৩]

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوْا اِسْمَ اللهِ عَلٰى مَا رَزَقَـهُمْ مِـنْ بَهِيْمَـةِ الأَنْعَـامِ ـ فَـإِلٰهُكُمْ إِلٰـهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةَ ـ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

অতএব তোমাদের খোদা একই খোদা তোমরা সেই একই আল্লাহর অনুগত ও আদেশ পালনকারী হও। আর হে নবী! সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে। খোদার নামের উল্লেখ শুনতেই যাদের দিল কেঁপে উঠে, যে বিপদই তাদের উপর আসে সে জন্য সবর করে, নামায কায়েম করে আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে আল্লাহর পথে খরচ করে।[১৪]

উল্লেখিত আয়াতসমূহে কোথাও নারীদের বা পুরুষদের শ্রেণী বিভাজন করা হয়নি। এসব আয়াতগুলি শুধু পুরুষ বা শুধু নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয় বরং সবার জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোথাও ধর্মীয় বিধিবিধান বা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণায় নারী জাতিকে অসম্পৃক্ত করেননি। পুরুষের মত নারী যদি সৎ কর্মশীল হয় তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে এবং তার ধর্মপালন ও ইবাদাত করার পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে অসৎকর্মশীল হয়ে জাহান্নাতে যাবে।[১৫]

আল্লাহ বলেন–

---

১১. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২১৮।

১২. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত তাওবা, আয়াত ঃ ১১১।

১৩. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ ত্বাহা, আয়াত ঃ ১৩২।

১৪. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল হজ্জ, আয়াত ঃ ৩৪-৩৫।

১৫. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ـ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক সে যদি মু'মীন হয়, তবে তাকে আমি অবশ্য অবশ্যই পবিত্র ও নিরাপদ জীবন যাপন করাব এবং তার কৃত সৎ কর্মের বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করব। [১৬]

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَابِرِيْنَ والصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ والصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ والْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ ـ اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ

নিশ্চয় মুসলিম নারী পুরুষ, মুমিন নারী ও পুরুষ; প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাকারিণী। সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী। সবরকারী ও সবরকারিণী বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী স্ত্রী, সদকা প্রদানকারী ও সদকা প্রদানকারিণী রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার স্ত্রী সচ্চরিত্র পুরুষ ও সতী স্ত্রী এবং আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রী এদের সকলের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। [১৭]

সুতরাং আমল ইবাদাতে আল্লাহপাক সকল মুসলমান নারী পুরুষের জন্য একইরকম শাস্তি ও পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং প্রথমত ঃ

ইসলামে কোন আদি পাপের ধারণাই নেই এবং এর দায়ভার বিবি হাওয়া (আ) থেকে সকল মহিলাদের উপর আসবারও কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত ঃ যখন বিশ্ব নারীর আত্মা আছে কিনা এবং নারী মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা এই বিতর্কে লিপ্ত ছিল তখন ইসলামই ঘোষণা করে যে প্রথম মানব মানবী উভয়কে সৃষ্টি করে নিজের নূর থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। এভাবে ইসলাম মানব মানবী উভয়কে মূলত একই মর্যাদা দেয়। [১৮]

বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গর্ভাবস্থা এবং সন্তান প্রসব নারীর মর্যাদাহানি করে। আর প্রসব বেদনা নারীর জন্য এক প্রকার দণ্ড ও শাস্তি। পূর্বের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। অথচ আল্লাহ পাক কুর'আনে উল্লেখ করেছেন গর্ভাবস্থা সন্তান প্রসব ও প্রসব বেদনা নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি এবং মাতৃত্ব ধারা নারীর সম্মানকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। [১৯]

---

১৬. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নাহল, আয়াত ঃ ৯৭।

১৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল আহযাব, আয়াত ঃ ৩৫।

১৮. আল্লামা জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** অনুবাদ ঃ আবু খালদুন আল মাহমুদ শারমিন ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

১৯. **বাইবেল আদিপুস্তক** ৩ ঃ ১৫; মুহাম্মদ আব্দুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য একই ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে বলা হয়েছে। ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত উভয় (সামর্থ্যবানদের জন্য) এর জন্যই সমানভাবে ফরজ। অবশ্য মহিলাদের কিছু প্রাকৃতিক অসুবিধার জন্য কিছু ছাড় দেয়া হয়েছে। এসব ছাড় মেয়েদের অসুবিধার সময় স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত সুবিধা এতে মর্যাদা খাট হবার প্রশ্নই উঠে না।[২০] গর্ভবতী অবস্থায় বা প্রসবোত্তর কালে বা ঋতুস্রাব এর সময় সারাদিন রোযা রাখা মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। এজন্যই আল্লাহ এই ব্যবস্থা রেখেছেন।[২১]

এর মানে এবাদত থেকে বঞ্চিত রাখা নয়। কারণ এবাদত বলতে ইসলামে নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালনকে বুঝায় না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে যে কোন বৈধ কাজ করা হোক না কেন তাই ইবাদাত।[২২] মূলত আল্লাহর আদেশ পালনই ইবাদাত।[২৩]

আল্লাহপাকের কাছে মান মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হল তাকওয়া, পরহেযগারী, ঈমান ও সৎকর্ম। এছাড়া নারী পুরুষ, বর্ণ বা বংশের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। কুর'আনে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, নারী পুরুষ উভয়েরই ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব সমান। ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে নারী পুরুষের সমান অধিকার।[২৪]

নারীর মসজিদে যাওয়ার অধিকার

মসজিদ আল্লাহর, কোন ব্যক্তি সংগঠন কিংবা সরকারের নয়। মসজিদে জনাগমন এবং মসজিদের দেখাশুনার মানদন্ড কুর'আনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللهَ

২০. মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব এবং প্রসবোত্তর সময়ে নামাজ এবং রোজা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে রোযা পরে কাজা করতে হয় আর নামাজ কাযা করতে হয় না। এমনকি স্তনদানকারী ও গর্ভবতী মায়েদেরও রোযার থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যা পরে কাজা আদায় করে নিতে হয়। সমাজের দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধ (জেহাদ) বাধ্য বাধকতা থেকেও মেয়েদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। (জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬-৫৭)।

২১. জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭।

২২. **ইবাদত** ঃ ইবাদাত মানে দাসত্ব, আনুগত্য ও বন্দেগী করা। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলাকে ইবাদাত বলে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

২৩. মহিলাদের এসব বিশেষ অবস্থা শেষে খ্রিষ্টানদের মত মুসলিম মহিলাদের কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। শুধু ওযু গোসল করতে হয়।

২৪. মুহাম্মদ আব্দুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর ঘরে যাতায়াত এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে তারাই যারা আল্লাহর ও কোন বিচারের দিনে বিশ্বাস রাখে। নামাজ কায়েম করে। নিয়মিত যাকাত দেয় আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করে না।[২৫]

মসজিদের গমন করা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন খোদাভীরু এবং নামাজ কায়েম ও যাকাত দানের ইচ্ছা। আল্লাহ অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলেছেন যে, মসজিদে গমনকারীদের লিঙ্গঁ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। এখন যদি কেউ বলেন, নারীদের মসজিদে যাওয়া উচিত নয় তাহলে এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ লজ্ঘন করেছেন এবং এমন কিছু বলছেন যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।[২৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় নারীদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি ছিল। তারা জুমার নামায ও অন্যান্য নামাযের জামাতে শরীক হতো তবে নারীদের জন্য মসজিদে নামায বাধ্যতামূলক নয়।[২৭] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে বাঁধা দিও না।[২৮] সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ রাযী আল্লাহু 'আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারোর স্ত্রী নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তার স্বামী যেন তাকে বাঁধা না দেয়। অথবা সে যেন বাঁধা প্রাপ্ত না হয়।[২৯]

এ হাদীস থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, কোন কোন পুরুষের পক্ষ থেকে তাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে আসার ব্যাপারে বাঁধা দেয়ার ঘটনা ঘটেছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাঁধা দিতে নিষেধ করেছিলেন এবং পুরুষদেরকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[৩০]

---

২৫. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত তাওবা, আয়াত ঃ ১৮।

২৬. কাওকাব সিদ্দীক, **মুসলিম নারীর সংগ্রাম,** অনুবাদ- মোঃ আউয়াল মিয়া, (ঢাকা ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট-২০০০), পৃ ৬৯।

২৭. মুহাম্মদ আব্দুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৮। একজন মসজিদে যেতে হলে অবশ্যই ইসলামের বিধান অনুসারে পর্দা মেন যেতে হবে। এবং এক্ষেত্রে তার পারিবারিক দায়িত্ব মাতৃত্বের দাবিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা, জামায়াতে নামায মহিলাদের জন্য ফরজ নয়। এছাড়াও সমকালীন পরিবেশকে গুরুত্ব দিতে হবে যাতে করে মসজিদে যাওয়ার ফলে ফেতনার সৃষ্টি না হয়।

২৮. **সহীহ বুখারী ঃ** জুময়া অধ্যায়, যে জুময়ার নামায পাবে না তার জন্য গোসল আবশ্যক হবে কি অনুচ্ছেদ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৪; **সহীহ মুসলিম,** সালাত অধ্যায়, ফিতনার আশংকা না থাকলে মহিলাদের মসজিদে গমন অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃ ৩২।

২৯. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল আযান, ১ম খণ্ড, (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ, জেলকদ-১৪১১, মে- ১৯৯২), পৃঃ ৩৭০।

৩০. আব্দুল হালীম আবু শুককাহ, **রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা,** প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তোমাদের মেয়েরা যখন তোমাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তখন তোমরা তাদের বাঁধা দিও না।[৩১] একথা শুনে বিলাল ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম। আমি অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে আমি তাদেরকে বের হতে দেব না। কারণ এর দ্বারা তাদের স্বামীদেরকে ধোঁকা দেয়ার সুযোগ পাবে।[৩২]

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু আতেকা বিনতে যায়েদ রাযী আল্লাহু 'আনহু –কে বললেন ঃ তুমি কেন ফজর ও এশার নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাও? অথচ তুমি জান যে, 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু এটা অপছন্দ করেন এবং এটা তাঁর আত্মমর্যাদায় বাঁধে। তিনি বললেন ঃ 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু নিজে আমাকে নিষেধ করছে না কেন? আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর এই বাণীর কারণেই তিনি কিছু বলছেন না যে, তোমরা আল্লাহর বান্দাদের মসজিদে যেতে বাঁধা দিও না।[৩৩]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুর রাজ্জাকের সূত্রে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আতেকা 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহুকে বলেছিলেন আপনি নিজে আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি এ থেকে বিরত হবো না। ইমাম যুহরী বলেছেন– হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু যখন আততায়ীর আক্রমণে আহত হয়েছিলেন, সে সময় আতেকা মসজিদেই ছিলেন।[৩৪]

নারীদের মসজিদে নামায পড়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতগুলো নীতিমালা ঘোষণা করেছেন–

---

৩১. **সহীহ মুসলিম,** নামায অধ্যায়, ফিতনার আশংকা না থাকলে মহিলাদের মসজিদে গমন অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃ ৩২।

৩২. হাদীসের বর্ণনাকারী সালেম বলেন, তখন আমার পিতা আব্দুল্লাহ বিলালকে এত গালমন্দ করলেন যে, আমি এর আগে কখনো এভাবে তাকে গালমন্দ করতে দেখিনি এবং তিনি বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি বলছ কিনা আল্লাহর শপথ আমি তাদেরকে বাঁধা দেব।

৩৩. **সহীহ বুখারী,** জুম'য়া অধ্যায়, মহিলা, শিশু ও অন্যদের কারণে জুম'য়ায় গোসল প্রয়োজন কিনা অনুচ্ছেদ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৪; **সহীহ আল বুখারী,** ১ম খণ্ড, (আধুনিক প্রকাশনী) কিতাবুল জুময়া অনুচ্ছেদ, পৃ ৩৮০।

৩৪. **ফতহুল বারী,** ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৪। **ফতহুল বারী** ঃ শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আসকালানী (মৃত ৮৫২/১৪৪৮) একটি অতি চমৎকার জ্ঞান সমৃদ্ধ শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইবন হাজার এ অনুগ্রহকারীগণের মধ্যে আমীর হিসেবে পগিণিত। কারণ অন্য কোন শরহ গ্রন্থ তাঁর শরহ গ্রন্থের কাছাকাছিও হতে পারেনি এবং তার অন্তঃস্তিত গুণাবলি ও সৌন্দর্যকে আপন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করতে পারেনি। তাঁর পূর্ণ শরহটি রচিত না হয়ে যদি শুধু মুকাদ্দামাহটি রচিত হত তবে এর সুগঠণমূলক আলোচনা এর মহান মর্যাদা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হত। ইয়ামেনের মুজতাহিদ আল্লামা শাওকানী (র) কে যখন ইমাম বুখারী (র) এর জামি আস সহীহ এর ব্যাখ্যা প্রণয়নের জন্য আহবান জানানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বুসার ইবনে সাঈদ রাযী আল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন মহিলা যখন মসজিদে এশার জামায়াতে অংশ নেয়। সে যেন তখন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।[৩৫] ইবনে 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমদের স্ত্রীরা যদি রাতে মসজিদে আসার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে , তাহলে তাদেরকে অনুমতি প্রদান কর।[৩৬]

ইবনে 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে ফজর ও এশার নামাজের জামায়াতে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছেন।[৩৭]

আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়তেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু সংখ্যক মুসলিম মহিলা শরীরে চাদর জড়িয়ে নামাযে শরীক হত। তারা এত অন্ধকার থাকতে নামায থেকে বাড়ি ফিরত যে, কেউ তাদেরকে চিনতে পারত না।[৩৮]

নারীকে মসজিদে যেতে বাঁধা দেওয়ার অধিকার কোন পুরুষের নেই। এমনকি সংশ্লিষ্ট পুরুষটি যদি মহিলার স্বামীও হন তবুও মসজিদে গমনে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বাঁধা দানের অধিকার রাখেন না।

আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকার থাকতে থাকতেই ফজরের নামায আদায় করতেন। (নামায শেষে) মুমীনদের স্ত্রীগণ বাড়িতে ফিরে যেতেন। কিন্তু অন্ধকারের জন্য তাদের চেনা যেত না বা (বর্ণনাকারী সন্দেহ)

---

৩৫. **মুয়াত্তা** ঃ ইমাম মালিক; কাওকাব সিদ্দিক, **মুসলিম নারীর সংগ্রাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে নামাযে পড়তে না আসার নির্দেশ দিয়েছেন। মসজিদ হচ্ছে পবিত্রস্থান, ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা পর্যালোচনা এবাদত বন্দেগী এবং কাজ কর্মের স্থান; ফ্যাশনের প্রদর্শনী কিংবা অন্যকে আকৃষ্ট করার জায়গা মসজিদ নয়। মসজিদে নারী পুরুষকে হতে হবে মার্জিত, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে পবিত্র।

৩৬. **সহীহ আল বুখারী,** ১ম খণ্ড, কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৮।

৩৭. **মুসনাদ** ঃ ইমাম আবু হানিফা; কাওকাব সিদ্দিক, **মুসলিম নারীর সংগ্রাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮। **মুসনাদ** ঃ মুসনাদ শব্দটি একবচন, বহুবচনে আলমাসানীদ মুসনাদ এমন গ্রন্থকে বলে যাতে সাহাবীগণের নামের ক্রমানুসারে হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়ে থাকে। এতে একজন সাহাবীর সমস্ত হাদীস একসাথে উল্লেখ করার পর অনুরূপভাবে অপর সাহাবীর হাদীস সমূহ উল্লেখ করা হয়। (ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, **আস সিহাহ আস সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা** (রাজশাহী ঃ আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর- ২০০২ খ্রিঃ) পৃ ২৬।

৩৮. **সহীহ বুখারী,** কিতাবুস সালাত, আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, জেলকাদ- ১৪১১, মে- ১৯৯১, পৃ ১৯৫; হাদীস নং ৩৯৫। এই হাদীস অনুযায়ী মহিলাদের নামাযের জন্য ফজরের সময়কাল এমন বলা হয়েছে যখন লোক সমাগম নেই এবং অন্ধকার ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকারের জন্য তারা পরস্পরকে চিনতে পারত না।[৩৯] একই রকম হাদীস একটা ভাষাগত পার্থক্য সহ বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে আবার–

আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায সমাধা করলে নারীরা সর্বশরীর চাদরাচ্ছাদিত করে ঘরে ফিরত। অন্ধকারের জন্য তাদেরকে চিনতে পারা যেত না।[৪০]

হিন্দা বিনতে হারেছ রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী (উম্মুল মুমিনীন) উম্মে সালামা তাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সময়ে নারীগণ ফরয নামাযের জামাআতে সালাম ফিরনোর সাথে সাথে উঠে পড়ত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথে নামায আদায়কারী পুরুষগণ আল্লাহ যতক্ষণ চাইতেন (নিজ নিজ জায়গায়) স্থির হয়ে (বসে) থাকতেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠলে তারাও উঠে পড়তেন এবং বাড়ির দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন।[৪১]

হিন্দা বিনতে হারেছ রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালামা বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে সালাম ফিরার সময় সালাম শেষ হওয়ার সাথে সাথে (জামাআতে অংশগ্রহণকারিণী) নারীগণ উঠে চলে যেত। আর এই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠার আগে স্বীয় জায়গায় কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। যুহুরী বলেন, আমাদের মনে হয় তিনি এটা (বসে থাকা) এজন্য করতেন, যাতে নারীগণ পুরুষদের উঠে পড়ার আগেই বেরিয়ে পড়তে পারে এবং পুরুষগণ তাদের (নারীদের সাথে মিশে না যায়) কেন তিনি সালাম ফিরানোর পরও নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ বসে থাকতেন তা আল্লাহই ভাল জানেন।[৪২]

---

৩৯. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল আযান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৯।

৪০. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল আযান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৮। সম্ভবত ফজরের নামাযের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর এটা স্থায়ী নীতি ছিল। এশা ও ফজরের ওয়াক্তে মসজিদে গমনাগমনে অসুবিধা থাকতে পারে কেননা তখন মদিনা বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত ছিল না। বর্তমানে বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত সমাজও সীমাহীন নৈতিকতা বর্জিত, শালীনতা ও শরীয়াতের সীমা বহির্ভূত কাজ চলছে। জাহেলিয়াতের পরিবেশ বিরাজ করছে।

৪১. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল আযান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৮।

৪২. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল আযান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৯। এই দুইটি হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহিলাদের নামাযে যেতে অনুমতি ছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধা দিতেও নিষেধ করেছেন। সেই সাথে সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের মহিলাদের নামাযের ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। যেমন– পুরুষদের নামাযের পর মসজিদে বসে অপেক্ষা করা। যাতে করে মহিলারা মসজিদ থেকে চলে যেতে পারে। তাই মসজিদে নামাযের ক্ষেত্রে এই শর্তটি অবশ্যই খেয়াল করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহ ইবন আবু কাতাদাহ আনসারী রাযী আল্লাহু 'আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি নামাযে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করে পড়ব বলে মনস্থ করি। কিন্তু শিশুদের কান্না শুনে আমার নামাযকে এই আশঙ্কায় সংক্ষিপ্ত করি যে, তাদের কান্না ও তাদের (শিশুদের) মায়েদের জন্য কষ্টদায়ক হবে।[৪৩]

আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নারীগণ যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানত, তাহলে বনী ইসরাইলের নারীদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল তেমনি এদেরকেও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, আমি রাবী আমরকে জিজ্ঞেস করলাম। বনী ইসরাইলের নারীদেরকে কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৪৪]

আল কানবী আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বর্তমান মহিলাদের আচার-আচরণ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে দেখতে পেতেন তবে অবশ্যই তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতে যেরূপ বনী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছিল।[৪৫]

ইবনুল মুছান্না আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন। মহিলাদের ঘরে নামায আদায় করা বৈঠকখানায় নামায আদায় করার চাইতে উত্তম এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা অধিক উত্তম।[৪৬]

---

৪৩. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল আযান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৮। এ হাদীস থেকে স্পষ্ট মহিলাদের মসজিদে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে পরিবার ও সন্তানদের প্রতি তার কর্তব্য ও অধিকারের খেয়াল করতে হবে। কেননা বর্তমানকালে মসজিদ থেকে বাচ্চার কান্না শুনার সুযোগ নাই। তাই এটা কোন পুরুষের বাঁধার প্রশ্ন নয়। ইসলামী আইনে নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মাতৃত্ব শিশু পালন ও সংসার পরিচালনা। যদি বাইরের কাজ ও ঘরের কাজে দ্বন্দ্ব বাঁধে তাতে ঘর রক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪৪. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল আযান, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৯। বিবি আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা –এর মত অনুযায়ী বর্তমান সমাজের নারীদের অবস্থা কতটা ভয়াবহ ও অবনতিশীল তা এই সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকটি সচেতন, শিক্ষিত মানুষ জানেন।

৪৫. **সুনানে আবু দাউদ,** ১ম খণ্ড, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, যিলহজ্জ– ১৪১০, জুন– ১০০, পৃ ৩১৮।

৪৬. **সুনানে আবু দাউদ,** ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৮। এটা বলার কারণ– নারীদের অবস্থার উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা যা নারীদের পর্দার উপর নির্ভরশীল। যে অবস্থা একজন নারীর পর্দার জন্য পরিবেশের জন্য উত্তম সেটাই তার করা উচিত। তথাপি তার পারিবারিক কর্তব্য ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের দৃষ্টিকোণ হতে নারীদরে জন্য গৃহে নামায পড়া উত্তম।

সুনানে আবু দাউদ ঃ ইমাম আবু দাউদ (র) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ। হাদীসে তাঁর জ্ঞানের প্রশংসা করে মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আস্‌সাগলী বলেন, হযরত দাউদ (আ) এর জন্য লোহাকে যেমন নরম ও সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। ইমাম আবু দাউদ (র) এর জন্যও হাদীসকে তেমনভাবে সহজ করে দেয়া হয়। তাঁর সুনান গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তার মধ্যে অন্যতম। এ

Dhaka University Institutional Repository

জুময়া ও দুই ঈদের খুতবার উদ্দেশ্যে হল মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা। শরীয়াত নারীর এসব জামায়াতে অংশগ্রহণ আবিশ্যিক করে দেয়নি। কারণ তাতে অনেক সময় কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের সম্ভাবনাা বেশি থাকে। অধিকন্তু এভাবে পারিবারিক জীবনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার আশংকা ও বিদ্যমান। কিন্তু শরীয়াত সাধারণভাবে নারীকে এসব সুযোগ কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে।[৪৭]

উম্মে আতিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদেরকে বের হওয়ার আদেশ দেয়া হত, আমরা কুমারী মেয়েদেরকে এমন কি ঋতুবতী মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করতাম। অতঃপর পুরুষদের পিছন থেকে তাদের তকবীরের সাথে সাথে তাকবীর পড়তাম এবং তাদের দোয়ার সাথে সাথে আমরাও ঐ দিনের বরকত এবং (গোনাহ হতে) পবিত্রতা লাভের আশায় দোয়া করতাম।[৪৮]

উম্মে আতিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ঈদের উদ্দেশ্যে) আমাদেরকে সাবালিকা পর্দানশীল মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হত। হাফসা রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় তিনি বাড়িয়ে বলেছেন যে, ঈদগায় ঋতুবতী মহিলাদের পৃথক রাখা হত।[৪৯]

উম্মে আতিয়া রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন (ঈদে) আমাদেরকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই আমরা ঋতুবতী, সাবালিকা এবং পর্দানশীল মহিলাদেরকে নিয়ে বের হতাম। ইবনে আওন কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনায় রয়েছে অথবা পর্দানশীল প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদেরকে নিয়ে (বের হতাম) যাই হোক, ঋতুবতী মহিলারা মুসলমানদেরকে জামায়াত এবং তাদের সামগ্রিক কাজের আহবানে শরীক হত এবং তাদের ঈদগাহে পৃথকভাবে অবস্থান করত।[৫০]

গ্রন্থটিতে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সংরক্ষিত হয়েছে। এটি অমূল্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ গ্রন্থটির গুরুত্ব লক্ষ্য করে পরবর্তীতে অনেক আলিম এর শরহ গ্রন্থ রচনা করেন।

৪৭. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯০। মেয়েরা নামাজের জামায়াতে যোগ দিতে পারে। ঘরে, পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে মসজিদে ময়দানে সবখানেই মেয়েরা জামায়াতে যেতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে মেয়েদের জামায়াতে নামাজ থেকে বঞ্চিত রাখতে মুসলমানদের নিষেধ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সময়ে এবং তাঁর প্রিয় খলিফার সময় মেয়েরা মসজিদে নামাজে যেত। তবে জুম্মা, জানাজা ও ঈদের নামাজ মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তারা ইচ্ছে করলেই যেতে পারে, না গেলেও কোন অসুবিধা নেই। এটা মেয়েদের জন্যে আল্লাহর অনুগ্রহ। (ঢাকা ঃ দি পাউওনিয়ার শান্তিনগর, আগস্ট– ২০০১, পৃ ১৩০)।

৪৮. **সহীহ আল বুখারী,** ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈদাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৮। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় ইবাদত ও জ্ঞান চর্চার এসব সমাবেশে নারীরা ব্যাপকভাবে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। (জালালুদ্দীন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯১)।

৪৯. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল ঈদাইন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৯।

৫০. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল ঈদাইন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১২। এই সব কয়টি হাদীসেই নারীদেরকে ঈদগাহে উপস্থিতির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনকি যেসব নারীরা ঋতুবতী ছিল তাদেরও। তবে

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সথে ঈদুল ফিতর বা আযহার দিন বের হলাম তিনি নামায আদায় করলেন। তারপর ভাষণ দিলেন। তারপর মহিলাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিলেন। নসীহত করলেন এবং তাদেরকে দান সদকা করতে নির্দেশ দিলেন।[৫১]

ইসলাম ধর্মীয় বিধি-বিধানের আমল ও ইবাদতের প্রতিটি পর্যায়ে মানব সম্প্রদায়ের অন্যতম অংশ নারী জাতিকে সম্পৃক্ত করেছে। উৎসাহিত করেছে, যাতে করে বৃহত্তর সমাজ গঠনে নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

ইসলামের সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এটি সার্বক্ষণিকভাবে অনুশীলনীয় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর এই জীবন ব্যবস্থা কখনোই তার স্বাভাবিকতার বিপরীত কোন কাজের প্রতি নির্দেশ দেয় না। ইসলাম মানুষকে তার আত্মার পরিশুদ্ধির দিকে আহবান জানায় এবং তাকে স্বপ্ন ও বাস্তবতার আদর্শ ও সত্যনিষ্ঠার উচ্চতর জগতে আরোহণে সহায়তা করে কিন্তু মানুষের জন্য এই উন্নয়ন ও উপদেশের প্রক্রিয়ায় সে কখনো মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন করতে চায় না।[৫২]

নারী ও পুরুষের মধ্যকার জটিলতার বিষয়টি সমাধানের জন্য ইসলাম যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তাও পুরোপুরিভাবে মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তাদের উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়ে ইসলাম কথা তখনই বলে, যখন তা মানব প্রকৃতি অনুযায়ী সমান হওয়ার দাবিদার। আর তখনই কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে যখন তা প্রকৃতি ও স্বাভাবিকতার দাবি অনুযায়ী ভিন্নতর।[৫৩]

ঐ সকল নারীদের কতক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। (১) সাবালিকা (২) পর্দানশীল। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে উপস্থিত মহিলারা এই সমাবেশের বক্তব্য ও এর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে।

৫১. **সহীহ আল বুখারী,** কিতাবুল ঈদাইন, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৯। বুখারী শরীফের অন্য একটি হাদীসে একই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি মহিলাদের উপদেশ দিলেন, নসিহত করলেন এবং দান করার নির্দেশ দিলেন। আমি তখন মহিলাদেরকে নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে বিলালের কাপড়ে দান সামগ্রী নিক্ষেপ করতে দেখলাম। (**সহীহ বুখারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪১০)।

৫২. ইসলাম এ কথা বিশ্বাসও করে না যে, মানুষের স্বাভাবিকতার পরিবর্তন সম্ভব এবং এই পরিবর্তন মানব জাতির কোন উপকারে আসতে পারে। বরং ইসলাম এটাই বিশ্বাস করে যে, বস্তুগত প্রয়োজনের ঠুনকো গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে পরিশুদ্ধ ও জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যক্তির স্বকীয়তা ও স্বাভাবিকতার আশ্রয় গ্রহণই একমাত্র উপায়। (মুহাম্মদ কুতুব, **ইসলাম ও নারী,** ঢাকা ঃ স্মৃতি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ খ্রিঃ, পৃ ২০)।

৫৩. মুহাম্মদ কুতুব, **ইসলাম ও নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ
ইসলামের আলোচিত বিষয়সমূহ

তালাকের অধিকার ও পদ্ধতি

পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। তালাক হচ্ছে এ বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পরিণতি। ইসলামে তালাকের সুযোগ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। পারিবারিক জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে বাঁচাবার জন্য। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন চরমভাবে ভাঙ্গন দেখা দেয়, পরস্পর মিলে মিশে ঠিক স্বামী স্ত্রী হিসেবে শান্তিপূর্ণ ও মাধুর্যমণ্ডিত জীবন-যাপন যখন একবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, একজনের মন যখন অপর জন থেকে এমনভাবে বিমুখ হয়ে যায় যে, তাদের শুভ মিলনের আর কোন আশাই থাকে না। ঠিক তখনই এ চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। এ হচ্ছে নিরুপায়ের উপায়।[১] শরী'আত তালাক পছন্দ করে না রাসূল (সা) বলেন–

اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللهِ الطَّلاَقُ ـ

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণিত ও ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ হচ্ছে তালাক।[২]

কারণ দাম্পত্য জীবনের দাবি হলো পারস্পরিক দায়িত্ব পালন, চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সারাজীবন বন্ধন অটুট থাকা। মহান আল্লাহ বলেন- স্ত্রীদের সাথে তোমরা সৎভাবে জীবন-যাপন করবে, তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করে, তবে হয়তো এমনো হতে পারে যে, আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ দেখেছেন। তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।[৩] তবে বিচ্ছেদের (তালাকের) দিকে

---

১. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন** (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, জিলহজ্জ–১৪১৯, মার্চ– ২০০০খ্রিঃ), পৃ ৩৭১।

২. **সুনান আবু দাউদ,** তালাক অধ্যায় (بَابُ فِيْ كَرَاهِيَّةِ الطَّلاَقِ) ২/২৫৪; **সুনান ইবন মাজাহ,** তালাক অধ্যায়, হাদীস নং ২০১৮; আল বানী দুরুল বলেন, ضَعِيْفِ سُنَنِ اِبْنِ مَاجَةَ তে বর্ণনা করছেন, ১৫৫; মুসতাদরাক হামিমের মতে বর্ণনাটি সহীহ কিন্তু ইমাম যাহরী এতে একমত পোষণ করেননি। **সুনান কুবরা,** বাইহাকী' ৭/৩৩২ সবগুলো বর্ণনাই ইবন 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত।

৩. **আল কুর'আন,** সূরা আন নিসা, আয়াত ঃ ১৯। কেননা মহান আল্লাহ চান স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের অন্তর আত্মা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকবে। একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করবে একজন অপরজনের চরিত্র ও সম্ভ্রমকে কলংকের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। পরস্পরের ন্যায্য অধিকার আদায় করবে। এবং উভয়ে উভয়ের সাথে উদার ব্যবহার করবে। একজন অন্যজনের সুখে আনন্দিত হবে এবং দুঃখে পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। শান্তনার বাণী শোনাবে এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই হচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কের আসল প্রাণ যদি কোন দাম্পত্য সর্ম্পকের এ প্রাণবস্তু না থাকে তাহলে সেটা যেন এক প্রাণহীন লাশ। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** ৪র্থ সংস্কারণ, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, সফর– ৪১৭, জুলাই– ১৯৯৬ খ্রিঃ, পৃ ২৩)।

Dhaka University Institutional Repository

তখনই এগুতে হয়, যখন স্বামী স্ত্রী উভয়ের মাঝে মীমাংসার সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যায় বরং পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।[৪]

তালাক এর সম্ভাবনা কমানোর জন্য ইসলামে নানা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম এমন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে তালাক এর প্রেক্ষিত তৈরি না হয়। এর মধ্যে আছে উপযুক্ত পাত্র পাত্রী নির্ধারণের কিছু নির্দেশনা।[৫] স্বামী স্ত্রীতে অমিল দেখা গেলে তা অতিক্রম করার উপদেশ।[৬] স্ত্রী বা স্বামী যে কোন একজনের ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা।[৭] সর্বোপরি তালাক বলার এবং এটা পুরো কার্যকরী হবার আগে অন্তবর্তীকালীন সময় (ইদ্দত) দেয়া। যে সময়ে হয়তো স্বামী স্ত্রীর পুণর্মিলন হতে পারে।[৮]

"কবুল" বলার মাধ্যমে মানুষ বিয়ে করে কিন্তু তার মানে কি এই যে, শুধু এই একটি শব্দ উচ্চারণই বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতা। বরং বিয়ের জন্য কত প্রস্তুতি কত আয়োজন করবার পর তার সমাপ্তি হয় কবুল উচ্চারণের মধ্যে। তেমনি আমি তোমাকে তালাক দিলাম এই বাক্যও প্রযুক্ত হবে বিয়েকে টিকাবার সব প্রাণান্ত প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর। এটাই ইসলামী নিয়ম।[৯]

---

৪. মূল মুহাম্মাদ সায়্যিদ সায়্যিদ আস সাফতী, ভাষান্তর ঃ মাহমূদুল হাসান ইউসুফ, **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ** (ঢাকা ঃ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, মে,– ২০০০ খ্রিঃ), পৃ ৬৬।

৫. আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মহিলাকে বিবাহ করার সময় চারটি বিষয় বিবেচ্য। তার ধনসম্পদ, তার বংশমর্যাদা তার রূপ সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। সুতরাং তোমার দীনদার মহিলাই বিবাহ করা উচিত (অন্যথায়) তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (**সহীহ আল বুখারী,** ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৫ম খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ, পৃ ৩৮০)।

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মু'মিন স্ত্রীর কোন স্বভাব কোন মু'মিন স্বামী অপছন্দ করলে, তাকে নিয়ে বিচলিত ও বিব্রত বোধ করবে না। কারণ এ স্বভাব অন্য আরেক জনের কাছে অপ্রিয় নাও হতে পারে। (**সহীহ মুসলিম,** দুধ পান করানোর অধ্যায় (بَابُ الوَصِيَّةِ بِالنِّسَاْ) ২/১০৯১ নং হাদীস; **মুসনাদ আহমদ** ঃ ২/৩২৯; উভয় বর্ণনাই আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত)।

৭. কিন্তু যখন পরস্পরের মতবিরোধ কেউ সহিষ্ণুতা দিয়ে জয় করতে পারছে না এবং উভয়ের মতবিরোধ এমন চরম আকার ধারণ করে যে, শত্রুতা ও বিচ্ছেদের আশংকা প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তখন ইসলাম এই মতবিরোধ মিটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে উভয়ের আত্মীয়-স্বজনের ওপর। তারা মতবিরোধের কারণগুলো খতিয়ে দেখবে এবং তা মিটিয়ে সমঝোতা ও আপোষ রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে এ কথাই আল কুর'আনে এভাবে বলা হয়েছে। তোমরা যদি স্বামী স্ত্রীর মতবিরোধ শত্রুতায় পরিণত হবার আশংকা কর, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন শালিশ ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন শালিশ পাঠাও। তারা দু'জন পরিস্থিতির সংশোধন চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেবেন। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নিসা, আয়াত ঃ ২৫)।

৮. জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০।

৯. যদিও কিছু কিছু মুসলমান ইসলামের শিক্ষা না জেনে অথবা অমান্য করে তালাক এর অপব্যবহার করছে। এসব অপব্যবহারের ঘটনাই অমুসলিমদের কাছে ইসলামী তালাক বলে মনে হয়। ফলে এই নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামে উপর কটাক্ষ করা হয়। (জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০-১৬২)।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও ইসলামে বিয়ে এবং তালাক কোনটাই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ফেলা হয়নি। মানুষের ভালর জন্যই তাদের আয়ত্বের মধ্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ইসলাম এ দু'টোর কোনটাকেই হালকাভাবে নেয়নি।[১০]

ইসলাম পুরুষকে তালাকের এখতিয়ার দেয়ার সাথে সাথে কতগুলো শর্তেরও অধীন করে দেয়া হয়েছে। পুরুষ তার নিজস্ব ধন-সম্পদ ব্যয় করেই স্বামীত্বের অধিকার অর্জন করে, এজন্য সে সমস্ত অধিকার থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে।[১১] ইসলাম বিচ্ছেদ বা তালাক প্রদানের বিষয়টি পুরুষের ক্ষমতায় দিয়েছে, কারণ নারীর তুলনায় পুরুষ সাধারণত বেশি বুদ্ধিমান, অধিক ধৈর্যশীল, দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং ঠাণ্ডামাথায় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে; এবং স্ত্রীর চেয়ে স্বামী পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বেশি সক্ষম।[১২] তাছাড়া বিচ্ছেদ পরবর্তী অবস্থায় শরীয়াত নির্ধারিত কিছু অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্মকাণ্ড স্বামীর উপরই বর্তায়।[১৩] তবে ইসলাম বিচ্ছেদ প্রদানের ব্যাপারে সুন্দর নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এবং তালাককে কতগুলো শর্তেরও অধীন করে দেয়া হয়েছে। সে এ শর্তের আয়ত্তাধীনে কেবল সর্বশেষ হাতিয়ার হিসাবে তার এ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে। কুর'আন মজীদের শিক্ষা হচ্ছে স্ত্রী যদি তোমার অপছন্দনীয়ও হয় তবুও যথাসাধ্য তার সাথে সদ্ভাবে মিলেমিশে জীবন যাপন করার চেষ্টা কর। কিন্তু যদি মিলেমিশে নাই থাকতে পার তাহলে তোমার এ অধিকার আছে যে, তাকে তালাক দিতে হবে।[১৪]

---

১০. জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০।

১১.

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ
اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ـ وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَاى وَلاَ تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ـ البقرة : ٢٣٧

কুর'আন তালাকের আহকাম বর্ণনা করতে গিয়ে প্রতিটি স্থানে তালাকের ক্রিয়াকে স্বামীর দিকে নির্দেশ করেছে। এ থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তালাক দেয়ার ক্ষমতা কেবল স্বামীকে দেয়া হয়েছে।

১২. এখানে সাধারণত কথাটি যোগ করা হয়েছে। অবশ্যই কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। (মুহাম্মাদ সায়্যিদ সায়্যিদ আস সাফতী, **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭)।

১৩. যেমন মহরের বাকী অংশ প্রদান, ইদ্দত পালনরত অবস্থায় ভরণ-পোষণ দান, বস্ত্র জাতীয় বিশেষ উপহার, সন্তানকে স্তন্য দানের পারিশ্রমিক ও লালন-পালনের ব্যয়ভার একমাত্র স্বামীকেই বহন করতে হয়। এ ধরনের আরো অনেক রকম দায়িত্ব রয়েছে। (মূল মুহাম্মদ সায়্যিদ সায়্যিদ আস সাফাতী, **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭)।

১৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬। কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে দু' ঋতুর মধ্যবর্তী সুস্থাবস্থায় এক তালাক দিবে যে, মধ্যবর্তী অবস্থায় শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। আর স্ত্রী সেই স্বামীর বাড়ীতে আলাদাভাবে ইদ্দত পূরণ করবে। স্বামী চাইলে ইদ্দতকালীন অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে এবং সে স্ত্রী হিসাবে বহাল থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বামীরা বেশি হকদার (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২২৮)

Dhaka University Institutional Repository

কোন পুরুষেরই একবারে তিন তালাক দেয়া উচিত নয়। ইসলামের বিধান হচ্ছে এক এক মাসের ব্যবধানে এক এক তালাক দাও। তৃতীয় মাসের শেষ নাগাদ চিন্তা ভাবনার সুযোগ পাওয়া যাবে।[১৫] অবশ্য এ সময় সুযোগের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝাপড়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে যদি ত্যাগ করাই স্বামীর সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে তৃতীয় মাসে করাই স্বামীর সিদ্ধান্ত হয়ে তাকে তাহলে তৃতীয় মাসে শেষ তালাক দিতে হবে অথবা পুনঃগ্রহণ (রুজু) না করে ইদ্দত অতিবাহিত হতে দাও।[১৬]

মহান আল্লাহ বলেন – أَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ـ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانْ ـ

"তালাক হচ্ছে দুই বার অতঃপর হয় উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে রাখতে হবে অথবা ভালভাবে সকল কল্যাণ সহকারে বিদায় দেয়া হবে।[১৭]

وَالْمُطَلَّقتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفِسِهِنَّ ثلثَةَ قُرُوْءٍ ـ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ ـ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الأخِرِ ـ

যেসব স্ত্রী লোককে তালাক দেয়া হয়েছে তারা তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজদেরকে বিরত রাখবে। তাদেরকে স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হয় তাহলে তারা এ অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজেদের স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে।[১৮] এই সময়কালে আল্লাহপাক এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনমাসের এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিও না বরং নিরে কাছেই রাখ। মহান আল্লাহ বলেন–

يايُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ـ وَاتَّقُوْا اللّهَ رَبَّكُمْ ـ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة ـ وَتِلْكَ حُدُوْدَ اللّهِ ـ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ـ لاَ تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذالِكَ اَمْرًا ـ

---

১৫. হয়ত কলহ বিবাদের সমঝোতার কোন উপায় বেরিয়ে আসবে অথবা স্ত্রীর আচরণের মধ্যে পছন্দনীয় কোন পরিবর্তন এসে যেতে পারে কিংবা স্বয়ং স্বামীর অন্তরও পাল্টে যেতে পারে। এ সময়কাল এবং আল্লাহর দেয়া এই বিধান সমগ্র মানব জাতির দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখারই একটি সুযোগ হিসেবে রাখা হয়েছে। (সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬-৪৭)।

১৬. সর্বোত্তম পন্থা এই যে, তৃতীয়বার তালাক না দিয়ে এমনিতেই ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হতে দেয়া। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছা করলে তাদের মধ্যে পুনর্বার বিয়ে হওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তৃতীয়বার তালাক দিলে তা মুগাল্লাযা বা চূড়ান্ত তালাক পরিণত হয়। এরপর তাহলীল ব্যতীত প্রাক্তন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকেরা সাধারণত এ মাসয়ালা সম্পর্কে অবহিত নয় এবং যখন তালাক দিতে উদ্যত হয়, একত্রে তিন তালাক ছুঁড়ে মারে। পরে অনুতপ্ত হয় এবং মুফতীদের কাছে গিয়ে ছল চাতুরী করে বেড়ায়। (সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬)।

১৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২২৯।

১৮. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও। তাদেরকে তাদের ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণের সুযোগ রেখেই তালাক দাও। ইদ্দতের সময় গুণতে থাক এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। (ইদ্দত চলাকালে) তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও বের হয়ে যাবে না। তবে কেবল তখনই তা করতে পার যখন তারা প্রকাশ্যে কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হয় এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করে সে নিজের ওপর অত্যাচার করে তুমি জান না। হয়তবা এরপর আল্লাহ সমঝোতার কোন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। অতঃপর যখন তারা ইদ্দতের নির্দিষ্ট সময়ের সমাপ্তিতে পৌঁছবে তখন হয় তাদেরকে ভালভাবে ফিরিয়ে রাখ অথবা উত্তম পন্থায় তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।[১৯]

এই পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবে তালাক প্রদান ইসলামে বর্ণিত সৌজন্য বিধির পরিপন্থি হবে। যেমন একবারে তিন তালাক অথবা ঋতুবতী (স্ত্রী) থাকাবস্থায় তালাক প্রদান। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় সতর্ক করে দিয়েছেন।[২০]

এ থেকে জানা যায় যে, একই সময়ে তিন তালাক দেয়া মস্ত বড় গুনাহ। এতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হয়। যে ব্যাপারে কুর'আনে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তালাকের পথে এতটা প্রতিবন্ধকতা রাখার পর সর্বশেষ এবং সবচেয়ে কঠিন যে প্রতিবন্ধক রাখা হয়েছে তা

---

১৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আত তালাক, আয়াত ঃ ১। এছাড়া মাসিক (ঋতু) বা হায়েয চলাকালীন অবস্থায় তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আদেশ করা হয়েছে, যদি তালাক দিতেই হয় তাহলে তুহর (পবিত্র) অবস্থায় তালাক দাও। কারণ– **এক ঃ** এ সময় শারীরিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যে, তাদের থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কথাবার্তা প্রকাশ পায়। যা তারা নিজেরাও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ করা পছন্দ করে না। এ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নিগূঢ় তত্ত্ব। **দুই ঃ** এ সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক থাকে না, যা তাদের পারস্পরিক চিত্তাকর্ষণ ও প্রেম ভালবাসার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ সময় উভয়ের মাঝে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এ সব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েয অবস্থায় তালাক দিতে নিষেধ করেছেন।

২০. বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবন 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু তার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তালাক প্রদান করলে, 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন ঃ তোমার ছেলে আবদুল্লাহকে ডেকে বলে দাও যে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। স্ত্রী বাড়িতে অবস্থান করে আবার সময়মতো ঋতুবতী হয়ে যখন পবিত্র হবে সে সময় সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে না তালাক দিবে? তালাকের সিদ্ধান্ত হলে ঋতু হলে পবিত্র হবার পর স্ত্রীর সাথে আর মিলিত হতে পারবে না। আর ঋতুর এই কাল যাপন হল ইদ্দত যা তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে তা পালন করতে হবে। (**সহীহুল বুখারী,** তাফসীর অধ্যায়; সূরা ঃ তালাক প্রথম পরিচ্ছেদ; ৮/৬৩৫); **সহীহ মুসলিম,** তালাক অধ্যায় (بَابُ تَحْرِيْمُ طَلاَقِ الحَائِضِ مَنْ غَيْرِ رَضَاهَا) ২/হাদীস নং– ১০৯৩-১০৯৪; **সুনান আবু দাউদ,** তালাক অধ্যায় ; (بَابُ فِيْ طَلاَقِ السُّنَّةِ) ২/২৫৫; **সুনান নাসাঈ,** তালাক অধ্যায়; (بَابُ مَا يَفعَلُ إنا طلق تطليقة وَهِىَ حَائِضَ) ৬/১৪১; **সুনান বিন মাজাহ,** তালাক অধ্যায় ঃ (باب طلاق السنة) ১/৬৫১; **মুসনাদ আহমদ,** ২/৬; সবগুলো বর্ণনাই ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত।

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মুগাল্লাযা তালাক[২১] দেবে সে এ স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না। যে পর্যন্ত সে অপর ব্যক্তির কাছে বিয়ে না বসবে এবং সে ব্যক্তিও তাকে ভোগ করার পর স্বেচ্ছায় তালাক না দিবে। মহান আল্লাহর বাণী।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه - فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ -

অতঃপর (দুই তালাক দেয়ার পর) স্বামী যদি স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে স্ত্রীলোকটি তার জন্য হালাল (পুনরায়বিবাহ যোগ্য) হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য পুরুষের তার সাথে বিয়ে না হবে এবং সে তাকে স্বেচ্ছায় তালাক না দেবে। দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেয়ার পর যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বজায় রেখে জীবন যাপন করতে পারবে তাহলে তাদের পুনঃবিবাহে কোন দোষ নেই।[২২]

হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব রাযী আল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি, যদি একই বৈঠকে তিন তালাক দিয়ে তার কাছে আসত। তিনি তাকে দৈহিক শাস্তি দিতেন এবং স্বামী স্ত্রীকে পৃথক করে দিতেন।[২৩]

খোলা তালাক ঃ[২৪]

ইসলামী শরীয়াত যেভাবে পুরুষকে এ অধিকার দিয়েছে যে, সে যে স্ত্রীকে পছন্দ করে না অথবা যার সাথে কোন রকমেই তার বসবাস করা সম্ভব নয় তাকে সে তালাক দিতে পারে। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও এ অধিকার দিয়েছে যে, সে যে পুরুষকে পছন্দ করে না বা যার সাথে তার কোন মতেই

---

২১. তালাকে মুগাল্লাযা অর্থাৎ তিন তালাক। এরপর এই স্ত্রী লোকটি পুনর্বার তার স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। যতক্ষণ অন্য ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয়ে আবার বিচ্ছেদ না হবে। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯-৫০)।

২২. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২৩০। এ হচ্ছে এমনি এক কঠিন শর্ত। যার কারণে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক দেয়ার পূর্বে শতবার চিন্তা করতে বাধ্য হবে। কুর'আন মজীদে যে, অপর এক ব্যক্তির সাথে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন ও তার কাছ থেকে তালাক লাভের শর্ত করা হয়েছে, যা প্রত্যেক স্বামীকে চূড়ান্তভাবে তালাক দানের উদ্যম থেকে বিরত রাখে। কেননা অপর কোন স্বামী কর্তৃক ব্যবহার হয়ে এলে তাকে প্রথম স্বামীর পক্ষে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে খুশি মনে গ্রহণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই তালাক দেবার আগে এই মর্মান্তিক পরিণতি, সন্তানদের ভবিষ্যৎ এবং নিজের ও পরিবারের মান সম্মানের কথা বার বার চিন্তা করবে। সবর করবে। (মাওলানা আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন,** ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৩)।

২৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯; বর্ণিত আছে একবারে যারা তিন তালাক দেয় হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু তাদেরকে দুররা মারতেন। (আবদুল খালেক, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৩১)।

২৪. স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে তার নিকট থেকে স্ত্রী কর্তৃক আদায়কৃত তালাককে খোলা তালাক বলা হয়। (**বুখারী শরীফ,** ৫ম খণ্ড, কিতাবুত তালাক, পৃ ১২২)।

Dhaka University Institutional Repository

বসবাস করা সম্ভব নয়– সে তার থেকে খোলা করিয়ে নিতে পারে এক্ষেত্রে শরীআতের নির্দেশের দুটি দিক রয়েছে। এক ঃ নৈতিক দিক,[২৫] দুই আইনগত দিক।[২৬]

পুরুষকে তার স্ত্রী থেকে আলাদা হওয়ার অধিকার দেয়ার সাথে সাথে তার ওপর বিভিন্ন শর্ত লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও খোলার অধিকার দেয়ার সাথে সাথে কতগুলো শর্ত আরোপ করে দেয়া হয়েছে, যা কুর'আন মজীদের এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ـ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِه ـ

তোমরা স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ (তালাকের সময়) তা থেকে সামন্য কিছুও ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়। কিন্তু তারা উভয়ে যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অটুট রাখতে পারবে না (তবে এটা স্বতন্ত্র অবস্থা) তোমরা যদি আশংকা করে যে, স্বামী স্ত্রী আল্লাহর সীমা রক্ষা করে জীবন যাপন করতে পারবে না– এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় প্রদান করে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় তাতে কোন দোষ নেই।[২৭]

কুর'আনের এ আয়াত থেকে আইনের নিম্নলিখিত ধারাসমূহ পাওয়া যায় ঃ-

---

২৫. নৈতিক দিক এই যে, চাই পুরুষ হোক অথবা স্ত্রী হোক প্রত্যেককে তালাক অথবা খোলার ক্ষমতা কেবল অন্যন্যোপায় অবস্থায় সর্বশেষ সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। শুধু যৌনাচারের উদ্দেশ্যে তালাক ও খোলাকে যেন খেলনায় পরিণত করা না হয়। হাদীসের গ্রন্থসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর নির্দেশসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে–

تَزَوَّجُوْا وَلاَ تَطَلَّقُوْا ـ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَالذَّوَّاقَاتِ (أحكام القران للجصاص جـــ ٣ ص ١٣٣)

তোমরা বিয়ে কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সে সব স্ত্রী পুরুষকে (ভালবাসেন না) পছন্দ করেন না, যারা নিত্য নতুন বিয়ে করে স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। বার বার তালাকের পথ অবলম্বন করে অবাধ যৌন চর্চাকারীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যে স্ত্রী লোক স্বামীর কোনরূপ ক্রটি ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই খোলার আশ্রয় নেয় তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকূল ও মানব জাতির অভিসম্পাত। খোলাকে খোলার পরিণতকারী স্ত্রী লোকেরা মোনাফিক। (**নাসায়ী,** কিতাবুত তালাক) আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ হল। সেই ব্যক্তির গোনাহ, যে কোন নারীকে বিয়ে করে এবং নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পর তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরানাও পরিশোধ করে না। (**মুসতাদরিকে হাকেম,** ২য় খণ্ড, পৃ ১৮২)।

২৬. কিন্তু আইন যার কাজ হচ্ছে– ব্যক্তির অধিকার নির্ধারণ করা, তা নৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করে না। তা পুরুষকে স্বামী হওয়র প্রেক্ষিতে খোলার অধিকার দেয়। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫২)।

২৭. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত ঃ এমন অবস্থায় খোলার আশ্রয় নিতে হবে যখন আল্লাহর সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।[২৮]

দ্বিতীয়ত ঃ স্ত্রী যখন বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় তখন তাকেও আর্থিক ক্ষতি মেনে নিতে হবে, যেভাবে পুরুষ স্বেচ্ছায় তালাক দিলে তাকেও আর্থিক ক্ষতি মেনে নিতে হয়।[২৯]

তৃতীয়ত ঃ বিনিময় প্রদান করে মুক্তি লাভ করার জন্য শুধু বিনিময় প্রদানকারীর ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। বরং এ ব্যাপারটির আপোষ নিষ্পত্তি তখনই হবে যখন বিনিময় গ্রহণকারীও এতে সম্মত অর্থাৎ স্ত্রী শুধু কিছু পরিমাণ অর্থ পেশ করে নিজেকে বিছিন্ন করে নিতে পারে না বরং তার দেয়া অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে স্বামীর তালাক দেয়া বিচ্ছিন্নতার জন্য অপরিহার্য।[৩০] এছাড়াও যে সব অবস্থায় স্ত্রী এককভাবে স্বামীকে তালাক দিতে পারে।

পঞ্চমত ঃ আইসিমা– বিয়ের সময় বা তার পর স্বামী তার তালাকের একক অধিকার স্ত্রীকে দিয়ে দেবার নাম আইসিমা।

দ্বিতীয়ত ঃ বিয়ের কাবিননামা স্বাক্ষরের সময় স্ত্রী কিছু শর্ত আরোপ করতে পারে যা ভঙ্গ হলে সে তালাক দিতে পারে।[৩১] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের খোলা তালাকের ঘটনাসমূহ ঃ

খোলার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মোকাদ্দমা হচ্ছে সাবিত ইবনে কায়েস রাযী আল্লাহু আনহু –এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছ থেকে খোলা অর্জন করে নিয়েছিলেন সাবিত রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে তাঁর দুই স্ত্রী খোলা অর্জন করেছিলেন এক স্ত্রী হচ্ছেন জামীলা বিনতে উবাই ইবনে সলুল (আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বোন) তাঁর স্বামী সাবিতের চেহারা তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। তিনি খোলার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছে বিচার প্রার্থনা করলেন এবং নিজের অভিযোগ পেশ করে বললেন–হে আল্লাহর রসূল। আমার মাথা ও তার মাথাকে কোন বস্তু কখনও একত্র করতে

---

২৮. 'ফালা জুনাহা আলাইহিমা শব্দগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যদিও খোলা একটি মন্দ জিনিস যেমন তালাক একটি মন্দ জিনিস। কিন্তু যখন এ আশংকা হয় যে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হয়ে যাবে তখন খোলা করে নেয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। অর্থাৎ এই তালাক চাওয়ার যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩-৫৪)।

২৯. কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে সে স্ত্রীর কাছ থেকে মোহর হিসাবে প্রদত্ত অর্থের সামান্য পরিমাণও ফেরত নিতে পারে না। যদি স্ত্রী বিচ্ছেদ কামনা করে তাহলে সে স্বামীর কাছ থেকে মোহরের আকারে যে অর্থ গ্রহণ করেছিল তার অংশ বিশেষ অথবা সম্পূর্ণটা ফেরত দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। (**তাফহীমুল কুর'আন,** সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ২২৯)।

৩০. যদি স্ত্রী 'ফিদয়া' (মুক্তি বিনিময়) পেশ করে এবং স্বামী তা গ্রহণ না করে, তাহলে এ অবস্থায় স্ত্রীর জন্য আদালতের আশ্রয় নেয়ার অধিকার আছে। ফাইন খিফতুম আল্লা ইউকীমা হুদূদাল্লাহ থেকে প্রকাশ্যভাবে জানা যায়। এ আয়াতে খিফতুম বলে মুসলামানদের 'উলিল আমর' বা সরকারী কর্মকর্তাকেই সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু আমীর বা শাসকদের সর্বপ্রথম দায়িত্বই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত সীমার হেফাযত করা, তাই তার কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ একজন স্ত্রীকে যেসব অধিকার দিয়েছেন তা তাকে দেয়ার ব্যবস্থা করা। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪)।

৩১. জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

পারবে না। আমি ঘোমটা তুলে তাকাতেই দেখলাম, সে কতগুলো লোকের সাথে সামনের দিক থেকে আসছে। কিন্তু আমি তাকে ওদের সবার চেয়ে বেশি কালো, সবচেয়ে বেটে এবং সবচেয়ে কুৎসিত চেহারার দেখতে পেলাম।[৩২]

ইবনে আব্বাস রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শামসের স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি সাবেতের দীনদারি বা চরিত্রগত কারণে তার সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি কুফরীর ভয় করি।[৩৩] কারণ তার কুৎসিত চেহারাই আমার কাছে অপছন্দনীয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিযোগ শুনলেন। অতঃপর বললেন ঃ

সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তুমি কি তা ফেরত দিবে? সে বলল, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল। সে তার বাগান সাবেতের কাছে হস্তান্তর করল। তিনি সাবেতকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়ার জন্য। ফলে সে তাকে পৃথক (তালাক) করে দিল।[৩৪] অন্য এক বর্ণনায় আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত রাযী আল্লাহু 'আনহুকে নির্দেশ দিলেন- তোমার বাগান গ্রহণ কর এবং তাকে এক তালাক প্রদান কর।[৩৫]

হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহুর সামনে এক মহিলা ও এক পুরুষের মোকাদ্দমা পেশ করা হল। তিনি স্ত্রীলোকটিকে কিছু উপদেশ দিলেন এবং স্বামীর সাথে বসবাস করার পরামর্শ দিলেন। স্ত্রীলোকটি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেনি।[৩৬]

'ওমর রাযী আল্লাহু 'আনহু ঐ মহিলার মানসিক অবস্থা যাচাই করার পর স্বামীকে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয় সামান্য অলংকারের বিনিময় হলেও একে 'খোলা' দিয়ে দাও।[৩৭]

এসব ঘটনা থেকে যেসব বিষয়গুলো জানা যায় তাহল-

---

৩২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫; (ইবনে জারীর)।

৩৩. **সহীহ আল বুখারী,** ৫ম খণ্ড, কিতাবুত তালাক (আধুনিক প্রকাশনী) পৃ ১২৩, হাদীস নং ৪৮৮৮। ইসলামে কুফরের ভয় কথাটার অর্থ হচ্ছে ঘৃণা ও অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও যদি আমি তার সাথে বসবাস করি তাহলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও সতীত্বের হেফাজতের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালন করতে সক্ষম হব না।

৩৪. **সহীহ আল বুখারী,** ৫ম খণ্ড, কিতাবুত তালাক, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩, হাদীস নং ৪৮৮৭।

৩৫. **সহীহুল বুখারী,** কিতাবুত তালাক, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত; সুনান নাসঈ; তালাক অধ্যায়, (بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الخَلع।৬/১৬১; উভয় বর্ণনা ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত।

৩৬. এতে উমর বিষয়টি তদন্ত করার জন্য একটি আবর্জনায় পূর্ণ কুঠরিতে তাকে আবদ্ধ করে দিলেন। তিনদিন বন্দী করে রাখার পর তিনি তাকে বের করে এনে জিজ্ঞেস করলেন এখন তোমার কি অবস্থা? সে বলল আল্লাহর শপথ। এরাত কয়টিতে আমার কিছুটা শান্তি হয়েছে।

৩৭. **কাশফুল গুম্মাহ,** ২য় খণ্ড, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার;** সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

(১) সাবিত ইবন কায়েসের স্ত্রীদের বর্ণিত অভিযোগকে খোলার জন্য যথেষ্ট মনে করলেন কেননা, তার দৃষ্টি শরীয়আতের উদ্দেশ্যের দিকে।[৩৮]

(২) উমর রাযী আল্লাহু আনহু –এর কর্মনীতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাযীর দায়িত্ব স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। স্ত্রী লোকটি যেসব কারণ বর্ণনা করেছে তা শ্রবণকারীর জন্য ঘৃণার কারণ হিসাবে যথেষ্ট মনে নাও হতে পারে। এর ফয়সালা করা তার দায়িত্ব নয়।[৩৯]

(৩) বিচারক উপদেশ দিয়ে স্ত্রীকে স্বামীর সাথে থাকার জন্য সম্মত করার চেষ্টা অবশ্যই করতে পারেন। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করতে পারবেন না।[৪০]

খোলার মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে বিচারকের অনুসন্ধানের কোন প্রশ্নই ওঠে না যে, স্ত্রী কি ন্যায্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে খোলার দাবি করছে না কেবল প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে বিচ্ছেদ চাচ্ছে?[৪১] স্ত্রী যদি খোলা দাবি করে, আর স্বামী যদি তাতে সম্মত না হয়, তাহলে বিচারক তাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিবেন। স্বামী তা মেনে নিতে বাধ্য। যদি তা মেনে না নেয় তাহলে কাযী তাকে বন্দী করতে পারবেন।[৪২]

---

৩৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে সৌন্দর্য দর্শনের ওপর কোন বক্তৃতা দেননি। যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এ মহিলাদের অন্তরে স্বামীর প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি জমে গেছে। তিনি তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। কেননা ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় একজন নারী ও একজন পুরুষকে বাধ্যতামূলক রাখার পরিণতি দীন, আমল আখলাক এবং সমাজ সভ্যতার জন্য তালাক ও খোলার চেয়ে অধিক মারাত্মক হবে। উল্লেখ্য সাবিত ইবন কায়েসের আর এক স্ত্রী ছিলেন হাবীবা বিনতে সাহল আল আনসারিয়াহ তিনিও খোলা তালাক নিয়েছিলেন।

৩৯. হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর কর্মনীতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারটি তদন্ত করার জন্য বিচারক সে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। যেন সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে। নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এদের মধ্যে এখন আর মিলমিশ হওয়ার কোন আশা নেই। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯)।

৪০. হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু উল্লিখিত মহিলাকে উপদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু বাধ্য করেননি।

৪১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীন এ কারণে বিচারক হিসাবে যখন খোলা মোকাদ্দমাগুলোর বিবরণ শুনেছেন তখন এ প্রসংগটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। কারণ ঃ এ অভিযোগের যথাযথ অনুসন্ধান করা কোন বিচারকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়া নারী খোলার অধিকার হচ্ছে পুরুষের তালাকের অধিকারের বিকল্প। অবাধ যৌন চর্চার প্রশ্ন তুললে উভয় ক্ষেত্রেই তার সমান আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু আইনে পুরুষের তালাকের অধিকার প্রয়োগকে অবাধ যৌনচর্চার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। সুতরাং আইনগত অধিকারের দিক থেকে স্ত্রীর খোলার অধিকারকেও কোন নৈতিক শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত পৃ ৬০)।

৪২. পূর্বোল্লিখিত হাদীসের বর্ণনা এরূপই এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীন এসব ক্ষেত্রে নগদ অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ করে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া শরী'আতে কাযীর মর্যাদা কেবল একজন পরামর্শদাতার নয় আইন প্রয়োগের অধিকার বিচারকের আছে। তা না হলে মানুষের জন্য আদালতের দরজা খোলা থাকা সম্পূর্ণ নিরর্থক। (জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬০)।

Dhaka University Institutional Repository

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী খোলার পরিণতি হচ্ছে এক তালাকে বায়েন। অর্থাৎ খোলার হুকুম কার্যকর হওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত চলাকালীন তাকে পুনগ্রহণের অধিকার স্বামীর থাকবে না।[৪৩] তবে যদি স্ত্রী লোকটি স্বেচ্ছায় তার কাছে পুনরায় বিবাহ বসতে চায় তবে তা সে করতে পারে।[৪৪]

খোলার বিনিময় নির্ধারণে আল্লাহ তা'আলা কোন শর্ত আরোপ করেননি যে কোন পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে স্বামী স্ত্রী সম্মত হবে, তার ওপরেই খোলা কার্যকর হতে পারে।[৪৫]

মুজতাহিদ ইমামগণের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর যুলুম-নির্যাতনের কারণে খোলার দাবি করে তাহলে বিনিময় গ্রহণ করা মূলত স্বামীর জন্য মাকরূহ।[৪৬]

সুতরাং প্রয়োজন বোধে স্ত্রী তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে। তার তিনটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথম বিবাহের চুক্তিপত্র যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় "খোলার" মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারেন। তৃতীয় স্ত্রী আদালতের সহায়তাও স্বামীকে তালাক দিতে পারে।[৪৭]

যে সব প্রেক্ষিতে স্ত্রী তালাক চাইতে পারে-

(ক) স্ত্রীকে ভরণ-পোষণে স্বামী অক্ষম হলে অথবা অস্বীকার করলে। (স্ত্রী যদি ধনী হয় তবুও তাকে পূর্ণ ভরণ-পোষণ দিতে স্বামী বাধ্য)।

(খ) দুর্ব্যবহার (যার অন্তর্ভুক্ত আছে প্রহার করা, গালি-গালাজ করা অথবা তাকে অন্যায় কাজ করতে চাপ দেওয়া)

---

৪৩. খোলার হুকুম কার্যকর হওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত চলাকালীন তাকে পুনগ্রহণের অধিকার স্বামীর থাকবে না। কেননা পুনগ্রহণের অধিকার অবশিষ্ট থাকলে খোলার উদ্দেশ্যই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া স্ত্রী যে অর্থ তাকে দিয়েছে তা বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যই দিয়েছে। স্বামী যদি তা গ্রহণ করে তাকে রেহাই না দেয় তাহলে এটা হবে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। শরী'আত কিছুতেই এটা জায়েয রাখে না। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত পৃ ৬০)।

৪৪. ইদ্দতকালীন সময় স্ত্রী স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে। কারণ এটা মুগাল্লাযা তালাক নয়। এ ধরনের তালাকের পর বিয়ের জন্য তাহলীল শর্ত।

৪৫. কিন্তু খোলার বিনিময়ে স্বামীর দেয়া মহরের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যে পরিমাণ মোহর দিয়েছে খোলার সময় সে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে না।" (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত পৃ ৬১)।

৪৬. হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বামীর পক্ষ থেকে যুলুম নির্যাতন হয়ে থাকলে খোলার সময় স্ত্রীর কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা তার জন্য মাকরূহ। হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু -এর সাথে একমত। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত পৃ ৬১)।

৪৭. **বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,** তৃতীয় ভাগ, ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) স্বামী পুরুষত্বহীন হলে।[৪৮]

(ঘ) স্বামী উম্মাদ হলে অথবা তার দূরারোগ্য/ছোঁয়াচে রোগ হলে।[৪৯]

(ঙ) দীর্ঘ অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে।[৫০]

(চ) স্বামীর দীর্ঘ দিনের জেল হলে।

(ছ) বিয়ের সময় স্বামী নিজের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিলে অথবা নিজের কোন দুর্বলতা গোপন করলে।[৫১]

ইসলামী শরীআত একচ্ছত্র ও একক তালাকের অধিকার নেই কেন ?

ইসলামী আইন স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ব্যর্থ বৈবাহিক সম্পর্ক অবসানে তালাক নেবার সুযোগ দিয়েছে। এই সুযোগের পদ্ধতিতে উভয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম স্ত্রীকে তালাকের

---

৪৮. অর্থাৎ স্ত্রীর বৈধ যৌন চাহিদা পূরণে অক্ষম হলে। স্ত্রী তালাক দাবি করতে পারে। হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু মতে– "তাকে এক বছরের চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে। এরপরও সক্ষম না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিতে হবে। (**সহীহ আল বুখারী,** ৫ম খণ্ড, কিতাবুত তালাক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪)।

৪৯. হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু 'আনহু ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতে চিকিৎসার জন্য এক বছর সময় নির্দিষ্ট করতে হবে। (**সহীহ আল বুখারী,** ৫ম খণ্ড, কিতাবুত তালাক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪)।

৫০. নিখোঁজ বা দীর্ঘ অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে মালেকী মাযহাব অনুসারে হানাফী মাযহাবের আলেমগণ ফতোয়া দেয়া পছন্দ করেছেন। মালিকী মাযহাব অনুযায়ী নিখোঁজ স্বামীর তিনটি অবস্থা রয়েছে এবং এর প্রতিটির নির্দেশ ভিন্নতর। যেমন– (ক) নিখোঁজ ব্যক্তি এতটুকু পরিমাণ সম্পদ রেখে যায়নি যাতে করে স্ত্রীর ভরণ-পোষনের খরচ সংকুলান হতে পারে। এ অবস্থায় বিচারক তাকে স্বামীর জন্য অপেক্ষায় থাকার নির্দেশ দেবেন না। বরং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর বিনা প্রতীক্ষায় নিজ ক্ষমতাবলে তাকে তালাক দিয়ে দিবেন অথবা তাকে নিজের ওপর তালাক আরোপ করার অধিকার দেবেন। শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবও এক্ষেত্রে মালিকী মাযহাবের সমর্থন করে। কেননা তাঁদের মতে ভরণ-পোষণের কোন ব্যবস্থা না থাকাটাই বিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট। বিচ্ছেদের উদ্দেশ্য স্বীয় হাকিমের তালাক দেয়ার পরিবর্তে এবং স্ত্রী লোকটিতে নিজের ওপর তালাক আরোপ করার অনুমতি দেয়াই অধিক উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরা (রা) কে বলেছিলে– "তুমিই তোমার মালিক। তোমার স্বামীর সাথে বসবাস করার অথবা তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার এখতিয়ার তোমার রয়েছে।" (খ) নিখোঁজ স্বামী সম্পদ রেখে গেছে কিন্তু তার স্ত্রী যুবতি এবং তাকে যদি দীর্ঘদিন অপেক্ষমান রাখা হয় তাহলে তার পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। এ অবস্থায় হাকিম তাকে এক বছর অথবা ছয় মাস অথবা যতদিন অপেক্ষা করা যুক্তিসংগত মনে করেন ততদিন অপেক্ষায় থাকার নির্দেশ দিবেন। (গ) নিখোঁজ ব্যক্তি যদি মুসলিম দেশে হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে যার সাথে সভ্য দুনিয়ার যোগাযোগ রয়েছে তার অনুসন্ধান চালানো এবং চার বছর অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হবে। (ঘ) যদি যুদ্ধক্ষেত্রে নিখোঁজ হয় তবে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। অথবা যদি দাঙ্গায় নিখোঁজ হয় তবে দাঙ্গা শেষ হবার পরে সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালানোর পর চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করতে হবে। তবে নিখোঁজ ব্যক্তি স্ত্রীকে এক অজানা ও অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেয়া এবং তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেয়া জায়েয নয়। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **স্বামী স্ত্রীর অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬)।

৫১. এ সকল অবস্থায় স্ত্রী তালাক চাইতে পারে। (জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬-১৬৭)।

Dhaka University Institutional Repository

নিঃশর্ত ও একক অধিকার দেয়নি কারণ এর ক্ষতিকর প্রভাব তার এবং পরিবারের উপর পড়তে পারে। যেমন ঃ

(ক) বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থায়িত্ব। স্বামীরা যেমন স্ত্রীদের আবেগ তাড়িত হয়ে তালাক দিতে পারে, মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ভুলের আশঙ্কা আরও বেশি। কাজেই যদি স্ত্রী তালাকের একক অধিকার থাকত তবে আবেগের বশে সে তালাক দিয়ে পরে হয়ত আফসোস করত।

(খ) স্বামী স্ত্রী উভয়েই তালাকের প্রতিক্রিয়ায় কষ্ট পায়। তবে স্বামীকে এ কষ্টের অতিরিক্ত আর্থিক খরচের বোঝাও বইতে হয়। মোহরানার সমস্ত টাকা তাকে পরিশোধ করতে হয়। ইদ্দতকালীন সময়ে (যা তিন মাস থেকে ৯ মাস পর্যন্ত হতে পারে) স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করতে হয়। ছোট সন্তান যদি স্ত্রীর কাছে থাকে তবে তাদের ভরণ-পোষণ করতে হয়। স্বামীর উপর এত আর্থিক লোকসানের বোঝা তার দ্বারা স্ত্রীকে তালাক দেয়ার বিরুদ্ধে একটি নিবারক (Deterrat) হিসেবে কাজ করে। যেহেতু মেয়েদের এমন আর্থিক লোকসানের আশংকা নেই সেহেতু তাদের নিঃশর্ত তালাকের সুযোগ দিলে এর অপব্যবহার হতে পারত। এছাড়া একক তালাকের অধিকার না থাকায় মেয়েদের তালাক পাওয়ার সুযোগ কেড়ে নেয়নি। বরং যৌক্তিক যে কোন প্রয়োজনে সে তালাক নিতে পারে। সে ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয় করে কোন জিনিস হাসিল করে সে তা রক্ষা করার জন্য শেষ চেষ্টা করে যাবে এবং কেবল তখনই তার ত্যাগ করবে যখন তা বর্জন করা ছাড়া আর কোন গত্যান্তর থাকবে না।[৫২]

বহুবিবাহ

ইসলামে একাধিক বিবাহ নিষেধ করা হয়নি তবুও আদর্শ মুসলিম পরিবার বলতে এক স্বামী এক স্ত্রীর পরিবারকেই বুঝায়। ইসলাম বহু বিবাহের[৫৩] সূচনা করেনি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রথা চলে এসেছে। ইহুদীদের মাঝে এই প্রথা ছিল খ্রিস্টানরাও এর উর্ধে নয় বরং ইসলামই বহু বিবাহ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করেছে এবং এর উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। মিসর, পারস্য, ভারত, ইউরোপ, গ্রীক, চৈনিক ও প্রাচীন আরব সহ প্রায় সকল প্রাচীন সভ্যতায় বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। বরং তারা এর কোন সীমা সংখ্যাও মেনে চলত না। ইসলাম তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এমনকি যেসব সমাজে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল সেখানেও যারা চাইত তাদের জন্য বহুগামীতার ব্যবস্থা ছিল।[৫৪]

---

৫২. জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭-১৬৮; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, স্বামী স্ত্রীর অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

৫৩. বহুবিবাহ বলতে একই স্বামীর একসাথে একাধিক স্ত্রী রাখাতে বুঝায়। অবশ্য দু'একটি প্রাচীন সমাজে একই স্ত্রীর একসাথে একাধিক স্বামীর ঘর করার নজিরও দেখা যায়। তবে তা ইসলাম ও সব একেশ্বরবাদী ধর্মেই নিষেধ। (আল্লামা জামাল আল বাদবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬)।

৫৪. যেমন কোড অব হামুরাবিতে যদিও এক স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করার নিয়ম ছিল কিন্তু সেখানেও অবস্থা সম্পন্ন লোকদের উপপত্নী রাখার ব্যবস্থা ছিল। একই ভাগে গ্রীক, রোমান সভ্যতায়ও একক স্ত্রী বিশিষ্ট পরিবার

Dhaka University Institutional Repository

যদিও সাধারণভাবে মনে করা হয় ইহুদী খ্রিস্টান আইন বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে কিন্তু বাস্তবে তা নয়।[৫৫] ইউরোপীয় ইহুদীদের মধ্যে মধ্যযুগ পর্যন্ত বহু বিবাহের চর্চা ছিল এবং আরব বিশ্বের ইহুদীদের মধ্যে আজও এই চর্চা আছে।[৫৬] ইহুদী ধর্মে অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। তাওরাতের অনুযায়ী নবীগণের প্রত্যেকেরই ছিল বহু সংখ্যক স্ত্রী। তাওরাতে বলা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মানের সাতশো স্ত্রী এবং তিনশো দাসী ছিল।[৫৭]

পরবর্তীতে ইয়াহুদী ধর্ম রাজা বাদশাহদেরকে সীমা সংখ্যাহীন বহুবিবাহ না করার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়। আর নারীর সংখ্যা রাজাদের জন্য ১৮ জন এবং সাধারণ পুরুষের জন্য ৪ (চার) জন নির্ধারণ করে দেয়া হয়।[৫৮]

এটা বহুল প্রচলিত ধারণা যে, খ্রিস্টবাদ কঠোরভাবে বহু বিবাহের বিরোধী। কিন্তু এই ধারণার পক্ষে ইহুদী ধর্মগ্রন্থে কোন দলিল পাওয়া যায় না। যদিও এক স্ত্রীতে তুষ্ট থাকাটা উত্তম এমন কথা দেখা যায় কিন্তু বহু বিবাহ নিষিদ্ধ এমন কোন আদেশ নেই।[৫৯] কেবল উপদেশ হিসেবে

দেখা গেলেও বহুগামিতা ছিল। বগুগামিতার কদর্য চিত্র আমরা ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াতের যুগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। (ঢাকা ঃ মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি- ১৯৯৮ খ্রিঃ, পৃ ৪৬)।

৫৫. ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখা যায় যে, বহু নবী, রাজা, এবং বিচারকের একাধিক স্ত্রী ছিল এবং কোথাও এটাকে নিষিদ্ধ বা অনৈতিক বলা হয়নি। যেমন গিডিয়ন (Gideon) এর অসংখ্য স্ত্রী ছিল এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে যে তার চরিত্র এত পবিত্র ছিল যে, স্বয়ং খোদার জ্যোতি তার উপর চলে আসত। আবাদন (Abadon) যিনি আট বছর ইসরাঈল শাসন করেছেন তাঁর চল্লিশজন পুত্র ছিল এবং অবশ্যই একাধিক স্ত্রী ছিল। ডেভিড এর একশ স্ত্রী ছিল। Rehoboam এর ১৮ জন স্ত্রী এবং তিনশত উপপত্নী ছিল। অব্রাহাম যাকে একত্ববাদীদের পিতা বলা হয় তাঁরও দু'জন স্ত্রী ছিল। (J. Hastings সম্পাদিত The Dectionary of bible Revised Bdetion charies Seribnr's son N. Y. 1963, P. 624; বহুবিবাহ একটি বাস্তবতা কারণ অব্রাহাম, দাউদ, জেকর সলোমান এ চর্চা করেছেন। জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭-১১৯)।

৫৬. জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭। (এডওয়ার্ড ওয়েস্ট মার্ক Short History of Marriage তৃতীয় খণ্ড; 1926. History of Human Marrage Bdward weston mark, 1925).

৫৭. তাহলে উপরের নবীদের সম্পর্কে বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ইয়াহুদী ধর্মে বহুবিবাহের প্রথাটি ইসলাম পূর্ব যুগেও বৈধ বলে বিবেচিত হত। (মুহাম্মদ আবদুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২০৩; ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬; জার্মান এবং ফ্রান্সে এর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয় দ্বাদশ শতকে। যার ফলশ্রুতিতে ইউরোপে ইহুদীদের মাঝে বহুবিবাহ বন্ধ হয়। তবে ইহুদী বিবাহ আইনে বহু বিবাহের স্বীকৃতি আছে; জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭)।

৫৮. জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯; The Dectionary of bible, James Hasting, Editor, Revised Edition Charles Seribner's 's son N. Y. 1963 P. 624.

৫৯. জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭; ওল্ড টেস্টামেন্টে খ্রিস্টান ঐতিহ্যের অংশ তাতে দেখা যায় যীশু (আ) বলেন, আমি আমার পূর্ববর্তী নবীদের আইন ধ্বংস করতে আসিনি বরং

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রত্যেক পুরুষের জন্য একজন স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বারা বড়জোর সাধারণ অবস্থায় এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে বুঝা যায়।[৬০] খ্রিস্টানদের মধ্যে মার্টিন লুথারের অনুমতিক্রমেই ফিলিপ ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলহেম একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। ১৬৫০ খ্রিঃ নুরেমবার্গ কনফারেন্সে যুদ্ধের কারণে পুরুষের সংখ্যা হ্রাসজনিত সমস্যা সমাধানকল্পে জনগণকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৬১]

বহুবিবাহ যে দেশে আইনত নিষিদ্ধ এবং এক বিবাহ যে জাতির আদর্শ সে দেশেও ধর্মে আইনের ভয়ে পুরুষেরা প্রকাশ্যে একাধিক বিয়ে করে না বটে, কিন্তু গোপনে অনেকেই অনেক প্রেমিকা ও উপপত্নী রক্ষা করে। ধর্মের ধারক ও বাহক বহু বিবাহের কড়া সমালোচক পাদরী পুরোহিতরাও এক বিবাহ কার্যত বাস্তবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৬২]

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বহু বিবাহের অবৈধ চর্চা করেছিলেন।[৬৩] কাল বিজয়ী ইসলাম আজ ক্লিনটনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, হিলারী ক্লিনটনের মত একজন স্ত্রী আপনার জন্য যথেষ্ট নয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী দুই, তিন বা চার জন পর্যন্ত স্ত্রী বিবাহ করার অনুমতি আল্লাহ মানুষকে দিয়েছে। ইসলামের বিধান বৈধভাবে নয় অবৈধভাবে চর্চা করায় আপনার চরিত্র

তাকে পূর্ণতা দিতে এসেছি। কাজেই আগের নবীদের আমলে বহু বিবাহ অনুমোদিত থাকলে তার আমলে তা নিষিদ্ধ হয়নি।

৬০. এ ধরনের কথা ইসলামেও বলা হয়েছে। আমরাও তা অস্বীকার করি না, কিন্তু এ কথার প্রমাণ কোথায় আছে যে, কোন পুরুষের প্রথম স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী বিয়ে করাই অবৈধ হবে এবং ব্যভিচারে গণ্য হবে। বাইবেলের কোন পুস্তকেই এমন কথা লেখা নেই। (মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬)।

৬১. সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড জনগণকে একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান করে আইন প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তৎকালীন পাদ্রীদের বিরোধিতার জন্য ইহা তখন সম্ভব হয় নাই। (আবদুল খালেক, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩০২)।

৬২. আমেরিকার Jimmy Swaggant (৫২) ছিলেন বর্তমানকালে পৃথিবীর বিখ্যাত, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাসম্পন্ন খ্রিস্টান মিশনারিদের একজন। মিস্টার সোয়াগার্ড ডেবোরাহ মুরফ্রী (Deborah Murphree) (২৮) নামক একজন পতিতাকে অবৈধ যৌন সংসর্গ করার জন্য অর্থ প্রদান করেছিল। উক্ত পতিতার ফটোসহ তার যৌন কেলেংকারির এই বিবরণ সৌদী আরবের বহু প্রচলিত পত্রিকা দি আরব নিউজ ২৪/০২/৮৮ এ প্রকাশিত হয়েছিল। টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ডেবোরাহ মুরফ্রী স্বীকার করে যে, ধরাপড়ার রাত পর্যন্ত এক বছরেরও বেশী সময় ধরে সোয়াগার্ডের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। সোয়াগার্ড কাঁদতে কাঁদতে সব স্বীকার করে এবং পদত্যাগ করেন। (মুহাম্মদ আবদুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২০৭)।

৬৩. সৌদী গেজেটে ১৯৯৮ সালের ৭ই আগষ্ট মনিকা লিউনস্কি ও ক্লিনটনের সাথে অবৈধ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মনিকা লিউনস্কীর এক বিরাট ফটোসহ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কেনেথ স্টার ৪ বছর বিষয়টি তদন্ত করেন। পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, ১৯৯৫-১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দুজনের অবৈধ এই গোপন সম্পর্ক ছিল Paulajones Gennifer flowers ও Kathlen willey নামে আরো তিনজন ললনার সাথে ক্লিনটনের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। (মুহাম্মদ আবদুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২০৮-২০৯)।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মান পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। আজো খ্রিস্ট ধর্মের মরমনস সম্প্রদায় এবং এনাব্যাপডিস্ট সম্প্রদায় বহুবিবাহ চর্চা করে।[৬৪] এ নাব্যাপিষ্ট ও মারমোন্স (খ্রিস্টানদের দুটি গ্রুপ) অত্যধিক ধর্মীয় আবেগ নিয়ে বহু বিবাহের সুপারিশ করেছেন।

সারকথা ইয়াহুদী ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে বহু বিবাহ বৈধ ছিল। ঈসা (আঃ) উহা বাতিল করেন নি। সুতরাং খ্রিস্টধর্মে তা বৈধ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। অধিকন্তু ইঞ্জিল শরীফে এমন কোন কথা নেই যাতে বহু বিবাহ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু প্রাচীন যুগের খ্রিস্টান পাদরী বর্তমান বহু বিবাহ নিষিদ্ধ মনে করত।

ভারতে বহু বিবাহ ঃ বৈদিক যুগ এবং এর পরবর্তীকালেও ভারতে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল একজন পুরুষ একই সময়ে যত ইচ্ছা, স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত।[৬৫]

চীনদেশে ঃ প্রাচীনকাল হতেই চীনদেশে কোন না কোন ধরনের বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন প্রধান মহিসীর পর স্বামী শত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত। তাদের গর্ভজাত সন্তান পিতার বৈধ সন্তান বলে পরিগণিত হত।[৬৬]

আফ্রিকায় বহুবিবাহ ঃ আফ্রিকার শতকরা বিশজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। ইউরোপের মিশনারিগণ আফ্রিকায় বহুবিবাহ প্রথা বন্ধের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তারা কোন কোন স্থানে কতকটা সফলতা লাভ করে থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীতে তারা বহুবিবাহ পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়েছেন।[৬৭]

রোম ও ফ্রান্সে ঃ খ্রিস্টান ধর্মের অধীনে আসার পূর্ব পর্যন্ত রোমও ফ্রান্সে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এরপর রোমান আইন প্রণেতা জাস্টিনিয়ান একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইন প্রণয়ন করেন।

---

৬৪. ১৮৪৭ সালে মরমনরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উডাহ নামক স্থানে বসবাস শুরু করে এবং ব্যাপকভাবে বহু বিবাহের প্রসার ঘটায়। ব্রিগাম ইয়াং এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মরমন চার্চ বহুবিবাহের প্রসার ঘটায়। ব্রিগাম ইয়াং এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মরমন চর্চা বহুবিবাহকে আধ্যাত্মিক বিধান হিসাবে প্রচার করত। ১৮৯০ সালে ফেডারেল সরকার বহুবিবাহকে নিষেধ করলেও মরমনদের চর্চা অব্যাহত থাকে। ৩০,০০০ মধ্যবিত্ত আমেরিকান মরমন এখনও বহুবিবাহ প্রথা গোপনে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে আছে। (**Husbands with More than One wife,** In Journal, June, 1967 esp. Page- 78; ১৯৬০ খ্রিঃ ওয়েস্টফিলিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পর যখন ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের ফলে জনসংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। তখন ফ্রেকাশ রেস্টেগ জিম্বার্গে এক প্রস্তাব পাস করেন যে, এখন থেকে প্রতিটি লোককে দুটি করে বিয়ে করতে হবে। (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৮ খন্ড শিরোনাম, খ্রিস্টধর্ম ও আধুনিককাল" পৃ ১৮৬-১৮৭)।

৬৫. **India status of Woman in Ancient India**, P- 66.

৬৬. **Encyclopaedia Britannica,** Vol. 4, Page- 400.

৬৭. আব্দুল খালেক, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইরান, গ্রীস, ব্যবিলন ও অস্ট্রিয়ায় ঃ ইরান, গ্রীস, ব্যাবিলন ও অস্ট্রিয়াতে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। নিউ টেস্টমেন্ট এক বিবাহ সমর্থন করলেও বিশপ ও পাদ্রীগণ ছাড়া অন্য কারও জন্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে নাই। খ্রিস্টান রাজাগণও বহু স্ত্রী গ্রহণ করত। চার্লেমেনের দুই স্ত্রী ও বহু উপপত্নী ছিল।[৬৮]

ইসলামে বিবাহ নিয়ন্ত্রণ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিতে বিভিন্ন ধরনের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। ইসলাম বিদ্বেষীরা নিন্দায় পঞ্চমুখ যে, হযরত মুহাম্মদ (স) বহুবিবাহ প্রথা চালু করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামই একমাত্র তৌহিদবাদী ধর্ম যা বহুবিবাহকে কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করে সীমাবদ্ধ করেছে। ইসলামে একাধিক বিবাহ কোন অত্যাবশ্যকীয় বা নির্দেশিত কাজ নয় শুধু বিশেষ কিছু অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা আল্লাহর দেয়া সুযোগ মাত্র।[৬৯] ইসলাম বিশেষ কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর অনুমতি প্রদান করেছে মাত্র।[৭০]

---

৬৮. Fida Hussain Malik : **Wives of the prophet,** P- 64-65; Sh Muhammad Ashrap, Lahore, Pakistan, 1983.

৬৯. জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২১। ইসলাম যখন দুনিয়ায় এলো তখন বহুবিবাহ প্রথা দুনিয়ার সকল দেশে ও সকল আইনে ব্যাপকভাবে চালু ছিল। কিন্তু তার কোন সীমা সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। এমনকি অতীতের কোন নবীর পর্যন্ত শত শত স্ত্রী থাকত। ইসলাম সর্ব প্রথম এই সংখ্যা চারের মধ্যে সীমিত করে। শেষ নবীর মাধ্যমে ইসলামের আনিত এই সংস্কার তার এক বিরাট অবদান।

৭০. মানুষকে একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য করে এমন বহু অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যেমন ঃ (১) স্ত্রী বন্ধ্যা হলে এবং স্বামী সন্তান চাইলে। (এক্ষেত্রে বন্ধ্যা স্ত্রীকে তালাক দেয়ার চেয়ে আর এক স্ত্রী গ্রহণ নৈতিকতা ও সৌজন্যবোধের দিক দিয়ে উত্তম ও সম্মানজনক। এতে করে পূর্বের স্ত্রীর আইনানুগ দাম্পত্য অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা অটুট থাকত। (২) যদি এমন কোন দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক বা স্বাভাবিক ঘৃণার উদ্রেগকারী রোগে আক্রান্ত হয় যার দরুন স্বামী তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে অক্ষম, এক্ষেত্রে দুটো বিকল্প থাকে। সে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে; এটা সৌজন্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং এতদিনের প্রেম ভালবাসার বিরোধ, উপরন্তু একজন রুগ্ন নারীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়ে চরম উপেক্ষা ও অবমাননা প্রদর্শন করা হয়। দ্বিতীয় পথ হলো– আর একটি বিয়ে করা। ৩) স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক যদি এতটাই খারাপ হয় যে, শালিস, সমঝোতা, আপোষ দরবার ব্যর্থ হয়। (৪) স্বামীকে যদি পেশাগত কারণে বছরের পর বছর প্রবাসে কাটাতে হয় এবং স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সাথে নিতে সক্ষম না হয়। এত দীর্ঘ সময় তার একাকী থাকা সম্ভব না হয়। তাহলে হয় সে আর একটি বিয়ে করবে নতুবা বিকল্প পথ বাধ্য হয়ে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা। (৫) স্বামী এতটা পৌরুষের অধিকারী যে, একজন স্ত্রী তার জন্য যথেষ্ট নয়। (মুসতাফা আস্ সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪, ৫৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিজ্ঞানী মাহমুদা আবদ আল সহ অনেকেই মত প্রকাশ করেন যে, বহু বিবাহ কোন সমাজ বিরোধী বা অবিবেচক কাজ ছিল না বরং এক জটিল বহু মাত্রিক প্রক্রিয়া যার বিভিন্ন রকম কারণ ছিল।[৭১] বিভিন্ন কারণ পরস্পর যুক্ত হয়ে অন্যান্য সামাজিক ফ্যাক্টর যেমন ঐতিহ্য, নৈতিকতা, আইন ইত্যাদির সাথে মিশে বহুবিবাহকে বাস্তবতা দিয়েছে।[৭২] অনেকক্ষেত্রে সামাজিক প্রয়োজন মানুষকে একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য করে।[৭৩] ইসলাম তথা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের সকল বিপর্যয় ও অশান্তি এড়াবার জন্য, বিশেষ প্রেক্ষাপটে, বিশেষ কারণে একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছে। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্মে বহু বিবাহের অনুমোদন ও অনুশীলন ছিল বলেই ইসলাম ও বহু বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে তা নয়। আসলে ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি সরাসরি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহপাকের নিকট হতে নাযিল হয়েছে।

---

৭১. (১) কোন বিবাহিত পুরুষ অপর মহিলার প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ল যে, তাকে বিয়ে করতে চাইল। (২) প্রথম স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা থাকা। (৩) কোন সমাজে ধনী প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের একাধিক স্ত্রী রাখার রেওয়াজ চালু থাকা। (৪) কোন সমাজে মেয়েরা গরিব লোকের প্রেম বা একমাত্র স্ত্রী হবার চেয়ে ধনী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী হতে চাইত। (৫) পুরুষের যৌন প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে বহু বিবাহের দিকে বেশি। (**The Family structure of Islams,** Hamudah Abd Al Ali).

৭২. কোন কোন দেশে বহুবিবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা হয়। যে সব সমাজে শিশু মৃত্যুর হার বেশি, তাদের মাঝেও বহু বিবাহের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। (জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২১)।

৭৩. প্রথমত যুদ্ধ বা অন্য কারণে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা সাম্য ব্যহত হলে, সেসব সমাজে বহুবিবাহ চালু হয়। ইউরোপ মাত্র সিকি শতাব্দীতে দুইটা বিশ্বযুদ্ধে কোটি কোটি যুবক মারা যায়। ফলে বিপুল সংখ্যক বিবাহিত ও অবিবাহিত নারী স্বামী ও অভিভাবক হারা হয়ে পড়ে। এই সকল মহিলারা অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে প্ররোচিত করে। ফলে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে, বিশেষত জার্মানিতে একাধিক নারী সংগঠন বহুবিবাহ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানায়। বস্তুত যুদ্ধ বিগ্রহ ও তার ফলে সংঘটিত ক্ষয়ের দরুন পুরুষের যে ঘাটতি দেখা দেয় তা পুরুষের জন্য বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। ১৯৪৮ সালে মিউনিখে যুদ্ধোত্তর নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সমস্যা সমাধানের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুসলমানদের বহুবিবাহ প্রথার প্রস্তাব প্রথমে সমালোচিত হলেও শেষে সম্মেলনের প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৪৯ সালে বন এর জনগণ বহুবিবাহকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানায়। (Said Abdullah Seif Al Haimy : **Woman in Islam,** Islamic Publication Ltd. Lahore. Pakistan Oct. 1979-92). দ্বিতীয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় কোথাও পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে। ফিনল্যান্ডের প্রতি চারটি বা তিনটি শিশুর একটি পুরুষ এবং অবশিষ্টগুলো স্ত্রী হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বহুবিবাহ সামাজিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। একাধিক বিবাহের অন্যতম কারণ হচ্ছে বিবাহযোগ্য নারী সংখ্যাধিক্য আমরা নির্দিধায় বলতে পারি, যখন উপজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর সংখ্যা অধিক হবে। তখন সেখানেও অনিবার্যভাবে বহু বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হবে। (**Polygamy**. P- 187) (মুসতাফা আস সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২-৫৩; জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২১)।

Dhaka University Institutional Repository

যে সমাজে পুরুষের স্ত্রীর সীমা সংখ্যা ছিল না। স্ত্রী হিসেবে নারীর কোন মর্যাদাও অধিকার ছিল না। সেই সময় ইসলাম একজন সাধারণ পুরুষের জন্য একই সাথে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই সাথে এগার/বারোজন রমনীকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবনে যত সমস্যা দেখা দিতে পারে সবগুলোর সমাধান বা তার ইঙ্গিত তিনি রেখে গেছেন। এটা ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ব্যতিক্রম।[৭৪] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا - خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য। অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।[৭৫]

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বাসনা মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে। ইসলাম এই প্রবৃত্তির স্বীকৃতি দিয়েছে এবং শর্তাধীনে ৪ জন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে।[৭৬]

স্বভাবের গতিকে অস্বাভাবিকভাবে রুদ্ধ করে দিতে গেলে এর কুফল প্রচণ্ডরূপে দেখা দিবেই। বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণের সাথে সাথে সমাজে পতিতাবৃত্তি, নারী হরণ ও ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধ প্রসার লাভ করে। এর ফলে বহুবিবাহের বিরোধী পাশ্চাত্য ও এর অনুসারিগণ আজ চরম বিপদ ও সংকটের সম্মুখীন।[৭৭] মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কয়েকটি দেশের মধ্যে জাপান অন্যতম হলেও আজকের জাপানি সমাজে যৌনতার ছড়াছড়ি। পতিতাবৃত্তি সেখানে আইন সিদ্ধ।[৭৮] পরিবার ব্যবস্থা ও সুস্থ পবিত্র পরিবেশ সেখানে খুবই দুরুহ ব্যাপার।

---

৭৪. মুহাম্মদ আবদুল হাই, **নারী অধিকার,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১১।

৭৫. **আল কুর'আন,** ৩৩ ঃ ৫০।

৭৬. একমাত্র একাধিক বিয়ে ব্যবস্থা অনুমোদনের মাধ্যমে বিয়ের বাইরে গোপনে যৌন সম্পর্ক, সামাজিক অশ্লীলতা ও নৈতিক অপরাধ সফলতার সাথে দমন ও প্রতিরোধ করতে পারে। আবদুল খালেক, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৫।

৭৭. এই সকল স্থানে পতিতাবৃত্তি বহু বিবাহের স্থান দখল করে আছে। কেবল নিউইয়র্কেই পঞ্চাশ হাজার উপপত্নী রয়েছে এবং প্রতি বছর নিউইয়র্ক শহরে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ গর্ভপাত করা হয়ে থাকে। এখানে প্রতি মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়। (Ben linsey : Revolt of Modern Youth; আবদুল খালেক, **নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৫)।

৭৮. পতিতালয় ছাড়াও জাপানের অলিতে গলিতে রয়েছে হরেক রকমের যৌন কারখানা। এগুলোর রয়েছে নানা চটকদার নাম। যেমন– বাথ হাউস, মেসেজ পার্লার, সেক্স ক্লাব, ডেটিং ক্লাব, টেলিফোন ক্লাব, ইমেজ ক্লাব, জে জে ক্লাব, ফ্যাশন ক্লাব ইত্যাদি। বর্তমানে শুধুমাত্র টোকিওতে এ ধরনের ৩৬৪টি ক্লাব আছে। এই সব ক্লাবে একজন জাপানী মেয়ে দৈনিক আয় করে একহাজার ডলার। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২৯)।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটেনেও একাধিক বিয়ে ব্যবস্থার পরিবর্তে বহুগামিতার ফলে পরিবার ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়েছে। একটি সুখী সুন্দর দাম্পত্য জীবন, সুশৃঙ্খল পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তে অবৈধ সম্পর্কের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ভেঙ্গে যাচ্ছে অসংখ্য পরিবার, জন্ম নিচ্ছে অগণিত অবৈধ সন্তান। সেখানে পুরুষ শুধু নারীকে ভোগ করছে কিন্তু পালন করছে না কোন পিতার দায়িত্ব ও স্বামীর কর্তব্য।[৭৯]

নৈতিক অপরাধ, নারী নির্যাতনে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান এখন শীর্ষে। দ্বিতীয় ইংল্যান্ড, তৃতীয় কানাডা, চতুর্থ জার্মান, পঞ্চম ফ্রান্স, তথাকথিত সভ্যতার দাবিদার নারী স্বাধীনতার মহান দেশ যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের অবস্থা শোচনীয়। যুক্তরাষ্ট্রে গৃহিনীরা হরহামেশা পারিবারিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে থাকেন। দাম্পত্য কলহে নিহতদের মধ্যে ৬০ শতাংশ স্ত্রী স্বামীর হাতে নিহত হন।[৮০]

নৈতিক অধঃপতন, স্বামী স্ত্রী সম্পর্কের অবনতি অবিশ্বাসের ফলে বিয়ের পাশাপাশি তালাকের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে।[৮১] অবৈধভাবে জন্ম নিচ্ছে লাখ লাখ ভাগ্যহত শিশু।[৮২]

পাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞানী ড. এ্যানি বেসান্ত বলেন– পাশ্চাত্যে এক বিবাহের প্রহসন আছে কিন্তু বাস্তবে তথায় বিবাহ বন্ধনের দায়িত্ব ব্যতিরেকে বহু নারী ভোগ অবাধে চলছে। নারী পুরুষের নিকট অশান্তি ও বিরক্তিকর হয়ে উঠলে সে তখন তাকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং নারী তখন নিরুপায় হয়ে পথে দাঁড়ায়। কারণ তাঁর প্রেমিক তার ভবিষ্যতের জন্যে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে না। কেবল সাময়িক ভোগই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে এমন গৃহে সসম্মানে সংরক্ষিত একজন গৃহবধূ ও মাতা অপেক্ষা এই ধরনের নারী শতগুণে নিকৃষ্ট। সেই রমনী হতে অনেক উৎকৃষ্ট অনেক সুখী ও অনেক সম্মানিত। যাকে অবৈধ ভাবে ভোগের পর আইনের সীমার বহির্ভূত; রজনী অবসানে আশ্রয়হীনা অবস্থায় রাস্তায় বের করে দেয়া হয়েছে।[৮৩]

---

৭৯. ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস ২৪তম বার্ষিক সংখ্যায় জানায় ১৯৯২ সালে ব্রিটেনে প্রতি তিনটি শিশুর মধ্যে ১টি শিশু অবৈধভাবে জন্মগ্রহণ করে। গত দু'দশকে বিবাহের হার ১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং একই সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। ১৯৯১ সালে প্রতি দু'টি বিয়ের মধ্যে একটিই ভেঙ্গে যায়। (**সাপ্তাহিক বিক্রম বর্ষ ৭**, সংখ্যা ৩৫, ১৫-২১ আগস্ট– ৯৪)।

৮০. "আমেরিকার নারীদের অবস্থা" **নিউজ উইক জরিপ** ০৬/০৭/১৯৯০ ইং।

৮১. ১৯৭৯ সালে আমেরিকার ২৩,৩১০০০ বিয়ের মধ্যে এক বছরেই ১১,৮১,০০০ তালাক সংঘটিত হয়। প্রত্যেক বছরই তালাকের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮২. ১৯৭৯ সালে মার্কিন মুল্লুকে ৪ লাখ অবৈধ শিশু জন্ম নেয়। একজন পুরুষ একজন নারীকে ভোগ করবে একটা অবৈধ সন্তানের দায়ও কলঙ্কের বোঝা একজন নারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে সমাজের গলগ্রহ বানিয়ে ছেড়ে দেয়। এমনকি এই অবৈধ সম্পর্কের ফলে যে সন্তান জন্মে পুরুষটি তার স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়া না। বরং ঐ সন্তানটি সমাজে জারজ সন্তান হিসাবে পরিচিত হয়। যতদিন সে বেঁচে থাকে ললাটে ব্যভিচারের নিদর্শন বহন করেই বেঁচে থাকে এবং কোথাও মাথা উঁচু করে 'দাড়াতে পারে না। এই সকল সন্তান বৈধ সামাজিক স্বীকৃতি বা মর্যাদা পায় না এবং পরিবারের উত্তরধিকারী হয় না। ফলে তৈরি হয় অগণিত অবৈধ সন্তান লালন কেন্দ্র। সেখানে পরিবারের কোন অস্তিত্ব থাকে না। মুহাম্মদ আবদুল হাই, **নারী অধিকার**, প্রগুক্ত পৃ.২১২।

৮৩. Fida Hussain Malik : **Wives of the Prophet,** A shraf Publications, Lahore 4th Ed. 1983. P- 74-75.

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও পাশ্চাত্যের শহরগুলোতে রাত্রীকালে হাজার হাজার নারী রাস্তায় রাস্তায় প্রেমিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভীড় জমায়। ইসলামের বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকলে যে সকল স্বামী এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না তারা একাধিক বিয়ে করত। অসহায় ও পরিত্যক্তা পাশ্চাত্য নারীদের সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র উপায়। বহু বিবাহ প্রথা গ্রহণ না করলে পতিতাবৃত্তি অবিরতভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং অবৈধ প্রণয়নী ও অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা মর্মান্তিকভাবে বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।[৮৪]

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মহিলা চিন্তাবিদ ড. এ্যানি বেসান্ত ওম্যাক কারলেন বহু বিবাহ প্রথা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

It is a beneficial institution which can save womanhood from destitution and prostitution.

এটি একটি কল্যাণজনক প্রথা যা নারীত্বকে অসহায়তা ও পতিতাবৃত্তি হতে রক্ষা করতে পারে।[৮৫]

সুতরাং এ সকল বাস্তবতায় প্রয়োজন ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও যদি ইসলাম এই সুযোগ না রাখত তবে অন্যায় এর পথকে খুলে দেওয়া হত। যার অবশ্যম্ভাবী ফল হত অবাধ যৌনচার। এক্ষেত্রে পুরুষ কেবল নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করে কোন দায় দায়িত্ব বহন করে না। এ কারণে ইসলামী শরীয়তে একজন পুরুষকে প্রয়োজনে চারটি বিয়ের অনুমতি দিয়েছে।[৮৬] পুরুষের অগণিত বিয়ে ব্যবস্থা, অবাধ যৌনাচার, নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে বিশেষ শর্তে বিশেষ প্রয়োজনে ইসলাম ৪টি বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। তবে এখানে স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও সমান আচরণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।[৮৭] স্ত্রীদের সাথে সমব্যবহার বহুবিবাহের অত্যবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। এছাড়া দ্বিতীয় বিয়ের আশা করা অবান্তর। সমব্যবহার বলতে বুঝায় সকল স্ত্রীকে এক মানের খাবার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন, সময় এবং সহানুভূতি দিতে হবে। শুধু এক ক্ষেত্রেই হয়ত সমান থাকা যাবে না। তা হচ্ছে ভালবাসা ও আবেগ। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল (স) আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।[৮৮]

---

৮৪. Clare Mc Farloane The Case of the Polygamy.

৮৫. **Fida Hussain Malik of cit,** P- 74-75.

৮৬. যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা তাহলে যে সব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয় তন্মধ্য হতে দুটো করে, তিনটে করে ও চারটে করে সর্বোচ্চ চারজনের এই সংখ্যা স্বয়ং সর্বজ্ঞতা, সর্বদ্রষ্টা ন্যায়ের প্রতীক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার করা। সুতরাং এর কারণ আল্লাহই ভাল জানেন। (**পবিত্র কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ৩)।

৮৭. তোমাদের প্রবল আগ্রহ থাকলেও স্ত্রীদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। কাজেই একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড় না যার ফলে আর একজনকে ঝুলন্ত রেখে দেবে। যদি তোমরা সমঝোতা প্রিয় ও সংযমী হও। তাহলে আল্লাহই দয়ালু ও ক্ষমাশীল। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ নিসা, আয়াত ঃ ১২৯)।

৮৮. ইসলাম স্ত্রীদের মধ্যে বস্তুগত ন্যায়বিচার যথাসাধ্য নিশ্চিত করার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরনব্যাধিতে আক্রান্ত থাকা অবস্থায় যে বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখে

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম তার স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে পালা বণ্টন করতেন এবং বলতেন ঃ হে আল্লাহ এটি আমার বণ্টন আমার সাধ্যমত। সুতরাং যাহাতে আমার সাধ্য নাই তাতে আমাকে তিরস্কার কর না।[৮৯]

হযরত আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার দুই জন স্ত্রী রয়েছে সে যদি তাদের মধ্যে সমব্যবহার (ন্যায়) প্রতিষ্ঠা না করে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তাঁর শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে।[৯০]

কুর'আনে বহু বিবাহের আলোচনা সমালোচনা করার পূর্বে এটা মনে রাখা দরকার যে, এই অনুমোদন কোন মানুষের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। এ সুযোগ আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া হয়েছে।[৯১] যিনি নারী ও নয় পুরুষও নন। কাজেই এর মাধ্যমে পুরুষকে অতিরিক্ত সুবিধা দেবার প্রশ্নই উঠে না। কুর'আন হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহর নাযিল করা সর্বশেষ জীবন বিধান। এরপর আর কোন কিতাব আসবে না। কাজেই পরবর্তী সব সমাজ, জাতি ও সময়ের চাহিদা পূরণের বিধান এতে না থাকত বা শুধুমাত্র আরব বিশ্ব বা কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার বা কোন নির্দিষ্ট জাতির সমস্যার সমাধান এতে থাকত। তবে এটা সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন হত না। বহুবিবাহের যৌক্তিক কারণ অতীতে ছিল। বর্তমানেও থাকতে পারে । এবং ভবিষ্যতেও তৈরি হতে পারে। এই বিভিন্ন সময় ও অবস্থার বাস্তবতা মোকাবেলার জন্যই ইসলামে এই সুযোগ রাখা হয়েছে।[৯২]

গেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর ও নজীরবিহীন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে এক রাত করে কাটাতেন যখন রোগ প্রবল আকার ধারণ করল এবং হাঁটতে অক্ষম হলেন, তখন তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে এক স্ত্রীর এর থেকে অন্য স্ত্রীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হত। যখন অবস্থা আরও খারাপ হল তখন তিনি আয়েশার ঘরে থাকার জন্য অন্য সকল স্ত্রীর নিকট অনুমতি চাইলেন। সবাই অনুমতি দিলে তিনি আয়েশা রাযী আল্লাহু 'আনহার গৃহে গেলেন এবং কয়েকদিন পর সেখানে থাকাবস্থায় ইন্তেকাল করলেন। (জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২২;)। ইসলামে একাধিক বিয়ের সুযোগ অত্যন্ত সংকীর্ণ একাধিক স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করার ক্ষমতা থাকা ও কোন প্রকারের অবিচার করা হবে না এ ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়া গেলেই কেবল একটি অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে এর অনুমোদন দেয়া হয়ে থাকে। এই বিধিগত কড়াকড়ির আনুগত্য করা ছাড়া একাধিক বিবাহের কুফল ব্যক্তি থেকে পরিবারে এবং পরিবার থেকে জাতিতে ছড়িয়ে পড়ে। (মুসতাফা সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮)।

৮৯. **আবু দাউদ,** তিরমিযী ও নাসাঈর বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ ২৭৯; বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, তৃতীয় ভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, পৃ ৮৪৭।

৯০. **তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ. ইবন মাজা ও দারিমীর বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ,** পৃ ২৭৯; বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, তৃতীয় ভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, পৃ ৮৪৭।

৯১. এ অনুমতির পিছনের কিছু বাস্তব কারণ আছে। এসব বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে আল্লাহ এবং তাঁর জ্ঞানের অসীমত্বের উপর দৃঢ় ঈমান নিয়ে।

৯২. জামাল আল বাদাবী, **ইসলামের সামাজিক বিধান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২৪; ইসলাম এক বিবাহ কিংবা একাধিক বিবাহ নয়, দুটি জিনিসের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। একদিকে সে এমন নৈতিক, সামাজিক ও

Dhaka University Institutional Repository

তবে এক স্ত্রীর ব্যবস্থাই উত্তম। অধিকতর স্বভাবসুলভ পরিবারকে অধিকতর টেকসই করতে সক্ষম এবং পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় সহায়ক। তবে বহুবিবাহ রোধ করার চেষ্টা আল্লাহর হুকুম পরিবর্তনের নামান্তর। তাছাড়া বহু বিবাহের অনুমতি যে সব প্রয়োজনের খাতিরে দেয়া হয়েছে তা থেকে উপকৃত হতে কোন ব্যক্তি বা জাতিকে বাধা দেয়াও অপরাধ। আল্লাহ তার আইনের কল্যাণকারিতা আমাদের চেয়ে ভাল বুঝেন। আর কোন আইনের অপব্যবহার দ্বারা তা বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা বুঝায় না বরং ঐ অপব্যবহার রোধ করার প্রয়োজনই বুঝায়।[৯৩]

নারীর সাক্ষ্যদান

সম্মান ও মর্যাদার বিচারে সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের মাঝে কোনই পার্থক্য ও ভেদাভেদ নেই। নারীকে শুধু নারী হয়ে জানবার কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা সম্পূর্ণ জাহিলী ধ্যান-ধারণা। এরূপ চিন্তা-ভাবনা ইসলাম স্বীকার করে না। কারো পাওনা বা অধিকার নিরূপণের জন্য যে সাক্ষ্য দেয়া হয়ে তার ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে।

সাক্ষীদের মধ্যে তোমরা যাদের পছন্দ কর (যাদের উপর তোমারা রাজি) তাদের মধ্য হতে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে। যদি দুজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষও দুইজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে। তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে।[৯৪]

বিধানগত পন্থা অবলম্বন করে, যাতে করে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের হক আদায়ে অধিকতর মনোযোগী হয় এবং হক নষ্ট করার সম্ভাবনা ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত থাকে। অন্যদিকে সে অবাধ উন্মুক্ত যৌনচর্চার দ্বার দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করে দেয় এবং কোন অবস্থাতেই তা অবারিত কিংবা একটি খিড়কি পর্যন্ত খুলে দিতে রাজি নয়। (সাইয়েদ হামেদ আলী, **একাধিক বিবাহ;** ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১ম প্রকাশ, শাওয়াল- ১৪১২, এপ্রিল- ১৯৯২, পৃ ৬৭)।

৯৩. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭২। একাধিক বিবাহযুক্ত পরিবারে এক বিবাহ বিশিষ্ট পরিবারের মত ততটা "সুবাতাস বয় না কিন্তু তা গুটি কয়েক পরিবারের ব্যাপার অপরিহার্য প্রয়োজন ও পরিস্থিতিতে শর্তসাপেক্ষে একাধিক বিয়ে এজন্য করা হয়েছে যে, এছাড়া অবাধ যৌন অনাচার রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। (সাইয়েদ হামেদ আলী, **একাধিক বিবাহ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮)।

৯৪. **পবিত্র কুর'আনুল কারীম,** সূরা আল বাকারা, আয়াত নং- ২৮২। মানবতা, মর্যাদা এবং যোগ্যতার সাথে যে এই পার্থক্যের কোন সম্পর্ক নেই, তা সুস্পষ্ট। একজন পুরুষের সাথে সাক্ষী হিসাবে দু'জন স্ত্রীলোকের শর্ত আরোপের কারণ তার সম্মান ও মর্যাদার সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। আর এখানে 'ভুল করার' মমার্থ হল ভুলে যাওয়া। তাই একজন অন্যজনকে মনে করিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম যদিও নারীকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে অধিকার ও কর্তৃত্ব দান করেছে, তথাপি তার ওপর যে বিশেষ সামাজিক দায়িত্বটি অর্পন করেছেন তা হলো পরিবার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। এ দায়িত্বটি তাকে বেশিরভাগ সময় নিজের বাড়ির অভ্যন্তরে কাটাতে স্বভাবতই বাধ্য করে।[৯৫]

এছাড়াও দুজন মহিলার কথা বলা হয়েছে কারণ মহিলারা পুরুষের তুলনায় বেশি আবেগ প্রবণ হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শিশুদের যত্ন ও পরিবারের পরিচর্যার জন্য আবেগ প্রবণভাবে সৃষ্টি করেছেন।[৯৬]

মুসলিম উম্মাহর প্রায় সমস্ত ফিকাহশাস্ত্রবিদই একমত যে, মেয়েদের যে সব ব্যাপারে পুরুষদের জানার সুযোগ নেই শুধু সেসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নারীর সাক্ষ্য যথেষ্ট। যথা দুধ পান করানো সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে।[৯৭] যেসব ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি বিরল। সেসব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণে যেমন সর্তকতা অবলম্বন করা হয়েছে তেমনি যেসব ক্ষেত্রে নারী ব্যতীত কোন পুরুষের প্রকৃত সত্য অবগত হওয়া আদৌ সম্ভব হয় না অথবা প্রায়শই সম্ভব হয় না। সেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর একক সাক্ষ্য গ্রহণও অনুমোদন করে।[৯৮] ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ

সন্তান প্রসব এবং মেয়েদের (গোপনীয় অংগসমূহের) দোষ ত্রুটির ব্যাপারে শুধু নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আমি যে সব (জ্ঞানী ও বিদ্বান) লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি তাদের কাউকেই এ মতামতের বিরোধী পাইনি।[৯৯] হানাফী ফকীহগণ, ইমাম মালেক (র), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং

---

৯৫. বিশেষত বেচা-কেনার সময়টিতে। আর এ থেকেই বলতে বুঝতে পারা যায় যে, অর্থনৈতিক সংক্রান্ত বিষয়ে নারী সাক্ষ্য দান অত্যন্ত বিরল ঘটনা হয়ে থাকে। এ ধরনের লেনদেনের কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ যদি বা কখনো সে পায় তবে সে তাৎক্ষণিকভাবে ওটাকে স্মরণে রাখতে আগ্রহী, তবে এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এরপর ঐ ঘটনা সাক্ষ্য দিতে সে যখন বিচারকের সামনে দাঁড়াবে, তখন তার খানিকটা ভুলেও যেতে পারে। অপর এক মহিলাও যখন এই ঘটনার সাক্ষ্য দেবে তখন তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। (মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৯৬. আল্লাহ প্রদত্ত এ আবেগ প্রবণতাই মহিলাদের পরিপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে অপূর্ণ চেতনার প্রতি ধাবিত করে। এ মানুষের পাওনা বা অধিকার এমন একটি জিনিস, যার ব্যাপারে সাক্ষীর স্থিতি ও দৃঢ়তা আবশ্যক। এবং সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রমাণ করতে বিচারকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা জরুরি। অনেক সময় মহিলারা আদালত কর্তৃপক্ষের সামনে জবানবন্দীতে যা বলা দরকার তা অনেকাংশে ভুলে যায়। তাই আদালতী কার্যক্রমে নারী সাক্ষ্য, পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক। কিন্তু মেয়েলি সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে মহিলাদের সাক্ষ্যই রায়ের জন্য পরিপূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। যথা- "দুধ পান করা"। এ কারণেই বিষয়টি আল কুর'আনে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে যে, যাতে একজন স্ত্রীলোক ভুলে গেলে অপর স্ত্রীলোক তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। (মূল মুহাম্মদ সায়্যিদ আস্ সাফতী, **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪; ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২২)।

৯৭. **সহীহুল বুখারী,** সাক্ষ্য প্রদান অধ্যায় (باب إذا شهد شاهد أو شهود بشى) , ৫/২৫১; **সুনান তিরমিযী,** দুধ পান করানো অধ্যায় (باب ما جاء فى شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع) , ৩/৪৫৭ হাদীসটি হাসান সহীহ; **সুনান আবুদ দাউদ,** রায় প্রদান অধ্যায় (باب ما جاء فى الر ضاع) , ৩/৩০৬। সবগুলো বর্ণনা উকবা বিন হারিস থেকে)।

৯৮. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২২-২৩।

৯৯. **কিতাবুল উম্ম,** ৭ম খণ্ড, পৃ ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের মতের সমর্থক আরো কিছু সংখ্যক ফকীহ মেয়েলী বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে শুধু মেয়েদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি।[১০০]

নারীর মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বহুসংখ্যক ফিকাহ শাস্ত্র বিশারদ অপরাধের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য আদৌ গ্রহণ করা যাবে না বলে রায় দিয়েছেন। এর কারণ এটাই যে, নারীর অধিকাংশ সময় নিজ বাড়িতে সাংসরিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার কথা এবং সেই সব দ্বন্দ্ব কলহের জায়গাগুলোতে তার উপস্থিত থাকার কথা নয়। যেখানে খুন বা হত্যকাণ্ড বা অনুরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়।[১০১] যদিও কোন নারী সেখানে উপস্থিত থাকেন তবে তার হত্যাকাণ্ড পর্যবেক্ষণের মত মানসিক অবস্থা থাকতে পারে না। তাই হত্যার ন্যায় লোমহর্ষক অপরাধের সঠিক বিবরণ দেয়ার মত দৃঢ়তা দেখানো তার পক্ষে সম্ভব কিনা সেটাই সন্দেহ জনক।[১০২]

হিন্দ বিনতে তালাবা একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, এক স্থানে আমরা কয়েকজন মহিলা সমবেত হয়েছিলাম। সেখানে চলার পথে এক মহিলা কাপড়ে আবৃত একটি শিশুকে পদদলিত করলে শিশুটির মা দাবি করল সে আমার সন্তানকে হত্যা করেছে। এ বিষয় দশজন মহিলা হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। আমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। হযরত আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু হন্তা মহিলার ওপর দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক করে দিলেন।[১০৩]

অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়। এক সময় চারজন মহিলা এসে হযরত উমর এবং আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু –এর সামনে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। এ সাক্ষীর ভিত্তিতে হযরত উমর আলী রাযী আল্লাহু 'আনহু স্বামী ও স্ত্রীকে আলাদা করে দিলেন।[১০৪]

---

১০০. ইবনে হাযম, আল মাহাল্লী, ৯ম খন্ড, পৃ ৩৯৫-৪০০; জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৬।

১০১. আর কোন মহিলা যদিওবা ঐ স্থলে উপস্থিত হয়েই বসে, তবে হত্যার ন্যায় দৃশ্য সচক্ষে দেখা পর্যন্ত তার ঐ জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকার কথা নয়। বরং তার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে, ওখান থেকে পালাতে না পারলেও চোখ বুঝে থাকবে এবং চিৎকার করবে এমনকি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

১০২. নারীর এরকম মানসিক অবস্থায় পরবর্তী সময়ে সাক্ষ্য দেয়া, অপরাধ, অপরাধী, অপরাধ সংঘটনের হাতিয়ার এবং কিভাবে তা সংঘটিত হয়েছে তার বিস্তারিত সঠিক বিবরণ দেয়ার মত দৃঢ়তা দেখান তার পক্ষে সম্ভব কিনা সেটাই সন্দেহজনক। ইসলামের ফৌজদারি দণ্ডবিধির যাবতীয় দণ্ড বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকলেই যে বাতিল হয়ে যায়, সেটা তো সর্ববাদী সম্মত ব্যাপার। এই সন্দেহের কারণেই তার সাক্ষ্য অনেকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। (মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২২। এখানে হত্যার ব্যাপারে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

১০৩. জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলমামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৬; ইবন হাযমের আল মুহাল্লী গ্রন্থের ৯ম খণ্ডের ৩৯৫-৪০০ পৃষ্ঠা।

১০৪. হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু ও হযরত 'উমর রাযী আল্লাহু আনহু থেকে পরস্পর বিরোধী যে মত পাওয়া যায় ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের এ মতটি দ্বারা তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। শুধু নারীদের সাক্ষ্য তারা এহেন পরিস্থিতিতে প্রত্যাখান করেছেন যখন ঘটনা সম্পর্কে অবগতি লাভের সুযোগ নারীর তুলনায় পুরুষের বেশি থাকে। আর মেয়েদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শুধু এমন ফয়সালা করেছেন যখন তাদের সাক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন ঃ

মেয়েরা যদি বিয়ের মজলিসে বা হাম্মাম খানায় সমবেত হয় এবং সেখানে হদের উপযুক্ত কোন ঘটনা সংঘটিত হয় তাহলে সে পরিস্থিতিতে হদের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। বকর ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতার বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ (র) থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।[১০৫]

ইবনে সাদাকা একটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি তার আত্মীয়-স্বজনদের অসিয়ত করে এবং ক্রীতদাসকে আযাদ করে আর নারী ছাড়া কোন পুরুষ সে সময় উপস্থিত না থাকে তাহলে এ ধরনের অধিকারের ক্ষেত্রে ইমাম আহমদের (র) এর মতে নারীর সাক্ষ্য জায়েজ। একইভাবে তালাকের রুজু করার ক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।[১০৬]

আল মুহাল্লাগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– ইবন হাযম যিনা প্রমাণের ক্ষেত্রে চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান সাক্ষী হতে হবে অথবা প্রতিজন পুরুষের পরিবর্তে দুইজন মুসলিম ন্যায়পরায়ণ মহিলা হতে হবে। হদ্দ, কিসাস, অনুরূপভাবে বিবাহ, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে ফিরাইয়া আনা, ধন, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা বা এককভাবে চারজন মহিলার সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকতে হবে।[১০৭]

আল্লামা ইবনে হাযম তো দুইজন মহিলাকে একজন পুরুষের সমকক্ষ স্বীকার করে নিয়ে সর্বাবস্থায় এবং সব রকমের অধিকারের ক্ষেত্রে ও বিষয়ে তাদের নির্ভরযোগ্য মনে করেন।[১০৮]

গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করলে অধিকার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। (**জালালুদ্দীন আনসার উমরী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৭)।

১০৫. আল এখতিয়ারাতুল ইলমিয়া আল মাতবু ঃ **মা'আল ফাতাওয়া,** পৃ ২১২।

১০৬. ইবনে কাইয়েম, আত্‌তারিকুল হুকমিয়া ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়া, পৃ ১৪২। কারণ তালাকের নথিপত্র লেখার সময় কোন নারীর উপস্থিত থাকা যত সহজ তালকের রুজু করার ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা তার চেয়ে বেশি সহজ। উল্লিখিত অবস্থায় যদি নারীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী অবস্থায়ও গৃহীত হওয়া উচিত। (জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮)।

১০৭. হুদুদ ছাড়া অপরাপর সকল ক্ষেত্রেই একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ বা দুইজন মহিলার সাক্ষ্য শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য হবে। এবং দুধপানের সাক্ষ্য হিসেবে একজন ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ বা মহিলা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। (ইবন হাযম, আল মুহাল্লা ১ম খণ্ড, পৃ ৩৯৫-৩৯৬; **বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,** তৃতীয় ভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গবেষণা বিভাগ, প্রথম প্রকাশ, শাওয়াল- ১৪০৭, জানুয়ারি- ২০০১, পৃঃ ৮৮২)।

১০৮. কাজী শুরাইহ (র) এর মতও অনেকটা এরকম। এক পরিবারের আসবাবপত্র সম্পর্কে তার কাছে একটি মামলা আসে। বাদী ও বিবাদী উভয়ে ছিলেন স্বামী স্ত্রী। স্বামী দাবি করছিল যে, সম্পদ ও আসবাবপত্র তার। কিন্তু চারজন মহিলা সাক্ষ্য দিল যে, এসব আসবাবপত্র স্ত্রীর। মহিলাদের সবার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাজী শুরাইহ স্বামীর বিরুদ্ধে মামলার রায় দিলেন। (**জালালুদ্দীন আনসার উমরী,** ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮)।

Dhaka University Institutional Repository

যেসব ফকীহ সর্বক্ষেত্রে এককভাবে নারীরে সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণ না করার জন্য তাদের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। তারা তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে।

বিখ্যাত তাবেয়ী মাকহুল (রঃ) শুধু মন দেয়া নেয়ার ব্যাপারে এককভাবে নারীদের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করা যায়। রাবীরা (রঃ) এর মতে বিয়ে, তালাক, শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি এবং দাস মুক্তির ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যে সব লেনদেন এবং অধিকার নির্ধারিত হয় সে সবক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।[১০৯]

ইবন কায়্যিম বলেছেন, ন্যায়পরায়ণ মহিলা সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতার দিক দিয়ে পুরুষের মতই গণ্য। তবে যদি তার ব্যাপারে কোন ভুল ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে। তাহলে তার সমান আরেকজন মহিলার সাহায্যে তার সাক্ষ্যকে শক্তিশালী করা হয়। দুইজন মহিলা যোগে সাক্ষ্যকে শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়াটি প্রদত্ত সাক্ষ্যকে কখনও কখনও এক বা একাধিক পুরুষ প্রদত্ত সাক্ষ্যের তুলনায় অধিক শক্তিশালী করে দেয়।[১১০]

সুতরাং আদালতে ন্যায়পরায়ণতার সংরক্ষণের জন্য মহিলার সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক গ্রহণ করাতে (কোন কোন ক্ষেত্রে) ইসলামী আদালতের কার্যপ্রণালী সমালোচিত হতে পারে না। বিশেষ করে ইসলামী আদালত এ বিষয়ের প্রতি কঠোর দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখেছে। যাতে কারো অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।[১১১]

তাই প্রশ্নটা সম্মান ও অসম্মানের নয় এবং যোগ্যতা ও অযোগ্যতার নয়। বরং প্রশ্নটা হল আইন বা বিধির প্রযোজ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার এবং সে সম্পর্কে বিচার ফয়সালার সতর্কতা অবলম্বনের যে কোন ন্যায়সঙ্গত আইন প্রণয়নের জন্য এ নিশ্চয়তা অর্জন করা জরুরী।[১১২]

---

১০৯. ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যৌথ বক্তব্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করা যেতে পারে। যদিও আর্থিক ক্ষেত্র কি তা নির্ধারনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে অল্প মতভেদ আছে। সমস্ত হানাফী ফকীহ এবং উসমান বাত্তী রাযী আল্লাহু আনহু শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি এবং কিসাস ছাড়া আর সব ব্যাপারে নারী ও পুরুষের যৌথ ও সম্মিলিত বক্তব্যকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে মেনে নেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) এই মত পোষণ করতে বলে একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়। অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় তার কাছে কিসাসের ক্ষেত্রেও যৌথ সাক্ষ্য জায়েজ। (জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯-১৮০)।

১১০. **বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,** তৃতীয় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮৯; মুহাম্মাদ আল গাযালী, **মিয়াতু সুফল আনিল ইসলাম,** ২য় খণ্ড, পৃ ২৬১-২৬৩।

১১১. ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণের মূল নীতিমালা যিনি প্রণয়ন করেছেন, তিনিই তো নারী পুরুষ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত। তিনি বলেন পরম করুণাময় আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন– যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী সম্যক অবগত। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ মূলক, আয়াত ঃ ১৪; মূল মুহাম্মাদ সায়্যিদ আস সাফতী ভাষান্তর মাহমুদুল হাসান ইউসুফ, **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫।

১১২. ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নারী ও পর্দা

ইসলামে আনুগত্যের ভিত্তি পরিপূর্ণরূপে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও রাসূলের উপর ঈমান রাখে, শরীয়তের আদেশ, নিষেধ তারই জন্য। যে কোন ব্যক্তির আদেশ মানার জন্য এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন, এমনিভাবে একজন নারী যখন জানতে পারে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সমাজের মধ্যে তার কি স্থান রেখেছেন, তখন তার ঈমানের দাবিই এই হয় যে, সে নারী যেন সন্তুষ্টচিত্তে ও আগ্রহ সহাকারে সেই স্থান মেনে নেয় এবং নিজের সীমা লংঘন না করে। কেননা ইসলামের সঠিক ও পরিপূর্ণ আনুগত্য নির্ভর করে ঈমানের উপরে।[১]

ইসলাম নারীকে তার সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ না করার এবং নিজেকে পর্দায়[২] আবৃত রাখার নির্দেশ দিয়েছে ইসলামী নৈতিক শিক্ষার মূল উপাদান হচ্ছে লজ্জা বা হায়া। ইসলাম লজ্জার এই প্রচ্ছন্ন উপাদানকে মানব প্রকৃতি হতে বের করে জ্ঞান, বোধশক্তি ও চেতনা দ্বারা প্রতিপালিত করে এবং একটি সুদৃঢ় নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করে, তাকে মানুষের মনের মধ্যে এক প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। কেননা রাসূল (স) বলেন – فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الإِيْمَانِ ـ

নিশ্চয়ই সত্য লজ্জা শরম ঈমানেরই অঙ্গ।[৩]

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম** (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২৫, শিরিশ দাস লেন, ঢাকা, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, মহাররম– ১৪২৩, এপ্রিল– ২০০২), পৃ ২০৫।

২. পর্দা মানে আবরণ, অর্থাৎ যা কিছু ঢেকে রাখা হয় কিংবা যার সাহায্যে কোন কিছু দৃষ্টির আড়াল করা হয় তাই পর্দা। মানুষ বস্ত্র পরিধান করে, এটাও মানুষের জন্য এক প্রকার পর্দা। পর্দার উদ্দেশ্য হলো– (১) ময়লা আবর্জনা থেকে রক্ষা করে ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। (২) বাইরের মানুষের কুদৃষ্টি থেকে হেফাজত করা। (৩) রোদ বৃষ্টি থেকে দেহকে রক্ষা করে। (৪) লজ্জা নিবারণ করে। (অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, **পর্দা প্রগতির সোপান,** ঢাকা : প্রথম প্রকাশ, সাওয়াল ১৪১৩ এপ্রিল– ১৯৯৩, পৃ ৬-৭)।

৩. **সহীহ আল বুখারী,** ১ম খণ্ড, আধুনিক প্রকাশনী, কিতাবুল ঈমান, পৃ ৪০, হাদীস নং ২৩। অন্যত্র রাসূল (স) বলেন– لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الإِسْلامِ الْحَيَاءُ ـ প্রতিটি দীনের একটি চরিত্র আছে এবং ইসলামের চরিত্র লজ্জা।

إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ـ

তোমার যদি লজ্জাই না থাকে, তবে যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। কারণ যখন লজ্জাই থাকে না, তখন পশু প্রকৃতির সূচনা প্রবৃত্তি মানুষের উপর জয়ী হয় এবং তখন তাহার নিকটে 'মুনকার' আর 'নকির' থাকে না। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ২০৬)।

Dhaka University Institutional Repository

লজ্জা বা হায়া এমন এক শক্তি যা মানুষকে অশ্লীলতা ও অন্যান্য মুনকার বা গর্হিত কর্ম হতে বিরত রাখে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও সুস্থতা রক্ষার জন্যে দাম্পত্য জীবনের বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য লজ্জা একান্ত অপরিহার্য মহামূল্য সম্পদ। মানুষের কাজে কর্মে, চলায়-বলায়, জীবনের সর্বস্তরে ও সব ব্যাপারেই এ হচ্ছে এক অতি প্রয়োজনীয় গুণ।[৪] এগুণই মানুষ ও পশুর পার্থক্যের ভিত্তি।

তাই সুস্থ ও সুশৃঙ্খল পরিবার ও সমাজ গঠনে নারী পুরুষের শালীনতা ও পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এটাই হল নারীর মর্যাদার ভিত্তি। পর্দা ও শালীনতার মাধ্যমেই পরিবারের স্থায়িত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা পায়। এটি যথাযথভাবে রক্ষিত না হলে একদিকে পরিবারের পবিত্রতা ও শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং অপরদিকে আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠন সম্ভব হয়ে উঠে না।[৫]

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যত প্রকার জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সবই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিপরীত আকর্ষণ স্বভাবগত করে দিয়েছেন। সৃষ্টি সেরা জীব মানুষের ক্ষেত্রেও নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তাই প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই তার বিপরীত প্রজাতির প্রতি অর্থাৎ পুরুষের প্রতি নারীর এবং নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ বিদ্যমান। মহান আল্লাহ নারী পুরুষের এ মিলন অবাধ ও লাগামহীন যেন না হয়, সেজন্য নারী পুরুষের মাঝে একটা নিয়ন্ত্রণ রেখা টেনে দিয়েছেন। তাহল পর্দা এবং বিয়ে বন্ধন। আভ্যন্তরীণ তাকিদে মানুষ যেন অবৈধ ও লাগামহীন যৌনাচারে জড়িয়ে না পড়ে সেই লক্ষ্যেই আল্লাহ নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্র, পোশাক ও জীবন পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৬]

ইসলাম নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দা ফরজ বা অবশ্যকরণীয় কাজ বলে নির্ধারণ করে দিয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন পর্দা সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন এবং কুর'আন পাকের যে সকল আয়াতে পর্দার আদেশ করা হয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হল।[৭]

---

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, **পরিবার ও পারিবারিক জীবন**, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫।

৫. আবদুল খালেক, **নারী**, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬।

৬. মুহাম্মদ আবদুল মান্নাম, **ইসলামের দৃষ্টিতে নিকাব**, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশ জুলাই–১৯৯৭), পৃ ৬।

৭. মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা পর্দা সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর মধ্যে কিছু নির্দেশ নবী করীম (সা) এর স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে এবং কিছু নির্দেশ আছে সাধারণ মু'মিন নারী ও পুরুষদের সম্বোধন করে। এখানে দুটো দিক অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য– (ক) আল্লাহ তায়ালা নবীর (সা) ঘর থেকেই সংশোধন কার্যক্রম শুরু করেছেন। (খ) যেহেতু নবীর স্ত্রীগণ সমস্ত মুমিন নারীদের আদর্শ তাই তাঁদের সম্বোধন করে যা বলা হয়েছে তা সমস্ত নারীকুলের ওপরই প্রযোজ্য এবং পুরুষকেও তা মেনে চলতে হবে। (অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, **পর্দা প্রগতির সোপান**, প্রাগুক্ত, পৃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ - ذَالِكَ اَزْكَى لَهُمْ - اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ - وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ - وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ -

(হে নবী) মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন এবং মু'মিন নারীগণকে বলে দিন, তারা তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে এবং স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, শুধু ঐ সৌন্দর্য ব্যতীত যা স্বভাবতই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এবং যেন তারা স্বীয় বক্ষের উপরে উড়িবার চাদর টানিয়া দেয় এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে [অন্য কারও নিকটে]। এই সকল লোক ব্যতীত, যথা ঃ স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, তৎপুত্র, ভ্রাতুস্পুত্র, ভাগ্নি, আপন স্ত্রী লোকগণ, স্বীয় দাস, নারীর প্রতি স্পৃহাহীন সেবক এবং ঐ সকল বালক যাহারা নারীর গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয় নাই। উপরন্তু তাদেরকে আদেশ করুন যে তারা যেন পথ চলবার সময় এমন পদধ্বনি না করে, যাতে তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য পদধ্বনিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।[৮]

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا - وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلَى -

হে নবীর স্ত্রীগণ তোমরা তো সাধারণ নারীদের মত নও। যদি পরহেযগারী অবলম্বন করার ইচ্ছা থাকে তাহলে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলিও না। কারণ ইহার ফলে যাদের অন্তরে খারাপ বাসনা আছে তারা তোমাদের উপরে এক ধরনের আশা পোষন করে বসবে। সহজ সরলভাবে কথা বলিও। আপন ঘরে থাকিও এবং অতীত জাহিলিয়াতের ন্যায় রূপ সৌন্দযের প্রদর্শনী করে বেড়িও না।[৯]

---

৮. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নূর, আয়াত ঃ ৩০-৩১। কুর'আনের এই আয়াতেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পর্দার মৌলিক নীতিমালাগুলো ঘোষণা না করেছেন– (ক) দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা। (খ) যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলা অর্থাৎ সতর ঢাকা পোশাক পরা এবং গায়ের মুহাররম পুরুষ থেকে নিজেকে হেফাজত করা। (গ) সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা। (ঘ) সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য জায়েজ এমন লোকদের নাম ঘোষণা যাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায়– মুহাররম পুরুষ বলা হয়। যাদের সাথে বিয়ে হারাম। (ঙ) নারীরা পথ চলার সময় বিনীতভাবে পদক্ষেপ ফেলবে যা অন্যকে জানান না দেয়, আকর্ষিত না করে।

৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহযাব, আয়াত ঃ ৩২-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ - ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ -

হে নবী আপন স্ত্রী কন্যা ও ঈমানদার মহিলাদের বলে দাও। তারা যেন নিজেদের ওপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয় এটা খুবই উত্তম নিয়ম যাতে তাদের চিনতে পারা এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।[১০]

সর্বপ্রথম ঈমানদার নারী পুরুষকে আদেশ করা হয়েছে দৃষ্টি অবনমিত কর। এবং লজ্জা স্থানের হিফাজতের কথা এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এর অর্থ দাঁড়ায় পবিত্রতার জন্য দৃষ্টির পবিত্রতা পূর্বশর্ত।[১১]

পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত সম্পর্কে তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসলূলুল্লাহ (স) বলেন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরাইয়া লয় আমি তার পরিবর্তে তাঁকে সুদৃঢ় ঈমানদার করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।[১২]

সহীহ মুসলিমে হযরত জারীর ইবন আবদুল্লাহ (র) বাজালী (র) হতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেই দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।[১৩]

নবী (স) বলেন যে ব্যক্তি কোন অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিনে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লৌহ ঢেলে দেয়া হবে।[১৪]

---

১০. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহযাব, আয়াত ঃ ৫৯। এই সকল আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, পুরুষকে তাকীদ করা হয়েছে যে, তারা যেন দৃষ্টি অবনমিত করে রাখে এবং যৌন অশ্লীলতা হতে আপন চরিত্রকে হেফাযাত রাখে। কিন্তু নারীদেরকে দৃষ্টি সংযম গুপ্তাংগের হেফাজত ও নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অন্য পুরুষের সাথে কথা বলার সময় সহজভাবে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৩২)।

১১. এটা তো সম্ভব নয় যে, কোন পুরুষ কোন নারীকে এবং কোন নারী কোন পুরুষকে কখনও দেখবে না। এই জন্য শরীয়াতের ব্যবস্থা দানকারীর নির্দেশ এই যে, হঠাৎ কারও উপর দৃষ্টি পড়লে এবং তার সৌন্দর্যের প্রতি কিছু আকর্ষণ অনুভূত হলে দ্বিতীয়বার তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেন "হে আলী প্রথমবার তাকানোর পর দ্বিতীয়বার আর তাকাবে না। কারণ প্রথম দৃষ্টিপাত তোমার। কিন্তু দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করার কোন অধিকার তোমার নেই।" (**আবু দাউদ,** কিতাবুল নিকাহ, অনুচ্ছেদ, মা ইউমারা বিহি মিল গাদদিল বাসার; **তিরমিযী,** আওয়াবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ মা জায়া ফী নাযবিল ফাযাআ, **আবু দাউদ শরীফ**)।

১২. **মারেফুল কুর'আন,** সূরা ঃ নূর, পৃ ৯৩৭; **বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন**, তৃতীয় ভাগ, ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪২।

১৩. **মারেফুল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নূর, পৃ ৯৪২।

১৪. **ফাতহুল কাদীর;** সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৪। তবে এমন অনেক অবস্থায় সম্মুখীন হতে হয়, যখন অপরিচিত নারীকে দেখা এমনকি স্পর্শ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন– কোন নারী কোন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন আছে। কিংবা নারী কোন মোকাদ্দমায় বিচারকের সম্মুখে সাক্ষী

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল ফকীহ বলেন, নারীও কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। তাদের দলিল হযরত উম্মে সালামা ও হযরত মায়মুনা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ (স) এর উপস্থিতিতে অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ (স) উম্মে সালামা ও মায়মুনা (রা) কে পর্দা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৫]

যারা নারীর পুরুষদের প্রতি দৃষ্টিপাত বৈধ বলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আয়েশা (রা) কে হাবশী যুবকদের ঈদের দিনে সামরিক কুজ কাওয়াজ দেখাবার হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।[১৬]

পুরুষদের চোখে নারীকে দেখা এবং নারীর চোখে পুরুষকে দেখার মধ্যে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে সামান্য পার্থক্য আছে।[১৭] শরীয়ত মুহররম মেয়েদের সাথে মেলামেশার সুযোগ দেয় এজন্য

অথবা বাদী-বিবাদী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। কোন নারী অগ্নিতে দগ্ধীভূত হচ্ছে পানিতে ডুবে যাচ্ছে, কোন নারীর সতিত্ব সম্ভ্রম নষ্ট হচ্ছে, কোন নারী দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে, এরকম অবস্থায় ঐ নারীকে উদ্ধার করা স্পর্শ করা, প্রয়োজনে কোলে করে তুলে আনাও ফরজ। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৪)।

১৫. যে অন্ধ সাহাবী হযরত ইবন উম্মে মাকতুম হতে পর্দা করার জন্য নবী (স) উম্মে সালমাকে আদেশ করেছিলেন সেই সাহাবীর গৃহেই আবার ফাতেমা বিনতে কায়েস (র) কে ইদ্দত পালন করবার জন্য নবী (স) আদেশ করেছিলেন। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী তার আহকামুল কুর'আনে ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন যে, ফাতিমা বিনতে কায়েস উম্মে শরীকের গৃহে ইদ্দত পালন করতে চেয়েছিলেন, নবী (স) বললেন ঃ এই বাড়িতে লোক যাতায়াত করে। তুমি ইবন উম্মে মাকতুমের বাড়িতে থাক। কারণ সে একজন অন্ধ এবং সেখানে তুমি বেপর্দাও থাকতে পার। (**বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,** ইফাবা, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪২; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৭)।

১৬. এই বর্ণনাটি বুখারী, মুসিলম, নাসায়ী মুসনাদে আহমদ প্রভৃতিতে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই ঘটনা সম্ভবত ঐ সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন হযরত আয়েশা (রা) নাবালিকা ছিলেন। এবং যখন পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হয় নি। কিন্তু ইবন হুব্বানে বিস্তারিত আলোচনায় বলা হয়েছে যে, ইহা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন আবিসিনিয়া হতে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এসেছিল। ইতিহাস হতে প্রমাণিত আছে যে, উক্ত প্রতিনিধি দল ৭ম হিজরীতে মদীনায় এসেছিল, এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে হযরত আয়েশা (রা) এর বয়স তখন পনর, ষোল বছর ছিল। উপরন্তু বুখারীর বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, নবী (স) হযরত আয়েশা (রা) কে চাদর দ্বারা ঢেকে রেখেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পর্দার নির্দেশাবলিও তখন অবতীর্ণ হয়েছিল। (**সুনানে আবু দাউদ**, পোশাক অধ্যায়, ৪র্থ খন্ড, পৃ ৩৬১; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৭)।

১৭. পুরুষের প্রকৃতিতে অগ্রবর্তী হয়ে কাজ করার প্রবণতা আছে, সে কোন কিছু মনপুত হওয়ার পর তা অর্জন করার জন্য চেষ্টানুবর্তী হয় কিন্তু নারী প্রকৃতিতে আছে বাধা প্রদান প্রবণতা ও পলায়ন পরতা। দুঃসাহসী হতে পারে না যে, কেহ তার মনপুত হবার পর তার দিকে ধাবিত হবে। শরী'আত প্রণেতা এ কারণে নারীর জন্য পুরুষকে দেখার ব্যাপারে ততখানি কঠোরতা ঘোষণা করেন নি, যতখানি করেছেন পুরুষের নারী দেখার ব্যাপারে। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৭)।

Dhaka University Institutional Repository

যে, তাদের সাথে থাকে স্নেহ ও ভালবাসার অনাবিল সম্পর্ক। সেখানে সর্বদা এই আবেগ অনুভূতিই তরঙ্গায়িত হতে থাকে।[১৮]

সুতরাং অনিয়ন্ত্রিত ও অকারণ দৃষ্টি অনাচারের কারণ হয়ে থাকে। তাই বিনা কারণে দেখা এবং এমন দেখা, যার ফলে অনাচার, অমঙ্গল সংঘটিত হতে পারে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি দেখার কোন প্রকৃত আবশ্যকতা এবং তার দ্বারা যদি কোন তামাদ্দুনিক মঙ্গল হয়, তা হলে তা ন্যায়সঙ্গত হবে।

দৃষ্টি সংযমের আদেশাবলি নারী পুরুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আবার কতক আদেশ নারীদের জন্য নির্দিষ্ট। তার মধ্যে প্রথম আদেশ এই যে, একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন বা প্রকাশ করত সামাজিক নির্দেশাবলির ব্যাপারে ইসলামের নিষেধ করা হয়েছে। প্রথম কাজ এই যে, সে নগ্নতার মূলোচ্ছেদ করেছে এবং নারী পুরুষের সতরের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন–

يَا بَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا -

হে আদম সন্তান তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি। এবং ইহা তোমাদের জন্য শোভাবর্ধক।[১৯]

দেহের যে অংশ আবৃত করা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) ইসলামের পরিভাষায় তাকে সতর বলে। পুরুষের জন্য নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশকে সতর বলা হয়েছে[২০] এবং নারীদের জন্য সতরের সীমারেখা অধিকতর প্রশস্ত করা হয়েছে। নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, নিজেদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত ছাড়া সমস্ত শরীরকে ঢেকে রাখতে। তাই মুখ ও দুই হাত ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরজ। (অবশ্য কর্তব্য)[২১] সতর ঢাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা

---

১৮. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, **ইসলামী সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৭।

১৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আল 'আরাফ, আয়াত ঃ ২৬।

২০. নাভী থেকে হাঁটু মধ্যবর্তী অংশ পুরুষের সতর। কেবল স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউ এই অংশ দেখতে পারবে না। আবু আইয়ুব আনসারী হতে বর্ণিত আছে নবী (স) বলেন– "হাঁটুর উপরে ও নাভীর নিচে যা আছে তা আবৃত রাখার অংশ। (**দারুকুতনী**) পুরুষের জন্য নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকার অংশ (মাবসূত) তোমাদের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যান্যের নিকট হতে তোমাদের সতর রক্ষা কর। (**আহকামুল কুর'আন**)

২১. মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জী পর্যন্ত ব্যতীত সমস্ত শরীরই নারীর সতর। স্বামী ব্যতীত সকল পুরুষের নিকটই এই সতর খোলা রাখা নিষিদ্ধ। নবী (স) বলেছেন, যে নারী আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তার জন্য এর বেশি খুলে রাখা জায়েজ নহে। এই বলে তিনি তাঁর হাতের কব্জীর মধ্যস্থলে হাত রাখলেন। (**ইবনে জারীর**) রাসূল (স) বলেন– যখন কোন বালিকা সাবালিকা হয় তখন তার শরীরের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়। শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জী পর্যন্ত হাতদ্বয় দেখা যেতে পারে। (**আবু দাউদ**) নবী করীম (স) এর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) একবার মিহি কাপড় পরিধান করে নবী (স) এর সম্মুখে আসলেন। যে কাপড়ের ভিতরে দিয়ে তাঁর শরীরের অংগ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়াইয়া লইয়া নবী (স) বললেন–হে আসমা সাবালিকা হওয়ার পর ইহা ও উহা ব্যতীত শরীরের কোন অংশ অপরকে দেখান কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে জায়েজ হইবে না।" একথা বলে নবী (স) তাঁর মুখমণ্ডল ও হাতের

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সময় থেকে প্রযোজ্য হয় যখন কোন বালিকা সাবালিকা হয় এবং যতদিন পর্যন্ত তার মধ্যে যৌন আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে ততদিন পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ থাকে। এই বয়স অতিক্রান্ত হলে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْس عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَــهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ـ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ

অর্থাৎ যে সকল অতি বৃদ্ধা স্ত্রী লোকে পুনরায় কোন বিয়ের আশা পোষণ করে না তারা যদি দোপাট্টা খুলে রাখে তাহলে তাতে কোন দোষ হবে না। তবে শর্ত এই যে, বেশভূষা প্রদর্শন করা যেন তাহাদের উদ্দেশ্য না হয়। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা তাদের জন্য মঙ্গলকর।[২২]

এই সত্যকে সম্মুখে রাখার পর সৌন্দর্য প্রকাশের সীমারেখা উল্লেখ করা দরকার।

(১) নারীকে তার সৌন্দর্য স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, সৎপুত্র, ভ্রাতা, ভাইপো ও ভাগ্নির সম্মুখে প্রকাশ করবার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(২) তাকে আপন গোলামের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।[২৩]

(৩) সে এমন লোকের সম্মুখেও সৌন্দর্য শোভা সহকারে আসতে পারে যে তার অনুগত ও অধীন এবং নারীদের প্রতি যার কোন আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা নেই।[২৪]

কব্জির দিকে ইংগিত করলেন। (**ফাতহুল কাদীর**) হাফসা বিনতে আবদুর রহমান একবার সূক্ষ্ম দেপাট্টা পরে হযরত আয়েশা (রা) এর ঘরে হাযির হলেন। আয়েশা (রা) তা ছিড়ে ফেলে একটা মোটা চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। (**ইমাম মালিক মুয়াত্তা**) নবী (স) বলেন– "আল্লাহর অভিশাপ ঐ সকল নারীদের উপর যারা কাপড় পরেও উলংগ থাকে। রাসূল (সঃ) বলেন– যেসব নারী যারা পোশাক পরেও ন্যাংটা, যারা নিজেদের কুকর্মকে অন্য লোকের কাছে জানান দিয়ে চলে যারা বুক স্কন্ধ বাঁকা করে একদিকে ঝুঁকিয়ে চলে, যাদের মাথা ষাঁড়ের চুটের মত ডান বামে ঢুলে ঢুলে পড়ে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং বেহেশতের সুগন্ধিও লাভ করতে পারবে না। যদিও তার সুগন্ধি বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে। (**মুসলিম শরীফ**)

২২. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আন নূর, আয়াত ঃ ৬০। কেবল ঐ সকল বৃদ্ধাদের জন্য এই নিয়ম শিথিল করা হয়েছে যারা বার্ধক্যে উপনীত হবার কারণে পোশাক সংক্রান্ত বাধা নিষেদ হতে মুক্ত হয়েছে এবং যাদের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি ব্যতীত কোন কুদৃষ্টি পতিত হবার আশংকা নেই। এই ধরনের স্ত্রীলোক দোপাট্টা অথবা চাদর ব্যতীত গৃহে অবস্থান করতে পারে।

২৩. নিজের গোলাম ছাড়া অন্য কারও গোলামের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয় নাই। সাবালিকা হওয়ার পর তাই প্রত্যেকে নারীর গৃহ অভ্যন্তরেও গায়রি মুহাররম থেকে পর্দা করতে হবে।

২৪. এই নির্দেশের তফসীর করতে গিয়ে হাফেয ইবন কাসীর বলেন–

اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ـ

এর দ্বারা ঐ সকল মজুর, চাকর ও অনুগত লোক বুঝায় যারা চালাক চতুর নয়, অত্যন্ত সরলচিত্ত এবং নারীদের প্রতি যাদের কোন যৌন বাসনা নেই। দুইটি অবস্থায় যৌন বাসনা না থাকতে পারে। প্রথম– তাদের মধ্যে মোটেই কোন যৌন বাসনা নেই। যথা ঃ বৃদ্ধ, অবোধ, অবা জন্মগত নপুংসক। দ্বিতীয়তঃ পুরুষোচিত শক্তি এবং নারীর প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহাকাঙ্খা আছে বটে। কিন্তু যে বাড়ির অধীনে সে একজন

Dhaka University Institutional Repository

(৪) যে সকল বালকের মধ্যে এখনও যৌন অনুভূতির সঞ্চার হয় নাই, তাদের সম্মুখেও সে সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারে।[২৫]

(৫) সকল সময় মেলামেশা করা হয় এরকম মেয়েদের সামনে মেয়েদের সৌন্দর্য শোভা প্রদর্শন করা জায়েজ আছে।[২৬]

কুর'আনে সে অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে একটি ব্যতিক্রমও আছে। যথা مَا ظَهَرَ مِنْهَا (মা জাহারা মিনহা) সাধারণভাবে যতটুকু প্রকাশিত হয় অথবা যে সৌন্দর্য বা বেশভূষা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাতে কোন দোষ নেই। অথবা যা স্বভাবতই স্বাভাবিক প্রকাশমান তাছাড়া একজন মুসমি নারীর সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাকে (যিনাহ) অহেতুক অন্যকে প্রদর্শন করা উচিত নয়।[২৭]

অনুগত চাকর অথবা যে বাড়ি থেকে সে সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করতে চায়, সে বাড়ির নারীদের প্রতি সে কোন যৌন বাসনা পোষণ করতে পারে না। তথাপি বাড়ির মালিককে এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৪০)।

২৫. মহান আল্লাহ বলেন–

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ - النور: ٣١

এমন বালাক বা নারীদের গোপন কথা সম্পর্কে পরিজ্ঞান হয় নাই।

২৬. কুর'আন পাকে সাধারণ নারীগণ শব্দের পরিবর্তে আপন নারীগণ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ অথবা আপন মহিলা আত্মীয়স্বজন অথবা আপন শ্রেণীর মহিলাগণকেই বুঝানো হয়েছে। **(তাফসীরে ইবনে জারীর)**

২৭. জামাল আল বাদাবী, **মুসলিম নারী পুরুষের পোশাক** (ঢাকা ঃ প্রথম প্রকাশ, ১৪১৮ হিজরী, ১৯৯৭ খ্রিঃ), পৃ ১০; শরী'আত প্রণেতা এই কথা বলেন যে, স্বেচ্ছায় অপরের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ করিও না। কিন্তু যে বেশভূষা আপনা-আপানি প্রকাশ হয়ে পড়ে অথবা প্রকাশ হতে বাধ্য তার জন্য কেহ দায়ী হবে না অর্থাৎ আমাদের নিয়্যত যেন সৌন্দর্য ও বেশভূষা প্রকাশের না হয়। দেহের গঠন ও উচ্চতা, শারীরিক সৌন্দর্য ও আকার আকৃতি তো বুঝা যাবে; এবং কাজ কর্মের জন্য আবশ্যক মত হাত ও মুখমণ্ডলের কিছুটা তো উন্মুক্ত করতে হবে। এতে কোন দোষ নেই। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫)। ইবনে মাসউদ। ইব্রাহীম নখয়ী ও হাসান বসরীর মতে, প্রকাশ্য সৌন্দর্যের অর্থ ঐ সকল বস্ত্র, সেইগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ঢেকে রাখা যায়। যথা ঃ বোরকা, চাদর ইত্যাদি। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আতা ইবন ওমর , আনাস, জাহহাক, সাঈদ বিন জুবাইর, আওযায়ী ও হানাফী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে এর অর্থ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় এবং এতে ব্যবহৃত সৌন্দর্য উপাদান সমূহ। যথা ঃ হাতের মেহেদী, আংটি, চোখের সুরমা প্রভৃতি। সাঈদ বিন আল মুসায়্যেবের মতে ব্যতিক্রম শুধু মুখমণ্ডল এবং অন্য এক বর্ণনামতে হাসান বসরীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) মুখমন্ডল ঢেকে রাখার পক্ষপাতি। তাঁর মতে প্রকাশ্য সৌন্দর্যের অর্থ হস্তদ্বয়, হাতের চুড়ি, আংটি, কংকন ইত্যাদি। মিসওয়ার বিন শাখরাম ও কাতাদাহ অলংকারদিসহ হাত খুলবার অনুমতি দেন এবং তার উক্তিতে মনে হয় যে, তিনি সমগ্র মুখমন্ডলের পরিবর্তে শুধু চক্ষুদ্বয় খুলে রাখার জায়েজ মনে করেন। (ইবনে জারীর ও আহকামুল কুরআন) এই সকল তাফসীরকার إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর অর্থ এটাই বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি দেন, যা বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। অথবা যা প্রকাশ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যে মু'মিন নারী আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশাবলির অনুগত থাকতে চায় এবং অনাচার ও অসৎ কর্মে লিপ্ত হওয়া যার ইচ্ছা নহে সে স্বয়ং নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় উন্মুক্ত করবে কি করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারীকে তার সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ না করা এবং দু'হাতের তালু ও মুখমণ্ডল ব্যতীত দেহের সমস্ত অংগপ্রত্যঙ্গ পর্দায় আবৃত রাখার নির্দেশ দেয়। তবে মুখমণ্ডল খোলা সম্পর্কে ফিকাহ বিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[২৮]

আর স্বতই প্রকাশিত অঙ্গগুলো ছাড়া চুল বুক, ঘাড় আবৃত করতে হবে। এক্ষেত্রে কুর'আনের আলোকে পোশাক সম্পর্কে কিছু নীতিমালার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। যথা–

(১) যে পোশাক দিয়ে আবৃত বা পর্দা করা হবে সেই পোশাক এতটা ঢিলে ঢালা হবে যেন তাতে মহিলাদের শরীরের আকৃতি প্রকাশিত না হয়।[২৯]

---

২৮. যারা মুখমণ্ডল খোলা রাখাকে বৈধ করেন তাদের যুক্তি হল – (১) সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতের এ অংশ– "–তারা (মুসলিম নারীরা) যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে আপনা আপনি যে সৌন্দর্য বেরিয়ে পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র"। এই আলেমগণ মনে করেন, মুখমণ্ডল আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ে। কাজেই এটা ঢেকে রাখা জরুরি নয়। (২) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস– একবার হযরত আবু বকরের (রা) কন্যা আসমা পাতলা কাপড় পরে রাসূল (স) এর ঘরে প্রবেশ করেন। তাকে দেখে রাসূল (স) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, আসমা, মেয়েরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তখন তার শরীরের কোন অংশ দেখা যায় এমনভাবে চলাফেরা ও পোশাক পরা বৈধ নয়। তবে এই অংগের কথা ভিন্ন।" এই বলে তিনি হাত ও মুখ দেখলেন। (**আবু দাউদ**) (৩) নামায ও ইহরাম অবস্থায় মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ; হওয়া থেকে বুঝা যায় এটা নারীর গোপন অংগ নয় এবং তা ঢেকে রাখা জরুরি নয়। এজন্য চার মাযহাবের আলিম ও পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত যে, মহিলাদের চেহারা ও হাতের পাতা ছাড়া পূর্ণ শরীর আবৃত রাখা অবশ্যকর্তব্য। উক্ত দুটি প্রত্যঙ্গ নিষিদ্ধ বা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কোন মহিলা লজ্জা ও শিষ্টাচাররের জন্য সেগুলো আবৃত রাখে তাহলে দোষের কিছু নেই বরং উত্তম। যদি মুখ ঢাকা ফরজ হত তাহলে হজ্জ্ব ও উমরায় সময় ঢেকে রাখার আদেশ হত। (মুহাম্মাদ সায়্যিদ আস সাফতী, **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬; জামাল বাদাবী, **মুসলিম নারী পুরুষের পোশাক,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১; আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, **রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা,** ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত; তিনি অসংখ্য হাদীসের ঘটনা উল্লেখ করে প্রমাণ করে মুখমণ্ডল দেখানো জায়েজ। মুঃ নসির উদ্দীন আল আল বানীর হিজবুল মারাত ইল মুসলিমাহ। পক্ষান্তরে যারা মুখমন্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব মনে করেন তাদের যুক্তি হল– (ক) সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতের "তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে" এ অংশটি মুসলিম নারীর সৌন্দর্য প্রকাশকে হারাম করে দিয়েছে। সুতরাং কোন মুসলিম নারী কিছুতেই তার শরীরের কোন সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে না। মুখমণ্ডল অনাবৃত করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা শরীরের প্রকৃত সৌন্দর্য তো তার মুখমন্ডল। আয়াতের অপর অংশে "তবে যা স্বতই প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র।" এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানে একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে বেরিয়ে পড়া সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। (খ) তাদের ২য় যুক্তি সূরা আল আহযাবের ৫৭ নং আয়াত ঃ হে নবী, তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমীন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিকতর ভাল নিয়ম। যাতে তাদেরকে চিনতে পারা যায় এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়।" এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা মুসলিম মহিলাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, কোন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে তারা যেন মাথার ওপর থেকে চাদরের আঁচল ঝুঁলিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে নেয়। তবে একটি চোখ খোলা রাখা যাবে। (**তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী তাফসীরে জালালাইন, আহকামুল কুর'আন আবু বকর জাসসাস, তাফসীরে কবীর, ইমাম রাযী, তাফসীরে বায়যাবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, গারায়িবুল কুরআন। আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী তাফসীরে কাশশাফ ঃ আল্লামা যামাখশারী**)।

Dhaka University Institutional Repository

(২) পোশাক ততটা পুরু হবে যেন তা আবৃত করে তাতে তার চামড়ার রং প্রকাশ না করে অথবা শরীরের সে আকৃতি যেন তুলে না ধরে যা লুকিয়ে রাখা প্রয়োজন। এটা স্পষ্ট যে, যদি পোশাক এত পাতলা হয় যা চামড়ার রং বা শরীরের আকৃতি বা সৌন্দর্য তুলে ধরে তবে উক্ত উদ্দেশ্য সফল হবে না।[৩০]

(৩) পোশাক এমন আকর্ষণীয় হবে না যার ফলে নারীর সৌন্দর্যে পুরুষ প্রলুব্ধ হয়। কুর'আন পরিষ্কারভাবে (জিনাহ্) সৌন্দর্য গোপন করার উদ্দেশ্য মহিলাদের পোশাকের প্রয়োজনীয় দিকগুলোর বিধান দিয়েছে। তাই এমন পোশাক দিয়ে পর্দা করা যুক্তিসংগত নয় যা পুরুষদের আকৃষ্ট করে।[৩১] উল্লিখিত তিনটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় উপাদান ছাড়াও আরো কিছু প্রয়োজনীয় দিক আছে যার প্রয়োজন সময় ও স্থানভেদে আপেক্ষিক। এগুলো হচ্ছে ঃ (ক) পুরুষের পোশাক

---

২৯. পর্দা করার পোশাকটি ঢিলে ঢালা হওয়া জিনাহ অপ্রকাশিত রাখার একটি মৌলিক দিক। হযরত মুহাম্মদ (স) একবার উপহার হিসেবে এক টুকরা মিহি কাপড় পেলেন। তিনি এটা ওসামাহ বিন জায়েদকে দিলেন। ওসামাহ দিলেন তা স্ত্রীকে। নবী (স) ওসামাহকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কেন উহা পরিধান করেননি। উত্তরে ওসামাহ বললেন যে, সেটা তিনি তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছেন। রাসূল (স) ওসামাহকে বললেন– তোমরা স্ত্রীকে ঐ পোশাকের নিচে একটি গোলালাহ পরিধান করতে বল। কারণ আমি আশংকা করছি ঐ পোশাক তার শরীরের হাড়গুলোর আকৃতি প্রকাশ করতে পারে। আরবীতে গোলালাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে এক ধরনের মোটা কাপড়। এটা পোশাকের নিচে পরা হয় যেন উহা শরীরের আকৃতি অপ্রকাশিত রাখে। এই হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ এবং আল বায়হাকীতেও স্থান পেয়েছে এবং আবু দাউদ শরীফের মত অন্যান্য হাদীস সূত্র দ্বারাও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। (জামাল বাদাবী, **মুসলিম নারী পুরুষের পোশাক,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২-১৩)।

৩০. রাসূল (স) পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন "যারা বস্ত্র পরিহিত কিন্তু উলঙ্গ। যারা গর্বের সাথে পদ সঞ্চালিত করে অথবা যারা হাঁটার সময় ঝংকার তুলে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। তাদের মাথাগুলো যেন ধাবমান লম্বা গলাবিশিষ্ট উঠের কুঁজের মত। (**সহীহ মুসলিম,** পোশাক ও সজ্জা অধ্যায় (بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلَاتِ الْمُمِيلَاتِ) ৩/হাদীস নং– ১৬৮০; **মুসনাদ আহমদ,** ২/৩৫৬ উভয় বর্ণনা আবু হুরায়রা (রা) হতে। অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সেই উলঙ্গ মহিলারা জান্নাতে কখনো যেতে পারবে না এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণ পেতেও অক্ষম থাকবে। **সহীহুল বুখারী,** ই'তিসাম অধ্যায় (بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ) ৩/১৩০০; **সহীহ মুসলিম.** ইলম অধ্যায় (بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَنَ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى) ৪/হাদীস নং- ২০৫৪; উভয় বর্ণনা আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।

৩১. এজন্যই পবিত্র কুর'আনে মুসলিম নারীদের জন্য আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে,–

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى -

অর্থ ঃ জাহিলিয়াতের যুগে যে ধরনের সাজসজ্জা ঠাক-ঠমক করে বেড়াতে এখন তা করিও না। (**আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহযাব, আয়াত ঃ ৩৩)। পুরুষের দৃষ্টি গোচর হয় এমন রঙচঙা চোখ ধাধানো পোশাক না পরিধান করা। দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য উঁচু হয়ে চলা। হাঁটার ধরণ এমন করা। এমন আচরণ করা যে সাজ সজ্জার পশ্চাতে কোন অপবিত্র ইচ্ছা নাই তাই ইসলামী সাজসজ্জা। যার মধ্যে তিলমাত্র খারাপ বাসনা আছে তাই জাহিলিয়াতের সাজসজ্জা।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে যা পরিচিত, নারীদের পোশাক সেরূপ হওয়া উচিত নয়।[৩২] (খ) অবিশ্বাসীদের পোশাক হিসেবে যা পরিচিত বিশ্বাসীদের পোশাক সেরূপ হওয়া উচিত নয়।[৩৩] (গ) পোশাক খ্যাতি, গর্ব, বা অহঙ্কারের পরিচায়ক হবে না।[৩৪]

ইসলামে যথারীতি পর্দায় আবৃত হয়েও কোন পর পুরুষের সাথে কোথাও নির্জনে অবস্থান করা বা সাক্ষাত করা বৈধ নয়। স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পর পুরুষের সঙ্গে নিভৃতে থাকতে এবং তার শরীর স্পর্শ করা শরীয়ত সম্মত নয়। সে যতই নিকটতম বন্ধু বা আত্মীয় হউক না কেন।[৩৫]

সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠান বা সম্মেলন ইত্যাদিতেও নারীর পক্ষে পর্দায় আবৃত হয়েও পুরুষের সাথে বিনা প্রয়োজনে মেলামেশা করা বৈধ নয়।[৩৬]

---

৩২. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যেসব পুরুষ নারীদের মত পোশাক পরে এবং যেসব পুরুষ নারীদের মত আচরণ করে রাসূল (স) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। (**সহীহ আল বুখারী, আবু দাউদ, আহমদ আদ দারিমী: সহীহ আল বুখারী,** ১৫ খণ্ড, পৃ ১৭৩; **আবু দাউদ,** ৪র্থ খণ্ড পৃ ৩৫৫, হাদীস নং ৩৫৪)।

৩৩. এটা শরীয়তের সাধারণ নীতিমালা থেকে উদ্ভূত। এ নীতিমালা হল এই যে, মুসলমানদের সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকবে এবং অবিশ্বাসীদের থেকে তাদের আচার-আচরণ ও চেহারা আলাদা হবে। (জামাল বাদাবী, **মুসলিম নারীপুরুষের পোশাক,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬)।

৩৪. মর্যদার প্রতীক হিসেবে অতিশয় ঝাঁঝালো পোশাক পরিধান করা অথবা কেউ মাত্রাতিরিক্ত জীর্ণ পোশাক পরে নিজেকে ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করে অন্যের প্রশংসা কুড়ানোর প্রয়াস চালান। উভয় উদ্দেশ্যই ইসলামী মানদণ্ডে সঠিক নয়। রাসূল (স) বলেন– যে ব্যক্তি খ্যাতির পোশাক দুনিয়ায় পরবে আল্লাহ্ হাশরের দিনে তাকে অপমানজনক পোশাক পরিয়ে উঠাবেন এবং পরে তা পুড়িয়ে দিবেন। [মুঃ নাসির উদ্দিন, আল বানীর– হিজাবুল সারাত– **ইন মুসলিমাহ ফিল কিতাব ওয়াহিসুন্নাহ,** ৩য় সংস্করণ, **আল মাকতাবুল ইসলামী,** বৈরুত লেবানন ১৩৪৯ হিজরী (১৯৫৯) এর উপর ভিত্তি করে রচিত এবং আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ ১১০-১১১)।

৩৫. স্ত্রী লোকের স্বামীর ভাই, চাচাত, খালাত, ফুফাত ভাই বা দেবর যাদের সাথে কোন মহিলার বিয়ে জায়েজ। এদের সাথে মেলামেশা ও দেখা সাক্ষাতের ফলে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠার আশংকা থাকে। উকাবা বিন আমের (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) বলেছেন– সাবধান, নিভৃতে নারীদের নিকট যাইও না। জনৈক আনসার বললেন– হে আল্লাহর রাসূল দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? নবী (স) বললেন– সে তো মৃত্যুর ন্যায়। (**বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী; সহীহ আল বুখারী**, ৫ম খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১, হাদীস নং ৪৮৪৯। রাসূল (স) বলেন– স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকটে যাইও না। কারণ শয়তান তোমাদের যে কোন একজনের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হবে। তিরমিযী। সহীহ বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ ১৮২; **সহীহ মুসলিম**, সালাম অধ্যায় স্বামী বা মুহাররমের সাথে দেখতে পাওয়া মহিলার পরিচয় দেয়া অনুচ্ছেদ, ২য় খন্ড, পৃ ৫৪)।

৩৬. **কেবলমাত্র তিনটি ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম** ঃ (১) ইবাদাতের স্থান–জুময়ার নামায ও ওয়াক্তিয়া নামাযের জামায়াতে মহিলাদের জন্য পুরুষদের থেকে পৃথক স্থান নির্দিষ্ট থাকলে হাজির হওয়া যাবে। এবং হজ্জের আনুষ্ঠানিকতায়। (২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঃ প্রয়োজনে এখানেও নারীদের পুরুষদের কাছ থেকে পৃথক ও পর্দা সহ অবস্থান করতে হবে। (৩) জিহাদের ময়দানে– দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কিন্তু এখানেও পৃথক অবস্থান ও পৃথক সমাবেশ জরুরি। (ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, **ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬)।

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক ও সতরের সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়ার পর নারীদের প্রতি যে শেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাহা এই–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُوْلَىٰ -

মর্যাদা সহকারে আপন আপন গৃহে অবস্থান কর। এবং জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় সাজ সজ্জা সহকারে ভ্রমণ করিও না।[৩৭]

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ -

অর্থঃ তারা যেন মাটির উপর এমনভাবে পদক্ষেপ না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।[৩৮]

فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِى قَلْبِه مَرَضٌ -

চাপা গলায় কথা বলিও না নতুবা যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা প্রলুব্ধ হবে।[৩৯] তাই কুর'আনে কোন নারীকে নারী পুরুষের কথোপকথনের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। যাতে করে শয়তানের ফাঁদে কেউ আটকা না পড়ে। সুবাস স্নাত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে পথ চলতে অথবা সভাস্থলে গমন করতে ইসলাম কোন মুসলিম নারীকে অনুমতি দেয় না।[৪০] ইসলামে লজ্জাবোধকে ঈমানের অন্যতম অঙ্গ বলা হয়েছে। তাই ইসলামী লজ্জা এতই অনুভূতিশীল যে, তার নমনীয় প্রকৃতির কাছে এই সূক্ষ্ম অনুভূতি অর্থাৎ সুঘ্রাণ বাতাসে ছড়িয়ে এক দুষ্ট মন থেকে অপর দুষ্ট মনে সংবাদ বাহক হিসাবে কাজ না করে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

---

৩৭. **আল কুর'আন,** সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ৩৩। تَبَرُّجُ শব্দের দুটি অর্থঃ এক– সৌন্দর্য ও সাজ সজ্জার প্রকাশ। দ্বিতীয়– চলার সময় ঠাক-ঠমক দেখান। চলিতে ছলকি পড়িছে কাঁকাল, যেন এইভাবে চলা, কমনীয় ভাব-ভংগিমা সহকারে চলা কুর'আনের আয়াতে উভয় অর্থই বুঝানো হচ্ছে। প্রথম জাহিলিয়াতের যুগে নারীগণ মনোহর সাজসজ্জায় বের হত। যেমনভাবে আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগের নারী সমাজ বাইরে চলাফেরা করে। চলবার ধরন ইচ্ছাকৃত এমন ছিল যে, প্রতিটি পদক্ষেপ মাটির উপর না পড়ে দর্শকের মনের উপর পড়িত। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৮-২৫৯)।

৩৮. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ নূর, আয়াত ঃ ৩১।

৩৯. **আল কুর'আন,** সূরা ঃ আহযাব, আয়াত ঃ ৩২। অপরকে শুনানোর জন্য স্বেচ্ছায় আওয়াজ না করা। প্রয়োজনের তাগিদে অপরের সাথে কথা বলার সময় সোজাসুজি এবং সহজভাবে বলা। কিন্তু মধুর কণ্ঠে আকর্ষিত ভংগীতে কথা বলার চেষ্টা করিও না। কুর'আনে পুরুষকে আকর্ষণ করার প্রলুব্ধ কোমল কণ্ঠকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (মুহাম্মদ সায়্যিদ সায়্যিদ আস সাফতী , **মুসলিম নারী প্রসঙ্গ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৯)।

৪০. নবী (স) বলেন– তোমাদের কেউ যখন মসজিদে যায়, তখন যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। **সহীহ মুসলিম,** নামায অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ ৩১ ও ৩২।] ইবনে মাজাহ নবী (স) বলেন– যে নারী আতর বা সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করত লোকের মধ্যে গমন করে সে একটি ভ্রষ্টা নারী। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, **পর্দা ও ইসলাম,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১২)।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারীকে গৃহের রানী করা হয়েছে। মূলত জীবিকার্জনের দায়িত্ব স্বামীর উপর এবং অর্জিত অর্থের দ্বারা গৃহের ব্যবস্থাপনা করা নারীর কাজ। তাই মু'মিন নারীরা মুহরিম কোন সাথী ছাড়া সফর করতে শরীয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪১]

সুতরাং হিজাব বা পর্দা একজন মু'মিন নারীকে মর্যাদাবান, সম্মানিত করে। হিজাব সমাজ জীবনে একজন নারীকে ব্যক্তিত্ববান সত্তা হিসেবে পরিচিত করে। হিজাব একজন স্বাধীন মুসলিম নারীর প্রতীক। এর মাধ্যমেই মুসলিম মহিলাকে একজন অমুসলিম মহিলার সাথে পার্থক্য করে শ্রদ্ধার আসনে আসীন করে। পরিচয় করিয়ে দেয় মুসলিম জাতি সত্তাকে।

৪১. রূরের রাস্তা হলে কোন মুহররিম পুরুষকে সঙ্গে নিতে হবে। যার সাথে জীবনে কখনও বিয়ে বৈধ নয় তাকে মুহররিম বলে। আর যার সাথে বিয়ে বৈধ তাকে গায়র মুহররিম বলে। (**সহীহ আল বুখারী,** অধ্যায় হজ্জ আনুচ্ছেদ মেয়েদের হজ্জ করা ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৪৪৬, সহীহ বুখারী কায়রো থেকে প্রকাশিত খণ্ড)।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাক ভারত উপমহাদেশের নারীর অবস্থা

(১৮০০-১৯৪৬)

রাঢ়, পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট নিয়ে গড়ে উঠা বাংলাদেশের প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতি ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে, যার প্রচ্ছন্ন পরিচয়, বাঙালি ও বিভিন্ন জাতিসত্তার সমাজ বিন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় সামাজিক, ধর্মীয় এবং নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একটি রেঁনেসা আন্দোলন, বাস্তব প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছিল। নারীদেরকে আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে শিক্ষাহীন, অসহায়, অক্ষম, ও অধিকার বঞ্চিতভাবে এতই দুর্বল করে রাখা হয়েছিল যে, তৎকালীন নারী সমাজ এর ব্যতিক্রম কিছু চিন্তা করার অথবা এ অবস্থা পরিবর্তনের কথা ভাবতেও পারেনি। নিপীড়িত হয়েও মুক্তির স্বাদের সাহস তাদের ছিল না। মধ্যযুগে মুসলমানরা যখন বাংলার শাসন শুরু করেন তখন তারা সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ধর্ম, আচার-আচরণ ও জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এলেন এবং বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে কোনভাবেই নিজেদের ঐতিহ্যকে বিলীন করে দিলেন না। ইসলাম নারীর জন্য যে সকল সামাজিক ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়েছে তা সেই সময়ের তুলনায় অনেক উদার এবং সমগ্র নারী সমাজের জন্য মঙ্গলজনক ছিল। ইসলামে নারী নির্যাতন রোধ করার কথা ঘোষণা করা হয়।[১]

যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে অধিকার প্রদান করেছে, সেটুকু অধিকার কিন্তু তৎকালীন বাংলার মুসলিম শাসকরা বাংলার নারীদের ভোগ করতে দিলেন না। যদিও ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবু দেখা গেল ভারতের মুসলিম শাসকরা মূলত শুধু নারীর পর্দা বা আব্রুর উপরই দৃষ্টি দিলেন। বাংলার নারী সমাজ এমনিতেই অন্তঃপুরবাসিনী ছিল সমাজের চলতি অনুশাসনেই। তবু মুসলিম শাসকরা নতুন নতুন ঘোষণা দিয়ে নারী সমাজের পায়ে বেড়ি বাঁধতে থাকেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১ খ্রিঃ) ও সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫৭৭ খ্রিঃ) নারীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ করলেন। বোরকা এবং ঢাকা গাড়ি ছাড়া মেয়েদের চলাফেরা নিষিদ্ধ হলো। বাড়িতে জেনানা[২] মহল তৈরি করা হল।[৩]

---

১. কন্যা শিশু হত্যা, স্ত্রীর প্রতি নির্দয় আচরণ, সৎ মা'কে বিয়ে করা ইত্যাদি ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ করা হল। নারীর শিক্ষার নির্দেশ দেওয়া হল, স্ত্রীর জন্য খোরপোশ, মোহরানা বাধ্য করা হলো। বহু মুসলিম মেয়ে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হল কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার, তালাকের অধিকার, বিধবা বিয়ের অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলামের দেয়া অধিকার থেকে নারীরা বঞ্চিত থাকল।

২. জেনানা মহল বলতে অন্দর মহলে নারীদের আব্রু ও মর্যাদা সহকারে অবস্থানের আলাদা মহলকে বুঝানো হয়ে থাকে। যা মুসলিম নারীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পরিচায়ক ছিল। সেখানে যে কোন পুরুষের যখন তখন প্রবেশ অধিকার সংরক্ষিত ছিল। এটা নারীদের জন্য অবরোধ নয়। তবে প্রয়োজনে নারীর বাইরে যাওয়ার অধিকার এবং পুরুষের ভিতরে প্রবেশের অধিকার ইসলাম অনুমোদন করে।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা ও হিন্দু ধর্মের নানারকম সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম শাসনামলে বাংলার বহু নারী ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। ধর্মান্তরিত হিন্দু নারীরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস বদলাতে পারেনি। সেজন্য বাঙালি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহ চালু হল, হিন্দুদের যৌতুক প্রথা দ্বারা মুসলিম পরিবারগুলো নিষ্পেষিত হতে থাকলো, মেয়ের পছন্দ করার অধিকার বতিল হল, বিধবারা হিন্দুদের মত বৈধব্য পালন করতে থাকল। কৌলিন্য প্রথার কারণে মুসলিম সমাজে অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হল। শিক্ষাসহ বিভিন্ন অধিকার অভিজাত নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। ইসলামের বিধান অনুসারে পাঠান ও মোগল শাসনামলে বাংলার নারী সমাজের মূল্য কোনভাবেই বৃদ্ধি পায়নি।[৪]

১৭৬৫ খ্রিঃ ইংরেজরা বাংলার দেওয়ানি পায়। এরপর চলে ইংরেজের শাসন। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়ে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, রাজনৈতিক বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন ঘটলেও দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কোন তারতম্য ঘটেনি।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পাশাপাশি তাঁত শিল্প সুতা ও কাপড় তৈরির কাজসহ বিভিন্ন কুটির শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি এ দেশে চালু ছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উনিশ শতকের ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত। এই সময়কালকে সাধারণভাবে নবাবি আমল বলা যায়।[৫] ইরেজ শাসনের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত এ দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা চালু ছিল এবং তা সমাজের সর্বস্তরে রক্ষণশীল ভাবধারা সৃষ্টি করেছিল। এর প্রভাব সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করা যায়।[৬] তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা ঘরের চার দেয়ালে অবরুদ্ধ ছিল। শিক্ষাহীন অনগ্রসর সমাজে নানারকম অবমাননাকর ধ্যান-ধারণা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ইত্যাদি বদ্ধমূল হয়েছিল। নানা প্রথা, বিধি-নিষেধ জারি করে প্রকারান্তরে নারীকে শোষন ও নির্যাতন করা হয় এবং পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয় সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিকভাবে। ভারত বর্ষে হিন্দু যৌথ পরিবার প্রথায় বংশানুক্রমে সম্পত্তির

---

৩. ডুব্র-গালিচান, **উইমেন আন্ডার পলিগেমি,** পৃ ১৯৯ উদ্ধৃতি: ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য,** কলকাতা ঃ ন্যাশনাল পাবলিশার্স। ১৯৮৭, পৃ ১৮: ইসলামী শরীয়াতের বিধানানুযায়ী নারীদের পর্দা করা ফরজ। তাই পর্দার উদ্দেশ্যে বোরকা পরার নির্দেশ ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশ। তাই এ নির্দেশ নারীদের অবরোধের পর্যায়ে পড়ে না।

৪. M. M. Siddiqui, **Women in Islam,** Chapt. III উদ্ধৃতি: ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

৫. গোপাল হালদার, **বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা** (কলিকাতা ঃ এ মুখার্জী অ্যান্ডকোং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫ খ্রিঃ), পৃ ৪।

৬. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন** (ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রিঃ), পৃ ৭। তৎকালীন মুসলিম সমাজের সামাজিক অনুষ্ঠানের রীতি নীতিতে রক্ষণশীলতার প্রমাণ সুস্পষ্ট। একইভাবে সাহিত্য সংস্কৃতি ছিল মার্জিত রুচিবোধ সম্পন্ন এবং নৈতিকাতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

মালিকানা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে বিভক্ত হতে থাকে এবং মেয়েরা ভরণ-পোষণ পেয়ে থাকে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে বাবার পরিবার থেকে মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুসলিম শাসকরা এ দেশে পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত অধিকার, দাম্পত্য সম্পর্ক সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছিলেন। প্রচলিত হিন্দুবিবাহ পদ্ধতি, বিধবাদের প্রতি সামাজিক অনুশাসন, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন এসব থেকে মুসলিম আইন ছিল ভিন্ন এবং এ আইনে নারীর অধিকার সংরক্ষিত ছিল।[৭] একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এবং বুড়ো বয়সেও বালিকা বধূ গ্রহণ সামাজিক প্রথা ছিল। হিন্দু পরিবারগুলোতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে একাধিক নারীকে বিধবা হতে হত। বিধবা হয়েও নিস্তার ছিল না। সতী হিসেবে তাদের স্বামীর চিতায় জীবন্ত আত্মাহুতি দিতে হত।[৮]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজপতি ও পারিবারিক অভিভাবকরা অর্থনৈতিক স্বার্থ ও প্রলোভনে সতীদাহ প্রথা চালু রেখেছিল।[৯] ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার সতীদাহ হয়েছে।[১০]

সে সময়ের সরকারি হিসাবে জানা যায়, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২ হাজার ৩৬৫ জন বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করা হয়েছে। শুধু কলকাতা ও আশপাশের এলাকাগুলোতে এই সতীদাহের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫২৮ জন।[১১]

১৮১৫-২৩ সালের মধ্যে সতীদাহের ফলে ৫ হাজার ১২৮টি বালক-বালিকা পিতৃ মাতৃহীন হয়। বঙ্গদেশে যত সতীদাহ হয় তার সাত অংশের এক অংশই হয়েছে শুধু হুগলীতে। এই হুগলীতেই রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। যিনি স্বয়ং ছিলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।[১২]

---

৭. পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন এবং নারীর অধিকার প্রদান কখনও করা হয়নি বরং পুরুষের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে নারীর ওপর নির্যাতন ও অধিকার হরণ হয়েছে নানাভাবে।

৮. স্বামীর চিতায় স্ত্রীর এই জীবন্ত সহমরণকে সতীদাহ বলা হত। অসহায় বিধবা মেয়েদের সতীদাহের সময় পূর্ণবতী বলা হত। অথচ বেঁচে থাকার সময় কোন মর্যাদা পাওয়া তো দূরের কথা, নানাভাবে তাদের লাঞ্ছিত হতে হত। সতীদাহ প্রথার সঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পারিবারিক সম্মান জড়িত ছিল। বিধবা মেয়েরা পুনরায় বিয়ে করলে বা পরিবার ছেড়ে চলে গেলে পারিবারিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে সতীদাহ প্রথার মত লোমহর্ষক নারী হত্যাকাণ্ড সমাজ স্বীকৃত ছিল। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত,পৃ ৮)।

৯. স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের কাছে সমাজপতিরা এই প্রস্তাব রাখত যে, দুটো পথ তাদের কাছে খোলা-হয় সহমরণে রাজি হবে, নয়তো সম্পত্তির অধিকার পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে, এমনকি তার সন্তানদের সম্পত্তির কোন অধিকার থাকবে না। সন্তানদের যেন সম্পত্তিতে অধিকার থাকে এই আকাঙ্ক্ষায় বিধবারা সহমরণে রাজি হত। কিন্তু অসহায় সন্তানদের ফাঁকি দিয়ে সমাজপতি ও পরিবারের অন্যরা সম্পত্তি হস্তগত করত। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৮)।

১০. ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য,** পৃ ২২; উদ্ধৃতি ঃ **এশিয়াটিক জার্নাল,** ১৮২৭ খ্রিঃ, ভলিয়্যুম ২৩, পৃ ৬৮৯।

১১. নির্মল সেনগুপ্ত, **রাজর্ষি রামমোহন,** সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭২ খ্রিঃ পৃ ৫৩।

১২. **এশিয়াটিক জার্নাল**, ১৮২৭ খ্রিঃ, ভলিয়্যুম ২৩, পৃ ৬৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য রাজপুত মেয়েদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বা কোন রাজপুত রাজার মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রীর সম্মান রাখার জন্য সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। শত্রুপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করে পরাজিত রাজার স্ত্রী ও মেয়েদের অধিকার পেয়ে যেত স্বাভাবিকভাবেই। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য রাজপুত মেয়েরা জহরব্রত পালন করত অর্থাৎ নিজেরাই বিষ খেয়ে মারা যেত।[১৩]

কুলিন মেয়েদের সমস্যা সমাজে প্রকট ছিল। কুলীন পুরুষ বহুসংখ্যক বিয়ে করতেন। কুলীন মেয়েরা শিশু বয়সে বা যে কোন বয়সেই হোক না কেন বিয়ের পর কুলীন স্বামীর ঘর করতে পারত না। স্বামীকে চোখে দেখাই সম্ভব হত না। ১৮৫৩ সালের অবিভক্ত বাংলার সরকারি রিপোর্টে জানা যায় যে, সে সময়ের কলকাতায় ১০ হাজার পতিতা মেয়ে ছিল কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী। সুন্দরী কুলীন মেয়েদের বিষ খাইয়ে মারার বহু ঘটনাও সে যুগে ঘটেছে।[১৪]

বাংলার নবজাগরণের মনীষীদের সাহায্যে নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের আন্দোলনের সূচনা ঘটলেও যত দিন পর্যন্ত নারী সমাজ তার নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, অত্যাচারিত অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য উদ্যোগী হয়নি, ততদিন পর্যন্ত তাদের জাগরণের পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেনি। কিন্তু সমাজের সার্বিক প্রগতির জন্য যাঁরা চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির নতুন দিক নিয়ে চর্চা শুরু করেন তাঁরা রেনেঁসার মানবিক আবেদন থেকে নারী সমাজের সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য এগিয়ে আসেন, প্রতিবাদ জানান এবং নারী নিপীড়ন বন্ধের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন তৈরির পক্ষে আন্দোলন করেন।[১৫]

উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় নারী অধিকার বিষয়ক যে সকল কর্মসূচি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে– (ক) সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ (খ) বিধবা বিবাহ আইন (গ) নারী শিক্ষার প্রসার (ঘ) সাহিত্য ক্ষেত্রে নারী সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। (ঙ) বিভিন্ন নারী কল্যাণ সমিতি গড়ে তোলা।[১৬]

---

১৩. তৎকালীন রাজপুত মেয়েরা সাহসিকতার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করত। এ কারণেই এটা অত্যন্ত সত্য যে অবিভক্ত বাংলায় বা ভারতবর্ষে সে সময় বাঙালি মেয়েদের মরতে হত না। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯)।

১৪. কুলীন পুরুষের কাছে কন্যাকে বিয়ে দেয়ার পর মেয়ের বাবা-মা কুলীন জামাইয়ের বাৎসরিক খচর দিতেন। বিবাহিত কুলীন মেয়েরা বাবা-মা মারা গেলে মামাবাড়িতে দাসত্ব করে, ঝি গিরি করে জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। এই যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য অধঃপতিত সমাজের প্রলোভনের হাতছানিতে বহু কুলীন মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। (চিত্রা দেব, **অন্তঃপুরের আত্মকথা,** আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪ খ্রিঃ পৃ ১০)।

১৫. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩। এই আন্দোলন সমাজ সংস্কারমূলক হলেও বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। এই আন্দোলনের বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তথা নারী প্রগতির সূত্রপাত হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৬. মাহমুদ কবীর, **বাংলাদেশের নারী** (ঢাকা ঃ সূচিপত্র, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি– ২০০৩), পৃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ

হিন্দু পিতৃতন্ত্রের খড়গের ক্রোধ থেকে নারীদের বাঁচানোর প্রথম উদ্যেগ নেয়া হয় উনিশ শতকে যার সূচনাকারী রাজা রামমোহন রায়। (১৭৭২-১৮৩৩)। রামকান্তের পুত্র রামমোহনকে ফার্সী উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র পাটনায় পাঠান উচ্চ শিক্ষার জন্য। সেখানে তিনি ফার্সীতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কুর'আনে নারী জাতির প্রতি সুবিচার এবং সদ্ব্যবহারের যে সব কথা আছে সেগুলোও রাজা রামমোহনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে। হিন্দু সমাজে সে আমলে নারী জাতির প্রতি সুবিচার করা হত না। পণ্ডিত নামে পরিচিত এক শ্রেণীর গোঁড়া লোক তখন হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। নানারকম বিধি-নিষেধের বেড়াজালে নারী জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন এরা। কোন নারী বিধবা হলে সমাজপতিরা জোর করে তাকে স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করত। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই ভয়াবহ নৃশংস কার্যটি ধর্মের নামে সম্পন্ন করা হত। কুর'আন পড়বার পরে রাজা রামমোহনের মন হিন্দু সমাজের এই নৃশংস প্রথার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে।[১৭]

নারী জাগরণে রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ ভূমিকার একটি অংশ হচ্ছে সতীদাহ প্রথা বন্ধে সাফল্য অর্জন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরির সূত্রে ১৮০০ সাল থেকে রাজা রামমোহন রায় পূর্ববাংলার বহু স্থানে ঘুরেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি করার সময় ১৮১১ সালে রংপুরে অবস্থানকালে তাঁর বড় ভাই জগমোহন রায় পরলোকগমন করেন। এই সময় তাঁর স্ত্রীকে সহমরনের জন্য জীবন্ত দাহ করা হল। এই ঘটনা রাজা রামমোহনকে তীব্র কশাঘাত হেনেছিল। তখন তার বয়স ছিল ৩৯ বছর। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, সতীদাহ প্রথা চিরতরে বন্ধ না করে তিনি নিরস্ত হবেন না।[১৮]

---

১৭. শ্রী রামমোহন বিদ্যাসাগর, মাইকেল ইন্দ্রভূষণ দাস, পৃ ৭। রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা, আরবি, ফার্সী, ইরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। জেমস মিল রচিত হিস্টরি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া (১৮১৮) এবং মেরি উলস্টন ক্রাফট রচিত ভিন-ডিকেশন অব দি রাইটস অব ওমেন (১৭৯২) বই দুটি গভীর আগ্রহে পড়েছিলেন এবং বাংলার নারীদের জন্য ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। (গোলাম মুরশিদ, **সংকোচের বিহ্বলতা ঃ আধুনিক অভিঘাতে বঙ্গরমনীর প্রতিক্রিয়া,** ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রিঃ, পৃ ১৬)।

১৮. যদিও ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন, তবু সমাজ সংস্কারে তাঁর দৃঢ়চেতা মন নিরন্তর সক্রিয় ছিল বলেই, সতীদাহের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করার জন্য তার আন্দোলন সমাজে প্রভাব বিস্তার করে এবং তা সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। (নির্মল সেনগুপ্ত, **রাজর্ষি, রামমোহন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ,** কলিকাতা ঃ ১৯৭২ খ্রিঃ, পৃ ৫১)।

Dhaka University Institutional Repository

১৮২৫ সালের শুরুতে তিনি কলকাতায় এসে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ১৮১৩ সালে লর্ড ময়রা সতীদাহ প্রথা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্দেশ জারি করেন এবং ১৮১৭ সালে তা চূড়ান্ত রাজবিধি হিসেবে প্রচারিত হল।[১৯]

সতীদাহ নিবারক নিয়মবিধি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ধর্মীরা সরকারের কাছে প্রতিবাদলিপি পেশ করেন। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগীরা ১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে পাল্টা আবেদন করেন যে, প্রতিটি শাস্ত্র অনুসারে এবং যেকোন দেশের মানুষের বুদ্ধি অনুসারে এসব ঘটনা নরহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২০]

শুধু প্রতিবাদলিপি, আবেদন-নিবেদন পেশ ও বই লেখা ইত্যাদিতেই রাজা রামমোহন রায় ব্যস্ত ছিলেন না; তিনি তাঁর সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে সতীদাহের ঘটনাকে প্রতিহত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কাজ ছিল ঘটনাস্থলে হাজির হওয়া, সতীদাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া, দাহ থেকে বিধবাকে রক্ষা করা, আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়িত করা।[২১]

১৮২৫ খ্রিঃ কলকাতার কাছে সতীদাহের একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। কলেরায় মৃত এক যুবকের বিধবা পত্নী চিতায় আগুন দেওয়ার পর সবার অলক্ষ্যে চিতা থেকে নেমে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। শ্মশান যাত্রীরা চিতার মধ্যে সতীকে দেখতে না পেয়ে জঙ্গল থেকে ধরে এনে তাকে মাঝ নদীতে ডুবিয়ে মারে।[২২] এই মর্মান্তিক সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য সমাজের প্রতিকূল শক্তির

---

১৯. উল্লেখ্য যে ইংরেজ সরকার বহুদিন ধরেই সতীদাহ বন্ধের জন্য উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভেবেও স্থানীয় ধর্মীয় ও সামাজিক বিরুদ্ধতার কথা বিবেচনা করে সতীদাহ বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞদের মতামত জানানোর চেষ্টা চলছিল এর সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের প্রবল আন্দোলন যোগ হয়ে সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ করার চেষ্টা শুরু হলো। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪)।

২০. নির্মল সেনগুপ্ত, রাজর্ষি রামমোহন, **সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫১। রাজা রামমোহনরায় সহমরণের ক্ষতিকর দিক ও শাস্ত্রে এর অনুমোদন আছে কি নেই এসব বিষয়ে দুটি বই লেখেন। সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নির্যাতনের সম্বাদ (১৮১৮) এবং সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নির্যাতকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯) শিরোনামে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫)।

২১. এমনকি রাজা রামমোহন রায় নিজেই শ্মশান ঘাটে যেতেন, বোঝাতে চেষ্টা করতেন এবং সতীদাহ বন্ধ করতেন। এজন্য বহুবার তাঁকে স্বার্থান্বেষী মানুষের হাতে গঞ্জনা-লাঞ্ছনা ভোগ করতে হলেও তিনি তার প্রতিজ্ঞায় স্থির ছিলেন। (নির্মল সেনগুপ্ত, রাজর্ষি রামমোহন, **সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪)। সতীদাহ করার সময় জোর করে ভাং, ধুতরা পাতার রস বা ঐ রকম নেশার জিনিস খাইয়ে আগুনে ফেলে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরা হত এবং খুব বেশি ধুপের ধোঁয়া করা হত যাতে অন্য লোক দেখতে না পায়। মৃত্যুর ভয়াবহ করুণ আর্তনাদ ঢাকবার জন্য এত রাজ্যের ঢাক ঢোল কাঁশি শাঁখ সজোরে বাজান হত যে, কেউ যেন তার চিৎকার, কান্না, অনুনয় বিনয় না শোনে। (শরৎ রচনাবলি, **নারীর মূল্য,** ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৫৭১-৫৭২; কনক মুখোপাধ্যায়, **উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর,** পৃ ৯)।

২২. এই ঘটনায় দেশের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রামমোহন রায়ের বন্ধু সহযোগীদল ও কলকাতাবাসী ইংরেজরা প্রতিবাদ করেন তখন বড়লাট ছিলেন লর্ড আর্মহার্স্ট। এতবড় নিষ্ঠুর ঘটনার পরও তিনি সতীদাহ বন্ধের আইন জারি করতে সাহস করেননি। তবে তিনি কঠোর কিছু নিয়ম জারি করে সতীদাহকে নিয়ন্ত্রিত করলেন। নিয়মগুলো হল ঃ (ক) কোন সহমরণ নারীকে মৃত পতির সঙ্গে ছাড়া অন্যভাবে দাহ করা যাবে না

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম করে, প্রতিরোধ আন্দোলন করেই রামমোহন রায় নিশ্চুপ হননি। তিনি হিন্দু শাস্ত্র থেকে সতীদাহ নিবারণের পক্ষে বহু উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে প্রমাণ করলেন যে, বিধবার সহমরণ শাস্ত্র অনুমোদন করেনি বরং বিধবার সাত্তিকতা ও শুদ্ধাচারের কথাই শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২৯ সালের ৪ই জানুয়ারি লর্ড বেন্টিক সতীদাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যে ডিক্রি জারি করলেন তার মুখবন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিগুলো লিপিবদ্ধ করা হল।[২৩]

১৮৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারি সতীদাহের পক্ষের সমাজ পতিরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন জানায় সতীদাহ প্রথা চালু রাখার জন্য। রামমোহন রায় পাল্টা আবেদন নিয়ে বিলেতে গেলেন। কমন্স সভাতেও তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। ১৮৩২ সালের ১২ জুলাই প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে সতীদাহ বন্ধের আইন চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হল।[২৪]

রাজা রামমোহন রায় নারী সমাজের প্রতি এই জঘন্য সমাজ স্বীকৃত হত্যাযজ্ঞ বন্ধের মাধ্যমে পাকভারত উপমহাদেশের অগণিত বিধবার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেন।[২৫] ১৯৩৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতা

বা অন্যকোনভাবে হত্যা করা যাবে না। (খ) সহমরণকামী বিধবাকে নিজে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে অনুমতি নিতে হবে, অন্যের মাধ্যম অনুমতি নিলে হবে না। (গ) বিধবার সহমরণে সহায়ক কোন ব্যক্তি চাকরি পাবে না। (ঘ) সহমৃতা বিধবার পতির কোন সম্পত্তি থাকলে সরকার তা বাজেয়াপ্ত করবে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬)।

২৩. রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের শাস্ত্রোক্ত প্রমাণসহ বই লিখে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকলেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬)।

২৪. প্রিভি কাউন্সিলের এজলাস বসল দুপক্ষের আবেদন বিবেচনার জন্য। এজলাসে লর্ড প্রেসিডেন্ট অব দি কাউন্সিল, লর্ডচ্যান্সেলর, ফার্স্ট লর্ড অব দি অ্যাডমিরালটি, লর্ড আর্মহার্স্ট, লর্ড জন রাসেল, মার্কুইস অব ওয়েলেসলি, মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন প্রমুখের পাশে রাজা রামমোহন রায়ও বসেছিলেন, দীর্ঘ আলোচনার পর সতীদাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। রামমোহন রায়ের পরিকল্পনা ছিল সমাজের অন্যান্য সংস্কারমূলক আন্দোলনের পাশাপাশি নারী প্রগতির জন্য কাজ করবেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধের আন্দোলনেই তাঁর ২১ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে, বিধবা বিয়ে চালু করা, বাল্য বিয়ে বন্ধ করা, স্ত্রী শিক্ষা চালু করার যে পরিকল্পনা ও লক্ষ্য তাঁর ছিল তা পূরণ করার সময় তিনি পাননি। অসুস্থ অবস্থায় ১৮৩৩ এ ১৮ই ফেব্রুয়ারি এই মহান সংস্কারক মারা যান। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬)।

২৫. ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার সতীদাহ হয়েছে। (ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য,** পৃ ২২: উদ্ধৃতি ঃ **এশিয়াটিক জার্নাল** ১৮২৭, ভুলিয়্যুম ২৩, পৃ ৬৮৯) সে সময়ের সরকারি হিসাবে জানা যায়, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২ হাজার ৩৬৫ জন বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করা হয়েছে। শুধু কলকাতা ও আশে পাশের এলাকাগুলোতে এই সতীদাহের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫২৮ জন। (নির্মল সেনগুপ্ত, **রাজর্ষি রামমোহন,** সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৭২ খ্রিঃ, পৃ ৫৩)। ১৮১৫-২৩ সালের মধ্যে সতীদাহের ফলে ৫ হাজার ১২৮ টি বালক-বালিকা পিতৃমাতৃহীন হয়। বঙ্গদেশের যত সতীদাহ হয়, তার সাত অংশের এক অংশই হয়েছে শুধু হুগলীতে। এই হুগলীতেই রামমোহন রায়ের আবির্ভাব, যিনি স্বয়ং ছিলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। (**এশিয়াটিক জার্নাল,** ১৮২৭, ভলিয়্যুম ২৩, পৃ ৬৮৯)। ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে ঢাকা জেলায় একশত পঁচানব্বই জন বিধবা স্বেচ্ছায় তাদের স্বামীর চিতায় আরোহণ করে। (ঐতিহাসিক জেমস টেলর, **কোম্পানী আমলে ঢাকা**)।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ঃ "ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তন করে গেছেন রাজা রামমোহন রায়। আত্ম বিস্মৃতির দৈন্য থেকে তিনি আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আপোসহীন, বন্ধনহীন অন্তরের শক্তি দিয়ে দেশে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন।[২৬]

বিধবা বিবাহ আইন চালু

রাজা রামমোহন ও বেন্টিক হিন্দু বিধবাকে প্রাণ দিয়েছিলেন। আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) বিধবাকে দেয়ার চেষ্টা করেন জীবন। রাজা রামমোহন রায়ের পরপর আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান লক্ষ্য করি। সেই সাথে রামমোহনের যুগের শেষে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর আবির্ভাব। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওকে সমাজ সংস্কারক বলে উল্লেখ করেছেন অনেকে।[২৭] ইয়ং বেঙ্গলের সদ্যসারা ছিলেন বিদ্রোহী। এরা ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণা ও ইংরেজ প্রগতিবাদীদের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশে, সমাজে বিক্ষোভ ও আলোড়ন তুললেও নিজেরা কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি।[২৮]

নারী সমাজের প্রতি তৎকালিন হিন্দু সমাজে যেসব নিপীড়ন নানাবিধ প্রথার মধ্য দিয়ে বা সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি নিষেধের নামে প্রচলিত ছিল, সেগুলো মধ্যে সতীদাহ বিধবার বিয়ে না দেওয়া, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে না দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রথা ও সামাজিক বিধি নিষেধের দুর্ভোগ মেয়েদের পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর, পরনির্ভর অসহায় ও নিষ্পেষিত করে রেখেছিল। নারী সমাজকে এসব নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত পরিকল্পনাগুলো নবযুগের মনীষীরা 'আত্মীয় সভার' মাধ্যমে এককভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে গেছেন।[২৯]

---

২৬. মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, **নারী মুক্তির সেকাল একাল,** সাপ্তাহিক দেশ, ৫৫ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১৯৮৮ খ্রিঃ, পৃ ২৭।

২৭. ডিরোজিও রামমোহনের মতো সক্রিয় নিবেদিত প্রাণ সমাজ সংস্কারক ছিলেন না। কিন্তু তিনি রামমোহনের প্রগতিমূলক প্রচেষ্টাগুলোকে অগ্রসর করে নেওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। তাঁর এই বিরোধিতা ডিরোজিওর দলকে সমাজ সংস্কারের বিষয়ে রামমোহনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে আকৃষ্ট ও উদ্যোগী করে তোলে। নির্যাতনের হাত থেকে নারীদের বাঁচার লক্ষ্যে, তিনি স্পষ্টত রামমোহনের যুগ থেকে ভিন্ন এবং নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষার সাহায্যেই মেয়েরা মুক্তি পাবে। (যোগেশ চন্দ্র বাগল, **ডিরোজিও, জিজ্ঞাসা,** কলকাতা ঃ ১৯৭৬ খ্রিঃ, পৃ ৭৪-৭৬)।

২৮. তবে ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম সদস্য, জরিপ বিভাগের কর্মচারী হিসেবে প্রথম এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গের আবিষ্কার (১৮৫২) রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০) চাকরি শেষে বাংলাদেশে বাস করতে এসে প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় মসিপত্র নামে একটি পত্রিকা বের করেন ১৮৫৪ সালে। ঘরের মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা এই কাগজের মাধ্যমে করা হত। তাঁরা স্ত্রী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৮)।

২৯. রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে আত্মীয়সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৌলীন্য প্রথা, কন্যা বিক্রি, পণপ্রথা, জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৯)।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার নারী সমাজ বাঁচার অধিকার পেল রামমোহন রায়ের কাছ থেকে। আর শিক্ষা, সম্মান, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচার পথ খুঁজে পেল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রধান ব্যক্তিত্ব রামমোহন রায় এবং দ্বিতীয়ার্ধের প্রধান ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।[৩০]

বাল্যবিবাহের দোষ ও বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়ে বহু লেখালেখি, তর্ক উত্থাপনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সফল হয়েছেন। মূলত রাজা রামমোহন রায়ের নাম যেমন সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধনের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি ঈশচরচন্দ্র বিদ্যাসাগরর নাম বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষা চালু করার সাথে স্মরণীয়।[৩১]

১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর হিন্দু বিধবার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে। রাজা রামমোহনের জীবিতকালে বিধবার সংখ্যা বেশি ছিল না কেননা সতীদাহের ফলে বিধবাদের বেঁচে থাকারই কোন পথ ছিল না। পরবর্তীকালে বিধবাদের সমস্যা সমাধানে রামমোহন রায়ের উত্তরসূরীরা এগিয়ে এলেন।[৩২] এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ ব্যাপারে লেখালেখি এবং এর পক্ষে বিপক্ষে তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে।[৩৩]

"বাল্য বিবাহের দোষ" নামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের মূল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। একই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তি ও সমাজোন্নতি বিধায়নী সুহৃদ সমিতির সহায়তায় বিধবা বিয়ের আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেন।

---

৩০. বিত্তহীন কিন্তু সামাজিক মান মর্যাদা সম্পন্ন পণ্ডিত পরিবারের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নানা বাঁধার মধ্য দিয়েও কৃতিত্বের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র, বেদান্ত সংস্কৃতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ইংরেজি শিখেছিলেন ভালভাবে, ফোর্ট উলিয়াম কলেজ শিক্ষকতার সময়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে উঠেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়– "প্রথম থেকেই তাঁর জীবন সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে। দরিদ্র বাবার দরিদ্র ছেলে "দয়ার সাগর" নামে বাংলাদেশের মানুষের মনে চিরদিনের জন্য স্থান করে নিয়েছেন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **চরিত্র পূজা,** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভাদ্র ১৩০২, **রবীন্দ্র রচনাবলী**, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৬৫ খ্রিঃ, পৃ ৪৯০, বিশ্বভারতী, কলিকাতা)।

৩১. এর শুরু তাঁর মায়ের প্রেরণায়। এর পিছনে কারণ ছিল। সংস্কৃত কলেজের নানাবিধ কাজের মধ্যে তীব্র সমাজ সংগ্রামে ব্যাপৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁর মা কাঁদকে কাঁদতে এসে ছোট এক বালিকার বৈধব্যের কথা বলে বললেন– এত শাস্ত্র পড়িলি তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই? তখন থেকে মাও ছেলে বিধবা সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হলেন। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **চরিত্র পূজা,** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভাদ্র ১৩০২, **রবীন্দ্র রচনাবলী,** চতুর্থ খন্ড, ১৯৬৫ খ্রিঃ, পৃ ৪৯২, বিশ্বভারতী, কলকাতা)।

৩২. প্রদীপ রায়, বিদ্যাসাগর, **সামাজিক ব্যক্তিত্ব** (কলকাতা ঃ বুক ট্রাস্ট, ফেব্রুয়ারি– ১৯৮৬), পৃ ৮৩।

৩৩. প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দি রিফর্মার (১৮৩৮ সালের ২৫ নভেম্বর) এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত বেঙ্গল স্পেকেটটার (১৮৪২ সালের জুলাই সংখ্যা) পত্রিকা দুটিতে হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিয়ের সমর্থনে শাস্ত্রীয় বিধান উল্লেখসহ প্রবন্ধ বের হয়েছিল। উনিশ শতকের স্বনামখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবা বিয়েকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লেখেন। এই বিতর্কের সূত্র ধরেই "বাল্যবিবাহের দোষ" বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি লেখা সর্বশুভকরী পত্রিকায় ১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে ছাপা হয়। (প্রদীপ রায়, বিদ্যাসাগর, **সামাজিক ব্যক্তিত্ব,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২; সূত্র ইন্দ্রমিত্র করুনাসাগর বিদ্যাসাগর, পৃ ২৭৭)।

Dhaka University Institutional Repository

এর আগে বিধবা বিয়ের আইন করার লক্ষ্যে ভারতের ল' কমিশন বিভিন্ন আঞ্চলিক আদালতের মতামত চেয়েছিল। অপরদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র ব্রিটিশ ভারতীয় সোসাইটির পক্ষে "নোটস অন দি ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স" (১৮৫৩) বইয়ে প্রস্তাব করেন যে, বিধবা বিয়ের বিষয়টি যেন আইনসভার এখতিয়ারের বাইরে থাকে।[৩৪]

বিধবা বিবাহ এ বিষয়ে নানারকম তর্ক-বিতর্ক চলাকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রখর বুদ্ধিমত্তা নিয়েই "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা" এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে) শিরোনামে যুক্তিসম্মত বই লেখেন। এই বইয়ের ক্ষুরধার যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা বিরুদ্ধ পক্ষীয়রা করতে থাকলে, তিনি অক্টোবর মাসে একই শিরোনামে দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি বিধবা বিয়ের আইন প্রণয়নের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেন।[৩৫]

সমাজের কদর্য অনাচারের স্বরূপ উদঘাটন করে তিনি সোচ্চার হলেন বিধবা বিয়ের আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে।[৩৬] ১৮৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর আইন পরিষদে বিধবা বিবাহের পক্ষে আইনের একটি খসড়া পেশ করেন আইন পরিষদের সদস্য জে. পি. গ্রান্ট। ১৮৫৬ সালে এই খসড়া আইনটি দ্বিতীয়বার পেশ করা হয়। তখনও এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ উঠতে থাকে। অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিয়ের আইন তৈরির সব বাঁধা দূর করে বিধবা বিয়ের আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাস হয়ে গভর্নর জেনারেল দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।[৩৭] এই আইন পাস হওয়ার পাঁচ মাস পর ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে।[৩৮]

---

৩৪. প্রদীপ রায়, বিদ্যাসাগার, **সামাজিক ব্যক্তিত্ব,** প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫, সূত্র বিমান বিহারী মজুমদার, **হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়ান সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল আইডিয়াজ ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ।** চ্যাপটার চার।

৩৫. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর লেখনীতে সমাজপতিদের বিকেকের কাছে তীব্র প্রশ্ন তোলেন যে, বিধবাদের ওপর পুরুষের শারীরিক বলপ্রয়োগের ফলে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা দেখা দিলে ভ্রূণহত্যার মতো সামাজিক অত্যাচার প্রশয় দিতে যারা দ্বিধা করেন না তারা কেন বিধবা বিয়ের প্রশ্নে এত বিতর্ক তুলছেন? (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১)।

৩৬. ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ৯৮৬ ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ বিধবা বিবাহ আইনের সমর্থনে এক আবেদন সরকারের নিকট পেশ করা হয়। ভারতের আরো বহু স্থান থেকে বহু ব্যক্তির আবেদন সরকারের কাছে পৌছতে থাকে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১)।

৩৭. জে. পি. গ্রান্টের দুঃসাহসিক তেজস্বিতার প্রেরণা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তীব্র সামাজিক আন্দোলনের যুক্তি। বিধবা বিবাহ বিষয়ে তাঁর লেখা বই এবং বহু লেখালেখি সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল বিধবা বিবাহ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২২)।

৩৮. এই বিধবা মেয়েটির নাম কালীমতি। মাত্র চার বছর বয়সে বিয়ে ও ছয় বছর বয়সে বিধবা হয়ে কালীমতী তখন ১০ বছরের বালিকা মাত্র। কিন্তু বৈধব্য জীবনের নানাবিধ বিধি-নিষেধের ফলে ওই বালিকা বয়সেই তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কালীমতির বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদের ব্রজপণ্ডিত সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র শ্রীশ চন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যারত্নের সঙ্গে। এই বিয়ের খরচ বাবদ ১০ হাজার টাকার ব্যয়ভার ঈশ্বরচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ থেকে পর্যন্ত মাত্র ১১ বছর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬০টি বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এসব বিয়ের খরচ বাবদ ৮২ হাজার টাকার দায়িত্ব তিনি নিজে বহন করেছিলেন। এজন্য তাঁর ৫০ হাজার টাকা ঋণ হয়েছিল।[৩৯]

তিনি একজন সমাজ কর্মীরূপে, নেতারূপে বিধবা বিবাহ আন্দোলন করেছেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে পাল্টা আন্দোলন করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে বিরুদ্ধাবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১৮৭০ সালে জনৈকা বিধবাকে বিবাহের উদ্যোগ নিলে তিনি তা সমর্থন করেন।[৪০]

আজও হিন্দু সমাজ বিধবার বিয়ে সহজভাবে মেনে নেয় না। বিধবার বিয়ের কথা ভাবতে এখনো রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়। এমনকি হিন্দু নারীরাও বিধবা বিয়ের কথা শুনলে আঁতকে উঠেন। সতীদাহ বন্ধ হয়েছে কেননা প্রকাশ্য নৃশংসতা বন্ধ করা সহজ। বিধবার এখনো বিয়ে হয় না, কেননা গোপন নৃশংসতা বন্ধ করা কঠিন। একজন বিধবা নারীর মনোবেদনা বোঝার মত সংবেদনশীলতা বা মনুষ্যত্ব রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আজো আয়ত্ত করেনি। অধিকাংশ হিন্দু বিধবার জীবনে দুর্গতির শেষ নেই; শ্বশুর বা পিতার পরিবারে তারা যাপন করে লাঞ্ছিত জীবন। নানাবিধি নিষেধ কৃচ্ছতা সাধনে জীবন তাদের দুর্বিষহ হয়ে উঠে।[৪১]

বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য বহু আন্দোলনের পর ১৮৬০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সহবাস সম্মতি আইন জারি হয়। সে আইনে মেয়েদের সর্বনিম্ন বিয়ের বয়স নির্দেশিত হয়েছিল ১০ বছর। যেসব বিবাহিত মেয়ের বয়স ১০ হয়নি তাদের সহবাসকে পাশবিক অত্যাচার হিসেবে গণ্য করা হত।[৪২]

বিদ্যাসাগর বহন করেছিলেন। সে সময়ের বহু গুণীজন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ এই বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১)।

৩৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিয়ের যোগান দিতে ৫০ হাজার টাকার বিরাট অংকের ঋণের ভাগী হয়েছিলেন। তাঁকে এই ঋণমুক্ত করার জন্য হিন্দু পেট্রিয়ট ও এডুকেশন গেজেট এর সম্পাদকবৃন্দ এবং অন্য কয়েকজন ব্যক্তি "বিধবা বিবাহ তহবিল" খোলার উদ্যোগ নিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আপত্তি জানান। সেজন্য এ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজেই এই ঋণ শোধ করেন। (প্রদীপ রায়, বিদ্যাসাগর, **সামাজিক ব্যক্তিত্ব,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯১)।

৪০. পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবা বিবাহ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে তাঁর বিরোধ বাঁধে। তখন তিনি বলেন- আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, আমি উদ্যোগ করে অনেকের বিবাহ দিয়েছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করে কুমারী বিবাহ করলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাতে পারতাম না। (প্রদীপ রায়, বিদ্যাসাগর, **সামাজিক ব্যক্তিত্ব,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯২)।

৪১. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, **নারী নির্যাতনের রকমফের** (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ-কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, মার্চ- ২০০১), পৃ ৫৯।

৪২. ১৮৮৯ সালে কলকাতার জনৈক হরিমোহন মাইতি তার এগার বছরের স্ত্রী কুলমনির সঙ্গে বলপূর্বক সহবাস করতে গেলে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ভারত ও ইংল্যান্ডে বাল্য বিবাহের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। ২৫ জন চিকিৎসক তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধের জন্য মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন করেন। মেয়েদের বিয়ের বয়স ১২, ১৪ এবং ১৬ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মতামত

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯০-এর দিকে ভারতজুড়ে দুটি বিতর্ক দ্বারা, রক্ষণশীলরা যে শক্তিশালী তা স্পষ্ট করে তুলেছিল। বিতর্ক দু'টির একটি ছিল সহবাস সম্মতি আইন।[৪৩] ১৮৯১ সালে ৯ জানুয়ারি ভারতীয় পিনাল কোর্ডের ৩৭৫ ধারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্যার এন্ড্রু স্কোবল বিল আকারে উত্থাপন করেছিলেন এই আইন। পূর্ববঙ্গে, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ তুঙ্গে উঠেছিল সহবাস সম্মতি আইনকে কেন্দ্র করে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে উগ্র আন্দোলন শুরু হয়। বালগঙ্গাধর তিলক সহবাস সম্মতি বিল নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজনীতি শুরু করেন। বাংলাদেশের মুসলিমদেরও এরা আহবান জানায় সহবাস সম্মতি বিলের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের মধ্যেও প্রচুর বিরুদ্ধতা ও প্রতিবাদ জেগেছিল।[৪৪] তবে বেশ কিছু প্রতিবাদ সত্ত্বেও নবাব আহসান উল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের বৃহত্তর অংশ এই বিলের পক্ষে মত দিয়েছিলেন।[৪৫]

এত তীব্র প্রতিবাদ ও পক্ষে-বিপক্ষে জোরদার আন্দোলনের পর ১৮৯১ সালের ১৯ মার্চ সহবাস সম্মতি আইন প্রণীত হয়।[৪৬]

নারী শিক্ষার প্রসার

নারী সমাজের সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের অবদান, সৃষ্টি করেছে এ দেশের নারী জাগরণের ঐতিহাসিক পটভূমি। শিক্ষিত সমাজের উদ্যোগের সাথে সাথে বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার আগ্রহও সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ সময় বাঙালি মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পেত না এবং পরিবেশও অনুকূল ছিল না। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে উঁচু অভিজাত পরিবারে নারী শিক্ষার

উত্থাপিত হতে থাকে। বিরুদ্ধাবাদীরাও তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে জনমত সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে ওঠে। (গোলাম মুরশিদ, **সংকোচের বিহবলতা ঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমনীর প্রতিক্রিয়া,** ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রিঃ পৃ ১৪৯-১৫০)।

৪৩. সংক্ষেপে এই আইনের মূল কথা ছিল, বারো বছরের নিচে বিবাহিত অথবা অবিবাহিত বালিকার সঙ্গে তার অনুমতি অথবা বিনা অনুমতিতে সহবাস করলে তা ধর্ষণযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদে, **নারী নির্যাতনের রকমফের,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬০)।

৪৪. ১৮৯১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই বিষয়ক প্রথম প্রতিবাদ সভায় জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল কুঞ্জপাল নাগ তীব্র প্রতিবাদ জানান। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রতিবাদ সভায় বহু মুসলিম জমিদার ও আইনজীবী বক্তৃতা করেন। জমিদার সৈয়দ গোলাম মোস্তফা, কবি কায়কোবাদ, মৌলভী মকবুল আলী, মুন্সী মহিউল্লাহ প্রমুখ বিরোধীতা করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৩)।

৪৫. মুনতাসীর মামুন, **পূর্ব বাংলার ব্রাহ্ম সমাজ** (১৮৫৭-১৯০৫), (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র), পৃ ১৯৯।

৪৬. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলন থাকার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, গ্রাম বাংলার গরিব সাধারণ নারী পুরুষ সবযুগেই শোষিত বঞ্চিত ছিল।[৪৭]

যদিও ভারতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সুশৃঙ্খল কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল কিনা সে সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সম্ভবত নারীদের জন্যে নিয়মিত বিদ্যালয় পদ্ধতির শিক্ষা তখনও চালু হয়নি। যে সব নারী শিক্ষালাভ করেছিলেন, তারা বাড়িতেই বিশেষভাবে নিযুক্ত শিক্ষক বা পণ্ডিতদের কাছে চিত্রকলা দর্শন এবং সংস্কৃতি বিষয়ে পড়াশোনা করতেন।[৪৮] মুঘল আমলেও পারিবারিক পরিমণ্ডলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মক্তবকে ঘিরে নারী শিক্ষা প্রচলিত ছিল। এ শিক্ষাকে সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক নারী শিক্ষা ভারতে শুরু হয় উনিশ শতকে।[৪৯] আবহমান কাল থেকে ভারতের মুসলমান শাসকগণ জনগণের শিক্ষা বিস্তারকল্পে মুসলিম মনীষীদেরকে জায়গীর তমঘা, আয়মা, মদদে-মায়াশ প্রভৃতি নামে লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি দান করতেন। এ সকল ভূ সম্পত্তির অনেক ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিকাংশই ছিল শিক্ষায়তনগুলোর ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ্‌কৃত। প্রায় সকল প্রাইমারী স্কুল, মক্তব এবং বহু উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান এসব লাখেরাজ সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল।[৫০]

---

৪৭. শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতে অনেক সুশিক্ষিত নারীর সন্ধান পাওয়া গেছে। Radhakumud Mookherji, **Ancient Indian Education : Brahamanical and Buddhist,** Macmellan, London, 1947 এবং A. S. Altekar, Education in Ancient India, India book shop, Banaras, 1951.

৪৮. K. L. Joshi and P. D. Shukla, **Women and Education in Indian society, In women and Education,** UNESCO, Paris, 1953, P. 87. 103.

৪৯. Krishneala Ray, **Education in Medieval India,** B. R. Publishing Corporation, Delhi, 1984, P. 25-33. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা বিনষ্ট হওয়ার পর মুসলিম সমাজের যে সীমাহীন দুর্দশা হয়েছিল তাহল– কোম্পানি ক্ষমতা হস্তগত করার পর মুসলিম সেনাবহিনী এবং ১৭৯৩ সালে গ্রাম্য পুলিশ প্রথা ভেঙে দেয়া হয়। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বেকরাত্ব ও দারিদ্রের মুখে ঠেলে দেয়া হয়। অষ্টাদশ তৃতীয় ভাগ থেকে ম্যানচেস্টারের মিলজাত বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণ আমদানির ফলে বাংলার তাঁত শিল্প ধ্বংস হয় এবং লক্ষ লক্ষ তাঁতীও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ইংরেজদের পলিসি ছিল, যাদের সাহায্যে তারা এ দেশের স্বাধীনতা হরণ করে এখানে রাজনৈতিক প্রভুত্ব লাভ করেছে, তাদেরকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে মুসলমানদের একেবারে উৎখাত করা। যাতে করে ভবিষ্যতে তারা আর কখনো স্বাধীনতা ফিরে পাবার কোন শক্তি অর্জন করতে না পারে। হ্যাস্টিংসের ভূমি ইজারাদান নীতি ও কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দুরা মুসলমান জমিদারদের স্থান দখল করে। লর্ড মেটকাফ ১৮২০ সালে মন্তব্য করেন ঃ দেশের জমিজমা প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে এক শ্রেণীর বাবুদের নিকটে হস্তান্তরিত করা হয়। এ এমন এক ভয়াবহ নির্যাতনমূলক নীতির ভিত্তিতে করা হয় যার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। (E. Thompson : **the life of charls Lord Metcalfe**; A. R. Mallick : British Policy and the Muslims of Bebgal).

৫০. ইংরেজরা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত এসব লাখেরাজ সম্পত্তি দখল করে নেয়। বর্ধমানের স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টর মিঃ টেইনার একদিনের ৪২৯ জন লাখেরাজদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। ফলে বহু স্কুল কলেজের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। বহু বনেদী বংশ উৎখাত হয়ে যায়। বহু সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগীয়

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃত ছিল এর প্রমাণ উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মুসলমানদের জীবিকার্জনের অবলম্বন ছিল সরকারের অধীনে চাকরি বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগগুলোতে। কোম্পানি দেওয়ানী লাভের পরও প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবত তাঁরা চাকরিতে বহাল ছিলেন। কারণ তখন পর্যন্ত সরকারি ভাষা ছিল ফারসী। কিন্তু হঠাৎ আকস্মিকভাবে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারী ভাষা করা হয়। মুসলমানগণ তার জন্যে পূর্ব থেকে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ১৮২৯ সালে সবরকম শিক্ষার বাহন হিসাবে স্কুল কলেজে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। ১৮৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সহসা সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজির প্রবর্তন হয়।[৫১] মুসলমান শাষকদের লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের ধারা বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে শ্রীরামপুরের মিশনারিরাই নারী শিক্ষার উদ্যোগ নেন সর্বপ্রথম যদিও খ্রিস্টধর্মের প্রসারই ছিল মূল লক্ষ্য। ১৮১১ সালে প্রায় ৪০টি বালিকা নিয়ে উইলিয়াম কেরী মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ধর্ম শিক্ষার জন্য প্রথম একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলেন।[৫২]

১৮১৮ সালে চুঁচড়ায় বালিকাদের জন্য আলাদা একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লন্ডন মিশনারি সোসাইটির রবার্ট মে।[৫৩] এরপর স্থানীয় ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের স্ত্রীদের উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৯ সালের মে জুন মাসে কলকাতায়। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল 'দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি', এই প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে ছাত্রীদের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রথমে গৌরী বাড়িতে একটি, পরে আরো কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এসব স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা প্রথম বছর ছিল ৮, দ্বিতীয় বছর হয়েছিল ৩২।[৫৪]

শিক্ষার যে কাঠামো ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছিল তা ব্রিটিশদের দ্বারা প্রবর্তিত। এর গুরুত্ব ঔপনিবেশিক রাজনীতি দ্বারা নির্ধারিত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত অথবা শিক্ষাগত ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নীতিমালা গৃহীত হয়েছিল ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ভারতে শিক্ষাকে অগ্রসর

কর্মচারী বেকার হয়ে পড়লেন। (**Pandit Jawaherlal Nehru : The Discovery of India**, P- 376-77)

৫১. শিক্ষিত এই জনগোষ্ঠির ইতিহাস থেকে তৎককালীন নারী জাতির কোন খতিয়ান পাওয়া যায় না। হঠাৎ এ পরিবর্তনের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় পূর্ণ সুফল ভোগ করে। বিভিন্ন কলেজ থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করে তারা সর্বত্র সরকারি চাকরিতে এক চেটিয়া অধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অঙ্গনে পট পরিবর্তনের ফলে সন্ত্রস্ত মুসলমান পরিবারসমূহ জীবিকার্জনের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে দারিদ্র। অনাহার ও ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়। (আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস** (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন– ১৯৯৪, জিলহজ্জ– ১৪১৪, পৃ ১০৪-১০৫)।

৫২. প্রদীপ রায়, বিদ্যাসাগর, **সামাজিক ব্যক্তিত্ব,** পৃ ৫৮।

৫৩. গৌতম নিয়োগী, **ছিলে সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী,** শারদীয়া দেশ, ১৩৯৩, পৃ ৪৪৩।

৫৪. গৌতম নিয়োগী, **ছিলে সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী,** শারদীয়া দেশ, ১৩৯৩, পৃ ৪৪০, সূত্র ঃ প্রিসিলা চ্যাপমান। হিন্দু ফিমেল এডুকেশন ১৯৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

করার ব্রিটিশ প্রকল্প তাই ভারতীয়দের মানসিকতা বা নৈতিকতার উন্নতিকল্পে গৃহীত হয়নি, গৃহীত হয়েছিল তাদের প্রয়োজনে।[৫৫]

মিশনারিরা তাদের ধর্মের প্রসার করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ১৮৩০-১৮৭০ সাল সময়কালের পূর্বে মেট্রোপলিস কলকাতায় এবং ঢাকাসহ অন্য কয়েকটি এলাকায় নারী শিক্ষার ব্যাপারে বহু প্রচেষ্টা চলতে থাকে। আশ্চর্যজনক হলেও দেখা যায় যে, খ্রিস্টান মিশনারিদের নির্দেশনায় কলকাতায় নারীশিক্ষার প্রারম্ভিকালে যে প্রকল্প পরিচালিত হয় সেখানে মুসলমান মেয়েদের উপস্থিতি ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রায়শই স্থানীয় অধিবাসীদের তত্ত্বাবধানে এই স্কুলগুলো পরিচালিত হত।[৫৬] মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে বলে অভিভাবকরা বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮২৯ সালে সোসাইটির পরিচালনায় ২০টি স্কুল চালু থাকার পরও ধর্মীয় প্রচারের কারণে পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনটি স্কুল ছাড়া সব স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।[৫৭]

'ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি' নামে বিলেতের খ্রিস্টান মিশনারিদের সহযোগিতায় মেরী অ্যান কুক নামের এক তরুণী নিজ দেশ ও আত্মীয়স্বজন ছেড়ে সবচেয়ে প্রথম এ দেশে এসেছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডের আহবানে অনুপ্রাণিত হয়ে। ১৮২১ সালে নভেম্বর মাসে মেরী অ্যান কুক কলকাতায় আসেন। মিস মেরী অ্যান কুক নামে এই ইংরেজ মহিলা ১৮২১-২২ সালের দিকে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে আটটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর মতে একজন মুসলমান মহিলার সাহায্যে মিস কুক কলকাতায় শ্যামবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় গঠন করেন। এই মহিলার পরিচয় আজও অজ্ঞাত। অজ্ঞাত ঐ মুসলিম মহিলার প্রচেস্টায় প্রতিষ্ঠিত ঐ স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে গিয়ে পঁয়তাল্লিশে দাঁড়িয়েছিল।[৫৮]

---

৫৫. অর্থাৎ কোন নীতিটি উপনিবেশকে সাহায্য করবে কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত করবে তার ভিত্তিতে। ভারতে শিক্ষাকে অগ্রসর করার ব্রিটিশ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমা ধারার একটি শ্রেণী তৈরি করা– যারা ঔপনিবেশিক শক্তিকে সেবা করবে। (আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪-১০৮)।

৫৬. সমাচার দর্পণ এর ১৮২০ সালের ২৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, "শুক্রবার সকাল দশটায়" কলকাতার গৌরী বাড়িতে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৫০ জন হিন্দু এবং মুসলমান মেয়ে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। (সোনিয়া নিশাত আমিন, অনুবাদ– পাপড়ীন নাহার, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর– ২০০২, পৃ ১১১)।

৫৭. নারী শিক্ষার প্রতি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আচরণ নির্মম হয়ে দেখা দিয়েছিল– মিশনারি স্কুলগুলো শিক্ষার্থীদের ধর্মান্তরিত করেছে এই অভিযোগে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৮)।

৫৮. নারী শিক্ষার জন্য এই অজ্ঞাত মুসলিম মহিলার উদ্দীপনা অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কারণ সেকালে এই সম্প্রদায়ের পুরুষরাই ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতির সাথে পরিচিত ছিল না। (প্রিসিলা চ্যাপম্যান– Hindu female Education, ১৮৩৯, লন্ডন)। দুর্ভাগ্যবশত এ সকল বিদ্যালয় ক্ষণজীবী হয়েছিল এবং কোলকাতায় স্বনামধন্য জে. ই. ডি বেথুন স্কুল (J. E. D. Bethune School) প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ১৮৪৯ এর পূর্ব পর্যন্ত কোন স্কুল স্থায়ী হয়নি। ১৮২৫ এর পর থেকে এসব উদ্যোগ ক্ষীন হতে থাকে মিশনারীদের দ্বারা ধর্মান্তরিত করার কারণে। এদের দেয়া শিক্ষার মধ্যে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষাও দেওয়া হত বলে হিন্দু উচ্চ বিত্ত ও মুসলমান মেয়েদের স্কুলে আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১২)।

Dhaka University Institutional Repository

মেরী অ্যান কুক কলকাতায় এসে ১৮২৪ সালের মধ্যে বাঙালি মেয়েদের জন্য ২৪টি স্কুল খোলেন। লেডি আর্মহার্স্টের পৃষ্ঠপোষকতায় 'লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড ইটস ভিসিনিটি' স্থাপিত হল ১৮২৪ সালের ২৫ মার্চ। দেশীয় প্রগতিশীল বিত্তবান রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাজা শিবকৃষ্ণ প্রমুখ ব্যক্তি এই সমিতির ব্যয়ভার বহন করতেন ও উৎসাহ দিতেন।[৫৯] তবে মিশনারিদের প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা দেওয়া হত বলে হিন্দু ও মুসলিম মেয়েদের প্রকাশ্যে স্কুলে না পাঠিয়ে ঘরে পড়ানো হত। সনাতনীভাবে মুসলমান মহিলারা শিক্ষার উপাদান গ্রহণ করেছিলেন অন্দর মহলের কঠোর বেড়াজালের মধ্যে। উচ্চবংশীয়, সম্ভ্রান্ত ও আশরাফদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা গুণগত দিক থেকে ছেলেদের শিক্ষার অনুরূপই ছিল। মেয়েদের পর্দার মধ্যে রাখা হত সাত অথবা সাতের কাছাকাছি বয়স থেকেই। নিভৃতচারিনীরা প্রধানত মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করত ধর্মীয় এবং নৈতিকতা বিষয়ে। মেয়েদের কুর'আন পাঠ শিক্ষা ও কিছু উর্দু এবং মৌলিক হিসাবের দক্ষতা অর্জনের জন্য ওস্তাদজী বা মহিলা শিক্ষক রাখা হত। পুরনো শরীফরা যখন নতুন শ্রেণী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করে তখন বাংলা চর্চা নতুন তালিকায় যুক্ত হতে থাকে।[৬০]

মিশনারিদের পরিচালিত স্কুলগুলো বাদ দিলেও ওই সময় দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগেও ততদিনে আরো কয়েকটি স্কুল চলছিল বলে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক বইয়ে উল্লেখ আছে। বইটির কিছু অংশ পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল। মেয়েদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম প্রচারণায় স্থানীয় অধিবাসীরা মিশনারিদের পক্ষে ছিলেন। মিশনারিদের দ্বারা কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের (Central female School) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৮২৬ এর ১৮ মে কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু এলাকায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের কাছে। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁর স্ত্রীর অনুরোধ ২০,০০০ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। লেডী এমহার্স্ট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৮২৮ সালে স্কুলটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। একই সময় আরেকটি মিশনারি বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল যার নাম The Ladies Association বা নারী সংঘ। বিরানব্বই জন মেয়ে নিয়ে কলকাতায় এই স্কুল স্থাপিত হয় ১৮২৭ সালের দিকে। প্রায় ১৬০ জন বালিকা এই স্কুলে পড়েছিল, এদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।[৬১]

---

৫৯. মেরী অ্যান কুক কলকাতায় এসে চার্চ মিশনারি সোসাইটিতে যোগ দেন। মিশনারি সোসাইটির পাদরি আইজাক উইলসনকে তিনি বিয়ে করেন ১৮২৩ সালে। ২৪ বছর ধরে তিনি মিশনারী সোসাইটির মাধ্যমে বাংলার নারী সমাজের জন্য শিক্ষাও ধর্ম বিস্তারের কাজ করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৮)।

৬০. কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক দ্বারা মেয়েদেরকে ইংরেজি শিক্ষা এবং কিছুটা সেলাই, এমব্রয়ডারি এবং মাঝে মাঝে সংগীত শিক্ষা দেয়া হত। (এটা ব্রাহ্ম, হিন্দু এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে বহুল জনপ্রিয় ছিল, যাদের গার্হস্থ্য সংস্কৃতির সাথে সঙ্গীত ছিল একীভূত) মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হত তাদের পরবর্তী জীবন অর্থাৎ স্ত্রী ও মাতার ভূমিকাকে কার্যকর করার জন্য। (সোনিয়া নিশাত আমিন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, অনুবাদ,** পাপড়ীন নাহার, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর– ২০০২, পৃ ১১০)।

৬১. শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, **বাংলার স্ত্রী শিক্ষা,** ১৮০০-১৮৫৬ কলিকাতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৩৫১ বাংলা সন, পৃ ৫। শ্রী যোগেশচন্দ্রবাগল উল্লেখ করেন যে, মুসলমান মেয়েরা দীর্ঘদিন লেখাপড়া চালিয়ে যায়নি। (প্রদীপ রায়, বিদ্যাসাগর, **সামাজিক ব্যক্তিত্ব,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯)।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫০ থেকে নারী শিক্ষায় নর্মাল স্কুলগুলোর উদ্যোগ কৃতকার্যতা অর্জন শুরু করতে থাকে। মিসমেরী কার্পেন্টার এবং মিস এনেট একরয়েড এই দুজন ইংরেজ নারী ১৮৬০ এবং ১৮৭০ এর দশকে নারী শিক্ষায় অবদান রাখার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারতে এসেছিলেন।[৬২] সেই সময় কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় নারী শিক্ষার সমর্থনে প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখে পুরস্কার পেয়েছেন ১৮৪০ সালে। এরপর পরই কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীন কৃষ্ণ মিত্র স্কুল খুললেন ১৮৫৭ সালে। মিস কার্পেন্টার নারী শিক্ষার একটি সাধারন বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যেখানে মহিলারা শিক্ষক হবার প্রশিক্ষণ পাবে। ১৮৬৩-৬৪ সালে ঢাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল বা নর্মাল স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৬। ১৮৬৭-৬৮ সালে পূর্ববঙ্গের ছয়টি নর্মাল স্কুলে ছয়জন শিক্ষয়ত্রী ছিলেন।[৬৩]

১৮৬৯ সালে মিস কার্পেন্টারের অনুরোধে সরকার কলকাতায় নারী শিক্ষার একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। পরে তিন বছরের মধ্যেই এটা বন্ধ হয়ে যায়।[৬৪] মেরী কার্পেন্টারের সকল কার্মোদ্যোগ এ দেশের মনীষীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন বীরঙ্গনা বিদেশের নারী সংগঠন থেকে তিনি ভারতের নারী শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।[৬৫]

নারী শিক্ষার প্রসারে বাংলার শিক্ষিত সমাজের উদ্যোগ

এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলে যে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ও তার পরবর্তী অনুসারী কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) প্রমুখ ব্যক্তিগণই হিন্দু নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা উন্নত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানবতাবাদী ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন হিন্দু নারী

---

৬২. মেরী কার্পেন্টার এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রামমোহন রায়ের বিলেতে। ব্রিস্টলে তাদেরই বাড়িতে ১৮৩৩ সালে। সেখানে তিনি রামমোহন রায়ের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হন বাংলার নারীদের বিষয়ে কাজ করার জন্য। তখন তার বয়স ছিল ২৬ বছর। অবশেষে ৫৯ বছর বয়সে তিনি ভারতবর্ষে এসে প্রথমে বোম্বাই, পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আতিথ্যে ছিলেন আহমেদা বাদে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩০)।

৬৩. উল্লেখ্য শিক্ষিকার অভাবে এ দেশের মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটতে পারেনি। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩০)।

৬৪. সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩; তবে কারো কারো মতে ভারত সরকার মেরী কার্পেন্টারের পরামর্শ অনুযায়ী ফিমেল নরম্যাল ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠায় সম্মত হননি। (ড. জ্ঞানশ মৈত্র, **নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮)। উল্লেখ্য ১৮৮৬ সালে চারটি ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের জন্য ২৪২ জন ছাত্রী পড়ত ১৮৯৯-১৯০০ সালে তা বেড়ে ৭০১ জন হয়েছিল। কিন্তু তবুও তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল কম। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩০)।

৬৫. গৌতম নিয়োগী, **শারদীয়া দেশ,** ১৩৩৯, পৃ ৪৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ উন্নয়নের জন্য। ঠিক একই সময়ে বাংলার মুসলিম সমাজে প্রথমে ছিল গোড়া ফারায়েজী আন্দোলনের প্রভাব এবং পরবর্তীতে ১৮৫৭ খ্রিঃ পর বাংলায় নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও উত্তর প্রদেশের সৈয়দ আহমেদ খাঁ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সমঝোতামূলক মনোভাবের সাথে ইসলামী চেতনার সমন্বয় করার প্রয়াস করেছেন।[৬৬]

১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের পর ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ ইংরেজদের মুসলিম নিধন ও অত্যাচার নির্যাতনের কাল অতিক্রম করে নিজেদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য এবং শাসক ইংরজদের সঙ্গে মুসলমানদের বৈরী মনোভাব দূর করার জন্য সারাজীবন নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নারীর মর্যাদা উন্নতিকরণ ও নারী শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে সৈয়দ আমীর আলী তুর্কী রমনীদের উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন– There is no reason why the Mussalmans of India should not follow the example of their brother Moslems of Constantinople. Where the women are able to move about freely and to take part in the social economy.

নারী জাতির উন্নতি ব্যতীত সমাজের উন্নতি অসম্ভব, তাই আমীর আলী বলেন– If the Mussalmans of India desire to raise themselves, they should restore women to the pedestal they occupied in the early centuries of Islam. [৬৭]

---

৬৬. অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম নবাবগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজ এক চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালি তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজ কোম্পানির শাসকবর্গের ভাষা এবং নতুন পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন না এবং শিক্ষাগ্রহণের সুযোগও ছিল না। (তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ,** ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন– ১৯৯৮, পৃ ৬০); ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব তথা আযাদী আন্দোলনের শতশত মুসলমনকে গ্রেফতার ও বন্দী করেন। তদানীন্তন কমিশনার মিঃ টেইলার, টেইলার বন্দীকৃত মুসলমানদেরকে বিনা বিচারে অতি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিকভাবে প্রতিনিয়ত কিছু সংখ্যক করে তাঁর বাংলার ময়দানে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে থাকেন এবং এ আন্দোলনের নেতা আহমদুল্লাহ বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে প্রথমে মৃত্যুদণ্ড এবং পরে মৃত্যুদণ্ডাদেশ রহিত করে যাবজ্জীবন দীপান্তর ওযাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহইয়া আলীরও যাবজ্জীবন দীপান্তর দেয়া হয় এবং তিনি আন্দামানে ইন্তেকাল করেন। আহমদুল্লাহর অন্তিম ইচ্ছা ছিল সহোদরের পাশেই সমাহিত হতে কিন্তু ইংরেজ সরকার তার এ নির্দোষ অক্ষতিকর ইচ্ছাটুকুও পূরণ করেনি। সাদিকপুরে পরিবারের বাসগৃহটি ভূমিসাৎ করে সেখানে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট নির্মিত হয়। একবস্ত্রে খালি হাতে পরিবারের নারী শিশুদের গৃহ থেকে উৎখাত করা হয়। ঈদের দিনে। পৈশাচিকতার এখানেই শেষ নয় পরিবারের সুবৃহৎ পারিবারিক কবরস্থানটি চাষ দিয়ে উৎখাত করা হয় এবং হিন্দুদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দেয়া হয়। যুক্তিসংত কারণেই মুসলিম সমাজ তখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিলেন। (আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭-২৭৮)।

৬৭. Sayyid Ameer Ali, **The Influence of women in Islam.** The Nineteenth century. May, 1899. P- 755-774, Quoted in K. K. Aziz Ameer Ali : His life and work (Lahore, 1986) P- 184. নারী শিক্ষার প্রশ্নে সমাজের অচলবস্থা দূর করার জন্য আমীর

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলীর নারী শিক্ষা এবং নারী জাগরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এই সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়াশনের মুহাম্মদ ইউসুফ ভারতীয় ব্যবস্থাপনা সভাসমূহে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি প্রথম উত্থাপন করেন।[৬৮] উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই সমসাময়িক পত্রিকায় অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান মেয়েদের স্কুলে পড়ার বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। এরও পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম বালিকার বিদ্যা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। সমকালীন সমাচার দর্পণ-এ তথ্যটি তুলে ধরে।[৬৯] বামাবোধিনী পত্রিকার ১৮৭৩ খ্রিঃ আগস্ট মাসের সংখ্যায় শিক্ষা বিভাগের ১৮৭১-১৮৭২ খ্রিঃ এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় কলিকাতায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১০টি এবং ১৪টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। যেগুলো সরকারি সাহায্য পায় না এবং যেগুলো পায় উভয় স্কুলে সর্বমোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৩২ জন। এর মধ্যে মাত্র ৫৮ জন ছিল মুসলমান ছাত্রী।[৭০] এর চেয়েও করুন চিত্র পাই ১৮৮০ খ্রিঃ ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের সেখানে মোট ছাত্রী সংখ্যা ১৫৩ জনের মধ্যে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা মাত্র একজন।[৭১] ১৮৮২ খ্রিঃ বামাবোধিনী পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় সম্পাদকের মন্তব্য অতি তাৎপর্যপূর্ণ স্ত্রী শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উন্নতি পারসী সমাজে এবং সর্বাপেক্ষা দুর্গতি মুসলমানদের মধ্যে।[৭২] তবে উনবিংশ মানসিকতার ক্রম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই শতাব্দীর আশির দশকে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'।[৭৩] ১৮৮৩ সালে।

আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "Central National Mohammadan Association" এই অচলাবস্থা দূর করার জন্য একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সমাধান বের করা যা প্রগতিবাদী ও রক্ষণশীল দুই দলেই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে এর কি সমাধান হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। (ওয়াকিল আহমেদ, **'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন,** ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৩-৮৪, পৃ ১১৬)।

৬৮. Bimanbehari Mazumdar, **History of Political thought from Rammohun to dayannda,** 1821-84, Vol. 1 : Bangal (Calcutta, 1934) P. 394-401.

৬৯. সমকালীন সমাচার দর্পণ এ তথ্যটি তুলে ধরে বলেন- ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশটার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকাদের বিদ্যা পরীক্ষা হয়েছিল। এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানদে বালিকা সর্বশুদ্ধা প্রায় দেড়শত পরীক্ষা দিয়াছে। (**সমাচার দর্পণ,** ২৭ ডিসেম্বর, ১৮২০, উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮, ঢাকা ঃ ১৯৬৪, পৃ ৩১ ও ৫২ পৃষ্ঠার ১৩ নং তথ্য নির্দেশ)। স্যার সৈয়দ আহমদের উদ্যোগে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে। ১৮৮৫ সালে লাহোরের আঞ্জুমান এ হিমায়েত এ ইসলাম নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পশ্চিম ভারতের মুসলিম নারীরা অন্যধর্মের নারীদের চেয়েও বেশি শিক্ষা লাভে সমর্থ হয়েছেন কারণ এসব স্থানে মুসলিম সংগঠনগুলো নারী শিক্ষার জন্য দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছে।

৭০. **বামাবোধিনী পত্রিকা,** ১২০ সংখ্যা, আগস্ট- ১৮৭০, পৃ ১৪৩।

৭১. **বামাবোধিনী পত্রিকা,** ১৮২ সংখ্যা, আগস্ট- ১৮৮০, পৃ ১৪৯।

৭২. **বামাবোধিনী পত্রিকা,** ২০৪ সংখ্যা, আগস্ট- ১৮৮২, পৃ ২৬২।

৭৩. আব্দুল আজীজ, ফজলুল করিম, ফজলুর রহিম, আবদুল মজিদ হেমায়েত উদ্দীন প্রমুখ মনীষীগণ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী বংশের মনীষী ঢাকা মাদ্রাসার তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

এই সংগঠন অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীতে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে। প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা নির্বাচন ও উক্ত পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্নস্থানে মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম বছর সর্বমোট ৩৭ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল ১৪ জন উর্দু ভাষায় এবং ২৩ জন বাংলা ভাষায়। তন্মধ্য উর্দু বিভাগে ১২ জন ও বাংলা বিভাগে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।[৭৪] নারী শিক্ষাকে মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে অধ্যাপক মেরাজ উদ্দিনের সহযোগিতায় মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য বাংলা পাঠ্য বই তোহফাতুল মোসলেমীন (১২৯০) গ্রন্থখানি রচনা করেন। নওশের আলী খান ইউসুফজী বঙ্গীয় মুসলমান (১৮৯১) পুস্তকে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর নারী শিক্ষা বিস্তারের সফলতার কথা উল্লেখ করেছেন।[৭৫]

ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাউন্সিল অব এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট এলিয়ট বীটন বা বেথুন ১৮৪৯ সালের ৭ মে তারিখে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজ মিশনারিদের উদ্যোগে পরিচালিত মেয়েদের স্কুলগুলো খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা হত এ কারণে কেউ এসব স্কুলে মেয়েদের পড়াতে আগ্রহী ছিলেন না। এই সংকট দূর করার জন্য শুধু হিন্দু পরিবারের মেয়েদের জন্যই তিনি এই স্কুলের ব্যবস্থা করেছিলেন। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার্থী হিসাবে গ্রহণ করা হত না। মূলত সে কারণেই মুর্শিদাবাদের নওয়াব বেগম ফেরদৌস মহলের আনুকূল্যে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়।[৭৬] মুসলিম সমাজে যখন নারী শিক্ষার বিষয়টি মূলত পর্দাপ্রথার কঠোর বিধি নিষেধের জন্য বাধ্যগ্রস্ত ছিল। মুসলিম মেয়েদের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। সেই যুগে কলকাতায় শ্যামবাজারের নামহীন একজন মুসলিম মহিলা শিক্ষাব্রতীর কথা জানা যায় যিনি ইংরেজ শিক্ষাব্রতী মিসকুকের শিক্ষা প্রসার ও প্রচারে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন।[৭৭]

সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওবায়দুল্লা আল ওবায়দীর নিকট হতে এ বিষয়ে এ সম্মিলনীর বিষয় তাঁরা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। (তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িক পত্রে, বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ,** ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৮ খ্রিঃ পৃ ৬২)।

৭৪. এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কলিকাতা, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, প্রভৃতি স্থানে মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেয়েরা অন্তঃপুরে বসেই স্ব স্ব অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারতেন। মৌখিক পরীক্ষক অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সমিলনী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। (তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি, মুসলিম নারী সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩)।

৭৫. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, ঢাকা ঃ মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সাহিত্যিক, ১৪শ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৪, পৃ ১-২১; ওয়াকিল আহমদ, **বাংলার বিদ্বৎসভা ঃ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী,** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সপ্তম সংখ্যা, জুন ১৯৭৮, পৃ ১২৪-১৩০।

৭৬. তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালি, মুসলিম নারী সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩।

৭৭. অজ্ঞানামা শিক্ষানুরাগী এই মহিয়সী মহিলা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করা, নিজের পাড়ায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় কলকাতায় মির্জাপুর, এন্টাল, জানবাজার,

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণে নবাব ফয়জুন্নেছার অবদান

যখন নারী শিক্ষার প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে চলছে তখন একজন মহিলা কুমিল্লায় পর্দানশীন মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বাংলার মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এই পথিকৃত নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী।[৭৮] ১৮৭৩ সালে নওয়াব ফয়জুন্নেছা কুমিল্লায় ইংরেজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৭৩ সালে বাংলাদেশ তথা ভারতে মুসলিম নারী শিক্ষার জন্য হয়ত এটাই প্রথম স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[৭৯] কুমিল্লা শহরে মেয়েদের জন্য তিনি পৃথকভাবে দু'টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। একটি কুমিল্লার নানুয়া দীঘির পশ্চিম পাড়ে অন্যটি কান্দির পাড়ে ১৮৭৩ সালে। ১৮৮৯ সালে নবাব খেতাব প্রাপ্তির পর উৎসাহিত হয়ে এটিকে তিনি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় এ উত্তীর্ণ করেন (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত)। ফয়জুন্নেছার মৃত্যুর পর আনুমানিক ১৯৩১ সালে স্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই স্কুলের সঙ্গে তিনি হোস্টেলও তৈরি করে দেন এবং মেয়েদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও তিনি বহু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়। এই উপমহাদেশেই নারী শিক্ষা আন্দোলনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[৮০]

প্রভৃতি এলাকার মুসলমান জনগণও তাদের পরিবারের মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। উচ্চবিত্ত বা ভদ্রসমাজের তুলনায় নিম্ন বিত্তদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের উৎসাহ ছিল বেশি। (**ইসলাম প্রচারক,** ৩য় বর্ষ, মার্চ-এপ্রিল– ১৯০০, প্রচার সংবাদ, পৃ ৩০৬। সূত্র ধুর্জটি প্রসাদ দে, **বাংলার মুসলমান সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলন ও সমাজ সচেতনতা ইতিহাস অনুসন্ধানে,** কলকাতা ঃ ১৯৮৭ পৃ ২৯১)।

৭৮. নবাব ফয়জুন্নেছা এক স্মরণীয় বক্তিত্ব। কুমিল্লা জেলার হোসনাবাদ পরগনার লাকসামের কিছু দূরে পশ্চিমগাঁয়ে ১৮৩৪ সালে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর জন্ম। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় ভাগে ফয়জুন্নেছার আবির্ভাব সে সময়েই, যখন বাঙালি মুসলমানেরা, তথা ভারতীয় মুসলমানেরা ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করেছে, ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভের পর থেকে মুসলিম জাতির জীবনে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের ধারা অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। যার ফলে মুসলমানরা শুধু বিত্তের দিক দিয়েই নিঃস্ব হয়নি। শিক্ষাদীক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে চিত্তেও এনেছিল নিঃস্বতা। আজন্ম পল্লীবাসিনী এক নারী, স্কুল কলেজের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকেও উপলব্ধি করলেন যুগোপযোগি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধু পুরুষের নয় নারীর জন্যও প্রয়োজন। একাধারে নবাব ফয়জুন্নেছা সমাজ কর্মী, সাহিত্যিক, জনদরদী, শিক্ষানুরাগী এবং সুশাসক ছিলেন। ১৯০৩ সালে ৬৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ,** ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন– ১৯৯৩, পৃ ১-৭)।

৭৯. ফয়জুন্নেছা সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে। যখন এ দেশীয় মুসলমান পুরুষদেরকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর করানোর জন্যে নেতৃবর্গ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সে সময়ে নারী শিক্ষার কথা ফয়জুন্নেছা শুধু ভাবেননি তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে এক দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। (রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্বাবঙ্গের মুসলিম সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ১-৭)।

৮০. সুফিয়া আহমেদ, **মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল** (১৮৮৪-১৯২২) অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ ১৯৭৪, ৩৯৯ পৃ পপেন ডিক্স– ডি। নানুয়ার দিঘীর সেই বিদ্যালয়টি জনৈক শৈলরানী দেবীর স্বামী

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান সম্প্রদায়ে নারী জাগরণ ছড়িয়ে পড়ায় মেয়েরা অধিক পরিমাণে স্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে। পরবর্তীকালে স্বনামধন্য হয়েছিলেন এমন বহু মেয়ে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সৈয়দা জাহানারা হায়দার (১৯১৭-১৯৮৮) এবং মেহেরুন্নেসা ইসলাম (জন্ম ১৯২১) উভয়েই যথাক্রমে ১৯৩৩ এবং ১৯৩৮ সালে ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হন এবং পরে কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট থেকে বি. এ. ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। এ অর্থে তারা পথপর্দশক।[৮১]

যখন এ দেশীয় মুসলমান পুরুষদেরকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর করানোর জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ আমীর আলী প্রমুখ নেতৃবর্গ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই সময়ে নবাব ফয়জুন্নেছা মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন।[৮২]

মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাস্টিস আমীর আলীর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল। এই সমিতির উদ্যোগে নারী শিক্ষার প্রসার ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রচার আন্দোলন হয়েছিল। এছাড়াও প্রখ্যাত ইসলাম ধর্ম প্রচারক শেখ জমিরুদ্দিন, স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে ১৯০১ সালে রাজশাহীতে উদ্দীপনামূলক ভাষণ দিয়ে সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন।[৮৩] এরকম বহু ধর্মপ্রাণ উদার ব্যক্তি স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে সমাজকে সচেতন করে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমান ওলামার সভাতেও স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল।[৮৪]

মুসলিম নারীদের মধ্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বড় বোন করিমুন্নেসা খানম, হুগলীর আগা মোতাহারের মেয়ে জমিদার মন্নুজান, তাহেরুন্নেসা এবং লতিফুন্নেসা এবং বেগম রোকেয়া যারা নারী শিক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন পরবর্তীকালে।

১৮৯৭ সালে তৎকালীন গভর্নরের স্ত্রী লেডী ম্যাকেনজি কলকাতায় মেয়েদের একটি মাদ্রাসা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব শামসী জাহান ফেরদৌস এ কাজে সহায়তা করেন। বামাবোধিনী পত্রিকার ১৮৯৬ সালের সংখ্যায় উল্লেখ আছে জনৈকা লতিফুন্নেসা

১৯৩০ সালে অত্যন্ত গোপনে মাত্র দশহাজার টাকার বিনিময়ে স্ত্রী শৈলরানীর নামে নামকরণ করেন নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। বর্তমানে সেই বিদ্যালয়টি শৈলরানী বালিকা বিদ্যালয়। (রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮)।

৮১. সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫-১১৬।

৮২. রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭।

৮৩. Khawaz Mumtaz and Raida Shaheed, **Women of Pakistan,** 2nd publishers, London 1987. P. 40.

৮৪. মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

সে বছর কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে ৫৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে চূড়ান্ত পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলা L. M. F. (Licentiate of Medical Faculty) ডাক্তার।[৮৫] ১৯০৯ সালে খোজেস্তা আকতার বানু "খোজেস্তা আকতার মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" নামে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যিনি সরোয়ার্দী বেগম নামেও পরিচিত। এটি ১৯৩৮ সালে মাধ্যমিক স্কুল হিসাবে চালু ছিল। খোজেস্তা আকতার সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি।[৮৬]

বেগম রোকেয়ার অবদান

বাংলার নারী শিক্ষার সাথে যাঁর নাম সবার আগে স্মরণীয় তিনি হচ্ছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। যিনি তাঁর জীবনের সকল অর্থবিত্ত, মেধা, মনন, শ্রম ব্যয় করেছিলেন নারী শিক্ষার জন্য। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের[৮৭] উদ্যোগে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনি সামান্য সম্পদ এবং শক্তি নিয়ে এই

---

৮৫. আলোচ্য লতিফুন্নেসা সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি শুধু জানা গেছে তিনি ছিলেন শাহজাদপুর নিবাসী। উষা চক্রবর্তী, **Condition of Bangali Women around the second half of the 19th century,** 1963 এবং শাহানারা হোসেন, Glimpses in the condition of Bengali Muslim women during the latter half of the nineteenth century : A study based on the Bamabodhini Patrika, Journal of the Institute of Development studies, Rajshahi Vol 111, 1978. (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪)।

৮৬. সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬।

৮৭. বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের ইতিহাসের সাথে নবাব ফয়জুন্নেসার মত যে মহিমাময়ী নারীর নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। (১৮৮০-১৯৩২) সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও বিশ শতকের বাংলার নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিজের হৃদয়রক্তে রঞ্জিত করেছেন যুগের জীবন কাহিনী। (শামীমা ইসলাম, বেগম রোকেয়া, **অর্জনের ইতিহাস,** ঢাকা ঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ৯ই ডিসেম্বর– ১৯৯১ খ্রিঃ, পৃ ১৭)। বেগম রোকেয়া বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব সকলের কাছে। তিনি বাংলার সর্বপ্রথম নারীবাদীদের একজন। রোকেয়া সে সময় এমন একটি প্রত্যয় দৃষ্টি এবং প্রাণশক্তি প্রকাশ করেছিলেন যা আজও আমাদের অভিভূত করে। তিনি ছিলেন একজন লেখক, তাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজসেবী। তিনি বিনা দ্বিধায় বাংলায় নবজাগরণের স্থপতি রামমোহন অথবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারীর স্থান পেতে পারেন, যদিও তাঁকে শুধু মুসলমান নারী শিক্ষার পথপ্রদর্শক মহিয়সী নারী হিসেবে বর্ণনা করা হয় তবে তাঁর ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মুক্তিকামী চিন্তাবিদের মতো রোকেয়াও শিক্ষার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়েছিলেন শৃঙ্খল মোচনের পূর্বশর্ত হিসেবে। বেগম রোকেয়া তেমনি একজন নিবিড় প্রথিকা, যিনি পুরোধিনী শুধু নারী জাগরণের নয়– আমাদের আধুনিক বিশ্বাসের, সমকালীন চৈতন্যের। (আবদুল মান্নান সৈয়দ, **বেগম রোকেয়া,** ১৯৮৩ খ্রিঃ প্রবেশক; সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬)।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন।[৮৮] স্বামীর মৃত্যুর পর সৎ কন্যার পীড়নে রোকেয়া তাঁর অসংখ্য স্মৃতি বিজাড়িত ভাগলপুর ছেড়ে চিরকালের মত কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হলেন। মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে ১৯১১ সালেই ১১ই মার্চ কলকাতায় ওয়ালিউল্লাহ লেইনে একটি ছোট কক্ষে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। বিদ্যালয় স্থাপনের ১৪ বছর পরও তিনি বাংলা শাখা শুরু করতে অপারগ হন। ওয়ালী উল্লাহ লেনের ছোট বিদ্যালয়টি সামাজিক নিন্দা এবং সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও যথেষ্ট অগ্রসর হয়। ১৯১৩ সালের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বর্ধিত হয়ে ৩৯ জনে দাঁড়ায়। ১৯৩১ সালে স্কুলটি হাইস্কুলে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর একটি করে শ্রেণী যুক্ত হচ্ছিল।[৮৯] সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে তফসিরসহ কুর'আন পাঠ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজি, বাংলা উর্দু, ফার্সি, হোম নার্সিং, ফার্স্ট-এইড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত। পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরা আগ্রহের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেছে কিন্তু ১১৪ টি মেয়ের মধ্যে মাত্র দুটি ছিল বাঙালি।[৯০] শিক্ষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে তিনি নানারকম বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তথাপি রোকেয়া

---

৮৮. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে তথ্যগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন- ১৯০৯ সালের ৩রা মে বেগম রোকেয়ার হিতৈষী স্বামী সাখাওয়াত হোসেন ইন্তেকাল করেন। বেগম রোকেয়া মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে স্বামীর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পরে, ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভাগলপুরে কিছুকাল এই স্কুল চলার পর জনাব সাখাওয়াতের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত একমাত্র কন্যা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বেগম রোকেয়ার সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করেন। অবশেষে ১৯১০ সালের শেষ দিকে বেগম রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কোলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হলেন। সেই সাথে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটিও কোলকাতায় স্থানান্তরিত হল। এরপর আটটি মাত্র ছাত্রী নিয়ে ১৯১১ সালের ১৬ ই মার্চ শুরু হলো সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের কাজ। (শামিমা ইসলাম, **বেগম রোকেয়া অর্জনের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৩-২৪); একই মত প্রকাশ করেন লেখক গোলাম মুরিশদ রামসুন্দরী থেকে, রোকেয়া, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, নভেম্বর- ২০০০, পৃ ১২৯)। নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করার মহান ব্রতকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। (তাহমিনা আলম, **বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪)। তিনি সামান্য সম্পদ ও শক্তি নিয়ে কোলকাতায় ১৯১১ সালের ১১ ই মার্চ সাখাওয়াত মেমোলিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭); রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবিভক্ত বাংলার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪২)।

৮৯. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষকই ছিলেন স্থানীয় খ্রিস্টান, অ্যাংলো, হিন্দু অথবা বাঙালি মুসলমান। একমাত্র বাঙালি শিক্ষক ছিলেন আনোয়ারা বাহার ও ফাতেমা খানম। (আনোয়ারা বাহার চৌধুরী উদ্ধৃত মোহাম্মদ শামসুল আলম ১৯৮৯ খ্রিঃ, পৃ ১২৪; সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭)।

৯০. বেগম রোকেয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরে অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন তাঁর স্কুলে মেয়েদের পাঠাবার জন্য। সেই সাথে মেয়েদের নিরাপত্তা এবং পর্দার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তথাপি তিনি রক্ষণশীলদের নানারকম নিন্দা ও তিরস্কার সয়েছেন। এই সমাজেই তিনি সমর্থনকারীও পেয়েছিলেন। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮)।

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থনকারীও পেয়েছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মহিলা এবং পুরুষরা তাঁকে সদা উৎসাহিত করে গেছেন এবং কখনো কখনো তাঁরা সরাসরি বেগম রোকেয়াকে বস্তুগত এবং নৈতিক সমর্থনও দিয়েছিলেন। এছাড়া উদারপন্থী দৈনিকগুলো এবং সাময়িক পত্রিকাগুলো তাঁর স্বপক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে।[৯১]

রোকেয়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষক সমাজকর্মী এবং সংসদ সদস্য শাসসুন্নহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)[৯২] বেগম রোকয়া তাঁকে সহকর্মী করে নিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়া বহু আগেই আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শামসুন নাহার এই সমিতির সম্পাদিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং এই সমিতির মাধ্যমে বহু নারী শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। শামসুন্নাহার ছিলেন রোকেয়ার সর্বপ্রথম অনুসারী এবং বন্ধু। এছাড়া তিনি রোকেয়াকে সাহায্য করেছিলেন বিদ্যালয় পরিচালক এবং আঞ্জুমান এর কাজে তাঁর জীবদ্দশায়।[৯৩]

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে যে কয়জন মহিয়সী রমণী জন্মগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে বেগম রোকেয়া অগ্রগণ্য। তা সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার প্রকৃত পরিচয় অস্পষ্টতায় ঘেরা। বেগম রোকেয়া ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও

---

৯১. তবে কোন কোন ব্যক্তি ও মহল বেগম রোকেয়ার ব্যক্তিগত চিন্তাবোধ ও বিশ্বাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে এবং তাঁর রচনাগুলোকে বিকৃত করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। অথচ বেগম রোকেয়া চিন্তা ও বিশ্বাসে আদর্শ মুসলিম নারী ছিলেন তা তাঁর রচনার থেকে প্রমাণিত হয়। এক বক্তব্যে তিনি বলেন– মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কুর'আন শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোর'আন শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখির মত আরবি শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কুর'আনের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে। সম্ভবত এজন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাস না করলে আমাদের সমাজে মেয়েদের কুর'আন শিক্ষাও দিবে না। (**বেগম রোকেয়া বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি,** পৃ ২৮২; সম্পদনা ঃ তাহসিনা তাকিয়া, **রোকেয়া রোকেয়ার সন্ধানে,** ঢাকা ঃ দি উইটনেস, পৃ ১৮)।

৯২. শামসুন নাহার মাহমুদ নারী শিক্ষা এবং নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলনসহ মৌলিক কিছু কাজের জন্য এদেশের নারী সমাজের কাছে খুবই আপন ও প্রিয়জন। তিনি ১৯২৮ সালে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ আই. এ পাস করলেন। ১৯৩২ সালে বি. এ. পাস করেন। সংসার ও সন্তান প্রতিপালনের কারণে দীর্ঘ দশ বছর পর ১৯৪২ সনে তিনি এম. এ. পাস করেন। ১৯৩৯ সালে লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা পদে যোগ দেন। তিনি একটি সুশিক্ষিত পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁর বাবা মুন্সি তামিজউদ্দীন তদানীন্তন পূর্ব বাংলার প্রথম স্নাতক নানা মাওলানা আব্দুল আজিজ ছিলেন মুসলমান সুহৃদ সম্মেলনীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। (শামসুন্নাহার মাহমুদ, **আমি যখন ছাত্র ছিলাম,** উদ্ধৃত, সাহিদা পারভিন বেগম শামসুন্নাহার, ১৯৮৬ খ্রিঃ, পৃ ২৬)।

৯৩. সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মহৎ শিক্ষাবিদ। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে মুসলিম মহিলাদেরকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনা, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা। যা ছিল ইসলামের মূল শিক্ষা।[৯৪]

শিক্ষা বিস্তারের প্রারম্ভিককালে ঢাকার অবস্থান

বৃহৎ মাত্রায় কোলকাতায় এবং স্বল্পমাত্রায় কুমিল্লায় যখন এই সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছে, ঢাকা তখন নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজস্ব ধারায় অগ্রসর হচ্ছিল। ১৮২৪ সালে ঢাকার খ্রিস্টান মহিলা বিদ্যালয় চার্লস লিওনার্ড কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছিল। হঠাৎ করে তাঁর মৃত্যুর কারণে ১৮২৬ সালে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। একই সময়ে চট্টগ্রামের মাদারবাড়ি, মুরাদপুর, ভালুয়াদিঘিতেও একটি করে স্কুল ছিল। ১৮৭৬ এর ডা. আনন্দচরণ খাস্তগীর চট্টগ্রামে একটি মাধ্যমিক ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৭ এ তাঁর জামাতা এই স্কুলকে ডাঃ খাস্তাগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত করেন।[৯৫]

এ সময়ে (১৯০৭ সালে) প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্ডার ডাফ বালিকা বিদ্যালয়ে (সম্ভবত পরে যা বিদ্যাময়ী নামে পরিচিত হয়) বহু সংখ্যক মেয়ে ভর্তি হতে আসে। ক্রমান্বয়ে ঢাকায় জোরালোভাবে নারী শিক্ষা বিস্তার ঘটলে স্কুলসমূহের পরিদর্শক মি. মার্টিন সরকারের কাছে ১৮৬২ সালে এই অঞ্চলে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপনের আবেদন করেন। বিবেচনা সাপেক্ষে ভারত সরকার মঞ্জুর করেন যে, "পরীক্ষামূলকভাবে এক বছরে জন্য ঢাকায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে, শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হোক।[৯৬] ফলস্বরূপ ১৮৬৩ সালের ১১ ই মে ঢাকায় প্রথম সরকারি নর্মাল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৬ জন ছাত্রী নিয়ে। ১৮৭২ সালের পর এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। (অথবা দিতে হয়)[৯৭]

ইডেন বালিকা বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়

---

৯৪. সম্পাদনা ঃ তাহসিনা তাকিয়া, রোকেয়া সন্ধানে, এ. এ. রহমান, **বেগম রোকেয়া ও ইসলাম,** ঢাকা ঃ দি উইটনেস পৃ ১৫।

৯৫. সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২০।

৯৬. Government of India to Government of Britain, 23 March, 1863, Bengal Belucation Consultations, XV. 70. March 1863, P-140, উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দীন আহমেদ, পৃ ৭০, ৮৮।

৯৭. সরকারের অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিদল যেমন দীননাথ সেন, অভয়দত্ত এবং কালীপ্রসন্ন ১৮৭০ সালে নিজস্ব বালিকা বিদ্যালয় অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার বাৎসরিক ১৫০ রুপি অনুমোদন করেন এই সভার জন্য। (হিন্দু সমাজের মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের আনুকূল্য অনুদান অনেক বেশী ছিল। (আদিনাথ সেন, **স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবন ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ,** কলিকাতা ঃ ধুর এন্ড সন্স, ১ম খণ্ড, ১৯৪৮, পৃ ১৪৬-১৪৮)।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার প্রথম আনুষ্ঠানিক বালিকা বিদ্যালয় ইডেন ফিমেল স্কুল। এ সময় নারী শিক্ষার ইতিহাসে এটা ছিল উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই স্কুল কামরুন্নেসা স্কুলের সাথে যুক্ত হয়।[৯৮]

১৮৭৮ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ১৮৭৮সালের সেপ্টেম্বরে সরকারের নিকট ইডেন স্কুলের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ইডেন বালিকা বিদ্যালয়। অন্য একটি উৎস উল্লেখ করে যে, ১৮৭৮ সালে Ashley Eden ঢাকায় বালিকাদের জন্য একটি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৯৯] স্কুলটি পুরানো ঢাকার লক্ষী বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৮০ সালে ১৫৩ জন ছাত্রীর মধ্যে একজন ছিল মুসলমান। ১৯১১ সালে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ জনে। ১৮৯৬ সালে বাঙালি মেয়েদের ৬টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি ছিল ইডেন বালিকা বিদ্যালয়।[১০০] ইডেন বালিকা বিদ্যালয় প্রশিক্ষন ক্লাস এবং আবাসিক সুবিধাসহ একটি চমৎকার বিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

এই শতাব্দীর গোড়াতে ইডেনে যেসব মহিলা লেখাপড়া করেছেন এবং পরবর্তীকালে বাংলার মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে স্বনামধন্য হয়েছেন। তাঁদের নামের দীর্ঘ তালিকা মিসেস আখতার ইমাম দিয়েছেন। আখতার ইমাম (জন্ম ১৯১৭) ইডেন স্কুলের কৃতিছাত্রী। মিসেস ইমামের বড় বোন আল তাফুন্নেসা বেথুন থেকে পাস করে পরবর্তী সময়ে স্কুল পরিদর্শক এবং কোলকাতার মহিলা প্রশিক্ষণ স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন

---

৯৮. এই স্কুলের উদ্ভবের ইতিহাস জানার জন্য সেই সময়ে ফিরে যেতে হবে। "শুভ সাধিনী সভা" নামে একটি বয়স্ক নারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। শুধু ব্রাহ্মরা না হলেও প্রধানত ব্রাহ্ম মেয়েরাই সেখানে পড়ত। এই স্কুলটি মেরী কর্পেন্টার পরিদর্শনের পর উৎসাহিত হয়ে বাংলা সরকার স্বেচ্ছাসেবী সমাজকে অনুরোধ করেছিলেন ঢাকায় অন্য আরেকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার ব্রাহ্মণ নবকুমার এবং সজসুন্দর মিত্র প্রস্তাব করেন যে, বয়স্ক নারী শিক্ষা স্কুলকে বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হোক। ১৮৭৮ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্কুলটি উদ্বোধন করা হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রতিষ্ঠাতারা সিদ্ধান্ত নেন যে, স্কুলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে সরকারের কাছে। লেফটেনেন্ট গভর্ণর Ashley Eden এর নামানুসারে স্কুলের নতুন নাম হবে ইডেন মহিলা স্কুল। সংগঠনের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং এ বছরই ইডেন সেপ্টেম্বরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। (**Bengal Education consultation.** ১৮৭৮, উদ্ধৃতি, শরীফ উদ্দীন আহমদে, ঢাকা। **A Study in Uban History and Development,** London : Curzon Press, 1986, P- 72)।

৯৯. হাসমত আরা, **ইতিহাসের বন্ধুর পথ পেরিয়ে দ্বীপালী হল কামরুন্নেসা;** দৈনিক দিনকাল, জুন ২১, ১৯৮৯)। এস. এম. আলীও তাঁর **Education and Culture in Dhaka during the last Hundred years** –এর ১৮৭৮ সালের এই ঘটনার উল্লেখ করেন।

১০০. **বামাবোধিনী পত্রিকা** ১৯৮০ সালের মার্চ সংখ্যা ১৮২; **Progress of Education in India** ১৮৯৬-৯৭, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পর্যালোচনা ১৯৯৮, পৃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। মিসেস জাহান আরা হায়দার ১৯৩৩ সালে কুমিল্লার ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে ইডেন কলেজে ভর্তি হন।[১০১]

ইডেন কলেজের ভূমিকা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আখতার ইমাম লেখেন– ইডেনের যেসব মুসলিম ছাত্রীরা পড়েছেন তাঁদের অনুসরণ করে আজকের বাংলার অবহেলিত নারী সমাজের অনেকে কুসংস্কার ও নিরক্ষরতার অন্ধকার চুরমার করে শিক্ষার আলোকে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।[১০২] গণিতে প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রিধারী মুসলিম মহিলা ফজিলাতুন্নেসা জোহা ১৯২১ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। কবি নজরুল তাঁর সম্মানে একটি কবিতা লিখেছিলেন। ১৯২৭ সালে ফলিত গণিত বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি গৌরব উজ্জ্বল কৃতিত্বের অধিকারী হন। ১৯২৮ সালে তিনি স্টেটস স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলেত যান।[১০৩]

ফজিলাতুন্নেসা ১৯৪৮-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকার ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর সময়ে ইডেন মহিলা ইন্টারমিডিয়েট কলেজটি ডিগ্রী কলেজে পরিণত হয়। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম মহিলা অধ্যক্ষা। তিনি কোলকাতার বেথুন কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান এবং পরে বেথুন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হন।

---

১০১. মিসেস জাহান আরা হায়দার তৎকালীন অধিকাংশ মহিলাদের মতই কঠোর পর্দা পালন করতেন এবং সর্বদা বোরকা পরতেন। মিসেস ইমাম, জাহান আরা এবং নিজেকে প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট মহিলা (অনার্সসহ) হিসেবে বর্ণনা করেন। এছাড়াও ইডেন থেকে যেসব মুসলিম ছাত্রী পাস করেন তারা হলো রাবেয়া খাতুন যিনি ময়মনসিংহ মহিলা প্রশিক্ষণ কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। মিসেস ইমামের সহপাঠী মালেকা আখতার বানু যিনি বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে নিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। এই দীর্ঘ তালিকায় আরো যাদের নাম রয়েছে তারা হলেন– আফসারুন্নেসা, সিতারা বেগম, জামসেদুন্নেসা, লুৎফুন্নেসা, জোহা, জোবায়দা খাতুন, লুমু বিলকিস বানু, নূরজাহান বেগম, লায়লা আরজুমান্দ বানু। এঁরা সকলেই পরবর্তীকালে লেখক শিক্ষাবিদ, সম্পাদক এবং শিল্পী হিসেবে খ্যাত হন। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারী আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩)।

১০২. আখতার ইমাম, **ইডেন থেকে বেথুন,** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৯০ খ্রিঃ পৃ ২৩।

১০৩. একজন মুসলিম মহিলার উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলেত যাত্রা ঐতিহাসিক উদাহরণ ছিল তৎকালীন সমাজে। ফজিলাতুন্নেসার বিলেত যাওয়ার ঘটনাটিকে আদর্শ হিসেবে তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মুসলিম প্রগতি আন্দোলনের অগ্রদূত জনাব নাসিরুদ্দীন সওগত পত্রিকার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। প্রথম মুসলমান বাঙালি মহিলার বিলেত যাত্রা উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষভাবে একটি গান লিখে নিজ কণ্ঠে সে দিনের সভায় গেয়েছিলেন। কবি জসিম উদ্দীনও ফজিলাতুন্নেসার বিলেত যাত্রা উপলক্ষ্যে বিদায় অভিনন্দন নামে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। (**শত বছরের বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, সংস্করণ, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ খ্রিঃ, পৃ ৩৮)।

Dhaka University Institutional Repository

দিপালী সংঘের অবদান

ঢাকায় "অনুশীলন" এবং "যুগান্তর সমিতি" নারী শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করে। সে সময় বাস্তবে মেয়েদের কোন স্কুল ছিল না শুধু ইডেন ছাড়া। ১৯২০-২৮ সালের মধ্যে দীপালী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা লীলা নাগ[১০৪] তাঁর সহযোগীদের নিয়ে ঢাকায় ৪টি মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৫]

দীপালী–১ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৪ এর দিকে। লীলা নাগ সে সময় একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এই স্কুলটি কামরুন্নেসা স্কুলে পরিণত করার ক্ষেত্রে নেপথ্যে ভূমিকা রাখেন।[১০৬] এভাবেই ১৯২৪ সালে কুমিল্লায় ফয়জুন্নেসা স্কুল স্থাপনের ৫০ বছর পর এবং রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপনের ১৩ বছর পর কামরুন্নেসা স্কুল স্থাপিত হয়। ইতোমধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা অধিক সংখ্যায় স্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে। নবাব ফয়জুন্নেছা এবং বেগম রোকেয়া তাঁদের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকটা নমনীয় করে এনেছিলেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্নস্থানে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

মেয়েদের কলেজ ঃ

শতাব্দীর চতুর্থ দশকের দিকে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে থাকে। অনেকেই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন।

---

১০৪. লীলা নাগের জন্ম ১৯০০ সালে সিলেটে। ১৯১৭ সনে ঢাকা ইডেন হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর বেথন থেকে বি. এ. পাস করেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও একমাত্র ছাত্রী। ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। ১৯২৬ সালে লীলা নাগ দিপালী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। (**শত বছরের বাংলাদেশের নারী**, ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭-২৮)।

১০৫. দীপালী–১ যা অচিরেই কামরুন্নেসা স্কুলে পরিণত হয়। দীপালী–২ বর্তমানে বাংলাবাজার গার্লস স্কুল নারী শিক্ষা মন্দির, বর্তমানে শেরে বাংলা স্কুল এবং পুরানা পল্টন গার্লস স্কুল। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫)।

১০৬. কথিত আছে যে, নবাব খাজা আহসানুল্লাহর চারজন স্ত্রী ছিল যাদের একজনের নাম কামরুন্নেসা। [হাসমত আরা এবং সোনিয়া নিশাত আমীনের সাথে পরীবানুর পৌত্রী মিসেসে সারোয়ার খানের সাক্ষাৎকার] কামরুন্নেসার তিন মেয়ে– মেহেরবানু, পরিবানু, আকতার বানু। আকতার বানু একজন সাহসী নারী হবার ফলে তাঁর লম্পট স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে স্বাধীনভাবে এস্টেট দেখাশুনা করতে শুরু করেন। যোগেশচন্দ্র নামে একজন আইনজীবী তাঁর সহযোগী এবং পরামর্শদাতা ছিলেন। দুর্ঘটনায় যোগেশচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর আকতার বানু তাঁর নিজস্ব এস্টেট থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য জমি দান করেন। সেই সাথে মেয়েদের শিক্ষার জন্য দিপালী সংঘের জন্যও এক খণ্ড জমি দান করেন। সেই স্কুলটিকে আকতার বানুর মায়ের নামে কামরুন্নেসা স্কুল নামকরণ করেন। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন**, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫)।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েদের মধ্যেও উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ বাড়তে থাকে। ১৯৩৬ সালে কোলকাতার বিভিন্ন কলেজে ১০৯৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ৮৬৭ জন ছিলেন হিন্দু এবং ৩৭ জন মুসলমান।[১০৭]

১৯৩৯ সালে এ বাংলায় ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার অধীনে ৩৫ জন ছাত্রী নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক বিভাগের ক্লাস শুরু হয়। এই কলেজে ১৯৪৭ এ উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে মোট ১৫২ জন ছাত্রীর ১২০ জন মুসলমান ছিল।[১০৮]

১৮৫৪ সালে স্যার উডের শিক্ষা নীতিমালায় ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মতো নারী শিক্ষা বিষয়ে তাদের নীতি ঘোষণা করে। এই নীতি মালার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। তবে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের কারণে ডালহৌসি নারী শিক্ষার প্রতি সাহায্যের হাত অব্যাহত রাখেননি।[১০৯]

১৯০৫ সালের পর থেকে নারী শিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সরকারি অর্থের বরাদ্ধ বৃদ্ধি।[১১০] ১৯০৫ সালে এই প্রদেশে ৩টি মাধ্যমিক ইংলিশ স্কুল ছিল। ১৯১১ সালে তা ৫টিতে দাঁড়ায়। তার মধ্যে একটি কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা স্কুল।[১১১] ইংরেজদের পক্ষ হতে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য আলাদা স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিন্দু সন্তানদেরকে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষা এবং ইউরোপ এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া এ প্রতিষ্ঠানের

---

১০৭ J. A. Salik Muslim Girls College - **The Purdah মায়া দত্ত সম্পাদিত লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ পত্রিকা,** ১৯৮৯, পৃ ২৩।

১০৮. স্যার জন উডহেড পার্ক সার্কাসে এক প্রশস্ত এলাকায় কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রথমে কলেজটি মুসলমানদের জন্য নির্মিত হলেও পরে অমুসলিমদেরও সেখানে প্রবেশধিকার দেয়া হয়। তবে ১৯৪৭ এর পূর্ব পর্যন্ত হোস্টেল শুধু মুসলিম মেয়েদের জন্য নির্ধারিত ছিল ১৯৪৭ পর পর্যন্ত হোস্টেলটি সব ধর্মাবলম্বীর জন্য খুলে দেয়া হয়। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২৭)।

১০৯. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার হিন্দু, ধনিক, বণিক, বেনিয়া শ্রেণী ব্যাংকার প্রভৃতির সাথে এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। বলা বাহুল্য এতে উভয়ের স্বার্থ সমানভাবে জড়িত ছিল। ইংরেজদের আগমনের পর তারা মুসলিম সমাজের প্রতি যে বর্বর ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করেছে যার করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন খোদ হান্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে, প্রতিটি জেলায় সাবেক নবাবদের কোন না কোন বংশধর ছাদহীন ভগ্ন প্রাসাদে অথবা শেওলা শৈবালে পূর্ণ জরাজীর্ণ পুকুর পাড়ে অন্তজ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে। ইংরেজদের আগমনের পর তৎকালীন ভারতের গোটা মুসলিম জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলার মুসলমান। ফলে মুসলমানদের যে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছিল তাও চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। (W. W. Hunter : **The Indian Mussalmans,** Bangladesh Edition 1975. P. 167, 138-141 ফলে মুসলমানরা বেঁচে থাকার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়; আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৬-১৪৭)।

১১০. শীলা বোস, **রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষার বিকাশ,** ঐতিহাসিক, ২ এপ্রিল, ১৯৮৮)

১১১. এম. কে. ইউ, মোল্লা, **The New Province of Eastern Bengal and Assam, Journal of Institute of Bangladesh studies,** (Rajshahi : 1981), P- 95.

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল।[১১২] একথা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে যে, মুসলমানরা জন্মগতভাবে, জাতিগতভাবে এবং তাদের ধর্মের দিক দিয়ে যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষানুরাগী ছিল। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে।[১১৩] অনেক সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা সত্ত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার এবং সমাজের উদ্যোগের কারণে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয় ঃ

(ক) আদর্শগতভাবে নারীরা নিজেদের শিক্ষা অর্জনকে অর্থবহ করে তোলার যোগ্যতা অর্জন করে।

(খ) বস্তুত তারা ধীরগতিতে গড়ে ওঠে পেশাগত চাকরি নির্ভর কাজের জন্য এভাবে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ সুগম হয়। ১৮৭৮ সালে ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। কোলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল, ঢাকার কামরুন্নেসা এবং ইডেন অথবা কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও মেয়েদের যথার্থ শিক্ষা শুরু হয় ১৯২২ সালের পর থেকে।[১১৪]

১৯৩৯ সালে লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই মহিলাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো তৈরি হয়ে যায়। ১৯২৩ থেকে ১৯৪০ এর মধ্যে মুসলিম নারী সমাজের ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নারী শিক্ষা সম্পর্কিত পুরনো আদর্শের দেয়াল ভেদ করে স্কুল কলেজ অভিমুখে যাত্রা শুরু হয় নারীদের। এ অঞ্চল এই অবকাঠামো যখন গড়ে উঠেছে, তখন একইভাবে জনপ্রিয় সংবাদপত্রসমূহে নারী শিক্ষা প্রসার আদর্শগত বিতর্কও উত্থাপিত হতে থাকে। এই বিতর্ক নারীশিক্ষাকে প্রভাবিত এবং প্রতিফলিত করে।[১১৫] সমাজ এবং ব্যক্তি উভয়

---

১১২. M. Fazlur Rahman, **The Bengali Muslims & English Education,** P- 48-51; Quoted from the rules, approved by the subscribes and general meeting held on 27 August, 1816, Calutta Christon Observer, July 1832, P.72.

১১৩. আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০।

১১৪. সরকারি রিপোর্ট এবং সমসাময়িক স্মৃতিচারণ থেকে তার প্রমাণ মেলে। পূর্ববাংলা এবং আসামকে নতুন প্রদেশ ঘোষণার বিষয়টি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। ১৯০৭-১৯১২ সালে শিক্ষা রিপোর্টে বলা হয়, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। ১৯০১-১৯০২ সালে বাংলায় স্কুলে ৫৭,৭২৬ জন মেয়ের মধ্যে মাত্র ৬,৩২ জন ছিল মুসলিম। ১৮৮১-৮২ সালে মাধ্যমিক স্তরের ১০৫১ জনের মধ্যে ১০ জন ছিল মুসলিম। ১৯৩১-৩২ সালে ইংলিশ হাইস্কুলে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৩৮৫৫, তার মধ্যে ৯৫ জন মুসলিম। ১৯৩১-৩২ সালে ৩৯৪ জন মেয়ে (হিন্দু এবং মুসলিম) ম্যাট্রিক পাস করে। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ১০৪৯-এ দাঁড়ায়। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারী আধুনিকায়ান,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪)। মুসলিম জনগোষ্ঠির প্রতি ইংরেজদের নিপীড়নমূলক আচরণ, বাস্তভিটা থেকে উৎখাত, হিন্দুদের অগ্রাধিকারের কারণে মুসলিম মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল।

১১৫. বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য নানাভাবে আলোচনা পর্যালোচনা হতে থাকে। সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত "তরুণের কাজ" শীর্ষক এক নিবন্ধে মুজীবর রহমান বলেন– স্ত্রী শিক্ষা যে সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তা বোধ হয় এই বিংশ শতাব্দীতে আপনাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। যে বাড়িতে

Dhaka University Institutional Repository

দিক দিয়ে নারী শিক্ষার প্রয়োজন। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফজিলাতুন্নেসা বলেন, শিক্ষা নারীকে তার কর্তব্য শিখিয়ে দেবে। স্বাধীনতা তাকে সর্বজনের নিন্দিত কাজে বাঁধা দেবে। নারী পুরুষ একজনকে বাদ দিয়ে চলতে গেলেই আছাড় খেতে হবে। অন্যজনকে সমাজ গড়ার চেয়ে ভাঙবার সম্ভাবনাই বেশি।[১১৬]

১৯০০-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এই সময়কালে প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলোতে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে বিষয়ের দিক দিয়ে মোটামুটি তিন ধরনের রচনা প্রকাশিত হত– (১) নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ওকালতি (২) নারী শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যবস্তু নিয়ে আলোচনা এবং (৩) নারীর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত। এই সব বিবরণ, অভিমত এবং বক্তব্য পর্যালোচনা করে পরিস্ফুট হয় যে, নারী শিক্ষার সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীদের পক্ষ হতেই শিক্ষার বিষয় নির্ভীক সাহসিক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল পদক্ষেপ ছিল নির্ভীক ও প্রতিবাদধর্মী। এভাবেই বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে মুসলিম শিক্ষিত পুরুষ সমাজে স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পাক-ভারত উপমহাদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে নারী সমাজের অংশগ্রহণ

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে দেশের মুসলমানগণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, জুলুম, নিপীড়ন অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততার মধ্যে শিক্ষা, দীক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে দিন যাপনে বাধ্য হয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালে বা ভাংগনের যুগে মুসলমানদের পক্ষে চিন্তাশীল সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। কেননা চিন্তাশীল সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে যে সময়, সাধনা, স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও শিক্ষার প্রয়োজন, এদেশীয় মুসলমানগণ ছিলেন সে সব থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। উনবিংশ শতকের শেষ পাদে এসে মুসলমান লেখকগণ যেন কিছুটা সচেতন হন। পুরো উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মুসলমানদের সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রয়াস তা কেবল মাত্র পুরুষ

বা যে সমাজে শিক্ষার আলো ঢুকিতে পারে না সে বাড়ি বা সে সমাজের শিশুদের শিক্ষাদানে কি-যে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, তাহা আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। (মুজীবর রহমান, তরুণের কাজ, **সওগাত,** ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৪, ১৯২৭ খ্রিঃ পৃ ৪৪৯)। স্ত্রী শিক্ষা না হইলে উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। পূর্বকালে মনীষীগণ স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা স্ত্রী জাতিকে উপযুক্ত শিক্ষায় গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন। (মোঃ আহাদ আলী, **হেড পন্ডিত স্ত্রী শিক্ষা,** শরিয়তে ইসলাম, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৭, ১৯৩০ খ্রিঃ, পৃ ৮৪)।

১১৬. মিস ফজিলাতুন্নেসা এম. এ. **"মুসলিম নারী মুক্তি"** সওগাত ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৬, ১৯২৯ খ্রিঃ, পৃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ ছিল।[১১৭] আর এর মধ্যেই পুরো উনবিংশ শতাব্দী ধরে আমরা একজন মহিলা সাহিত্যিকের নাম হলেও পাই তিনি নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী।[১১৮]

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা গিরিশ মুদ্রাযন্ত্র থেকে শ্রীমতি ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর রচিত সাহিত্য গ্রন্থ "রূপজালাল" প্রকাশিত হয়। যার মাধ্যমে ফয়জুন্নেছা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[১১৯] মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মুসলিম মহিলা কবির নাম পাওয়া গিয়েছে, তিনি রহিমুন্নেছা।[১২০] মধ্যযুগীয় সাহিত্যে রহিমুন্নেছার আবির্ভাব যদিও একটি বিরল ঘটনা, তথাপি রহিমুন্নেছা অন্যের গ্রন্থের অনুলিপি করতে গিয়ে স্থানে স্থানে স্বয়ং কাব্য চর্চা করেছেন। তাঁর নিজস্ব কোন গ্রন্থ ছিল না। রহিমুন্নেছা শুধুমাত্র পদ্যে সাহিত্য চর্চা করেছেন, ফয়জুন্নেছা কেবল পদ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি স্থানে স্থানে গদ্য চর্চাও করেছেন এবং ফয়জুন্নেছার "রূপজালাল" একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিবি তাহেরন নেসা[১২১] নামক একজন মুসলমান মহিলার রচিত একটি গদ্য নিবন্ধ বামাবোধিনী পত্রিকার ২৫তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই মহিলাকে সম্ভবতঃ প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা বলে আখ্যায়িত করা যায়। লেখিকা এ নিবন্ধে স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা এবং

---

১১৭. মুসলমান পুরুষদের সংগে মহিলারা কেন সমভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে সক্ষম হননি তার কারণ সহজেই অনুমেয়। পিছিয়ে থাকা মুসলিম সমাজের নারী সমাজ ছিল আরো অধিক পিছিয়ে। (রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ,** ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, জুন– ১৯৯৩, পৃ ৭৫)।

১১৮. উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর আবির্ভাব। সে সময় মুসলমান পুরুষ লেখকদের সংখ্যাই খুব সীমিত। ১৮৭৬ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারি বাঙালি মুসলিম মহিলার লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই হিসেবে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর রূপজালাল বইটি প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। (রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬)।

১১৯. রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬।

১২০. ফয়জুন্নেছার পূর্বে আরও দু'জন বাঙালি মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকের নাম ও তাঁদের রচিত সাহিত্য সম্পর্কে জানা গেলেও বিচারে সবদিক থেকে ফয়জুন্নেছাই বিশিষ্টতা অর্জন করে আছেন। এর পূর্বে যে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবির নাম পাওয়া গিয়েছে তিনি রহিমুন্নেছা। যদিও রহিমুন্নেছা ছিলেন পদ্মাবতী পুঁথির একজন অনুলেখিকা, তথাপি কবিত্ব শক্তির অধিকারিণী ছিলেন বলে উক্ত পুঁথির সংগে সংযুক্ত করেছেন স্বলিখিত আত্মবিবরণী; বারমাসীতে 'ভাতৃবিলাপ' ও 'দোর দানা বিলাপ'। আত্মবিবরণী ব্যাখ্যা করে ডক্টর এনামুল হক কবির সময়কাল নির্দেশ করেছেন ১৭৬৩ হতে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। (ডাঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, **মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি,** বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, পৃ ৫৩; উদ্ধৃত করেন মজিরুদ্দিন বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, পৃ ১১)।

১২১. তাহেরন নেসার কোন বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। তার এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের শেষে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বোদা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী, এই বোদা কোথায় আমার তা সঠিক জানা নেই। দিনাজপুরে একটি বোদা আছে। হতে পারে এই বোদা দিনাজপুরেরই। তাঁর রচনাটি প্রকাশিত হবার আগে সেটি যে তাঁরই লেখা তার ভাল প্রমাণ পাঠাতে বলা হয়েছিল। সুতরাং ধরে নিচ্ছি, এটি তাঁর নিজেরই লেখা এবং এ রকমের একটি পাঠশালায় অধ্যয়নরত মুসলিম পরিবারের একটি বালিকার পক্ষে লিখতে পারার কৃতিত্বকে অসামান্য বলে বিবেচনা করতে হয় প্রকৃত অর্থে বোদা পঞ্চগড় জেলার একটি থানা। (গোলাম মুরশিদ, **রাম সুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একাশো বছর,** ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রিঃ, পৃ ৯০-৯১)।

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগিতা বর্ণনা করেছেন। প্রারম্ভে তিনি বলেছেন যে, "স্ত্রী এবং পুরুষ শ্রেণী কোন একটি না থাকলে পৃথিবীর "পরম মঙ্গলাকর নিয়মসকল প্রতিপালিত হত না, বরং পৃথিবী জনশূন্য অরণ্যানি তুল্যবোধ হত। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পরম হিতকর ও সুখবিধায়ক অমূল্য বিদ্যারত্ন লাভোপযোগী জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু এদেশের মহিলারা সেই বিদ্যাধনে বঞ্চিত হয়ে বিশ্বের অনুপম শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। অজাত ও মৃত পুত্র কেবল দুঃখদায়ক, কিন্তু মূর্খ সন্তান অসীম দুঃখের উৎস। উপসংহারে লেখিকা বলেন যদি ধরাধামকে যথার্থই সুখধামরূপে দেখার বাসনা থাকে তাহলে পুরুষ সমাজ যেন সকল উদাসীন্য বর্জন করে স্ত্রীগণকে বিদ্যা ভূষায় ভূষিত করতে চেষ্টা পান"।[১২২]

তবে এসব কিছুর পাশাপাশি নবাব ফয়জুন্নেছা একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার কৃতিত্বের দাবিদার। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ফয়জুন্নেছাই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। মোবাশ্বের আলী বলেছেন, শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র উপমহাদেশে অপর কোন সাহিত্যে মুসলমান মহিলা রচিত গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নাই।[১২৩] অতএব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফয়জুন্নেছা নিঃসন্দেহে এক গৌরবোজ্জল স্থানের অধিকারী। "রূপজালাল" ব্যতীত ফয়জুন্নেছা কর্তৃক রচিত বলে আরো দু'খানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সে সবের বাস্তব রূপ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। গ্রন্থ দুখানি হল– 'সংগীত সার', ও 'সংগীত লহরী'।[১২৪] শুধু নামোল্লেখ ছাড়া বই দু'টোর বাস্তব অস্তিত্বের কোন হদিস এ পর্যন্ত কেউ দিতে সক্ষম হয়নি। "রূপজালাল" গ্রন্থে[১২৫] নবাব ফয়জুন্নেছা বিচিত্রভাব ও ভাষার সমন্বয়ে অপরূপ সব কাহিনী আমাদের পরিবেশন করেছেন। কোন একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসরণ না করে তিনি আমাদেরকে বিচিত্রতার বেড়াজালে আবদ্ধ করেছেন। ফয়জুন্নেছা যে মূলত পুঁথি সাহিত্যের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রূপকথা ধর্মী অলৌকিক ঘটনা ও

---

১২২. বর্তমান প্রবন্ধটি তাহেরন নেসার প্রকাশিত রচনার মধ্যে সম্ভবত সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ। তার আর কোন লেখা এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। (গোলাম মুরশিদ, **রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর,** প্রাগুক্ত, পৃ ৯১)।

১২৩. মোবাশ্বের আলীর "নবাব ফয়জুন্নেছা' এবং "রূপজালাল" **রূপজালাল শত বার্ষিকী স্মরণী,** ১৯৭৬, পশ্চিমগাঁও কুমিল্লা, ১৯৭৭ খ্রিঃ, পৃ ৪৫-৪৬।

১২৪. ড. সিরাজুল ইসলাম, ড. আদমুদ্দিন, ড. আব্দুল আউয়াল, জনাব আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখেরা ফয়জুন্নেছার উপর আলোচনা করতে গিয়ে প্রত্যেকেই রূপজালাল ব্যতীত ফয়জুন্নেছার উল্লিখিত গ্রন্থ দু' খানির নাম উল্লেখ করেছেন। (ড. আব্দুল আউয়াল, **প্রথম মুসলিম গদ্য লেখিকা, ফয়জুন্নেছা, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মরণীকা,** কুমিল্লা ঃ ১৯৭৩ খ্রিঃ, ১৯৭৫ খ্রিঃ, পৃ ৪৯)।

১২৫. নবাব ফয়জুন্নেছার অনবদ্য সাহিত্য রূপজালাল আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে পরিচিত। এই গ্রন্থে মূল একটি কেন্দ্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও প্রচুর শাখা উপশাখায় কাহিনীকে প্রসারিত করে দিয়ে এত অধিক ভাবের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যে তার থেকে প্রায়ই মূল কাহিনী খুঁজে বের করা মুশকিলই হয়ে উঠেছে। লেখিকা কখনো গদ্যে কখনো পদ্যের সংমিশ্রণে কাহিনীকে উপস্থাপন করেছেন। (রওশন আরা বেগম, **নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮)।

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রের সমাবেশে দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ প্রেম চিত্রময় পুঁথির উদাহরণ স্বরূপ মধুমালতী, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান ইত্যাদির উল্লেখ করা যায় রূপজালাল ও এগুলোর ব্যতিক্রম নয়।[১২৬] ফয়জুন্নেসাকে মধ্যযুগীয় বলা ভুল হবে। কারণ তাঁর একই পুস্তকে অত্যন্ত আধুনিক গদ্যের (বঙ্কিমের মতো) পরিচয় পাওয়া যায় যা মাঝে মাঝে সংস্কৃত কবিতাতে বিধৃত।[১২৭] ১৯০২ সালে ফয়জুন্নেছা খাতুন নামে প্রথম মুসলিম মহিলা মুসলমানদের সম্পাদিত ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯০২ সালে ইসলাম প্রচারক তাঁর হামদ, ঈশ্বর প্রশস্তি প্রকাশ করে। এছাড়াও তিনি Gold Smith এর The Hermit কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন ১৮৮৪ সালে।[১২৮]

শিক্ষা বিস্তারের ফলে বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন কাঠামোর শিক্ষা লাভ, মহিলাদেরকে লেখালেখির জগতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল। সনাতনী যুগে অন্দর মহলেই মহিলারা সর্বদা লিখতেন। তবে উপনিবেশিক শাসনের আওতায়, শিক্ষার নতুন ধারার আবির্ভাবে তারা সৃজনশীলতার এক নবযুগে পদার্পণ করেন। উনিশ শতকে যারা লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন কালক্রমে তাঁরা তাদের লেখার স্বীকৃতি পেলেন। তাঁরা বাংলায় লিখতেন, যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকেই গৃহে উর্দুতে লেখাপড়া করেছিলেন। এই নারীরা যেমন ছিলেন নবযুগের ফসল তেমনি ছিলেন যুগ পরিবর্তনের বাহক।[১২৯] ১৮৯৭ সালের বামাবোধিনীর জুন সংখ্যায় লুৎফুন্নেসা নাম্নী আরো একজন মুসলমান মহিলা লেখকের কবিতা ছাপা হয়, যিনি কাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে পাস করেছিলেন। কবিতাটির নাম ছিল “বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের প্রতি”।

---

১২৬. মোবাশ্বের আলী, **নবাব ফয়জুন্নেছা এবং রূপজালাল, রূপজালাল শতবার্ষিকী স্মরণী,** ১৯৭৬ খ্রিঃ, পশ্চিমগাঁও কুমিল্লা, পৃ ৫৬।

১২৭. এ ক্ষেত্রে ভুলে গেলে চলবে না যে এখানে এমন এক নারীর কথা বলা হচ্ছে যিনি নিজেই তাঁর জমিদারী পরিচালনা করতেন। একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন এবং একাধিক বিবাহের কারণে তিনি স্বামীকে ত্যাগ করেছিলেন, স্বাতন্ত্রের দাবিতে এবং বেগম উপাধি ত্যাগ করে লিঙ্গ নিরপেক্ষ 'নবাব' উপাধি ধারণ করেছিলেন। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬)।

১২৮. আজিজুন্নেছা খাতুন বাংলার চেয়ে উর্দুতে লিখতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। তার “উদাসীন” এর ভূমিকা থেকে অন্তত সে রকমই ধারণা হয়। সেখানে তাঁর দীক্ষাগুরু মৌলবী সেরাজ উদ্দীন আহমদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা রয়েছে। স্বামী মোকাদ্দেসুল হকের মৃত্যুতে আজিজুন্নেছা কৈশোরেই বিধবা হন। তারপর খুলনায় তেতুলিয়ার জমিদার হামিদুল্লাহ খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায় না। এখানেও স্বামীর মৃত্যুতে দাম্পত্য জীবন দীর্ঘ মেয়াদী হয়নি। তৃতীয়বার সাতক্ষীরার লুৎফার রহমানের সঙ্গে বিয়ে হবার পর আবারও বৈধব্য তাঁর ভাগ্যে জোটে। এরপর আজিজুন্নেছা ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় নিয়ে সামাজিক কর্ম ও সাহিত্য সাধনায় বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। (আবুল আহসান চৌধুরী, ১৯৯৬ খ্রি, পৃ ২২; সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬১)।

১২৯. তাদের লেখার বিষয়বস্তু হত এমন– বাগানে জ্যোৎস্না উপভোগ অথবা একজন মায়ের স্নেহ-মমতার কাহিনী অথবা তা দেখা, অথবা না পাওয়া বিষয়াদি। গল্প লিখতেন দৈনন্দিন জীবন এবং আনন্দ ভালবাসার, বিরহ-বিচ্ছেদ, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা ঐতিহাসিক রোমান্স নিয়ে। মহৎ ব্যক্তির জীবনী এবং সামাজিক সমস্যা নিয়ে। (সেনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬)।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজগঞ্জ নিবাসী খায়রুন্নেসা (১৮৭০-১৯১২) ১৯০৪ সালে আমাদের শিক্ষার অন্তরায় নামে একটি রচনা প্রকাশ করেন। খায়রুন্নেসার লেখায় উপযুক্ত শিক্ষা। সংস্কৃতি এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রয়েছে বলে মনসুর উদ্দীন মত প্রকাশ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে তিনি নারী সমাজের প্রতি বিদেশী সামগ্রী বর্জনের আহবান করেন। ৬৮ পাতার পুস্তিকা তাঁর সতীর পতি ভক্তি ছিল ভাল স্ত্রী হওয়ার উপদেশমূলক নির্দেশিকা।[১৩০]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মোটামুটি প্রতিটি মধ্যবিত্তের ঘরে জার্নাল, সাপ্তাহিক, পক্ষিক এবং দৈনিক সংবাদপত্র পৌছাঁতে শুরু করে। সেকালের আরেকজন লেখিকা হচ্ছেন সিলেট নিবাসী সাহিফাবানু (১৮৫০-১৯২৬) তিনি জনবহুল কলরবময় ঢাকা ও কোলকাতা থেকে দূরে ঐ রকম একটি আধা মফস্বল শহরে থেকেও সাহিত্য অঙ্গনে জায়গা করে নিয়েছিলেন।[১৩১]

রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী ছিলেন (১৯০৭-১৯৩৪) একজন সমাজ বিশ্লেষক। রাজিয়া তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে প্রবন্ধকার, কবি ও ছোটগল্প লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। রাজিয়া খাতুন সেসব সীমিত সংখ্যক মহিলাদের একজন ছিলেন যিনি সে সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলন, যথা স্বদেশী আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদির খুব ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন।[১৩২] কোলকাতা থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের স্বল্পায়ু কিন্তু জনপ্রিয় এবং প্রগতিশীল ধূমকেতু পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। তিনি মিসেস এম, রহমান এই নামে ধূমকেতুর মহিলা বিষয়ক কলাম লিখতেন। নবাব ফয়জুন্নেসার রচনা আবিষ্কার এবং তাঁর সাহিত্য সমালোচকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার পূর্বে, তদানীন্তন আধুনিক কালের প্রথম মহিলা লেখক হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম বিবেচিত হত। রোকেয়া তাঁর সাহিত্যকর্ম শুরু করেন ১৯০১ সনে নবপ্রভা প্রত্রিকায় "পিপাসা" নামক রচনাটি প্রকাশের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক লেখক হিসেবে রোকেয়ার লেখায় হয়তো নান্দনিকতার অভাব ছিল কিন্তু তিনি তা পুষিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর লেখার তীক্ষ্মতা স্পষ্টতা এবং নারীদের বিষয়গুলো সম্পর্কে একাগ্রতার মাধ্যমে।[১৩৩]

---

১৩০. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন, **এম এ. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,** ১-৩ খণ্ড, ৩য় সংস্করণ (ঢাকা ঃ রতন পাবলিকেশন্স, ১৯৮১ খ্রিঃ, পৃ ১৯৭-১৯৮)।

১৩১. সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২।

১৩২. রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী জন্ম ১৯০৭ সালে এবং মৃত্যু ১৯৩৪ সালে। তাঁর স্বামী আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। রাজিয়ার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্প "শ্রমিক -এ। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে মুসলমান নারীর শিক্ষা গৃহে এবং বাইরের মহিলাদের ভূমিকা, পর্দা, অবরোধ, ইসলামে নারী মর্যাদা, মাতৃত্ব ইত্যাদির বিষয়। (রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, **বঙ্গীয় মুসলিম মহিলাগণের শিক্ষার ধারা,** সওগাত ভাদ্র- ১৩৩৪, পৃ ২৭৩)। তাঁর লেখার কোন কোন স্তবকে নিজের ধর্মের ব্যাপারে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য রয়েছে। এ কারণে তিনি তৎকালীন বিকাশমান মুসলিম সমাজে সমালোচিত হয়েছিলেন। অনেক লেখকের মত তিনি পর্দা ও অবরোধের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

১৩৩. সাহিত্যের এমন কোন মাধ্যম ছিল না যাতে রোকেয়া হাত দেননি, কবিতা, ছোটগল্প, ব্যঙ্গ রচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ফ্যান্টাসি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করেছেন। ১৯০১ সালে নবপ্রভা প্রত্রিকায় "পিপাসা" নামক রচনাটি প্রকাশের পর তাঁর পরবর্তী লেখা "অলংকার না badge of slavery বেশ আলোড়ন সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া শুধু অনৈসলামী অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ ও মুসলিম নারী শিক্ষারই অগ্রদূত ছিলেন না। তিনি বাঙালি মুসলমানের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যও মজবুত হাতে কলম ধরেছিলেন এবং অংশ নিয়েছিলেন বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে। ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন কল্যাণমুখী সমাজ গঠনই ছিল তাঁর আদর্শ।[১৩৪] বেগম রোকেয়ার লেখা প্রবন্ধ সাহিত্য থেকে তা প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রচণ্ড আল্লাহ ভীরু এবং ইসলামের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল রমনী ছিলেন। তাঁর লেখনী হতে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মহিলা ছিলেন এবং কুর'আন সুন্নাহর সত্যিকার প্রয়োগ ও ইসলামের বিধানের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। যেমন "স্কুলের বিরুদ্ধে কতদিকে কত প্রকার ষড়যন্ত্র তা একমাত্র আল্লাহ জানেন। একমাত্র ধর্মই আমাদিগকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে।" অনত্র স্কুলের আঠার বৎসর পূর্তিতে তিনি বলেন, "হে আল্লাহ আমরা তোমরাই উপাসনা করি এবং তোমরাই সাহায্য প্রার্থনা করি কুর'আন শরীফের এই বচনটিই আমি জীবনের পরতে পরতে সত্য বলিয়া উপলদ্ধি করিলাম।"[১৩৫] এক বক্তব্যে তিনি বলেন, "মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কুর'আন শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কুর'আনের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে। সম্ভবত এজন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাস না করলে আমাদের সমাজে মেয়েদের কুর'আন শিক্ষাও দিবে না। আমরা কুর'আন শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কার্য করি না। শুধু তাহা পাখির মত পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি। যদি কেউ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র লয় কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধপত্র ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থাপত্র খানাকে মাদুলীরূপে গলায় পরিয়া থাকে আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে"?[১৩৬]

করেছিল। কোলকাতায় গিরিশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত মহিলা পত্রিকায় এটি ছাপা হয়েছিল। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২)।

১৩৪. দি উইটনেস, **রোকেয়া সন্ধানে, সম্পাদনায় তাহসিনা তাকিয়া** (ঢাকা ঃ প্রকাশকাল– ডিসেম্বর– ১৯৯১, খ্রিঃ পৃ ১২।

১৩৫. শামসুন নাহার, **রোকেয়া জীবনী,** প্রথম প্রকাশ, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, পুনমুদ্রা (১৯৩৭) (ঢাকা ঃ রিয়াদ মাহমুদ, ১৯৮৭, পৃ ৮৩); সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের এক পুরাতন ছাত্রী রওশনআরা বলেন, "মনে পড়ে তাঁর আদেশমত দৈনিক ক্লাস আরম্ভের পূর্বে বিস্তীর্ণ হলে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতাম। তিনি একটা দোয়া পড়িতেন, আমরা সকলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতাম। ঐ দোয়াটি তিনি যখন পড়িতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি হৃদয় দিয়া আমাদের সেদিনের সাফল্যের জন্য খোদাকে ডাকিতেন। সে যে কি গভীর আন্তরিকতা ভরা আবেদন, তাহা বুকের মধ্যে অনুভব করা যায়, মুখে বলা যায় না।" (রোকেয়া জীবনী, **শামসুন নাহার,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬)।

১৩৬. মিসেস আর. এস. হোসেন, **বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি,** সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা চৈত্র ১৩৩৩/১৯২৭ পৃ ২৮২। এ থেকে বুঝা যায় যায় তিনি কুর'আন তেলাওয়াত করাই নয় বরং তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা জরুরি মনে করতেন যাতে লোকেরা কুর'আনকে জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেবেলায় আমি মার মুখে শুনতাম, কুর'আন শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে। সে কথা অতি সত্য। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেলদ বাঁধা কুর'আনখানা আমার পিঠে ঢালের মতো করে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কুর'আন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কুর'আন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।[১৩৭]

সম্পদের উত্তরাধিকার ও মোহর প্রসঙ্গে তিনি লিখেন– "হায় পিতা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্তে পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছ। কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে। আহা! "মহম্মদীয় আইন" পুস্তকের মসি রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নয়।"[১৩৮]

আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে আমাদের জঘন্য অবরোধ প্রথাই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে বোরকা ছাড়িতে বলেন, বলি উন্নতি জিনিসটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে বুঝিবে যে, জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে?[১৩৯]

নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার ইসলাম প্রদত্ত। নারীদের অবলা বলে গণ্য করা হয়। রোকেয়া বলেন, অবলাদেরও চক্ষুকর্ণ আছে, চিন্তাশক্তি আছে, উক্ত শক্তিগুলোর অনুশীলন যথানিয়মে হওয়া উচিত। তাহাদের বাকশক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করবার জন্য নয়। এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে গাটহীন, বাঁধনহারা হয়ে চলা, বলা, খেলা নয়– নর-নারীর উভয়কেই একটি সীমারেখা মেনে চলতে হবে এবং এ সীমারেখা মেনে চলাটা মানব সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশ ও শৃঙ্খলার জন্য অতীব প্রয়োজন।[১৪০]

---

১৩৭. বেগম রোকেয়া, **ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলমান,** মাসিক মোহাম্মদ, জ্যৈষ্ঠ– ১৩৩৮।

১৩৮. বেগম রোকেয়া, **"গৃহ" মতিচুর,** প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ, পৃ ৭২। বেগম রোকয়োর এই সকল প্রবন্ধ যেখানে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার চিন্তা ও বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন তিনি। এই সকল প্রবন্ধকে খণ্ডিত ও বিকৃত করে উপস্থাপন করছেন কোন কোন গোষ্ঠি।

১৩৯. বেগম রোকেয়া, **"বোরকা" মতিচুর**, প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ, নবনূর ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯০৪ খ্রিঃ। সকল সভ্য জাতিদেরই কোননা কোনরূপ অবরোধ প্রথা আছে। এই অবরোধ প্রথা না থাকলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে' এমন পবিত্র অবরোধ প্রথাকে যিনি জঘন্য বলেন, তাঁর কথার ভাব আমরা বুঝতে অক্ষম।

১৪০. বেগম রোকেয়া, **সৌরজগৎ,** পৃ ১৩১-১৩২। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি তার "বোরকা" প্রবন্ধে লিখেছেন– "আমাদের তো বিশ্বাস যে, অবরোধের সাথে উন্নতির বেশি বিরোধ নাই উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই।" সুতরাং পর্দার ব্যাপারে বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ ছিল এটা বিতর্ক করার কিছুই নেই। সামগ্রিক বিবেচনায় বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন সাচ্চা মুসলমান, আদর্শ দা'য়ী ইলাল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ইসলামই নারী মুক্তি দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারীত্বের অভাবে সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্থানে নারী মুক্তি স্বাধীনতার বিধান চাপা পড়েছিল। বেগম রোকেয়া ইসলামী দর্শন ও আদর্শ দ্বারাই নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে সেসব বিধানের পুনর্জন্মের চেষ্টা করেছেন। লেখিকার দু একটি উক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করে বা ঐ সকল উক্তির উপর ভিত্তি করে ইসলামের বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়াকে দাঁড় করানো একটি অন্যায়। কেননা তৎকালীন প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার সাথে লড়াই করে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রচণ্ড ক্ষোভ, গোস্বা ভরে কখনো কখনো এ জাতীয় কিছু মন্তব্য করেছেন।[১৪১]

প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা উপন্যাসিক নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী[১৪২] স্বপ্রতিষ্ঠ কর্মে আপন পরিচয়ে বাঙালি নারী সমাজে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই দেদীপ্যমান। বিয়ের পর সাহিত্যচর্চা করে মাত্র ২৯ বছর বয়সে ১৩২৯ (১৯২৩) সালে তাঁর রচনা প্রথম উপন্যাস "স্বপ্নদ্রষ্টার" জন্য তিনি সে সময়ের সাহিত্য সমাজে সমাদৃত হয়েছিলেন।[১৪৩] সম্ভবত তাঁর কর্মের সূচনা হয় "আহ্বান-গীতি" নামক একটি কবিতার মাধ্যমে। কবিতাটি ১৩১৮ সালে কহিনূর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। "সওগাত" পত্রিকার সপ্তমবর্ষ প্রথম সংখ্যায় "আমাদের কাজ" নামে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। কথাশিল্পী হিসেবে নুরুন্নেছা খাতুনের সাধনার কালমাত্র ছয়/সাত বছরের। এই সময়ের মধ্যে নূরুন্নেছা খাতুন এর ছয়টি উপন্যাস স্বপ্নদ্রষ্টা, জানকী বাঈ, আত্মদান, ভাগ্যচক্র, বিধিলিপি ও নিয়তি প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছয়টি উপন্যাস ছাড়াও 'মোসলেম বিক্রম,' 'বাঙ্গালার মুসলিম রাজত্ব' নামে দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিছেন। এছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীকে তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সমিতি তাঁকে 'বিদ্যানিবোদিনী' উপাধিতে ভূষিত করেন। নিখিল ভারত সাহিত্য সঙ্ঘ

---

১৪১. সংম্পাদনা ঃ তাহসিনা তাকিয়া, **দি উইটনেস, রোকেয়া সন্ধানে,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭।

১৪২. নূরুন্নেছা খাতুনের জন্ম মুর্শিদাবাদের শাহপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ পীর শাহ তাহেরের বংশোদ্ভূত খোন্দকার পরিবারে ১৮৯২ সালে। (আনুমানিক) তাঁর বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। তিনি কন্যার শিক্ষার পথে কোন বাঁধা দেননি সম্ভবত এ কারণে যে, অন্দর মহলেই সাধিত। তার প্রথম উপন্যাস স্বপ্নদ্রষ্টার ভূমিকায় নুরুন্নেছা লেখেন স্কুলের বেঞ্চে বসবার অভিজ্ঞতা তিনি পাননি। তিনি কোন গৃহ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও পাননি। তিনি তাঁর তৃষ্ণা ও কৌতুহল নিবারণের জন্য নিজ থেকেই বর্ণমালা শেখেন এবং নিজে বই নিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। (নুরুন্নেছা খাতুন, বিদ্যাবিনোদিনী, স্বপ্নদ্রষ্টা, পৃ ২)। তিনি ১৯২১ সালে হুগলি শহরের কাজী গোলাম মোহাম্মদ মোক্তারের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কাজী সাহেব একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির লোক এবং লেখাপড়ার প্রতি অত্যন্ত উৎসাহী। তিনি স্ত্রীর সাহিত্য কর্মে উৎসাহ যুগিয়েছেন। (**শত বছরের বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৯)।

১৪৩. নূরুন্নেছা খাতুনের **"স্বপ্নদ্রষ্টার পূর্বে"** একটি সামাজিক উপন্যাস **"জোবেদা"** ১৯২১ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এস. এফ. খাতুন রচিত এই বইটি সেই অর্থে মুসলিম মহিলা লিখিত প্রথম উপন্যাস। উল্লেখ্য যে, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রথম উপন্যাস পদ্মরাগ তারও আগে লেখা। তবে সেটা প্রকাশিত হয় ১৯২৪/১৯২৫ সালে। (**শত বছরের বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩, পৃ ৯-১০; সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮)।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধি দেন। এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনের আমন্ত্রণে তিনি যোগ দিতেন এবং সে সকল সভায় সমাজ গঠনে সাহিত্যকের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন। ১৯৩৭ সালে মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশনে "বঙ্গসাহিত্যে মোসলমান" শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রচুর সুনাম অর্জন করে।[১৪৪] ১৯২৯ সালে সওগাত মহিলা সংখ্যায় তাঁর ছবি ও গল্প পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। আশি উত্তর বয়সেও জ্ঞানুশীলনের ব্যাপারে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। ১৯৭৫ সালের ৬ই এপ্রিল এই স্বনামধন্য সাহিত্যিক পরলোকগমন করেন।[১৪৫]

বেগম সারা তৈফুর

১৮৯৩ সালে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা দু'জনেই শিক্ষানুরাগী ছিলেন কিন্তু সমাজ ও পরিবেশের কারণে কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেননি।[১৪৬] ১৯১৪ সনে ঢাকার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও গ্রন্থকার সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। জনাব তৈফুর স্ত্রীর মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও প্রতিভা লক্ষ্য করেছিলেন তাই স্ত্রীর প্রতিভা বিকাশে তাঁর সুদৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁর একমাত্র গ্রন্থ "স্বর্গের জ্যোতি" ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম-এর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এর আগে কোন মহিলা নবী জীবনী লেখেননি। সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ইত্যাদিতে তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায়

---

১৪৪. ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় মোসলমান মহিলা সঙ্ঘের সভায় সভানেত্রী হিসেবে তিনি যে ভাষণ দেন তা সে বছর "সওগাত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে অন্য কোন বাঙালি মুসলিম মহিলা সমিতির এরূপ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি বা এরূপ অভিভাষণও কোন মুসলিম মহিলা পাঠ করেননি। (**শত বছরের বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

১৪৫. নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনীর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ি বিক্রির টাকা দিয়ে মেধাবী ছাত্রদের জন্য একটি বৃত্তি চালু করা হয়। এছাড়া তাঁর নিজস্ব টাকায় "নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্যপদক" প্রবর্তন করা হয়। সাহিত্যের পাঁচটি শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য পাঁচজন মহিলাকে এই পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই শাখাগুলো হল- উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প কবিতা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ। বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ প্রতি বছর এই পদক বিতরণ করত। (**শত বছরের বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১১)।

১৪৬. সারা তৈফুরের পিতা ছিলেন হোসনে নূর আহমেদ এবং মাতা বদরুন্নেসা বেগম শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বড় বোন ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা তিনি সেই সময়ে পাননি। অতি বাল্য বয়সে তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে কিছু বাংলা শিখেছিলেন। তাঁদের বরিশালের বাড়িতে সে যুগের 'মহিলা বান্ধব', বামাবোধিনী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা আসত এবং সেগুলো ঘরে বসে তিনি খুব ছোটবেলা থেকেই নিয়মিত পড়তেন। সারা তৈফুরের সাহিত্য অঙ্গনে পদক্ষেপ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১২-১৩)।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম সারা খাতুনের "ময়না" নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭১ সনের ৭ ডিসেম্বরে এই সারা তৈফুর ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।[১৪৭]

মামলুকুল ফাতেমা খানম[১৪৮]

তিনি ঘরেই শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেন। তবে অন্য অনেকেই যা করেনি তিনি তা করেছেন তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল এবং ঢাকায় পোস্তা গার্লস স্কুল–এ শিক্ষাকতা করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তিনি প্রচুর বই পড়তেন। তাঁর অনেক লেখার মধ্যে এখন শুধু পাওয়া যায় সাতটি ছোটগল্পের একটি চটি সংকলন "সপ্তর্ষী" (১৯৬৪) এবং তৎকালীন ঢাকার তরুণ লেখক এবং একটি স্বল্পায়ু সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক আবুল ফজলকে লেখা কিছু চিঠি। মামলুকুল ফাতেমা খানম ১৯৫৭ সালে ইন্তেকাল করেন।[১৪৯]

আকিকুন্নেসা আহমদ[১৫০]

"আধুনিকা স্ত্রী" ও "আধুনিক স্বামী" নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। মাত্র দুটি গ্রন্থ রচনা করেও তিনি ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছেন। বেগম আকিকুন্নেসা নিজে একজন গৃহবধূ হিসেবে স্বামী সন্তানদের দেখাশুনা করা এবং সকল প্রকার সামাজিকতা বজায় রেখেও নারীদের প্রতি তাঁর নিজের কর্তব্যের প্রতি সজাগ ছিলেন। তাই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে "আধুনিকা স্ত্রী" (১৯৫৩) ও "আধুনিক স্বামী (১৯৬২) গ্রন্থ দু'টি রচনা করেন। ১৭ জুন ১৯৮২ সনে বেগম আকিকুন্নেসা আহমদ ইন্তেকাল করেন।

---

১৪৭. তাঁর পূর্ণ নাম ছিল নাম বেগম হুরায়ুন্নিসা সারা খাতুন। তাঁর একমাত্র গ্রন্থ "স্বর্গের জ্যোতি" প্রকাশের পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। সারা তৈফুর ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান মহিলা যিনি রেডিওর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিশেষত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোকে চালু করে উজ্জীবিত রাখার জন্য স্ক্রিপ্ট লিখে ব্রডকাস্ট করতেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১২-১৩)।

১৪৮. মামলুকুল ফাতেমা খানম ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নূরুন্নেছার চেয়ে দুই বছরের ছোট। তাঁর বাবা রেলওয়ের কর্মচারী ছিলেন। একটি রক্ষণশীল পরিবারে বিয়ে হওয়ার কারণে তিনি তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করে সন্তানদের নিয়ে মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসে স্বনির্ভর জীবন যাপন শুরু করেন। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯)।

১৪৯. আবুল ফজল এই রুচিবান এবং মমতাময়ী মহিলার কথা তাঁর লেখায় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। তিনি সর্বদা বাঙালি বিধবার মতো সাদা শাড়ি পরিধান করতেন। তাঁর বাড়িটি ছিল তৎকালীন ঢাকার উঠতি তরুণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্মের "আড্ডাখানা" আবুল ফজল তাঁকে রোকেয়ার স্বল্প পরিচিত সহকর্মী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (সোনিয়া নিশাত আমিন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯)।

১৫০. আকিকুন্নেসা ১৮৯৬ সালে ১ জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার বার্নিস্বর্দি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলনা আহমেদ আলী আকালুবী। মাতা– হায়াতুন্নেসা, বিখ্যাত লেখক, কলামিস্ট, আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের স্ত্রী হচ্ছেন আকিকুন্নেসা। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থের প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮)।

Dhaka University Institutional Repository

আখতার মহল সাঈদা খাতুনকেও এই সকল লেখকদের দলে স্থান দেয়া যায়। আখতার মহল সাঈদা খাতুন ১৯০১ সালে পূর্ব বাংলায় ফরিদপুর জেলার একটি ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ির বৌ এর বই পত্রে এবং লেখালেখিতে আসক্তি শ্বশুর বাড়ির লোকজন ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু আখতার মহল গোপনে লিখে গেছেন। তিনি তাঁর লেখা ট্রাংকের ভেতর তালাবদ্ধ করে রাখতেন। একদিন তাঁদের নোয়াখালীর বাড়িতে বেড়াতে এসে স্বয়ং কবি নজরুল ইসলাম সেগুলো আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা নওরোজে ছদ্মনামে এবং সওগাতে স্বনামে প্রকাশিত হয়। মাত্র ২০ বছর বয়সে তার অকাল মৃত্যুতে তাঁর লেখক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁর লেখা দু'টি প্রবন্ধ এখন পাওয়া যায়।[১৫১]

বেগম রোকেয়ার অনুসারী শামসুন্নাহার মাহমুদ[১৫২]

এ দেশের নারী শিক্ষা, নারী জাগরণের প্রচার ও প্রসারে অনন্য কীর্তিও অবদান রেখে গিয়েছেন। বেগম রোকেয়ার সঙ্গে শামসুন নাহারের পরিচয় হয় লেখার মধ্য দিয়ে। অল্প বয়সে শামসুন নাহারের প্রথম লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয় তৎকালীন কিশোরদের পত্রিকা "আঙ্গুর" নামক মাসিক পত্রিকায়। এরপর নওরোজ ও অন্যান্য পত্রিকায় শামসুন নাহারের কিছু কিছু লেখা ছাপা হয়। তাঁর প্রথম রচনা "পুণ্যময়ী" লেখা হয় মাত্র দশ বছর বয়সে এবং ১৯২৫ সালে তা প্রকাশিত হয় যখন তাঁর বয়স সতের। এই বইকে উপলক্ষ্য করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর অশিষ বাণী। কবির স্বহস্তে লিখিত কবিতাখানি ব্লক করে পুণ্যময়ীর প্রথম পাতায় ছাপানো হয়েছিল। অল্প বয়স থেকেই শামসুন নাহার লেখাপড়ার প্রতি যেমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন তেমনি সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগ জন্মেছিল তাঁর বাল্যকাল থেকেই। এর কারণ তাঁদের বাড়িতে ছিল একটা সুন্দর সাহিত্যিক পরিবেশ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ পুণ্যময়ী, ফুল বাগিচা, বেগম

---

১৫১. ১৯১৩ সালে নোয়াখালীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আখতার মহলের বিয়ে হয়। কিন্তু সে বিয়েটি সম্ভবত সুখকর হয়নি। তার লেখা গদ্যের ভাষা ছিল প্রাঞ্জল। আখতার মহল সম্পর্কে আর কিছু বিস্তারিত জানা যায়নি। (সোনিয়া নিশাত আমীন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯)।

১৫২. শামসুন্নাহার মাহমুদ এমন একটি পরিবারে বড় হয়ে উঠেছিলেন সেখানে পুরুষরা পাশ্চাত্য উদার নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত এবং নারী অধিকারের জন্য সংগ্রামে বিশ্বাসী। ১৯০৮ সালে শামসুন নাহার মাহমুদ নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুন নাহার এর পিতৃকূল ও মাতৃকূল উভয়েই শিক্ষিত ছিল। অতি অল্প বয়সে শামসুন নাহার পিতৃহীন হন। শামসুন নাহার তখন ছয় মাসের শিশুকন্যা তখন থেকেই নানার বাড়িতে বড় হন। তখন তাঁর নানা আবদুল আজিজ চট্টগ্রামে ডিভিশন্যাল ইন্সপেক্টর অব স্কুল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমনি পরিবেশে নাহার বড় হয়ে উঠেন। ডাক্তার ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ এর সাথে শামসুন নাহার এর বিয়ে হয়। ওয়াহিদ মাহমুদ শুধু স্ত্রীর উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করেননি বরং সারা জীবন স্ত্রীর সব কাজেই সর্বতোভাবে সমর্থন সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২-৪৩)।

Dhaka University Institutional Repository

মহল, রোকেয়া জীবনী; শিশুর শিক্ষা, আমার দেখা তুরস্ক, নজরুলকে যেমন দেখেছি। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা "বুলবুল"। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক– সবুজ পাঠ, কিশোর সাথী, তাজমহল পাঠ, নতুন তাজমহল পাঠ, বিচিত্রপাঠ্য। ১৯৬৪ সালে মাত্র ৫৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৫৩]

সৈয়দা মোতাহেরা বানু[১৫৪]

১৯০৬ সালে নভেম্বর মাসে বরিশাল জেলার পটুয়াখালীর বাসনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি মোতাহেরা বানুর কাব্যচর্চা শুরু হয় তার বিয়ের পর থেকে। তবে লেখালেখির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পিতা সৈয়দ সাজ্জাদ মোজাফ্ফরের কাছ থেকেই। "সওগাত ১৩২৬ সংখ্যায় 'খেলার সাথী' নামে কবিতাটিই হচ্ছে তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত কবিতা। সেই থেকে মোতাহেরা বানু কবিতা লেখা শুরু করেন আর থামেননি। এর মধ্যে বাল্য বিধবা, প্রতীক্ষা, অধীরা ও চিরবাঞ্ছিত অন্যতম।[১৫৫] সৈয়দা মোতাহেরা বানুর কাব্যচর্চা দীর্ঘকালের নয়। তাঁর কাব্য কাল মূলত আট-দশ বছরের। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন খুবই ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান নামাজি। তিনি পরলোকগমন করেন ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ ঢাকার হলি ফ্যামেলি হাসপাতালে।

---

১৫৩. শামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন মূলত একজন শিক্ষাবিদ, একাধারে সাহিত্যিক এবং বহু সমাজসেবা সংগঠনের সংগঠক ও পরিচালক। তাঁর অধিকাংশ লেখাই শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখিত। মুসলিম বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা শিশুদের বিভিন্ন শিক্ষামূলক গ্রন্থ "নার্স" নামে বাঙালি মহিলাদের জন্য নার্সিং এর উপরও তিনি একটি নির্দেশিকা লেখেন। (সোনিয়া নিশাত আমিন, **বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭; শত বছরে বাংলাদেশের নারী, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭)।

১৫৪. কবি মোতাহেরা বানুর বিয়ে হয় ১৯১৯ সালে ১৪ই এপ্রিল, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের আপন ভাগ্নে আবু নাসের মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর সঙ্গে। পারিবারিক পরিমণ্ডলে পিতামাতা, মাতামহ, স্বামী এবং স্বামীর বোন সারা তৈফুরের কাছ থেকে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হওয়ার অনুকূল পরিবেশ লাভ করেন। (সাঈদা জামান, **সৈয়দা মোতাহেরা বানু,** ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর– ২০০০ খ্রিঃ, পৃ ২২)।

১৫৫. কবি মোতাহেরা বানুর কবিতাগুলো মোসলেম ভারত নামক মাসিক পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে আষাঢ় ১৩২৭, শ্রাবণ ১৩২৭, ভাদ্র ১৩২৭ ও আশ্বিন ১৩২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মোতাহেরা বানুর মত একজন বাল্য কুলবধূর পক্ষে এই কাব্যচর্চা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল। সৈয়দা মোতাহেরা বানুর জীবদ্দশায় তার কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তবে তাঁর মৃত্যুর পর ড. আমলেন্দু দে'র সম্পাদনায় "কাফেলা" নামে তাঁর একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়। (সাঈদা জামান, **সৈয়দা মোতাহেরা বানু,** প্রাগুক্ত, পৃ ২৭)।

Dhaka University Institutional Repository

জেব-উন-নেসা-জামাল[১৫৬]

জেব-উন-নেসা-জামাল বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে গীতিকার হিসেবে পরিচিত। জেব-উন-নেসা জামাল লেখিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন একেবারে ছোট বয়সে। তখন তিনি মাত্র ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়েন, আজাদ পত্রিকার 'মুকুলের মহফিল' কলকাতা থেকে প্রকাশিত ছোটদের পত্রিকা জলছবি, শিশুসাথী, রং মশাল প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তিনি কবিতাই বেশি লিখতেন। পঞ্চাশ ষাটের দশক থেকে গদ্য রচনা শুরু করেন। সেসব লেখা মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হতো। তিনি একটি ইংরেজি বই অনুবাদ করেন। কিশোরদের উপযোগী এই বইটির নাম বেল সাহেবের টেলিফোন আবিষ্কার। জেব-উন-নেসা জামাল একজন সঙ্গীত শিল্পীও ছিলেন গায়িকা থেকে গীতিকার হওয়ার প্রেরণা আসে তাঁর মেয়ে জিনাত রেহানার জন্য। মেয়ের জন্য ১৯৬৬ সালে থেকে তিনি গান লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখা গানের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজারের মতো। "আমার যত গান" জেব-উন-নেসা জামালের প্রথম গীতি সংকলন। "আর্জি" নামে মরমী গানের একটি সংকলন ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আর একটি গানের বই "গান এলো মোর মনে।" এই প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার, লেখিকা ও টিভি ব্যক্তিত্ব জেব-উন-নেসা জামাল ৭০ বছর বয়সে ১৯৯৫ সনে ১লা এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।[১৫৭]

দৌলতুননেছা খাতুন

তিনি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতার কর্মস্থান বগুড়া জেলার সোনাতলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মী, সমাজ সেবিকা ছাড়া দৌলতুন্নেছা খাতুন লেখিকা হিসেবেও ছিলেন যথেষ্ট পরিচিত। দৌলতুননেছা খাতুন বার বছর বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাহিত্য চর্চা করেছেন। অল্প বয়স থেকেই দৌলতুননেছার রচনা বঙ্গশ্রী, দেশ, নবশক্তি, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। রস রচনা, একাংকীকা, প্রবন্ধ, গল্প,

---

১৫৬. জেব-উন-নেসা জামাল বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর। বাবা মরহুম ডাঃ কসির উদ্দীন মা জিয়াউন নাহার তালুকদার। মা জিয়াউন নাহার সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ হওয়া পর্যন্ত একটানা মিউনিসিপ্যালটির মহিলা কমিশনার ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে তারা একটি উচ্চবিত্ত পরিবার ছিল। ১৯৫৪ সালে বীরভূম জেলার সৈয়দ জামাল উদ্দীনের সঙ্গে জেব-উন নেসা জামাল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধহন। তিন বছর তিনি কণ্ঠশিল্পী হিসাবে বেতারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ গীত গ্রন্থ "সাগর তীর থেকে"। এছাড়াও রয়েছে গল্প গ্রন্থ হারানো দিনের গল্প" (সৈয়দা খালেদা জাহান, **জেব-উন-নেসা জামাল**, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন– ১৯৯৯ খ্রিঃ, পৃ ১১-১৭)।

১৫৭. সৈয়দা খালেদা জাহান, **জেব-উন-নেসা জামাল**, প্রাগুক্ত, পৃ ১১-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে তাঁর বাস্তববাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।[১৫৮] দৌলতুনছো খাতুনের প্রথম উপন্যাস "পথের পরশ" ১৯৫৭ সালে এবং দ্বিতীয় উপন্যাস "বধূর লাগিয়া" ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও পরবর্তী সময়ে "কোমরপুরের ছোট বউ", "বিবস্ত্র ধরনীও", "নাসিমা ক্লিনিক" নামের তিনটি উপন্যাস গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। আরও কয়েকটি উপন্যাস তিনি লেখেন। যার পাণ্ডুলিপি রয়েছে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি ছোটগল্প খুঁজে পাওয়া যায়। ঝর্ণা ও চন্দন বিষ পাহাড় নামের দুটি নাটক নিয়ে শিশুদের জন্য একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সমাজকল্যাণ বিষয়ক দুটি বইও তিনি লেখেন।[১৫৯] দৌলতুননেছা ১৯৭৭ সালে নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী স্বর্ণ পদক পান উপন্যাসে। এছাড়াও ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের আবদুর রাজ্জাক স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার।" একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। দৌলতন নেছা খাতুন ৪ঠা আগস্ট ১৯৯৭ সালে দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।[১৬০]

সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামালের জন্ম ১৯১১ সালের ২০ জুন। সুফিয়া কামাল কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি। তাঁর সাহিত্য জীবনের লেখালেখির পিছনে মামার বাড়ির নিজস্ব লাইব্রেরী মায়ের অনুপ্রেরণা এবং নবাব বাড়ির মিলাদের গজলের সুর, পাইক ও পেয়াদাদের জারি, সারি গানের সুর মূর্ছনা তাঁর কচি মনে যে দোলা দিত সেটারও প্রভাব ছিল। তার প্রথম কবিতা বর্ষা ও গল্প "সৈনিক বধূ"। ১৯২৬ সালে সওগাত পত্রিকায় কবিতা বাসন্তী প্রকাশিত হয়। তবে প্রথম গল্প গ্রন্থ কেয়ার কাঁটা ১৯৩৭ সালে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম হল– "সাঝের মায়া, (কবিতা) একাত্তরের ডায়রি, মায়া কাজল, উদাত্ত পৃথিবী" ইত্যাদি।[১৬১]

---

১৫৮. এছাড়াও তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন যেগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়। চিত্রনাট্য টিভি নাটকসহ আরও কিছু ভিন্নধর্মী লেখার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। (মুহাম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, **বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা,** ঢাকা ঃ দিদার পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৭ খ্রিঃ, পৃ ১৪৬)।

১৫৯. গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুননেছা খাতুন** (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন– ১৯৯৯ খ্রিঃ), পৃ ২১; এবনে গোলাম সামাদ, প্রসঙ্গ ঃ **দৌলতুননেছা খাতুন দৈনিক ইনকিলাব** ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ খ্রিঃ।

১৬০. গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুননেছা খাতুন,** প্রাগুক্ত, পৃ ২১-২২।

১৬১. কবি সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ **"সাঝেঁর মায়া"** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহার পাঠালে তাঁর কাছ থেকে আর্শিবাদ পত্র লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন। "তোমার কবিত্ব আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে এবং নিশ্চিত তোমার প্রতিষ্ঠা।" বিশ্বকবির আশা সত্যি হয়েছিল। সুফিয়া কামাল দেশী বিদেশীসহ চল্লিশটি পদকে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একুশ পদক ১৯৭৬। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, বেগম রোকেয়া পদক অন্যতম। প্রথম জীবনে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি শেষ জীবনে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ইসলাম সম্পর্কে বিতর্কিত কিছু মন্তব্যের জন্য তিনি সমালোচিত হন কোন কোন মহলে। তিনি ২০ নভেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

রোমেনা আফাজ

রোমেনা আফাজ মহিলাদের সাহিত্য চর্চার ভুবনে রহস্য সিরিজ লেখার একচ্ছত্র সাম্রাজ্ঞী এবং বাংলা উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। রচনা প্রাচুর্যে ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে তিনি সত্যিই একটি বিশেষ আসনের অধিকারী। বিশেষ করে এদেশের কিশোর যুবক সকলেই তাঁর লেখার একনিষ্ঠ ভক্ত।

রোমেনা আফাজ বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর দুটি রহস্য উপন্যাস সিরিজ বনহুর এবং "রক্তে আঁকা ম্যাপ" এর মধ্যে দিয়ে। এ যাবৎ তাঁর ১০৬টি উপন্যাস (আনুমানিক) প্রকাশিত হয়েছে। মহিলা সাহিত্যিকদের জগতে এতগুলো উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব শুধু মাত্র তাঁরই। রোমেনা আফাজ বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস লিখেছেন। সামাজিক উপন্যাস দেশের মেয়ে, কাগজের নৌকা, শেষ মিলন, আলেয়ার আলো ইত্যাদি। রোমান্টিক উপন্যাস জানি তুমি আসবে, প্রিয়ার কণ্ঠস্বর, ভুলের শেষে ইত্যাদি মান্দীগড়ের বাড়ি, রঙ্গীয়া কিশোর উপন্যাস।[১৬২] তার প্রথম রচনা "বাংলার চাষী" কবিতা অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক "বগুড়ার কথা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে তিনি আব্দুর রাজ্জাক স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার পান। নয় সন্তানের জননী রোমেনা আফাজ পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত সুখী। এখনও তিনি লিখে চলেছেন।

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকে প্রথম দুই দশকের মধ্যে আরও অনেক মুসলিম মহিলা কবি সাহিত্যিকদের প্রকাশ ঘটে। যারা গল্প, কবিতা, উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। মাফরুহা চৌধুরী এদেশের সাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ করে ছোটগল্পের লেখিকারূপে পরিচিত। শিক্ষকতার পাশাপাশি তৎকালীন "দৈনিক পাকিস্তান", দৈনিক বাংলা পত্রিকায় তিনি সাংবাদিকতার কাজ করেন। দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় মিশ্রী ছদ্ম নামে সদর অন্দর কলামটি পরবর্তীকালে দৈনিক বাংলা পত্রিকায় স্বনামে "স্বর ব্যঞ্জন" কলাম লেখেন। ১৯৪৮ সালে তার প্রথম গল্প দীনবন্ধু ছাপা হয়। তিনি বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, নজরুল একাডেমী, বাংলা সাহিত্য পরিষদ পদকসহ বহু সাহিত্য পদক লাভ করেন।[১৬৩]

১৯৯৯ সালে ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (শত বছরে বাংলাদেশের নারী, **নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯-৫০)।

১৬২. ১৯২৬ সালে বগুড়ার শেরপুরে রোমেনা আফাজের জন্ম। তাঁর বাবা কাজেমুদ্দীন একজন পুলিশ ইনসপেক্টর ছিলেন। বাবার চাকরির সুবাদে তিনি বাবার সাথে অখণ্ড ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছেন। রহস্য উপন্যাস লেখার বিশেষ প্রেরণা পেয়েছেন, বাবা যেহেতু পুলিশে কাজ করতেন। পঞ্চাশ দশকের এই লেখিকার কথা লন্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা "Our Home" এক নিবন্ধে A brilliant Authoress শিরোনামে তার সম্পর্কে একটি লেখা ছাপা হয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ডাঃ আফাজের সাথে তার বিয়ে হয়। পরবর্তীকালে স্বামীর সহযোগিতা ও প্রেরণা তাঁকে সাহিত্য চর্চায় অধিকতর আগ্রহী করে তোলে। সাহিত্য রচনায় তিনি বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪-১০৫)।

১৬৩. মাফরুহা চৌধুরী বগুড়া জেলার ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরাবর মেধাবী ছাত্রী ছিলেন ১৯৪৮ সনে ম্যাট্রিকে বাংলায় লেটার ও বৃত্তিসহ ১৯তম স্থান অধিকার করেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর পরই বিয়ে হয় কবি তালিম হোসেনের সঙ্গে। বিবাহিত জীবনে স্বামী ও শ্বশুরের উৎসাহও সহযোগিতায় পড়াশুনা

Dhaka University Institutional Repository

ড. মালিহা খাতুন

ড. মালিহা খাতুন ১৯২৮ সালের ২২ জুলাই পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লর্স স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান ও ১৯৫৯ সালে দর্শনে এম. এ. পাস করেন। ড. মালিহা খাতুন অনেক বই এর প্রণেতা মূলত তিনি নাট্যকার উপন্যাসিক গল্পকার প্রবন্ধকার ও কবি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ১৫টি। ১৯৭৭ সালে সাহিত্য বিনোদিনী পুরস্কার লাভ করেন।[১৬৪]

মাহমুদা খাতুন

মাহমুদা খাতুন সিদ্দীকা ১৯০৬ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। সওগাত এবং বেগম পত্রিকার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি নিয়মিত লেখেছেন। মাহমুদা খাতুনের প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের নাম "পসারিনী" ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য লেখা "মন ও মৃত্তিকা" ও অরণ্যের সুর"। বিভিন্নপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ও পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত তাঁর কবিতার সংখ্যা প্রায় শতাধিক। কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ১৯৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১৬৫]

জেব-উন নেসা আহমদ

জেব-উন নেসা আহমদ ১১ এপ্রিল ১৯৩৮ সনে সিলেটের লামাবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশক থেকে বেগম জেব-উন-নেসা আহমদ শিশু কিশোরদের জন্য লেখায় উৎসাহিত হন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৮টি। এছাড়া পান্ডুলিপি আকারে রয়েছে আরও ৩৯টি গ্রন্থ। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা পাঁচাত্তরের ওপরে। ১৯৩৩ সনের ১২ জানুয়ারী মাত্র ৫৫ বছর বয়সে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পরে তিনি মারা যান।[১৬৬]

চালিয়ে যান। কবি স্বামীর উৎসাহে তিনি তাঁর সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫-১৫৬)।

১৬৪. ডঃ মালিহা খাতুনের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান উল্লেখযোগ্য। নারী শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের যে কয়জন মহিলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি তাঁদের মধ্যে অনন্য। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন রোকেয়া স্মরণ সমিতি। এই সমিতির তিনি প্রতিষ্ঠাতা। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১২১)।

১৬৫. কবি মাহমুদা খাতুনের লেখাপড়া হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁর বাড়িতেই। বিখ্যাত "আনোয়ারা" পুস্তক রচয়িতা মুজিবর রহমানকে গৃহ শিক্ষক হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের খুব বেশী সুযোগ হয়নি তার। তাঁর বারো বছর বয়সে "ইসলাম জ্যোতি" নামে তার প্রথম কবিতা ছাপা হয় আল ইসলাম পত্রিকায়। মাহমুদা খাতুন বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন। অপরিণত বয়সে পুতুল খেলার মত বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। সে কারণে তিনি আজীবন কুমারীর মত জীবন কাটিয়েছেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০-৪১)।

১৬৬. জেব-উন-নেসা আহমেদ শিশু সাহিত্য এবং শিশু-কিশোর পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে একজন পথিকৃত হয়ে থাকবেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৩-১৩৪)।

Dhaka University Institutional Repository

মিসেস রাজিয়া মজিদ

মিসেস রাজিয়া মজিদ ১ জানুয়ারি ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪০ সালে মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর লেখিকা জীবন আরম্ভ হয়। বর্তমানে রোববার, ইত্তেফাক বেগম দৈনিক ইনকিলাব ও দৈনিক দিনকালে নিয়মিত লিখেছেন। তিনি "পেনশন" ছায়াছবির কাহিনীকার। টেলিভিশন ও রেডিও নাট্যকার। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৯ সালে একুশে পদক ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রচুর ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। মিসেস রাজিয়া মজিদ এখনও নিয়মতি লিখেছেন।

কবি আজিজা এন মোহাম্মদ

কবি আজিজা এন মোহাম্মদের জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়ে। পাশাপাশি প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে কবি আজিজা কাব্যচর্চা করেছেন। তার বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নয় সন্তানের জননী আজিজা এন মোহাম্মদ ১৯৮৪ সালের ৬ অক্টেবর ইন্তেকাল করেন।

তৎকালীন সময় যে সকল মহিলারা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরাই লেখার জন্য কলমও হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাই সাহিত্য ক্ষেত্রে তো অবশ্যই অন্যান্য ক্ষেত্রেও মহিলারা বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করতে থাকে সংখ্যায় কম হলেও। এঁদের মধ্যে সাংবাদিকতায় নূরজাহান বেগম[১৬৭] "বেগম" পত্রিকায়। নার্সিং এ তুবা খানম,[১৬৮] সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ রাজিয়া খান,[১৬৯]

---

১৬৭. নূরজাহান বেগম সওগাত সম্পাদক জনাব নাসির উদ্দিনের একমাত্র সন্তান এবং শিশু সংগঠক ও সাংবাদিক জনাব রোকনুজ্জমা খানের পত্নী। তাঁর সম্পাদিকা হওয়ার পিছনে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য এবং নিজের একাগ্রতা কাজ করেছে। ১৯৪৭ সালে বেগম পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। এরপর থেকে আজ অবধি এর দায়িত্বপালন করেছেন নূরজাহান বেগম। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২-৯৩)।

১৬৮. মেয়েদের নার্সিং পেশাকে আমাদের দেশের মানুষ সম্মানের চোখে দেখে না। এদের মধ্যে যারাই আর্ত মানবতার সেবায় এগিয়ে এসেছেন তুবা খানম তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। যখন কলকাতায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা চলছিল তখন তাঁরা নিরাপত্তার জন্য মেডিকেল কলেজের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। এ সময় তিনি লক্ষ্য করেন আহত হিন্দুদের সেবা করার জন্য হিন্দু নার্স আছে কিন্তু মুসলমানদের সেবার জন্য কেউ এগিয়ে আসেন। এই অসহনীয় অবস্থা তুবা খানমকে নার্সিং পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তীতে মা ও মামার আপত্তি সত্ত্বেও রেডক্রিসেন্টের মাধ্যমে লন্ডন থেকে নার্সিং এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ফিরে এসে এই পেশায় যোগদান করেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গৃহ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১)।

১৬৯. রাজিয়া খান জন্ম ১৯৩৬ সালে ফরিদপুরে। বাবা তমিজউদ্দীন খান ছিলেন, অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী, আইন সভার সদস্য এবং জাতীয় পরিষদের স্পীকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স এবং এম. এ. প্রথম হয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে ইংল্যান্ডে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাবিদ মেহেরুন্নেসা[১৭০] ইসলাম জোহরা বেগম, জোবেদা খানম, আনোয়ারা ইসলাম মনসুর সহ আরও অনেক মহিলা ব্যক্তিত্ব যাদের ত্যাগ ও সীমাহীন চেষ্টায় বর্তমানের মুসলিম নারী সমাজ শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

রাজনৈীতক অঙ্গনে নারীদের অবস্থান

পাক ভারত উপমহাদেশের নারী জাগরণ ও আন্দোলনের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি সন্ধিক্ষণ রয়েছে, যা কখনো চোখে পড়ে কখনো পড়ে না। এই সময়টাতেই নারীর অধিকার সচেতনতা গড়ে উঠেছে। একদিকে মেয়েদের সংগঠিত করার উদ্যোগ-প্রচেষ্টা, অন্যদিকে লেখালেখি ও আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে।

ইংরেজরা পলাশী ক্ষেত্রে যুদ্ধের অভিনয় করে কূট কলা কৌশলে সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে এবং ১৭৬৪ সালে মীর কাসেমকে পরাজিত করে বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনদণ্ড লাভ করেই ক্ষান্ত হল না। বরঞ্চ সমগ্র মুসলমান জাতিকে নির্মূল করার নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে লাগল। মুসলমানদের সকল আয়মা, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা হল। মুসলমানদের হাত থেকে খাজনা আদায়ের ভার দেয়া হল হিন্দুদের উপর। এভাবে মুসলমানরা সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হতে লাগল। শুধু তাই নয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনেও মুসলমানরা বাধাগ্রস্ত হতে লাগল। হিন্দু জমিদারদের এলাকায় গো কুরবানী এবং আজান দেয়া নিষিদ্ধ হল। দাড়ির উপরে ট্যাকস্ ধার্য করল, হিন্দুদের পূজাপার্বণে মুসলমানদেরকে চাঁদা দিতে, পূজার যোগান ও বেগার দিতে বাধ্য করা হল।[১৭১] বাংলার মুসলমানদের এ চরম দুর্দিনের জন্মগ্রহণ করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। একদিকে ব্রিটিশ এবং অপর দিকে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার মহাজনদের উপর্যুপরি অত্যাচার নিষ্পেষণে মুসলমানরা অনন্যপায় হয়ে মাথা নত করে সব কিছু সহ্য করে যাচ্ছিল। শরীয়তুল্লাহর আহবানে নিপীড়িত মুসলমানগণ দলে দলে তাঁর কাছে এসে জমায়েত হতে থাকে এবং ব্রিটিশও হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করল। এ আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীত, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তীতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ মুহসীন ওরফে দুদু মিয়া, সাইয়েদ আহমদ শাহ বেরেলভী, মওলানা শাহ মুহাম্মদ

লাভ করেন এবং ফিরে এসে অবজারভার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন। এখনও নিয়মিত লিখে চলেছেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭)

১৭০. মেহেরুন্নেসা ইসলাম জন্ম ১৯২১ সালে। ১৯৩৮ সনে ম্যাট্রিক পাস করে। পরবর্তী আই. এ. বি. এ. এবং এম. এড. করেন। তৎকালীন প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও স্কুলে কলেজের ছেলেদের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। মেহেরুন্নেসা ইসলাম ২০০২ সালে ইন্তিকাল করেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬-৭৭)।

১৭১. আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ২০০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাইল ও মাওলানা ইসহাক বিপ্লবী আহমদুল্লাহ, মওলানা বেলায়েত আলী, মওলানা ইমামুদ্দীন, সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী, প্রমুখ ব্যক্তিগণ।[১৭২]

১৮০০ সাল থেকে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম পরিবারের মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রকাশ্য ময়দানে সরাসরি ছিল না বললেই চলে। বরং ঐ সময় এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় শিক্ষা, সাহিত্য, নারী অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে। এ সময়ে ব্রিটিশ বিরোধি আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও অবদান রেখেছেন এরকম কয়েকজন মহিলার নাম উল্লেখ করতে চাই।

জোবেদা খাতুন চৌধুরী

জোবেদা খাতুন চৌধুরী জন্মেছিলেন ১৯০১ সালে ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলার এক প্রান্তিক অঞ্চলে। জোবেদা খাতুন,[১৭৩] ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিলেন। যখন জাতীয় পর্যায়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো সমগ্র বাংলায়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিলেতি পণ্য বর্জন এবং চরকায় সুতরা কাটার প্রচলনেও তখন মেয়েদের একটা প্রবলতর আন্দোলন ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলধারায় কংগ্রেসের পাশাপাশি অন্যান্য দলের উল্লেখরযাগ্য ভূমিকা থাকলেও কংগ্রেস তখন পর্যন্ত অগ্রগামী একটি দল। জোবেদা খাতুন ১৯২৮ সালে যোগ দিলেন কংগেসে। স্বামীর সস্নেহ প্রয়শই জোবেদা খাতুনকে রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখার সাহস জোগায়। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন, ব্রিটিশ লবণ আইন ভাঙ্গার আন্দোলনের সময় কংগেসি মহিলাদের নিয়ে সিলেট "শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ" নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। জোবেদা খাতুন অল্পদিনের মধ্যেই এই সংগঠনের সভানেত্রী মনোনীত হন। তিনিই তৎকালীন আমলে একমাত্র প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন পুরুষের পাশাপাশি। জোবেদা খাতুন সারা বৃহত্তর জেলায় মহিলা সংঘের ২৮টি শাখা স্থাপন করেন তখন। এই আইন অমান্য আন্দোলন প্রতিহত করতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সভা হয়। সে সভাতেও অন্যান্য সহকর্মী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন জোবোদা খাতুন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে সর্বপ্রথম

---

১৭২. পাক ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশদের অত্যাচার নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলিম সম্প্রদায় এবং এ কাজে ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছে হিন্দু সম্প্রদায়। যখনই মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তখনই তাদরেকে নির্মূল করার জন্য ব্রিটিশ ও হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্র হয়েছে। এরকম অবস্থায় উল্লিখিত মনীষিরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। এবং অন্দর মহলে যোগান দিয়েছে মুসলিম মহিলারা। প্রকাশ্য ময়দানে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। (আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৯-২০১)।

১৭৩. খান বাহাদুর শরাফত আলী চৌধুরীর কন্যা ছিলেন এই জোবেদা খাতুন চৌধুরী। ১৯১৯ সালে সিলেটের কৃতি সন্তান খান বাহাদুর আবদুর রহিম চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২০-১২২)।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলারা স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করে। এ সময় ১৪৪ ধারার জারি অবস্থায় পুলিশ বেষ্টিত হয়ে জোবেদা খাতুন স্বাধীনতার শপথবাক্য উচ্চারণ করে সহকর্মীদের উদ্দীপ্ত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অখণ্ড বাংলাসহ গোটা সুরমা উপত্যকায় নতুন একটি নারী সংগঠনের জন্ম হয় যার নাম ছিল "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।" সর্বসম্মতিক্রমে জোবেদা খাতুন এই সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন।[১৭৪]

সিলেটে জমিদারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় সে আন্দোলনেও জোবেদা খাতুন অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর জোবেদা খাতুন কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিলেন এবং মহিলা মুসলিম লীগ গঠন করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি।

বদরুন্নেসা আহমদ

১৯০৩ সালে মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে "নোয়ার্দা জানানা মাহফিল" প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী। ১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় কলকাতার আকাশ যখন রঞ্জিত তখন তিনি তাঁর জীবন বিপন্ন করে তিনি একটি "পীস কমিটি" গঠন করেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দুপক্ষের থেকেই তিনি একটি মেলার আয়োজন করেন। এভাবে দাঙ্গা প্রতিরোধে বদরুন্নেছা আহমদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

শামসুন নাহার মাহমুদ

শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক শামসুন নাহার মাহমুদের ব্যক্তিগত পরিচিতি আমাদের জানা। কিন্তু এই কর্মোউদ্যোগী মহিলা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন সময়ে। বেগম রোকেয়া বহু আগেই "আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম বা "নিখিল বঙ্গ" মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামসুন নাহার এই সমিতির সম্পাদিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।[১৭৫]

---

১৭৪. বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করাই ছিল এ সমিতির লক্ষ্য কিন্তু পরবর্তীতে নারীর প্রতি সামাজিক এবং পারিবারিক বৈষম্য দূরীকরণসহ নিরক্ষরতা দূরীকরণে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে নারী জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার শিক্ষা দেয়া হত। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রিলিফ সংগ্রহ ও বিতরণের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা ছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং ন্যায্য মূল্যে কাপড় সরবরাহের জন্য মহিলাদের কো-অপারেটিভ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০)।

১৭৫. বেগম রোকেয়া ১৯১৬ সনে "আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম" বা মুসলিম মহিলা সমিতি গঠন করেন। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্বে এ সমিতি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ক্রমে বাঙালি মুসলিম মহিলা সমাজে একটি চেতনাবোধ সৃষ্টি হয়। শামসুন নাহার এই সমিতির সম্পাদিকার দায়িত্বভার নিয়ে নানা ধরনের কাজ করে সুনাম অর্জন করেছেন। শামসুন নাহার ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতে বক্তৃতা দিয়ে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে সুনাম অর্জন করেছিলেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসন সংস্কার আইন পাস করেন। তখন পর্যন্ত ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। এই সময় শামসুন নাহার নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলকাতা শাখার তরফ থেকে এ দেশের মেয়েদের ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলন চালাতে থাকেন। যার ফলে ভারতীয় নারীরা ভোট দেয়ার অধিকার পেল এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কয়েকটি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হল। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে বাংলার মুসলমান নারী সমাজের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন শামসুন নাহার। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সে সময়ও তিনি ছিলেন দুঃস্থ দরিদ্র জনগনের পাশে। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ "এমবিই" উপাধিতে সম্মানিত করেন।

হোসনে আরা[১৭৬]

হোসনে আরার জন্ম ১৯১৬ সালে। হোসনে আরা ব্রিটিশ বিরোধি আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। স্বামীর সাহচর্যে তিনি "ভারত ছাড়" আন্দোলন অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনে প্রতিহত করার জন্য সারা ভারতে জারি হয়েছিল ১৪৪ ধারা। ১৯৩২ সালের ২৩ জানুয়ারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবাই মিছিল করে এসে মিলিত হবে কলকাতার গড়ের মাঠের মনুমেন্টের পাদদেশে। নির্ধারিত দিনে শুরু হয় নারী পুরুষ মিছিল। হোসনে আরা ও স্বদেশী পতাকা নিয়ে মিছিলে সামিল হয়েছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজ সৈন্যরা দলে দলে মিছিলের ওপর হামলা করে। সৈন্যদের হামলা উপেক্ষা করে হোসনে আরা পৌঁছে যান মনুমেন্টের কাছে। ১৪৪ ধারা ভংগের অপরাধে গ্রেফতার করা হয় হোসনে আরাকে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে কারাভোগ করেন প্রথম বাঙালি মুসলিম মেয়ে হোসনে আরা।

---

১৭৬. হোসনে আরা, জ্ঞান তাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভাতিজী ছিলেন। ১৯৩০ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামীর সাহচর্যে তাঁর ভেতর ক্রমশ রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। এবং তিনি ভারত ছাড় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কারাভোগ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** ঢাকা ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৬১)।

Dhaka University Institutional Repository

দৌলতুন্নেসা খাতুন

দৌলতুন্নেছা খাতুন ১৯২২ খ্রিঃ বগুড়ার সোনাতলায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন থেকে দৌলতুননেছার সংগ্রামী জীবন শুরু। মাত্র ১৪ বছর বয়সে দৌলতুননেছা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩০ সালের লবণ অমান্য আন্দোলনের সভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শোনা যায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে এলে তিনি বিপ্লবী বেনজীর আহমদের মতোই ঝাঁপ দেন নদীতে।[১৭৭] দৌলতুননেছা খাতুন গুপ্ত বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এমনকি তিনি গোপনে পিস্তল চালনার প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে লবণ আইন ভঙ্গ করার অপরাধে গ্রেফতার হন এবং তাঁদের বাড়ি ক্রোক করে বাড়ি থেকে তাঁর স্বামীকে বের করে দেয়া হয়। দৌলতুননেছা সাত মাস কারাভোগ করেন। এভাবে একের পর এক আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্বদান করেন দৌলতুননেছা আজীবন। এই আপোষহীন নেত্রী ১৯৯৭ সনে ৪ আগস্ট ইন্তেকাল করেন।[১৭৮]

১৮০০ খ্রিঃ থেকে ১৯৪৬ খ্রিঃ পর্যন্ত পাক ভারত উপমহাদেশ ছিল মুসলিম জাতির এক ক্রান্তিকাল। এই দুঃসময়ে ময়দানে পুরুষরা করেছেন অস্তিত্বের লড়াই এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। অন্যদিকে মুসলিম মহিলারা শিক্ষা আন্দোলন বিশেষ করে এবং সাথে সাথে আংশিক হলেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতে থাকে। ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে পাক ভারত উপমহাদেশ তথা উপমহাদেশের নারীদের অবস্থান।

---

১৭৭. দৌলতুন্নেছা খাতুনের মাত্র ১২ বয়সে তিনি স্বামী ডাঃ হাফিজুর রহমানের সংসারে যান। স্বামী ডাঃ হাফিজুর রহমান একজন উদার চেতা ও প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন। তারই অনুপ্রেরণায় উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক এবং সমাজকল্যাণে এম. এ. পাস করেন। দৌলতুননেছা শিক্ষাজীবনে সংগ্রাম করেছেন জ্ঞান সাধনায় দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে তা হয়েছে বিঘ্নিত। এবং বার্ধক্যে অর্থনৈতিক কষ্ট একমাত্র পুত্রের পঙ্গুত্ব একাকিত্ব সব মিলিয়ে কেটেছে এক দুর্বিসহ জীবন। (শাহেদ আলী, দৌলতুননেছা খাতুন, অন্তরঙ্গ আলোকে ঢাকা ঃ **দৈনিক ইনকিলাব,** ১৫ই আগষ্ট– ১৯৯৭ খ্রিঃ)।

১৭৮. গোলাম কিবরিয়া পিনু, দৌলতুননেছা খাতুন, **দৈনিক বার্তা,** রাজশাহী ঃ ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩ খ্রিঃ; গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুননেছা খাতুন বাংলা একাডেমী,** ঢাকা প্রথম প্রকাশ, জুন– ১৯৯৯ খ্রিঃ, পৃ ১৬; সদরুল হোসেন, **রংপুর প্রতিভা,** ১ম খণ্ড, ভারত খালী গাইবান্ধা, (প্রকাশকাল নেই) পৃ ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাকিস্তান আমলে নারীদের অবস্থা

(১৯৪৭-১৯৭০ খ্রিঃ)

এ উপমহাদেশের বুকে "পাকিস্তান" নামে মুসলমানদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সকল যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে অত্যন্ত ন্যায় সংগত। কারণ এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপরেই ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব একান্তভাবে নির্ভরশীল। পাকিস্তান আন্দোলনের দাবী একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকার মেনে নিতে পারেন নি, অপরদিকে হিন্দু কংগ্রেসও শুধু মেনে নিতেই অস্বীকার করেনি, বরঞ্চ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিরোধিতা করেছে। তথাপি উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানের ক্রমাগত সাত বছর যাবত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর নারীর রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন দেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে।[১] মানব সৃষ্টির সূচনার থেকেই মুসলমান ও অমুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উদ্ভব হয়েছে। এ যাবত বলবৎ আছে এবং চিরদিন থাকবে। উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান শত শত বছর ধরে একত্রে বাস করে আসছে একই শহরে, গ্রামে ও মহল্লায়, একই আঙ্গিনার এপারে-ওপারে। একই ভাষায় উভয়ে কথা বলে, একই মাটিতে জন্ম, একই আলো-বাতাসে লালিত-পালিত ও বর্ধিত। কিন্তু উভয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি। একই জাতিতে পরিণত হয়নি। উপমহাদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও এ সত্য স্বীকার করেন।[২]

বাবু নীরদ চৌধুরী বলেন সত্য বলতে মিঃ জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের বহু পূর্বেই দুই জাতিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ শুধু তত্ত্বকথা না এটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা। সকলেই বর্তমান শতকের প্রথমে এটির অস্তিত্বের কথা জানত। এমনকি আমরা ছেলেবেলায় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব থেকেই জানতাম।[৩]

---

১. আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৪।

২. স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "আর মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধেও। আমরা বহু শত বছর পাশাপাশি থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি। আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ দুঃখের মানুষ। তবু প্রতিবেশীর সংগে যে সম্বন্ধ মানুষোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাঠ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। আমরা জানি বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসেনা ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেয়া হয়।" (**রবীন্দ্র রচনাবলী,** ১২ শখণ্ড, শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃ ৯০৯; আবদুল মওদুদ ঃ **মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ,** সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃ ৪২০; আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪২০।

৩. **The Autobiography of an unknown Indian,** N. C. Choudhury, P- 229-231.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আন্দোলনের দুটি মাত্র বুনিয়াদ ছিল। একটি এই যে, আমরা দুনিয়ার অন্য কোন জাতির অংশ নই বরঞ্চ একটি স্বতন্ত্র জাতি। আর অন্য কোন জাতির সাথে মিলিত হয়ে কোন মিশ্র জাতীয়তাও বানাতে পারি না। দ্বিতীয়ত ঃ আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি আমাদের দ্বীন। এছাড়া আমাদের জাতীয়তার অন্য কোন ভিত্তি নেই। সুতারাং একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, নিছক কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে অথবা সাময়িক ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করা হয়নি। আন্দোলনের ভাবাবেগত অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে ভাবাবেগের উৎস ছিল মুসলমানদের ঈমান ও আকীদাহ বিশ্বাস। যার সূচনা হয়েছিল মানব জাতির সৃষ্টির সাথে সাথেই।[৪]

বাংলার জাতীয় জাগরণ, শিক্ষা আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন তথা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমেই পাক ভারত উপমহাদেশে ক্রমান্বয়ে নারী জাতি, সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনে তাঁদের অবস্থান করে নিতে চেষ্টা করেছিল। ব্রিটিশ ও হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষী পরিবেশ, সীমিত সুযোগ, পরিবেশের বাঁধা সামাজিক পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও এই জাগরণের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু নারী ব্যক্তিত্বের নাম জানা যায়। যে সকল নারীরা, নারীর অধিকার, মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদা, অবরোধ প্রথা দূর করা, স্ত্রী শিক্ষাবিস্তার, এসব নিয়ে আন্দোলন করেছেন। পাশাপাশি পুরুষরা সামগ্রিকভাবে দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়ে, রাজনৈতিক কাজ করার মধ্য দিয়ে নারী মুক্তি ও প্রগতির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই দুই ধারার মাধ্যমেই বাংলার নারী আন্দোলনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত এই দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হল। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল তৎকালীন পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। দেশ ভাগের পরও কিন্তু সম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হল। সে দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল নিঃস্ব হয়েছিল লাখ লাখ মানুষ এবং অগণিত নারী লাঞ্ছিত হয়েছিল সম্ভ্রম হারিয়েছিল।[৫] ভারত বিভাগের পরও ভারতে মুসলিম নিধনযজ্ঞ বন্ধ করা হয়নি। খুনের দরিয়া সাঁতার দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নরনারী, শিশু সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নেয়। দিল্লীর বিভিন্ন

---

৪. একথা সত্যি একমাত্র ইসলামী আবেগ অনুভূতিই ছিল এ আন্দোলনের প্রেরণাদায়ক শক্তি। মুসলামানদের এ পূর্ণ অনুভূতি ছিল যে, তাদের পরিণাম যা কিছুই হোক না কেন, তাদের কুরবানী দ্বারা অন্ততপক্ষে ইসলামের নামে একটি রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করবে। যেখানে ইসলামের বাণী সমুন্নত হবে এবং ইসলামী সমাজব্যবস্থা বাস্তবে কায়েম হবে। এটাই চিল সেই আবেগ অনুরাগ যা এ শ্লোগানে রূপায়িত হয়েছিল, পাকিস্তানের উৎস কি– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" (আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৫)।

৫. খোকা রায়, **সংগ্রামের তিন দশক** (১৯৩৮-১৯৮৬) (ঢাকা ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পুরানা পল্টন, ফেব্রুয়ারি– ১৯৮৬), পৃ ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড বন্ধের উদ্দেশ্যে মি. গান্ধী অনশন ব্রত পালন করতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবন দিয়েও তা বন্ধ করতে পারেননি।[৬]

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর কংগেস নেত্রী জোবেদা খাতুন কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। মহিলা মুসলিম লীগ গঠন করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি। ফলে মুসলিম মহিলাদের ভেতর এ সময় প্রাণ চাঞ্চল্য জাগ্রত হয়। ঠিক এ সময় সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হল। জোবেদা খাতুনের নেতৃত্বে মহিলা মুসলিম লীগের কর্মীরা ঘুরে ঘুরে এ গণভোটকে সাফল্যমণ্ডিত করার কাজে নিজেদের মেধা এবং শ্রম বিনিয়োগ করলেন একেবারে শর্তহীনভাবে।[৭] ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের ফলে শামসুন নাহার মাহমুদ স্বামী পুত্রসহ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং রাজধানী ঢাকা শহরে বসবাস শুরু করেন। পাকিস্তান শাসনামলে সমাজকল্যাণ মুলক কাজের পাশাপাশি মুসলিম লীগ সরকারের রাজনৈতিক কাজেও তিনি অংশ নেন। পূর্ব পাকিস্তান এমন কোন সংঘ, কমিটি, বা প্রতিষ্ঠান ছিল না সরকারি বা বেসরকারি যাই হোক তার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন না।[৮]

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পত্নী বেগম লিয়াকত আলী খান প্রতিষ্ঠা করলেন এক নারী সমিতি। যার নাম ছিল "অল পাকিস্তান ওমেনস এসোসিয়েশন"। সংক্ষেপে "আপওয়া"। ঢাকাতে এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ব পাকিস্তান শাখা গঠিত হয়। সমিতির প্রেসিডেন্ট হলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী বেগম নূরুল আমীন, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। পরবর্তীকালে বেগম শামসুন নাহার বহুবার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।[৯] পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রীর

---

৬. আব্বাস আলী খান, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৭। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন– (ক) গান্ধীজি তাঁর অনশন ভাঙ্গার শর্তগুলো বলতে থাকেন। তাহলো– হিন্দু ও শিখদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের আক্রমণ করা এক্ষুণি বন্ধ করতে হবে। তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তারা ভাইয়ের মতো একত্রে বাস করতে পারবে। (খ) হিন্দু ও শিখকে এ নিশ্চয়তা দানে সকল চেষ্টা করতে হবে যেন কোন একজন মুসলমানও জানমালের নিরাপত্তার অভাবে ভারত থেকে চলে না যায়। (Abul Kalam Azad, **India Wins Freedom,** p- 238)

৭. বাঙালি মুসলিম রাজনীতিবিদ, জোবেদা খাতুন চৌধুরীর অবদান উল্লেখযোগ্য **শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।

৮. বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্ত্রী শিক্ষা বোর্ড, প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটি, বিভিন্ন সরকারি ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়, কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং স্কুলের গভার্নিং বডির সদস্য ছাড়াও বিভিন্নভাবে পাকিস্তানের গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮)।

৯. দেশ বিভাগের পর পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগের নেতৃত্বস্থানীয়দের স্ত্রীরা বা মহিলা মুসলিম লীগের নেত্রীবৃন্দ (যাঁরা ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন) দেশ বিভাগের পর অবাঙালি মুসলিম জনগণ ভারত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে থাকে এবং বিহার থেকে ব্যাপকহারে মুসলিমরা পূর্ব পকিস্তানে আসে। সরকার এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২১; আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, **শামসুন্নহার মাহমুদ** (১৯০৮-১৯৬৪) ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ৫ ফেব্রুয়ারি– ১৯৮৭, পৃ ৩৬)।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আহবানে পশ্চিম পাকিস্তানের তরুণী ও মহিলারা প্রাথিমিক চিকিৎসা, ত্রাণ পুনর্বাসনের ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং রিফিউজি মহিলা শিশুদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এছাড়াও এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে লীগ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের সংগঠনগুলো ছিল উইম্যান্স ভলান্টারি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৪৮) পাকিস্তান উইম্যান্স ন্যাশনাল (১৯৪৯), পাকিস্তান উইম্যানস নেভাল রিজার্ভ (১৯৪৯) এই তিনটি মহিলা সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠনের মূল নিয়ন্ত্রক ছিল সরকার এবং সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পালন করতেন বেগম রানা লিয়াকত আলী খান।[১০]

পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে ১৯৪৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বেগম রানা লিয়াকত আলী খান মহিলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সক্রিয় ১০০ জন মহিলার এক সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলনে আগত মহিলাদের নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় "আপওয়া" সংগঠন।[১১] বাড়ির বাইরে মেয়েদের পেশাগত কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা, মেয়েদের শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধির জন্য কুটির শিল্প কেন্দ্র চালু করা, অর্থকরী উৎপাদনমুখী শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। করাচি, লাহোর, পেশোয়ারের ছোট বড় শহর গ্রামের মহিলারা সেই সংগঠনের কাজে যুক্ত হতে থাকে। এই সংগঠনের মূল সংগঠকরা ছিলেন মূলত সরকারি উচ্চ পর্যায়ের অফিসারের স্ত্রী। সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে, সরকারি পরিকল্পনার সঙ্গে মিল রেখে এই সংগঠনের কাজ করতে হত।[১২] ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হল।[১৩] ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছিল গভর্নর হাউসে।[১৪]

---

১০. ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে তবে মেয়েরাও যেন দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য মেয়েদের কে ন্যাশনাল গার্ড হিসেবে সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার আহবান জানান হয়। অল্প সময়ের মধ্যে করাচিসহ সর্বত্র ২ হাজার ৪০০ মহিলার সমন্বয়ে তিনটি ব্যাটলিয়ন গঠিত হয়। এই সামরিক প্রশিক্ষণ মুসলিম নারী জাগরনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (Eds) **Woman of Pakistan**; Zed books Ltd. London, New Jew Jersey U. S. A. 1987, P- 52).

১১. ১৬ বছরের উর্ধ্বে ধর্ম-বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মহিলার জন্য উন্মুক্ত এই সংগঠনটি মহিলাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত সচেতনতা সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যেই গ্রাম ও শহরের মহিলাদের মধ্যে কাজ করতে সচেষ্ট হয়। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২১:)।

১২. Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (Eds) **Women of Pakistan,** P- 552.

১৩. বেগম সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী। এবং যুঁই ফুল রায় ও নিবেদিতা নাগকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হলো। মূলত কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, কমিউনিস্ট মহিলা কর্মী যুঁই ফুল রায়, নিবেদিতা নাগ, পূর্ণিমা বকশী, রীনা চক্রবর্তী, মজিরা খাতুন, মনোরমা বসু, হেনাদাস, জ্যোৎস্না নিয়োগী, ভানু দেবী, অর্পণা প্রমুখ কয়েকজন ছিলেন এই মহিলা সমিতির উদ্যোক্তা। জাতিগত স্বাতন্ত্রের দাবিতে পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে যারা ছিল ঘোর বিরোধি। সুতারাং তাঁদের মন মানসিকতা ও কর্মকাণ্ডে তারই প্রতিফলন ছিল। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২৪)।

১৪. **সাপ্তাহিক বেগম,** সওগাত প্রেস, পাটুয়াটুলী, ডিসেম্বর, ১৯৫০।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন জেলা ও শহরে জনগণের বিভিন্ন দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে আন্দোলন, সংগ্রাম, মিটিং, মিছিল, করতে থাকে। এ সময় হামীদা বেগমের নেতৃত্বে মহিলাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীল কাজের সূচনা হয়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রতিবেশীদের মধ্যে সেবামুলক কাজ করতেন। অভাবগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্য দান, বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা, শীতবস্ত্র বিতরণ, সেলাই, হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ দান এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষিকা এবং সরকারি অফিসারগণের স্ত্রীগণের মধ্যে জামায়াতের দাওয়াত দানের মাধ্যমে তাদের সংগঠিত করা, ঘরে ঘরে ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করা. এসবই মহিলা জামায়াতের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৬ সালের পর থেকে বহু বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে হামিদা বেগম, নাইয়ার বানু সহ বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা এ পথে দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমান দেন।[১৫]

দেশ বিভাগের আগে পূর্ববাংলার প্রায় সমস্ত স্কুল কলেজে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশি। দেশ ভাগের পর দলে দলে হিন্দু ভারতে চলে যেতে থাকে। অন্যদিকে দলে দলে মুসলমান নরনারী পাকিস্তান এসে আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রী শিক্ষক ঘাটতি দেখা দেয় মারাত্মক আকারে। এ অবস্থায় মুসলিম লীগ সরকার চাপের মুখে পড়ে। ছাত্র শিক্ষক শূন্যতার কবলে পড়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। জোবেদা খাতুন সিলেটের নারী শিক্ষার বিস্তারে এই প্রচন্ড বাঁধা দূর করার বাসনা নিয়ে শহর থেকে শহরতলী ঘুরেছেন। ছাত্র সংগ্রহসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার জন্য এবং আর্থিক অনুদান সংগ্রহের কাজে।[১৬] একই রকম ছাত্র শিক্ষক শূন্যতা সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলাগুলোতেও।

সামজ উন্নয়নের কাজ ও নারীর অধিকার নিয়ে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের কাজ শুরু হলেও শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার জন্য আগ্রহী মহিলাদের কোন সংগঠন ছিল না। ১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় "বেগম" পত্রিকা এবং ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "বেগম ক্লাব"। বেগম ক্লাব এবং পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানের মহিলাদের সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠল। বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী।[১৭]

---

১৫. আব্বাস আলী খান, **জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস,** প্রথম খন্ড, ঢাকা ঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, দ্বিতীয় প্রকাশ, জমাদিউল আউয়াল ১৪১৭, সেপ্টেম্বর– ১৯৯৬, পৃ ১৪২।

১৬. সিলেট কলেজই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের স্কুল কলেজ নিয়ে সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে থাকে। ঢাকার ইডেন কলেজ ও স্কুল নিয়েও চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্রী সংখ্যা কমে যাওয়ায় ইডেন ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলকে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। কমিউনিষ্টপার্টির নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ১৫ ই নভেম্বর এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ছাত্রী ও শিক্ষকগণ। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬)।

১৭. ১৯৫৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বেগম ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের প্রগতিমনা লেখিকা, সমাজসেবিকা, শিল্পী, রাজনৈতিক নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত পৃ ১৩২)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সালে দেশ জুড়ে ভাষা বিতর্ক জমে ওঠে। সিলেটের বড় বড় মুসলীম লীগ নেতারা বাংলা ভাষার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুর রব নিশতার এক সংক্ষিপ্ত সফরে সিলেটে আসেন। জোবেদা খাতুন এক মহিলা প্রতিনিধি দল নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা চালুর দাবি জানান।[১৮]

একই দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পাঠালেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের কাছে। ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ সিলেটের গোবিন্দ পার্কে মহিলা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। যদিও সে জনসভাটি সফল করতে পারেননি তারা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর মহিলা সমাজের উপরও চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২২ তারিখ ভোরে জোবেদা খাতুনের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। সিলেটে। একইভাবে ঢাকায় বিভিন্ন সংগঠনের মহিলারা সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও একটি নিন্দা প্রস্তাব নেন। এ সময় নারায়ণগঞ্জ মডার্ন গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষয়ত্রী মমতাজ বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১৯]

নারী আন্দোলন নেত্রী দৌলতননেসা খাতুন ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনে। সচেতন ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৫৪ সালে রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়ার সমন্বয়ে গঠিত এলাকার মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন।[২০] ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে আইন পরিষদে আরও যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন নূরজাহান মুরশিদ, বদরুন্নেসা আহমদ, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তফতুন্নেসা, মেহেরুন্নেসা খাতুন ও তিনজন সংখ্যালঘু সদস্য ও নেলী সেন গুপ্তা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হন। এদের বিজয় সাফল্যে নারী সমাজের মধ্যে আলোড়ন ও আত্মবিশ্বাস জাগে।[২১]

---

১৮. রাষ্ট্রভাষা বাংলা চালুর দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে যারা স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তারা হলেন– জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা শাহের বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, সামসি খানম চৌধুরী নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন প্রমুখ। এ স্মারকলিপি পাঠানোর খবর পেয়ে তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম বেগম জোবেদা খাতুন চৌধুরীর কাছে এ অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন। সেখানে উল্লেখ ছিল, সিলেটের পুরুষরা যা পারেনি আপনারা তাই পারলেন। (**শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১)।

১৯. এই বিক্ষোভকালে আরো কিছু মহিলা গ্রেপ্তার হয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য জানা যায়নি। ঢাকা ও চট্টগ্রামে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৩১)।

২০. ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর গণরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ডিক্রী জারি করেন। এর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের গণপরিষদের তদানীন্তন স্পীকার পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতা তমিজউদ্দিন খান পূর্ব পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। বহু রাজনৈতিক জটিলতা শেষে সারা পাকিস্তান থেকে জরুরি অবস্থা ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৯২ (ক) ধারা উঠিয়ে নেয়া হয়। এতে পুনরায় আইনসভার কাজ শুরু হয় রাজবন্দীরা মুক্তিপায়। (মালেকা বেগম, নূরজাহান মুরশিদের সাক্ষাৎকার (ঢাকাঃ **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২; গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতুন নেছা খাতুন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬)।

২১. গোলাম কিবরিয়া পিনু, **দৌলতন নেছা খাতুন,** প্রাগুক্ত, প, ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

দৌলতননেসা খাতুন ৯২ (ক) ধারায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করলে প্রতিবাদ আন্দোলনে সক্রিয় হন। এবং ১১ মাস কারা ভোগ এবং ৩ মাস অন্তরীণ থাকেন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নূরজাহান মোরশেদ, বেগম রাজিয়া বানু ও দৌলতননেসা খাতুনকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। দৌলতন নেছা ফিল্ম সেন্সর বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৫৭-৫৮ সালে জেলা রিফর্ম কমিশনের সদস্য ছিলেন এবং তিনি গাইবান্দার জেলা পরিদর্শকও ছিলেন।[২২]

পাকিস্তান আইনসভায় দুজন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন– বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন ১৯৩৭ সালে এবং বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ তিনি মুসলিম লীগ নেত্রী ছিলেন।[২৩] মেয়েদের আইনগত অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এই দুজন মহিলা প্রতিনিধি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৪৮ সালে বাজেট অধিবেশনে মহিলাদের কাজের অধিকার ও সুযোগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য মহিলা প্রতিনিধিরা জোরালো প্রস্তাব রাখেন। এই দুই মহিলা নেত্রীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উদ্যোগে বিষয়টি সংসদে উত্থাপিত হয় এবং মুসলিম মহিলার ব্যক্তিগত আইনের শরীয়ত বিল (১৯৪৮) কার্যকরী হয় ১৯৫১ সালে।[২৪]

১৯৪৮ সালের ৮ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সভায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সংসদে নারীর সমঅধিকার সম মর্যাদা, সমকাজে সমবেতন ও শরিয়ত আইনে মুসলিম মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়গুলো অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিতে সনদটি সংসদে গৃহীত হয়।[২৫] এই সনদটি গৃহীত হওয়ার পিছনে বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ এবং বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহর প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ সালের রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলনের পর সরকারি দমননীতির ফলে সব ধরনের আন্দোলনই কিছুদিনের জন্য বন্ধ হতে বাধ্য হয়।

মুসলীম লীগ সরকারের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মওলানা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি, গণতান্ত্রিক দল এবং পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠিত হয়েছিল দেশের প্রথম যুক্তফ্রন্ট।

---

২২. **শত বছরে বাংলাদেশের নারী,** নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮১।

২৩. **Women of Pakistan,** প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫। বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার সালমা সোবহানের মা, আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বোনের মেয়ে।

২৪. মুসলিম মহিলার ব্যক্তিগত আইনের শরীয়ত বিল ১৯৪৮ কার্যকরী করার দাবিতে সংসদীয় নেত্রী জাহানারা শাহনেওয়াজ ও অন্যান্যের নেতৃত্বে.বেশ কিছু মহিলা সংসদ অভিমুখে প্রতিবাদ মিছিল করেন। (**মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫)।

২৫. **Women of Pakistan,** Ibid, P- 56.

Dhaka University Institutional Repository

এক কালের মুসলিম লীগ নেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরী এই সময় দলত্যাগ করেন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন কিন্তু তিনি জয়ী হননি। নূরজাহান মোর্শেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলিম লীগ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন শামসুন্নাহার আহমেদ। তিনিও পরাজিত হন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যা নূরজাহান মোর্শেদ, বেগম রাজিয়া বানু ও বেগম দৌলতুন্নেসাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।[২৬]

১৯৫৬ সালে চূড়ান্তভাবে যে সংবিধান রচিত হলো তাকে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের জন্য বিশেষ নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট করা ও মহিলাদের ভোটে মহিলাদের নির্বাচনের আইন ঘোষিত হল। এই আইনের ফলে মহিলারা সাধারণ আসন ও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে মাত্র দুই ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছিল। মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের তৃতীয় অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের মধ্যে নূরজাহান মোর্শেদ যোগ দিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। এই সময় সরকারি উদ্যোগে সোশ্যাল ওয়ার্ক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।[২৭]

মূলত সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য এই কমিটি গঠিত হয়। মিউনিকের সম্মেলনে এই কমিটির পক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা যোগ দেন। মুসলীম লীগ সরকার কর্তৃক জমিদারি প্রথা বাতিল করা হয়। এ সময় জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় জমিদার গৃহিনী, কন্যা ও পরিবারের মহিলারা রিকসা শোভাযাত্রা করে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে জমিদারি ব্যবস্থা বজায় রাখা অথবা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান।[২৮]

আবু হোসেন সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের নানা সংকটের মোকাবিলা করতে না পারায় মূলত কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামীলীগ এদের বিক্ষোভের মুখে আবু হাসেন সরকারের পতন ঘটে। এবং কেন্দ্র ও পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু অচিরেই ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ

---

২৬. ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে গণপরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫৬ সালেরর ২৩ মার্চ সেই সংবিধান চালু হয়েছিল। এই সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলমিক রিপাবিলিক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্বপাকিস্তান এই দুটি প্রদেশের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। উভয় প্রদেশে ১৫০ করে ৩০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনসহ পার্লামেন্টারি শাসন প্রতিষ্ঠার বিধান দেওয়া হল। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪০)।

২৭. পূর্বপাকিস্তানে সে সময় সরকারি উদ্যোগে 'সোশ্যাল ওয়ার্ক কনফারেন্স" অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সকল স্তর ও সকল মতের সমাজ কল্যাণমূলক কাজে যুক্ত মহিলাদের নিয়ে সভা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এই সম্মেলন থেকে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের নারী পুরুষকে নিয়ে গঠিত এই কমিটির সভানেত্রী ছিলেন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদের স্ত্রী এবং সহ সভানেত্রী ছিলেন নূরজাহান মোর্শেদ। (**মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২)।

২৮. এই প্রথম ধনী জমিদার কন্যা, স্ত্রী, মহিলারা মূল্যবান গাড়ির পরিবর্তে রিকসা শোভাযাত্রা করে প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা করেন। এঁরা সরকারের কাছে স্মারক লিপিতে জানান যে, জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির ফলে ৮০ লাখ লোক অনশনের সম্মুখীন হবে। (সাপ্তাহিক বেগম, ১৯৫৬-৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

ও শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়।[২৯] ১৯৫৯ সাল থেকে সামাজিক ও ধর্মীয় সভানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞা শিথিল হতে থাকলে কিছু কিছু সমাবেশ মিলাদ-মাহফিল ইত্যাদির সুযোগে বিভিন্ন সমিতির সদস্যরা একত্রিত হতে থাকেন।[৩০] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব এবং সাথে সাথে কিছু কিছু ইসলাম বিদ্বেষী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পারিবারিক আইন ১৯৬১ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক আইন ১৯৬১ প্রণীত হলে, পূর্ব পাকিস্তানে মাওলানা আব্বাস আলী খান, জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ, পশ্চিম পাকিস্তানে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবসহ ওলামা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ পবিত্র কুর'আনের কিছু বিধানের পরিপন্থি। ১৯৬১ –এর পরিবারিক আইনের কয়েকটি ধারা, যেমন– চার বিয়ে নিয়ন্ত্রণ, তালাকের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন।[৩১]

ষাটের দশকে পশ্চিম পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের কাজ আরও বৃদ্ধি পায়। আলেম উলামা ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পারিবারিক আইন সংশোধনীর দাবি সোচ্চার থাকলেও নারী সমিতির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পরিষদে কোন সংশোধন ছাড়াই আইনটি গৃহীত হয়।[৩২] আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও নারীর অবস্থান ও মর্যাদা আগের তুলনায় কোন অংশেই বৃদ্ধি পায়নি বরং দিন দিন মূল্যবোধের অবক্ষয় ইসলাম বিরোধি পরিবেশ সৃষ্টির কারণে নারী সমাজকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।

---

২৯. সব রকম সভা, সংগঠন বেআইনি ঘোষিত হল। সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হল। এ পরিস্থিতিতে নারী সংগঠনের কার্যক্রমও বন্ধ থাকল।

৩০. ৬০ সালের শুরুতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলো সাংগঠনিক কাজ পুনরায় শুরু করে। গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, ওয়ারী মহিলা সমিতি, শিশুরক্ষা সমিতি, আপওয়া, শিশুকল্যাণ পরিষদ ছাড়াও ইউনির্ভাসিটি উইমেন্স ফেডারেশন, ইসলামিক মহিলা মিশন, নিখিল পাকিস্তান সমাজ কল্যাণ সমিতির পূর্ব পাকিস্তান শাখা ইত্যাদি মহিলা সংগঠন সামরিক শাসনের মধ্যেও তাদের সম্মেলন, বার্ষিক সাহিত্য সভা ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করেছেন। (খোকা রায়, **কংগেসের তিন দশক,** ঢাকা ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃ ১৬০)।

৩১. কুরআন এবং সুন্নাহ একজন পুরুষকে চার বিয়ের অনুমতি দিয়েছে কুর'আন ও সুন্নাহ স্পষ্ট ভাষায় তালাকের পথ বন্ধের বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির পথ নির্দেশ করেছে। উত্তরাধিকারের ব্যাপারেও নির্ধারিত আইন রয়েছে। সুতরাং অত্যন্ত সংগত কারণেই কোর'আন সুন্নাহ বিরোধি কোন আইন ধর্মীয় আইনেরই বিরুদ্ধাচারণ।

৩২. এ দেশের নারী সমাজ দুর্বার আন্দোলন করে সামরিক জান্তার কাছ থেকে তাদের ন্যায্য পারিবারিক অধিকার আদায় করলেও বাস্তবে সমাজ জীবনে এর সুফল পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। পরিবারিক আইন ১৯৬১ প্রণীত হলেও সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হয়নি। (**মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯)। আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও সামাজিক ও পরিবারিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানের কোন উন্নয়ন হয়নি কারণ এতে প্রমাণিত হয় স্রষ্টার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আইন কেউ দিতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানে প্রাপ্ত নারীর ভোটে নারী সদস্য নির্বাচনের অধিকার অনুযায়ী ১৯৬২র সংবিধানে ২০ ধারায় জাতীয় পরিষদে ৬টি ও প্রত্যেক প্রদেশের ৬টি আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত হল এবং রাষ্ট্রপতি দ্বারা সংরক্ষিত ৬টি মহিলা আসনে প্রার্থী মনোনয়ন হওয়ার পদ্ধতি চালু হল। কয়েকজন মহিলা মন্ত্রীকেও এ সময় নিয়োগ করা হল।[৩৩]

১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে শামসুন্নহার মাহমুদ নির্বাচকমণ্ডলীর বিলের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আইন পরিষদসহ নির্বাচকমণ্ডলীতে ২৫ শতাংশ আইন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার দাবি জানান পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যা বেগম রোকাইয়া আনোয়ার। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যা বেগম জি. এ. খান ও বেগম মমিনুন্নেসা আহাদের বিরোধিতার ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।[৩৪] জাতীয় পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ৩টি করে ৬টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, মহিলা সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট প্রদেশ থেকে আইন পরিষদের মাধ্যমে সদস্যা নির্বাচিত হবেন। সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না এই বিধিবলে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নির্বাচিত সদস্যা বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ অযোগ্য ঘোষিত হলে সেই আসন শূন্য হয় এবং উক্ত আসনে উপনির্বাচন হয়।[৩৫]

এ সময় সামরিক সরকার প্রধান আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তান সফর কালে ময়মনসিংহের মহিলাদের প্রতিনিধি স্থানীয় চারজন মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করে নারী সমাজের কিছু দাবি পেশ করেন।[৩৬] তখন পূর্ব পাকিস্তানের সম্মিলিত নারী সমাজের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসটির নাম হয় "রোকেয়া হল"।

১৯৬২ সাল থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত সরকার বিরোধী ও গণতন্ত্রকামী দলের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের জন্য প্রগতিশীল দল সিদ্ধান্ত নিলেও তা কার্যকরি হয়নি। অবশেষে খাজা নাজিমুদ্দিনের উদ্যোগে পাঁচটি বিরোধী দল নির্বাচনের লক্ষ্যে ৯ দফা কর্মসূচি নিয়ে "কপ" গঠন

---

৩৩. **Women of Pakistan,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬০।

৩৪. উক্ত প্রস্তাবটির মুল বক্তব্যটি কি তা অবশ্য জানতে পারিনি।

৩৫. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারী সমাজের উল্লিখিত অবস্থানের সাথে সাথে নানাবিধ সামাজিক কমিশনে পূর্ব পাকিস্তানের আপওয়ার সদস্যা ছাড়াও অন্য সমাজ সেবী মহিলাদের যুক্ত করা হচ্ছিল। (**মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০)।

৩৬. ময়মনসিংহের মহিলা প্রতিনিধিদের পেশকৃত দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল–

(১) স্বামী স্ত্রী দুজনই সরকারি কর্মচারী হলে উভয়কে একইস্থানে কাজের সুবিধা দান। (২) মহিলাদের জন্য সি.এস.এস. পরীক্ষাদানের সুযোগ ও পরবর্তীতে সি. এস. পি. অফিসার হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। (**মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০)।

Dhaka University Institutional Repository

করে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধীদল বা "কপ" মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনীত করে ১৯৬৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।[৩৭]

নির্বাচনকালে দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সমাজ কল্যাণমূলক কাজের বাইরে পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে এ দেশের নারী সমাজ বিভিন্নমুখী কাজ এবং ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রচারে ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়ে পুরো দুই দশকে জুড়ে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি ও অধিকার অর্জনের বিষয়টি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে এ সময় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ময়দানে সক্রিয় ছিল।[৩৮]

১৯৬৪ সালের নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ পরাজিত হন। তবে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত যুদ্ধের সময় সরকারি উদ্যোগে প্রতিরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। রাইফেল চালানোসহ নানা রকম প্রাথমিক স্তরের সামরিক শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা, নার্সিং ইত্যাদি প্রশিক্ষ মহিলা সংগঠন "আপওয়ার" উদ্যোগে সাধারণ মহিলাদের দেয়া হল।

১৯৬৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। সামরিক আইন ভঙ্গ করে দেশে আন্দোলন সংগ্রাম সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করা হল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা আইয়ুব খান ১৯৫৬ সালে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রণীত শাসনতন্ত্র বাতিল করে সাড়ে তিন বছর স্বৈরশাসন চালু রাখেন। বেসামরিক শাসন উত্তরণের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬২ সালের ১ মার্চ নতুন এক শাসনতন্ত্র জারি করেন।[৩৯] পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে একমাত্র জামায়াতে

---

৩৭. মিস ফাতেমা জিন্নাহ গার্লস গাইডের প্রধান ও নার্সিং সমিতির উপদেষ্টা ছিলেন। মাওলানা মওদূদীসহ সকল ইসলামী দল মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী হিসেবে সমর্থন করেন। অপর পক্ষে সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে জোর প্রচার চালানো হয় যে, রাষ্ট্র প্রধান পদে মহিলার নির্বাচন জায়েজ নয়। (**মালেক বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩)।

৩৮. পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম বাংলার নারী সমাজ পশ্চাৎপদ অবস্থায়, শিক্ষার অভাবে, অর্থনৈতিক কষ্টে অবরুদ্ধ পরিবেশে বঞ্চিত ছিল তার ন্যায্য অধিকার থাকে। দীর্ঘদিনের নারী আন্দোলনে অভিজ্ঞ শামসুননাহার মাহমুদ, বেগম সুফিয়া কামাল দৌলতন নেছা খাতুন জামায়াতে ইসলামীর হামিদা বেগম, নাইয়ার বানু, মুনিরা বেগম প্রমুখ নেত্রী নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ ভিন্ন মত ও পথে এগিয়ে গেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর শামসুন্নাহার মাহমুদ দৌলতন নেসা জোবেদা খাতুন প্রমুখ নেত্রী মনে করলেন সরকারি দলের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়েই নারী প্রগতি আসবে। অন্য দিকে বেগম সুফিয়া কামালসহ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মুসলিম লীগ সরকারের মাধ্যমে অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক দলের মাধ্যমে নারী সমাজের প্রগতি সম্ভব নয়। তাই এঁরা যে যেখানে থেকেছেন সেখানেই গড়ে তুলেছেন স্থানীয় বেসরকারি মহিলা সংগঠন ও আন্দোলন। (**মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬)।

৩৯. ১৯৬২ ১ জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং ৮ জুন রাওয়াল পিণ্ডিতে নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। ২৪ জুন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৯ জুন নেতা এক বিবৃতিতে আইয়ুব খানের জারিকৃত শাসনতন্ত্র গ্রহণীয় নয় বলে ঘোষণা করেন। (অধ্যাপক গোলাম আযম, **জীবনে যা দেখলাম,** দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা ঃ কামিয়াব প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর– ২০০২, পৃ ২৬২-২৬৩)।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামীই সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুনবর্হাল হয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ তো আইয়ুব খানই দখল করে নেন। এ দলের যারা ঐ সংগঠনের যোগদান করেননি তাদের নতুন করে সংগঠিত হতে স্বাভাবিকভাবেই বিলম্ব হয়। অন্যান্য দলের মধ্য থেকেও আইয়ুব খান কিছু নেতাকে ভাগিয়ে নিতে সক্ষম হন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজের দল আওয়ামী লীগকে পুনবর্হাল না করে অন্যান্য দলের সাথে মিলে আন্দোলন করার পক্ষে ছিলেন। তাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথেই প্রথম সাক্ষাৎ করেন।তিনি আইয়ুব বিরোধি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য মাওলানা মওদূদীর উপরই সবচেয়ে বেশি আস্থা পোষণ করতেন। তাই মত বিনিময়ের পর দু'জনে একমত হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতের কন্টিনেন্টাল হোটেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন।[৪০]

তার মতো গতিশীল এক নেতার অভাবে পূর্ব ও পাশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ পেল না। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। সংগ্রাম আন্দোলনে গণজাগরণ সৃষ্টি হয় উনসত্তরে। ৬৯ এর ১৯ জানুয়ারি ছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয় এবং ২০ জানুয়ারি ছাত্রী মিছিলে গুলি করা হয়। শহীদ হলো আসাদ। এই হত্যার বিরুদ্ধে হরতাল সভা মিছিল হতে থাকে। ৭ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার থেকে মহিলা সমাজের উদ্যোগে শোক মিছিল করা হয়। অসংখ্য বোরকা পরা মহিলা এতে যোগ দেন।[৪১] দেশে ছাত্র আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল। এ সময় মহিলা সমাজ রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে বিবৃতি দেওয়া, পথসভা, সমাবেশ ইত্যাদি কাজ করেছেন। ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনে নারী সমাজের সমর্থন সৃষ্টির জন্য ছাত্রীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন মহিলা নেত্রীর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল।[৪২]

১৯৭০ সালে ৪ এপ্রিল বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মালেকা বেগমকে সাধারণ সম্পাদিকা করে প্রতিষ্ঠিত হলো "পূর্বপাকিস্তান মহিলা পরিষদ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ছিল একমাত্র সংগঠন যে সংগঠন সারা দেশের মহিলাদের সংগঠিত করে এবং সংগ্রামের প্রস্তুতি

---

৪০. তার মতো এক গতিশীল নেতার অভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ পেল না। (অধ্যাপক গোলাম আযম, **জীবনে যা দেখলাম,** দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা ঃ কামিয়াব প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ ডিসেম্বর, পৃ ২৬২-২৬৩)।

৪১. কবি সুফিয়া কামালের ১৯৬৯ সালের ব্যক্তিগত **দিনলিপি** থেকে অপ্রকাশিত। গ্রন্থকারের কাছে সংরক্ষিত।

৪২. এই সংগ্রাম কমিটির নেত্রী ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, আহবায়িকা মালেকা বেগম। প্রয়াত বদরুন্নেসা আহমদ, জোহরা তাজউদ্দিন, আমেনা আহমেদ, নূরজাহান মোর্শেদ, সেলিনা বানু, নূরজাহান কাদের, সারা আলী, রাজিয়া বানুর নাম উল্লেখযোগ্য। মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছাত্রী-নেত্রীদের ভূমিকা ছিল প্রধান। রাজধনী সহ বাংলাদেশের সর্বত্র মহিলা ও ছাত্রী নেত্রীরা সফর করে করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন মহিলা সংগ্রাম পরিষদের শাখা। (মালেকা বেগম, **বাংলার নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০-৬১)।

Dhaka University Institutional Repository

নেওয়ার জন্য আহবান জানায়। তাই মহিলারা শহরে শহরে সমাবেশ করে লাঠি হাতে কুচকাওয়াজ করেন, স্বামী সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রেরণা দেন।[৪৩]

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পূর্ব বাংলার ওপর পাকবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হল। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস হানাদার পাক সেনাদের দ্বারা প্রায় ১৪ লাখ নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং স্বামী, পুত্র, কন্যা, বা অভিভাবক হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। এর ভেতর ধর্ষিতা হয়েছেন হাজার হাজার। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সামরিক ও গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ৭ কোটি বাঙালি নর নারী জনতার জীবন মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারত না সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া। মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ যেমন হয়েছেন ট্রেনিং পাওয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা, তেমনই দেশের ভেতর মুক্তিযোদ্ধাদের সব কাজে সামরিক ট্রেনিং ছাড়াই সাহায্য করেছেন। আপামর জনসাধারণ ছিলেন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বেশিরভাগ বইপত্রে সাধারণ মানুষের অনুপস্থিতি পীড়াদায়ক।[৪৪] স্বাধীনতার মাত্র দুদিন আগে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ দেশের সেরা বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পীদের হত্যা করা হয়েছে। যা সমগ্র জাতিকে হতবাক করে দেয়। রক্তস্নাত নয় মাস ব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হল।[৪৫] পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন একটি দেশ বাংলাদেশের সৃষ্টি হল। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত সম্ভ্রমহারা অগণিত মা, বোন, অগণিত ভাইয়ের জীবন দানকে জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে শ্রদ্ধাভরে।

---

৪৩. ১৯৬৯ সালের **দৈনিক ইত্তেফাক,** সংবাদ, সাপ্তাহিক বেগম; **মালেকা বেগম বাংলাদেশের নারী আন্দোলন,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২; মালেকা বেগম, **নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক,** ঢাকা ঃ অন্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি- ২০০২, পৃ ৫৮।

৪৪. মালেকা বেগম, **নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক,** প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪।

৪৫. রাজধানী ঢাকার শহীদ মিনারে কবি সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসমাবেশ হয়েছিল। সে সভায় সকলে মিলে শপথ নিয়েছিলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলবেন। (সুফিয়া কামাল, **একাত্তরের ডায়েরী,** ঢাকা ঃ জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৯)।